যদি জীবন গড়তে চান-১

যদি জীবন গড়তে চান

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
গ্রন্থকার, আহকামে যিন্দেগী, ফাযায়েলে যিন্দেগী,
বয়ান ও খুতবা, ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ,
ফিকহুন্ নিছা, আহকামে হজ্জ,
কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র
ও ইসলামী মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি।

প্রকাশনায়
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪

যদি জীবন গড়তে চান

মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

প্রথম প্রকাশ:
আগষ্ট ২০১৪, শাউয়াল ১৪৩৫

প্রকাশনায়:
মাকতাবাতুল আবরার

মূল্য: ২৯০.০০ (দুইশত নব্বই টাকা মাত্র)

সংক্ষিপ্ত সূচিপত্র

সূচিপত্র

(এক) মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য আলোচনা

তৃতীয় অধ্যায়

যদি যুবক জীবন গড়তে চান

চতুর্থ অধ্যায়

যদি বৃদ্ধ জীবন গড়তে চান

পঞ্চম অধ্যায়

যদি বরকতময় জীবন গড়তে চান

ষষ্ট অধ্যায়

যদি সমৃদ্ধ জীবন গড়তে চান

সপ্তম অধ্যায়

যদি টেনশনমুক্ত জীবন গড়তে চান

অষ্টম অধ্যায়

যদি নিরাপদ জীবন গড়তে চান

নবম অধ্যায়
যদি সুখ-শান্তিময় জীবন গড়তে চান

দশম অধ্যায়

যদি সুখী দাম্পত্য জীবন গড়তে চান

একাদশ অধ্যায়

যদি খাঁটি মু'মিন-মুসলমান রূপে জীবন গড়তে চান

দ্বাদশ অধ্যায়

যদি খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার রূপে জীবন গড়তে চান

সূচি সমাপ্ত

ভূমিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّيْنَ، وَعَلٰى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ.

أَمَّا بَعْدُ:

ইসলাম আমাদের যে জীবন-বিধান ও জীবন- দর্শন প্রদান করেছে, তা অনুসরণ করলে যেকোনো বয়সের, যেকোনো শ্রেণীর ও যেকোনো স্তরের মানুষের জীবন সুন্দরভাবে গঠিত হবে। সব বয়সের, সব শ্রেণীর, সব স্তরের মানুষের যেমন জীবন কাম্য তেমন জীবন গঠন করার জন্য ইসলাম ব্যতীত আর কোনো বিকল্প নেই। “যদি জীবন গড়তে চান” নামক এ পুস্তকে সব বয়সের, সব শ্রেণীর, সব স্তরের মানুষের যেমন জীবন কাম্য তেমন জীবন কীভাবে গড়া যায় কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তারই আলোচনা সন্নিবেশিত করা হয়েছে। পুস্তকটির সংক্ষিপ্ত সূচি দেখলেই পুস্তকটির পরিচয়, পুস্তকটির উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কি তা স্পষ্ট হয়ে উঠবে ইনশা আল্লাহ।

সব বয়সে সব স্তরে জীবনকে সুন্দর করতে কে না চায়? জীবন সুন্দর করে গড়ার প্রাণান্তকর চেষ্টা আমরা সকলেই করে যাচ্ছি। কিন্তু অনেকেই তা করছি নিজেদের চিন্তাপ্রসূত পন্থায়, নিজেদের মনগড়া পদ্ধতিতে। তাই যেমন জীবন কাম্য তেমন জীবন গড়ে তোলা সম্ভবপর হয়ে উঠছে না। শিশু-কিশোরদের জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না, যুবক জীবন সুন্দর করে গড়ে তোলা সম্ভব হচ্ছে না, বৃদ্ধ জীবন সুন্দর হচ্ছে না। সর্বান্তকরণে চাইলেও সমৃদ্ধ ও বরকতময় জীবন গড়ে উঠছে না, সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠছে না, টেনশনমুক্ত জীবন গড়ে উঠছে না, নিরাপদ ও শান্তিময় জীবন গড়ে উঠছে না, নূরে নূরান্বিত আলোকময়

জীবন গড়ে উঠছে না। কিসের অভাবে গড়ে উঠছে না। শুধু কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে জীবন গড়ার সুষ্ঠ দিকনির্দেশনা সামনে আনার অভাব। এ অভাব পূরণ করার লক্ষ্যেই পুস্তকটি রচনার প্রয়াস গ্রহণ করা হয়েছে। সব বয়সের, সব শ্রেণীর, সব স্তরের মানুষের জন্যই পুস্তকটি তাদের কাম্য জীবন গড়ে তোলার দিকনির্দেশনা প্রদান করবে ইনশা আল্লাহ।

আল্লাহ তাআলা এ পুস্তকটিকে আমার ও মুসলমান ভাই-বোনদের জীবন গঠন ও নাজাতের ওছীলা করুন। আমীন!

বিনীত
মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
২৯ রমজান, ১৪৩৫ হিজরী
২৮ জুলাই, ২০১৪ খৃষ্টাব্দ

প্রথম অধ্যায়

যদি শিশু-কিশোরদের জীবন গড়তে চান

প্রথম অধ্যায়

যদি শিশু-কিশোরদের জীবন গড়তে চান

শিশু ও কিশোরের পরিচয়

সাধারণত অল্পবয়স্ক বালক বা বালিকাকে শিশু বলা হয়। অনেক সময় প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বালক-বালিকাকে শিশু বলা হয়। আর কিশোর/ কিশোরী হল ১১ থেকে ১৫ বছর বয়স্ক বালক-বালিকা।

শিশু-কিশোরদের জীবন গড়ার জন্য করণীয়

শিশু-কিশোরদের জীবন গড়ার জন্য মৌলিকভাবে দুটো কাজ করতে হয়। এক. শিশু-কিশোরদের সাস্থ্যগত পরিচর্যা। দুই. তাদের মানসিক পরিচর্যা। আজকাল মানুষ আগের তুলনায় অনেক বেশি সাস্থ্য-সচেতন। তাছাড়া চিকিৎসাশাস্ত্রও অনেক উন্নত হয়েছে। ফলে সাস্থ্যগত পরিচর্যার উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে মানুষ আগের চেয়ে অনেক বেশি ওয়াকেফহাল। তাই শিশু-কিশোরদের সাস্থ্যগত পরিচর্যা সম্বন্ধে এখানে তেমন আলোচনার প্রয়োজন বোধ করছি না। এখানে শুধু শিশু-কিশোরদের মানসিক পরিচর্যার মাধ্যমে তাদের মানসিক জীবন গড়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় আলোচনা পেশ করছি।

শিশুদের জন্মের পূর্বে করণীয়

বস্তুত শিশু-কিশোরদের মানসিক পরিচর্যা শুরু হয় তাদের জন্মেরও পূর্ব থেকে। শিশু-কিশোরদেরকে গড়ার চিন্তা তাদের জন্মের আগ থেকেই করতে হয়। সন্তানকে ভাল বানানোর পরিকল্পনা তার জন্মের আগ থেকেই গ্রহণ করতে হয়। এজন্য একজন ভাল মেয়ে বিয়ে করতে হয়, তাহলে তার গর্ভে একজন ভাল সন্তানের আশা করা যায়। সন্তান গর্ভে আসার পর মায়ের চিন্তা-ভাবনা, মায়ের মন-মানসিকতা ও মায়ের আচার-আচরণ সবকিছুর প্রভাব পড়ে থাকে গর্ভস্থ সন্তানের ওপর। তাই সন্তান গর্ভে আসার পর মাকে সব ধরনের কু-চিন্তা ও পাপ-চিন্তা পরিহার করতে হবে এবং ভাল চিন্তা নেক চিন্তা রাখতে হবে। তাহলে সন্তানের ওপর তার সু-প্রভাব পড়বে। ভাল মা না পেলে ভাল সন্তান লাভ হয় না। ভাল ফল চাইলে ভাল গাছ লাগাতে হয়– এটাই স্বাভাবিক রীতি। তেতুল গাছ বুনে মিষ্টি আমের আশা করা যায় না। সেখ সাদী (রহ.) বলেন,

مکن بد کہ بد بینی از یار نیک ÷ نمی روید از تخم بد بار نیک

অর্থাৎ, বন্ধুদের সাথে খারাপ ব্যবহার করলে তাদের থেকে খারাপই দেখতে পাবে। খারাপ বিজ বপন করলে তার থেকে ভাল ফল দেখতে পাবে না।

সন্তান হল মাতা-পিতা নামক গাছের ফল। অতএব ভাল গাছ তথা ভাল মাতা-পিতা না হলে ভাল ফল তথা ভাল সন্তান পাওয়া যাবে না।

ফকীহ আবুল লাইছ সমরকন্দী (রহ.) বর্ণনা করেছেন, হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে একজন পিতা তার এক পুত্রকে নিয়ে এল। ঐ পুত্র পিতা-মাতার অবাদ্ধ ছিল। পিতা মনে করল, খলীফা ওমর খুব কড়া মানুষ, তাঁর কাছে পুত্রকে নিয়ে যাই, তিনি দু' চারটে ধমক দিয়ে দিলে পুত্র সোজা হয়ে যাবে। খলীফার কাছে পুত্রকে নিয়ে গেল। বলল, মাননীয় খলীফা! এই পুত্র আমার হক আদায় করে না, সে আমার অধিকার আদায় করে না, সে আমার অবাদ্ধ, সে আমাকে মানে না। সন্তানের দায়িত্ব পিতা-মাতাকে মান্য করা। এটা পিতা-মাতার অধিকার। তাই লোকটা বলল, সে আমার অধিকার আদায় করে না। হযরত ওমর (রা.) কড়া প্রকৃতির হলেও কোনো বাছ-বিচার ছাড়াই কারও ওপর কঠোরতা করবেন তা তো হতে পারে না। দুই পক্ষের কথা না শুনে কোনোদিন সঠিক বিচার করা যায় না, এটাই বাস্তবতা, এটাই নিয়ম। তাই তিনি ছেলেটির কাছে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি পিতা-মাতার হক আদায় কর না? তখন ছেলেটি জিজ্ঞাসা করল, হে খলীফা! সন্তানের ওপর পিতা-মাতার অধিকার আছে। পিতা-মাতার ওপরও কি সন্তানের কোন অধিকার আছে? খলীফা বললেন,

হ্যাঁ, সন্তানেরও অধিকার আছে। তখন খলীফা সন্তানের তিনটা বড় অধিকারের কথা উল্লেখ করলেন।

এক: أَنْ يَسْتَنْجَبَ أُمَّةً

অর্থাৎ, তার জন্য একজন ভাল মায়ের ব্যবস্থা করবে।

দুই: أَنْ يُحْسِن اسْمَهٗ

অর্থাৎ, তার একটি ভাল নাম রাখবে।

তিন: وَيُعَلِّمُهُ الْقُرْاٰنَ

অর্থাৎ, তাকে কুরআন শিক্ষা দিবে।

ছেলেটি তখন বলল, হে খলীফা! তাহলে শুনুন। আমার মা হলেন সিন্ধুর একজন বান্দী, আমার পিতা ঐ বান্দীকে বিবাহ করেছিলেন, আমি তার গর্ভের সন্তান। আর পিতা আমার নাম রেখেছেন "হাফ্‌ল" (যার অর্থ দল, পানি একত্র হওয়ার স্থান ইত্যাদি। অর্থাৎ, নামের অর্থ খুব একটা ভাল নয়।) আর আমাকে এক অক্ষরও কুরআন শরীফের তা'লীম দেননি। ছেলেটির কথা শুনে হযরত ওমর (রা.) একটা লাঠি নিয়ে পিতার উপর উঁচু করলেন যে, এখন তোমাকে শাসন করা দরকার। তুমি বলছ, সন্তান তোমার অধিকার আদায় করে না, তুমিই তো তার অধিকার আদায় করনি। অর্থাৎ, সে তোমার অধিকার আদায় করবে কেন? আগে তো কর্তব্য ছিল তোমার সন্তানকে ভালভাবে গড়ে তোলা অর্থাৎ, তার অধিকার আদায় করা। তুমি যতটুকু সন্তানের অধিকার আদায় করবে, তুমি যেভাবে সন্তানকে গড়ে তুলবে, সন্তান থেকে তুমি ততটুকুই সেভাবেই পাবে। এখন দেখা যাচ্ছে তুমি তোমার দায়িত্ব পালন না করে উল্টো সন্তানের বিরুদ্ধে অভিযোগ করছ। তোমাকেই আগে শাসন করা দরকার। লোকটাকে তিনি দরবার থেকে তাড়িয়ে দিলেন। (তাম্বীহুল গাফিলীন) এখান থেকে বুঝা যাচ্ছে, ভাল সন্তান চাইলে তার জন্য একজন ভাল মায়ের প্রয়োজন। ভাল মা থেকেই ভাল সন্তান পাওয়া যায়। দুনিয়াতে অভিজ্ঞতায়ও দেখা গেছে অধিকাংশ বুযুর্গ এবং অলি-আউলিয়ার বংশ ভাল এবং তারা ভাল মায়ের সন্তান। অতএব সন্তানকে ভাল করার পদক্ষেপ সন্তানের জন্মের আগ থেকেই নিতে হয়। ভাল সন্তানের জন্য একজন ভাল চিন্তা-চেতনা ও ভাল মন-মানসিকতা সম্পন্ন মেয়ে ও ছেলে চাই। মাতা-পিতার চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার প্রভাব তাদের সন্তানের মধ্যে বিস্তৃত হয়। হাদীছে বিবাহ করার সময় মেয়ের দ্বীনদারীর দিককে প্রাধান্য দিতে বলা হয়েছে। চিন্তা করলে বুঝে আসে মেয়ে তথা বিবাহকারী পুরুষের

ভবিষ্যত সন্তানের জননী যেন ভাল চিন্তা-চেতনা ও ভাল মন-মানসিকতা সম্পন্ন হয় তা নিশ্চিত করার জন্যই এই নীতি রাখা হয়েছে।

সন্তানের মধ্যে মাতা-পিতার চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতার প্রভাব পড়ার একটা বাস্তব ঘটনা হযরত থানভী (রহ.) বয়ান করেছেন। এক নতুন দম্পতি অর্থাৎ, স্বামী-স্ত্রী দুজনে স্থির করল, আমরা একটি সু-সন্তান চাই। তাই এখন থেকে আমরা কোনো খারাপ কাজ করব না, কোনো খারাপ চিন্তা করব না, খারাপ কিছু মনে স্থান দিব না। যাতে আমরা একটি সু-সন্তান লাভ করতে পারি। সিদ্ধান্ত মোতাবেক তারা জীবন পরিচালনা করতে থাকল। এক সময় তাদের একটি ছেলে সন্তান হল। ছেলেটি কিছু বড় হয়েছে। তাকে সাথে নিয়ে পিতা একদিন কোথাও যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে রাস্তার পাশে ছিল একটা বরই গাছ। ছেলেটি ঐ গাছ থেকে একটা বরই ছিড়ে খেল। তখন পিতা চিন্তা করলেন, এ তো পরের মাল চুরি করে খাওয়া হল। এই চুরির মনোবৃত্তি তার মধ্যে কোত্থেকে এল! ঘরে ফিরে বিবিকে জিজ্ঞাসা করল- সত্য বলবে। সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় তোমার মনে এরকম চুরির চিন্তা এসেছিল কি না? বিবি বলল, হ্যাঁ সন্তান গর্ভে ছিল, এ সময় আমাদের পাশের বাড়ির বরই গাছ থেকে মালিকের অগোচরে একটা বরই ছিড়ে খেয়েছিলাম। এ কারণেই হয়তো সন্তানের মধ্যে তার প্রভাব পড়েছে।

সন্তানাদিকে দ্বীনদার বানানোর পদ্ধতি প্রসঙ্গে কুরআন-হাদীছের আলোকে ওলামায়ে কেরাম আরও বলেছেন, মানুষ যদি হালাল রিযিক গ্রহণ করে, তাহলে তার মধ্যে ইসলাম বিরোধী কোনো চেতনা জন্ম নিবে না। বরং হালাল রিযিকের আছরে তার রক্তে, তার মাংসে, তার মস্তিস্কে, তার মন-মানসিকতায়, তার চিন্তা-চেতনায়, তার সবকিছুতে ইসলামী চেতনা প্রতিফলিত হবে। তাই একজন ভাল সন্তান চাইলে মা বাবাকে হালাল রিযিক গ্রহণ করতে হবে। কারণ হালাল খাবার থেকে যে রক্ত জন্ম নিবে, সেই রক্ত থেকে যে বীর্য জন্ম নিবে, তার মধ্যে ভাল আছর থাকবে, তার দ্বারা সন্তানের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা ভাল গঠিত হবে। সম্প্রতি বৈজ্ঞানিক গবেষণায়ও প্রমাণিত হয়েছে, বীর্যের মূল যে জিন, সেই জিনই সন্তানের শারীরিক আকার-আকৃতিসহ স্বভাব-চরিত্র সবকিছু নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। স্বভাব-চরিত্র ও চিন্তা-চেতনায় হারাম মালের আছর হয়– এটা বাস্তবেও প্রমাণিত। একটি ঘটনা। হযরত মাওলানা ইয়াকূব নানুতবী (রহ.) –যিনি এক সময় দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন– একবার এক দাওয়াতে গিয়েছিলেন। কয়েক লোকমা খানা খাওয়ার পরই তাঁর মনে সাড়া জাগল এ খাদ্যটা বোধ হয় হালাল নয়। আল্লাহর পক্ষ থেকে বুযুর্গানে দ্বীনের অন্তরে এরকম অনুভূতি জাগ্রত হয়ে থাকে। তিনি মেজবানকে অর্থাৎ, ঘরওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি এই খাবার কীভাবে সংগ্রহ করেছেন? জানতে

পারলেন, এই খাবার হালাল উৎস থেকে আসেনি। ইয়াকূব নানুতবী (রহ.) খাওয়া বন্ধ করে দিলেন, আর এক লোকমাও গ্রহণ করলেন না। ইয়াকূব নানুতবী (রহ.) নিজে বয়ান করেছেন, এরপর ঐ যে এক দুই লোকমা খেয়েছি, তার কারণে দুই মাস পর্যন্ত মনের মধ্যে গোনাহের চেতনা জাগ্রত হতে থাকত এবং মনের মধ্যে গোনাহের অন্ধকার অনুভব হত। একবার এক গোত্র প্রধানের দেয়া লাড্ডু খেয়েও হয়রতের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল। প্রায় মাসখানেক হযরতের মনে গোনাহের চেতনা জাগ্রত হত।

শরীআতে যেসব খাদ্য-খাবার হারাম করা হয়েছে, তা হারাম করার একটা প্রধান কারণ হল তার ভেতর খারাপ প্রভাব রয়েছে। শুকর, কুকুর খাওয়া হারাম করা হয়েছে। কারণ তাদের মধ্যে মন্দ চরিত্রের বৃত্তি রয়েছে। যেমন– তাদের মধ্যে বেহায়ায়ী তথা নির্লজ্জতা রয়েছে। যারা সেগুলো খায় তারাও সেগুলোর মত নির্লজ্জ হয়ে যায়। পশ্চিমা বিশ্বের যারা শুকর খায়, তারা এমন নির্লজ্জ হয়ে যায় যে, মানুষের সামনে রাস্তায় পার্কে নির্লজ্জভাবে যৌন কর্মে লিপ্ত হয়। তারা এমন নির্লজ্জ কেন হয়? কারণ নির্লজ্জ হওয়ার মত খাদ্য-খাবার তারা গ্রহণ করে। এছাড়াও আরও অনেক কারণ রয়েছে।

বুঝা গেল ভাল চিন্তা-চেতনা ও ভাল মন-মানসিকতা সম্পন্ন সন্তান চাইলে মাতা-পিতাকে সন্তান জন্মের পূর্ব থেকেই হালাল রিযিক গ্রহণ করতে হবে। নইলে হারাম খাদ্য-খাবারে তাদের চিন্তা-চেতনা ও মন-মানসিকতা খারাপ হয়ে গড়ে উঠবে আর সন্তানের মধ্যেও তার প্রভাব বিস্তৃত হবে। সারকথা সন্তানকে ভাল বানানোর কার্যক্রম তার জন্মের আগ থেকেই শুরুকরতে হবে।

শিশুর জন্মকালীন করণীয়

সন্তানকে ভাল বানানোর জন্য তার জন্মের সময়ও কিছু করণীয় রয়েছে এবং তারপরেও ধীরে ধীরে অনেক কিছু করণীয় রয়েছে। যখন সন্তান জন্মগ্রহণ করে, তখন সুন্নাত হল সন্তানের কানে আযান ইকামতের শব্দাবলী শোনানো। ডান কানে আযানের শব্দগুলো, বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শোনাতে হয়। জন্মের শুরু থেকেই তার কানে যেন আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূলের কথা এবং সবচেয়ে উত্তম ইবাদত নামাযের কথা প্রবেশ করে। যদিও এখন সে কিছুই বোঝে না, তা স্বত্ত্বেও এর দ্বারা তার মনের মধ্যে আল্লাহ ও আল্লাহর রসূলের নাম এবং আযান ইকামতের সুন্দর কথাগুলোর আছর হবে। শুরু থেকেই তার মনে আল্লাহ, আল্লাহ্‌র রসূলের নাম ও কালিমা ইবাদতের সু-প্রভাব পড়বে। যদিও ঐ শিশু তখন আযান ইকামতের মর্ম বুঝতে সক্ষম নয়, তবুও তার মনে আযান ইকামতের মধ্যে কথিত আল্লাহ আল্লাহর

রসূলের নাম ও ইবাদতের কথার সু-প্রভাব পড়বে। নামাযের জন্য যেমন দাঁড়িয়ে কানে আঙ্গুল দিয়ে আযান দেয়া হয় বা নামাযের জন্য যেভাবে ইকামত দেয়া হয়, সন্তানের জন্য আযান-ইকামত দেয়ার নিয়ম সেরকম নয় বরং ডান কানে শুধু আযানের শব্দগুলো আর বাম কানে ইকামতের শব্দগুলো শুনিয়ে দিতে হয়। ছেলে-মেয়ে উভয়ের ক্ষেত্রেই এটি সুন্নাত।

নবজাতকের কানে আযান ইকামতের শব্দাবলী শোনানোর পর কোনো দ্বীনদার বুযুর্গ দ্বারা খেজুর বা কোনো মিষ্টদ্রব্য চিবিয়ে তার সামান্যটুকু ঐ নবজাতকের মুখের মধ্যে তালুতে লাগিয়ে দিতে হবে। একে বলা হয় 'তাহ্নীক'। এটি করা সুন্নাত। এতে করে বুযুর্গের মুখের লালার মাধ্যমে বুযুর্গীর সু-প্রভাব নবজাতকের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হবে।

হাদীছে এসেছে– হযরত আয়েশা (রা.) বয়ান করেছেন,

إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُؤْتٰى بِالصِّبْيَانِ، فَيُبَرِّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. الحديث. (رواه مسلم في باب حكم بول الطفل الرضيع حديث رقم ٦٨٨)

অর্থাৎ, রসূল (সা.)-এর কাছে নবজাতকদের আনা হত। তিনি তাদের জন্য বরকতের দুআ করতেন এবং তাদের তাহনীক করতেন। (মুসলিম)

জন্মপরবর্তী দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে করণীয়

মাতার অবর্তমানে বা তাঁর অপারগতার অবস্থায় দুধমাতার মাধ্যমে সন্তানকে দুধ পান করাতে চাইলে দুধমাতা হিসাবে চরিত্রবান ও দ্বীনদার মহিলা নির্বাচন করা কর্তব্য। কারণ, বাচ্চার চরিত্রে দুধের একটা বিরাট প্রভাব থাকে। এ ক্ষেত্রে দুধমাতার চরিত্রের প্রভাব সন্তানের মধ্যে পড়বে। তাই দুধমাতা হিসাবে চরিত্রবান ও দ্বীনদার মহিলা নির্বাচন করা কর্তব্য।

দুধ শুধু সন্তানের শরীর গঠনেই ভূমিকা রাখে না, তার স্বভাব-চরিত্র গঠনেও ভূমিকা রাখে। একবার আমাদের দেশে একটা দৈনিকে একটা চাঞ্চল্যকর খবর বেরিয়েছিল। পত্রিকার কাটিং বহু বছর যাবত আমার কাছে সংরক্ষিত ছিল। খবরটা এরকম– জনৈক লোকের কোনো সন্তান বেঁচে থাকত না। গ্রাম্য কুসংস্কার মোতাবেক সন্তান বেঁচে থাকবে এই আশায় লোকটা তার দুগ্ধপোষ্য এক মেয়েকে এক ফোটা কুকুরের দুধ খাইয়ে দিল। এর পর এক সময় দেখা গেল মেয়েটির হাত পায়ের নখগুলো কুকুরের মত বড় এবং বাঁকা হয়ে গেছে, যা কাটতে গেলেই মেয়েটি ব্যথা-

যন্ত্রণায় চিৎকার শুরু করত। মাঝে মধ্যে সে কুকুরের মত হাতের নখ দিয়ে মাথা মুখে আঁচড় দিত। মেয়েটির ছবিসহ খবর ছাপা হয়েছিল।

তাই মায়ের অবর্তমানে বা তাঁর অপারগতার অবস্থায় দুধমাতার মাধ্যমে সন্তানকে দুধ পান করাতে চাইলে দুধমাতা হিসাবে চরিত্রবান ও দ্বীনদার মহিলা নির্বাচন করা কর্তব্য।

ভাল দুধমাতা নির্বাচনের বিষয়ে ইংগিত রয়েছে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন,

حَقُّ الْوَلَدِ عَلٰى وَالِدِهٖ أَنْ يُحْسِنَ اِسْمَهٗ، وَيُحْسِنَ مِنْ مُرْضِعِهٖ، وَيُحْسِنَ أَدَبَهٗ.

(رواه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم ٨٦٦٧. وفيه ضعف)

অর্থাৎ, সন্তানের পিতার ওপর সন্তানের অধিকার হল পিতা তার সুন্দর নাম রাখবে, তার জন্য ভাল দুধমাতা নিযুক্ত করবে এবং তাকে ভালভাবে আদব শিক্ষা দিবে। (শুআবুল ঈমান)

সন্তানের খাদ্য-খাবার প্রদানের ক্ষেত্রে করণীয়

সন্তানের লালন-পালন হালাল সম্পদ দ্বারা হওয়া চাই, নইলে তার চরিত্রে হারাম খাদ্যের কুপ্রভাব পড়বে। চরিত্রে কীভাবে খাদ্য-খাবারের প্রভাব পড়ে এ সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। সন্তানকে দ্বীনদার রূপে গড়ে তোলার জন্য পিতা-মাতাকে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে তারা নিজেরা যেমন হালাল রিযিক গ্রহণ করবে, সন্তানকেও হালাল রিযিক দ্বারা লালন- পালন করবে। সন্তানকে লালন-পালন করার, সন্তানের ভরণ-পোষণের যে
দায়িত্ব পিতা-মাতাকে দেয়া হয়েছে, সে দায়িত্ব আদায় হবে না যদি সন্তানের ভরণ-পোষণ হালাল রিযিক দ্বারা না হয়। সন্তানের লালন-পালন, সন্তানের ভরণ-পোষণ পিতা-মাতার উপর ওয়াজিব। এই ওয়াজিব দায়িত্ব আদায় হবে না, যদি হালাল রিযিক দ্বারা তা সম্পন্ন করা না হয়। হালাল রিযিকের ক্ষেত্রে বয়ষ্ক আর নাবালেগ ছেলে-মেয়ে সকলের জন্য হুকুম এক। কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

﴿يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَ اعْمَلُوْا صَالِحًا﴾

অর্থাৎ, হে রসূলগণ! তোমরা হালাল-পবিত্র জিনিস গ্রহণ কর এবং নেক আমল কর। (সূরা মুমিনূন: ৫১)

মুফাস্‌সিরীনে কেরাম বলেছেন, এই আয়াতে হালাল রিযিক গ্রহণ করা এবং নেক আমল করা– এই দু'টো কথা বলা হয়েছে। এ দু'টো কথাকে পাশাপাশি বলা হয়েছে। এর কারণ হল নেক আমল ও ইবাদতের সাথে হালাল রিযিকের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। হালাল রিযিক ছাড়া নেক আমল ও ইবাদত কবূল হয় না। যে ব্যক্তি হালাল রিযিক গ্রহণ না করে, হারাম উপার্জনের দ্বারা যার ভরণ-পোষণ হয়, তার মধ্যে নেক আমলের সত্যিকার জয্‌বা, নেক আমলের সত্যিকার স্বাদ সৃষ্টি হয় না। বরং তার মধ্যে গোনাহের প্রতি আকর্ষণ এবং নেক কাজের প্রতি বিকর্ষণ সৃষ্টি হয়। নেকির কাজ তার কাছে ভাল লাগে না, গোনাহের কাজ তার কাছে ভাল লাগে। দ্বীনী কথা তার কাছে ভাল লাগে না, বদ-দ্বীনী কথা তার কাছে ভাল লাগে। দ্বীনী কাজ তার কাছে ভাল লাগে না, বদ-দ্বীনী কাজ তার কাছে ভাল লাগে। হারাম রিযিকের কারণেই তার মধ্যে এসব নেতিবাচক মনোবৃত্তি সৃষ্টি হয়। তাই হালাল রিযিক গ্রহণ করাকে নেক আমলের পূর্বশর্ত করে দেয়া হয়েছে। সহীহ্ দ্বীনী চেতনা সৃষ্টি হওয়ার জন্য হালাল রিযিক গ্রহণ করা জরূরী। এটা বয়স্কদের ক্ষেত্রে যেমন জরুরি, শিশুদের ক্ষেত্রেও তেমনি জরুরি। এই খাদ্য-খাবার দ্বারাই শিশুর রক্ত-মাংস বেড়ে উঠবে। এই খাদ্য-খাবার দ্বারাই তার মন-মানসিকতার পুষ্টি যোগান পাবে। কাজেই সে ভবিষ্যতে নেককার হবে, না বদকার হবে, ভবিষ্যতে তার মধ্যে নেক কাজের জয্‌বা হবে, না বদকাজের জয্‌বা হবে- এগুলো অনেকটা নির্ভর করছে খাদ্য-খাবার হালাল বা হারাম হওয়ার ওপর।

শিশু-কিশোরদের বেলায়ও খাদ্য-খাবার হালাল হওয়ার ব্যাপারে গুরুত্ব প্রদানের বিষয় বুঝে আসে নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত থেকে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেছেন যে, একদিন কিশোর হাছান (রা.) একটা সদকার খেজুর তুলে মুখে নিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা দেখতে পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,

كَخْ كَخْ اِرْمِ بِهَا، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّا لَا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: أَنَّا لَا تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ. (متفق عليه: رواه البخاري ٣٠٧٢، ورواه مسلم ٢٢٥٢ واللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, ওয়াক! ওয়াক!! (মুখ থেকে ফেলে দেয়ার বা বমি করে দেয়ার ইংগিতসূচক শব্দ) ফেলে দাও, তুমি কি জান না আমরা সদকা খাই না? এক রেওয়ায়েতে এসেছে– জান না আমাদের জন্য সদকা হালাল নয়? (বোখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছিলেন বনূ হাশেম গোত্রের লোক। আর বনূ হাশেমের জন্য যাকাত ফিতরা খাওয়া জায়েয ছিল না। কারণ

যাকাত ফিতরা হল মালের ময়লা। আল্লাহ্ তা'আলা নবীকে এবং নবীর পরিবার ও বংশকে মালের ময়লা থেকে হেফাজতে রেখেছেন।

শিশু-কিশোরদেরকে অতিরিক্ত বিলাসী খাদ্য-খাবার প্রদান করবে না, এতে তাদের অভ্যাস খারাপ হয়ে যাবে।

শিশু-কিশোরদের আদর-স্নেহ প্রসঙ্গ

শিশু-কিশোদের স্নেহ করা, তাদেরকে আদর-সোহাগ করা সুন্নাত। নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোদের স্নেহ করতেন, আদর-সোহাগ করতেন। হাদীছের কিতাবসমূহে এর বহু ঘটনা বর্ণিত আছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোদের কেমন আদর-সোহাগ করতেন তার একটি ঘটনা। একবার তিনি মেম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দিচ্ছেন। এই সময় তাঁর মেয়ের ঘরের নাতী হযরত হাসান, হুসাইন (রা.) মসজিদে হাজির হয়ে গেল। তারা দুজনে মসজিদের মধ্যে ছুটাছুটি করছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খুতবা রেখে মেম্বর থেকে নেমে তাদেরকে কোলে তুলে নিলেন, বুকের সাথে জড়িয়ে ধরলেন, আর বললেন,

اِنَّ الْوَلَدَ مَبْخَلَةٌ مَجْبَنَةٌ. (رواه ابن ماجة برقم ٣٦٦٦، وفي الزوائد: إسناده صحيح)

অর্থাৎ, "এই বাচ্চাদের কারণেই মানুষ বখীল হয়, কাপুরুষ হয়।" এদের চিন্তায় মানুষ প্রয়োজনীয় স্থানে ব্যয় করা থেকেও দূরে থাকে, শুধু সঞ্চয় করে রাখতে চায়, এভাবে এদের চিন্তায় মানুষ বখীল হয়ে পড়ে। এদের চিন্তায় মানুষ জেহাদে যেতে চায় না, চিন্তা করে যদি মরে যাই, তাহলে এই বাচ্চা-কাচ্চাদের কী হবে? এভাবে মানুষ এদের চিন্তায় কাপুরুষ হয়ে পড়ে।

যাহোক শিশু-কিশোরদের আদর স্নেহ করা সুন্নাত। যারা শিশু-কিশোদের প্রতি স্নেহ করে না তাদের সম্বন্ধে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তারা আমার আদর্শভুক্ত নয়। এক হাদীছে এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ حَقَّ كَبِيْرِنَا فَلَيْسَ مِنَّا. (رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الر حمة برقم ٤٩٣٥

অর্থাৎ, যারা আমাদের ছোটদের প্রতি দয়া-স্নেহ করে না এবং আমাদের বড়দের হক চেনে না তারা আমার আদর্শভুক্ত নয়। (আবূ দাঊদ)

শিশু-কিশোদের স্নেহ করলে তাদের মন কোমল হয়, তাদের সহজাতবৃত্তি অনুকূলভাবে বিকশিত হয়। পক্ষান্তরে শিশু-কিশোদের সাথে অনাদর ও অবহেলার আচরণ করলে তাদের মন নিষ্ঠুর হয়ে যেতে পারে, তাদের সহজাতবৃত্তি বক্রভাবে আগে বাড়তে পারে, তারা বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

ইসলামের সবকিছুর মধ্যেই ভারসাম্য রয়েছে। শিশু-কিশোরদের আদর-সোহাগের ব্যাপারেও এ নীতিটি প্রযোজ্য। তাই মনে রাখতে হবে তাদের আদর-সোহাগ যেন হয় পরিমিত। তাদের আদর-সোহাগের মাত্রায় ত্রুটি থেকে যাওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনি সীমা ছাড়িয়ে যাওয়াও কাম্য নয়। আদর-সোহাগের স্বল্পতা তাদের সহজাতবৃত্তির বিকাশকে নিস্তেজ করে দিতে পারে, আবার আদর-সোহাগের মাত্রাতিরিক্ততা তাদের লাগামহীন করে তুলতে পারে।

শিশু-কিশোরদের সামনে গুরুজনদের কথাবার্তা ও আচার-আচরণ প্রসঙ্গ

শিশু-কিশোরদের সামনে কোন্ ধরনের কথা বলা যাবে কোন্ ধরনের কথা বলা যাবে না, কোন্ ধরনের আচরণ করা যাবে, কোন্ ধরনের আচরণ করা যাবে না– শরীয়তে এই সবকিছু বলে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, সন্তান যদি দুধের শিশুও হয়, সেই দুধের শিশুর সামনেও পিতা-মাতা যৌনবিষয়ক আলাপ করবে না, যৌন আচরণে লিপ্ত হবে না। এরূপ নিয়ম রাখার কারণ হল এখন যদিও সে কিছুই বোঝে না, তবুও তার সামনে কৃত যৌনবিষয়ক আলাপ বা যৌন আচরণ তার মস্তিস্কে ছাপ ফেলবে, নির্লজ্জতার ছাপ ফেলবে। এসবের একটা ছাপ তার মস্তিষ্কে অংকিত হয়ে থাকবে। ভবিষ্যতে এই ছাপ তার মস্তিস্কে প্রকট হবে এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

শিশু-কিশোরদের মনে বড়দের সব কথা ও আচরণের প্রভাব পড়ে থাকে। এজন্যই হাদীছে যে ওয়াদা পুরো করা হবে না সন্তানকে তেমন ওয়াদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَلَا يَعِدِ الرَّجُلُ صَبِيَّهُ ثُمَّ لاَ يَفِيْ لَهُ. (رواه ابن ماجة برقم ٤٦، قال شعيب الأرنؤوط في تعليقيه على سنن ابن ماجة: صحيح موقوفا أكثره عن ابن مسعود.)

অর্থাৎ, মানুষ তার সন্তানকে ওয়াদা দিবে পরে তা পূর্ণ করবে না– এমন যেন না হয়। (ইবনে মাজা)

অনেকেই সন্তানকে ভুলানোর জন্য তথা অন্যদিকে আকৃষ্ট করে শান্ত করার জন্য বলে থাকে, তোমাকে এই কিনে দেব, ঐখানে নিয়ে যাব ইত্যাদি। কিন্তু বাস্তবে নিয়ত হল আদৌ তা করবে না। এ হাদীছে এরূপ ওয়াদা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ এটাও মিথ্যার শামিল। এতে ঐ সন্তান প্রতারণা করা শিখবে, ওয়াদা খেলাপ করা শিখবে।

মিথ্যা বলা মহাপাপ। শিশু-কিশোরদের সামনে মিথ্যা কথা বলবে না, তাহলে তারাও এই মহাপাপ শিক্ষা করবে। শিশু-কিশোররা মিথ্যা কথা বললে তাদের সাবধান সতর্ক করতে হবে, তাদের বাধা দিতে হবে, তাদের বোঝাতে হবে, মিথ্যা বলা অন্যায়, তাহলে তারা মিথ্যাকে অন্যায় বুঝতে শিখবে।

পদে পদে শিশু-কিশোরদের শিক্ষা প্রদান

শুধু মিথ্যাকেই অন্যায় বোঝানো নয় সব অন্যায়কে অন্যায় বলে তাদের বোঝাতে হবে, তাহলে তারা সব অন্যায়কে অন্যায় বুঝতে শিখবে। তাহলে শিশু বয়স থেকেই তাদের মন-মানসিকতা সহীহ্‌ভাবে গড়ে উঠতে থাকবে। প্রত্যেকটা পদে পদে তাদের শেখাতে হবে কোন্‌টা ন্যায় কোন্‌টা অন্যায়। তাহলে এখন থেকেই তাদের মনে ভাল মন্দের চেতনা বদ্ধমূল হতে থাকবে। অনেকে মনে করে এখন ওরা ছোট্ট, এখন কি ওদের এত নীতিকথা শেখার সময় হয়েছে? এখনই তাদের শেখার বয়স। শিশু বয়সেই তাদেরকে শেখাতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে তারা ঠিকমত চলতে পারে। শিশুদের শেখাতে হবে বর্তমানের জন্য নয়, ভবিষ্যতের জন্য। ছোট থাকতেই পদে পদে তাদেরকে শিক্ষা দিতে হবে। ছোট বয়সের শিক্ষাই তাদের মনে অংকিত ও স্থায়ী হয়ে থাকে। ইমাম বায়হাকী হযরত হাসান বসরী (রহ.) থেকে বর্ণনা করেছেন যে,

اَلْعِلْمُ فِي الصِّغَرِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ. (رواه البيهقي في المدخل، كذا في المقاصد الحسنة وكشف الخفاء ومزيل الإلباس)

অর্থাৎ, শিশু বয়সের জ্ঞান পাথরের অংকনের ন্যায় (তার মনে বদ্ধমূল হয়ে থাকে)। (আল-মাদখাল)

বোঝানো হয়েছে, পাথরে কোন অংকন করলে, কোন দাগ দিলে তা যেমন স্থায়ী হয়ে থাকে, সহজে তা আর মুছে যায় না, তদ্রূপ শিশু অবস্থায় তার মনে যে দাগ পড়ে, শিশু বয়সে তার মনে যা কিছু রেখাপাত করে, তা অনেক দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে, সহজে তা মুছে যায় না। তাই শিশু বয়সই হল সন্তানকে ভাল বানানোর প্রকৃত সময়,

শিশু বয়সই সন্তানের মধ্যে সু-চেতনা সৃষ্টির মূল সময়। আমরা অনেক সময় অবহেলা করি এই ভেবে যে, এখন সে কচি বাচ্চা, এখন এত নীতিকথা শেখানোর কী দরকার? অথচ এখনই বেশি দরকার। এটা দরকার এখনকার জন্য নয় বরং ভবিষ্যতের জন্য, কিন্তু সময় এখনই। এখনই পদে পদে তাকে ভালটি বোঝাতে হবে, পদে পদে তার ভেতরে ভাল চেতনা প্রবেশ করানোর চেষ্টা করতে হবে। ভাল বানানোর সম্ভাব্য যত পদক্ষেপ হতে পারে সবটিই এখন থেকেই গ্রহণ করতে হবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোরদেরও পদে পদে শিক্ষা দিতেন। একটি ঘটনা। হযরত উম্মে সালামা (রা.) ছিলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর স্ত্রী। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর স্ত্রী হওয়ার পূর্বে হযরত উম্মে সালামার আরেক ঘরে বিয়ে ছিল। যখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে বিয়ে হয়, তখন আগের ঘরের একটা বাচ্চা সঙ্গে নিয়ে আসেন। তার নাম ছিল উমার ইবনে আবী সালামা। এই উমার ইবনে আবী সালামা (রা.) বয়ান করেছেন যে, আমি তখন ছোট। একদিন সবাই খেতে বসেছি। তখন অভ্যাস ছিল পরিবারের সকলে একসঙ্গে বড় বর্তনে বসে খাওয়া। হযরত আম্‌র ইবনে আবী সালামা বলেন, আমরা এরকম একটা বড় বর্তনে খাচ্ছিলাম। আমি আমার সামনে থেকে নয় বরং বর্তনের এদিক সেদিক থেকে নিচ্ছিলাম। আমার হাত এদিক ওদিক ঘুরছিল। তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

كُلْ مِمَّا يَلِيْكَ. (رواه البخارى في باب الأكل مما يليه برقم ٥٣٧٧)

অর্থাৎ, (হে বাচ্চা, শোন!) নিজের সামনের থেকে খাও। (বোখারী)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝিয়েছেন, অন্যের সামনে থেকে নিবে না, এতে লোভ প্রকাশ পায়। যেদিকে ভালটা এবং বড়টা দেখে সেটা নিতে মনে চায়, এতে মনের লোভ প্রশ্রয় পায়। বিশেষভাবে বাচ্চাদের এই মনোভাব দেখা যায় যে, মাছের বড় পিচটা আমার চাই, মাথাটা আমার চাই, মুরগির রানটা আমার চাই, ইত্যাদি। এরূপ মুহূর্তে বাচ্চাদেরকে বোঝানো উচিৎ, তাদেরকে নিষেধ করা উচিৎ, যাতে তাদের মধ্যে লোভ বাড়তে না পারে। হয়তো বাচ্চারা সবটা মানবে না, তারপরও বলতে থাকলে, বোঝাতে থাকলে ধীরে ধীরে বুঝ পয়দা হতে থাকবে।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শিশু-কিশোরদের পদে পদে শিক্ষা দিতেন, তার আর একটি ঘটনা। তিরমিযী, ইবনে মাজা ও তাবারানী প্রমুখ কিতাবে ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাটির সারসংক্ষেপ হল হযরত ইক্‌রাশ ইবনে যুওয়ায়েব (রা.) বলেন, ছোট থাকতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে একদিন শিখিয়েছেন যে, নিজের সামনে থেকে খাবে, অন্যের সামনে থেকে নিবে না। এরপর

আরেক দিনের ঘটনা হল- এক বর্তনে কয়েক ধরনের খেজুর ছিল। হযরত ইক্‌রাশ (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে ঐ একদিন যে বলেছেন নিজের সামনে থেকে খেতে, সে অনুযায়ী আজও আমি শুধু নিজের সামনে থেকেই খাচ্ছিলাম। (যার কারণে অন্যান্য ফল খেতে পারছিলাম না।) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বুঝতে পেরে বললেন, (তোমাকে যে বলেছিলাম নিজের সামনে থেকে খাবে, এটা হল যদি বর্তনে শুধু এক রকমের খাবার থাকে। আর বিভিন্ন রকমের খাবার থাকলে বিভিন্ন দিকে হাত দিয়ে নিতে পার।) তুমি যেখান থেকে ইচ্ছে নিতে পার, আজ তো অনেক ধরনের খাবার। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পদে পদে বাচ্চাদেরকে শিখাতেন। পদে পদে বাচ্চাদেরকে তা'লীম দিতেন।

ছোট থাকতেই নেক কাজে অভ্যস্ত করানোর গুরুত্ব

এভাবে ছোট থাকতেই শিশু-কিশোরদের সব ধরনের নেক কাজে অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। যদিও এখনই তাদের ওপর সেসব নেক কাজ ফরয-ওয়াজিব নয়। কিন্তু এখন থেকে অভ্যস্ত না করালে পরবর্তীতে তা করানো কঠিন হবে। যেমন: সাত বছর বয়স হলেই সন্তানকে নামাযের হুকুম দিতে বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

مُرُوْا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ، وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِيْنَ، وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. (رواه أبو داود في باب متى يؤمر الغلام بالصلاة برقم ٤٩١)

অর্থাৎ, তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামাযের আদেশ দাও, আর দশ বছর হলে মার দিয়ে হলেও নামায পড়াও। আর তখন থেকে তাদের বিছানা পৃথক করে দাও। (আবূ দাউদ)

এখানে লক্ষ করার বিষয় হল সাত বছর বয়সে নামায ফরয হয় না, ফরয হয় বালেগ হলে। তারপরও এখন নামাযের আদেশ দেয়া এজন্য, যাতে এখন থেকেই বালেগ হওয়ার আগ পর্যন্ত সে নামাযে পুরো অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে। এখন থেকে যদি শুরু করা না হয়, তাহলে বালেগ হওয়ার পর সে নিয়মিত নামাযী হয়ে উঠতে পারবে না। অভ্যস্ত হতেই দীর্ঘ দিন লেগে লেগে যাবে। এভাবে তার অনেক নামায কাযা হয়ে যাবে, গোনাহগার হতে থাকবে। সেটা যেন না হয়, তাই ছোট থাকতেই অভ্যস্ত করানোর জন্য সাত বছর বয়স থেকে নামাযের হুকুম দিতে বলা হয়েছে এবং দশ বছর থেকে শাসন করে নামায পড়াতে বলা হয়েছে।

শুধু নামাযের ব্যাপারে নয়, সব ধরনের দ্বীনী আমলের ব্যাপারে সন্তানকে ছোট বয়স থেকেই তা'লীম দিতে হবে। যেটা করানো সম্ভব করাতে হবে। সন্তানদের হাতে দান-সদকা করাতে হবে, যাতে তাদের মধ্যে দান- সদকার চেতনা ও অভ্যাস গড়ে ওঠে। আপনি ফকীরকে ভিক্ষা দিবেন, কিংবা গরীবকে যাকাত দিবেন, সেটা আপনার সন্তানের হাত দিয়ে দেওয়ালে তার মধ্যে দান করার মনোবৃত্তি গড়ে উঠবে। উলামায়ে কেরাম সন্তান লালন-পালন করার নীতির মধ্যে বলেছেন, আপনি কোন খাদ্য-খাবার ঘরে এনেছেন, এখন সকলের মাঝে সেটা বন্টন করে দিতে হবে, আপনি আপনার বাচ্চার হাতে যদি বন্টন করান, তাহলে তার মধ্যে অন্যকে দেয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে। সে যদি নিজের জন্য বড়টা রাখতে চায়, তাহলে তাকে বোঝাতে হবে, সব সময় নিজের হককে ছোট করে দেখা ভাল। তোমার ভাইকে বা বোনকে তুমি বড়টা দাও, নিজে ছোটটা নাও। সে না মানলেও বলতে থাকতে হবে, তার কানে দ্বীনী চেতনার কথা পড়তে থাকবে। দ্বীনের কোনো কথা আছর থেকে খালি যায় না, কিছু না কিছু আছর হবেই।

মনে রাখতে হবে– সন্তানের প্রথম বয়সই তার সংশোধন ও গঠনের উপযুক্ত সময়। প্রথমদিকে নষ্ট হয়ে গেলে পরে তার সংশোধন অত্যন্ত দুরূহ হয়ে পড়ে। প্রথম দিকে অবুঝ সন্তান বলে অবহেলা করে ছেড়ে দিলে পরবর্তীতে অনুতপ্ত হতে হয়।

শিশু-কিশোরদের পোশাক-পরিচ্ছদ বিষয়ে করণীয়

বয়স্কদের জন্য যেসব জিনিস নিষিদ্ধ, শিশু-কিশোরদের জন্যও সেসব জিনিস নিষিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। যে লেবাস-পোশাক বয়স্কদের জন্য নিষিদ্ধ, শিশু-কিশোরদের জন্যও তা নিষিদ্ধ। যদিও শিশু-কিশোরদের আমলনামা এখনও চালু হয়নি, অতএব তাদের কোনো পাপ নেই; এরপরও নিষেধ করা হয়েছে। কারণ, তা না হলে এটা যে অবৈধ তা তারা বুঝতে শিখবে না। যেমন– প্রাণীর ছবিযুক্ত পোশাক বয়স্ক মানুষ পরিধান করতে পারবে না, শিশু-কিশোরদেরও আমরা সেরূপ পোশাক পরিধান করাতে পারব না। নইলে এটা যে খারাপ– এই মানসিকতা তাদের মধ্যে সৃষ্টি হবে না, বরং তারা বুঝবে এটা ভালই। এভাবে একটা খারাপকে তারা ভাল বুঝতে শিখবে, একটা অবৈধ জিনিসকে তারা বৈধ ভাবতে শিখবে। এভাবে তাদের মানসিকতার বিকৃতি ঘটতে থাকবে। বয়স্কদের বেলায় যেমন ছেলে হলে তার জন্য মেয়েদের কাটছাঁটের পোশাক এবং মেয়ে হলে তার জন্য ছেলেদের কাটছাঁটের পোশাক নিষিদ্ধ, তেমনি ছেলেমেয়ে ছোট হলেও তাদেরকে এই নীতির ভিত্তিতে পোশাক-পরিচ্ছদ দিতে হবে। মেয়েকে ছেলেদের পোশাক কিংবা ছেলেকে মেয়েদের

পোশাক দেয়া যাবে না। এক হাদীছে এসেছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বয়ান করেছেন,

لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَآءِ وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَآءِ بِالرِّجَالِ. (رواه البخاري في كتاب اللباس رقم ٥٨٨٥)

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরুষদের মধ্যে যারা নারীদের বেশ ধারণ করে এবং নারীদের মধ্যে যারা পুরুষের বেশ ধরে তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। (বোখারী)

এ হাদীছের বক্তব্য অনুসারে বড়দের ন্যায় শিশু-কিশোরদেরও পরিচালিত করতে হবে।

মনে রাখতে হবে মনের ওপর পোশাক-পরিচ্ছদেরও প্রভাব পড়ে থাকে। তাই শিশু-কিশোরদের যে পোশাকই দেয়া হবে তা যেন অতি বেশি জাঁকজমকপূর্ণ না হয়। অতি বেশি জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক পরিধান করালে তাদের মধ্যে বিলাসী মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

শিশু-কিশোরদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা প্রসঙ্গ

পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব বড়দের বেলায় যেমন শিশু-কিশোরদের বেলায়ও তার ব্যতিক্রম নয়। তদুপরি শিশু-কিশোরদের বেলায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব রয়েছে আরও একটা কারণে। তাহল শিশু-কিশোরদের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখলে এবং পরিষ্কার- পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করালে তাদের পরিচ্ছন্ন মানসিকতা গঠিত হবে। শরীর ও পোশাকের পরিচ্ছন্নতা মনের ওপর প্রভাব ফেলবে। তাদের শরীর ও পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন না রাখলে তাদের মধ্যে নোংরা থাকার মানসিকতা সৃষ্টি হতে পারে।

শিশু-কিশোরদের সাহচর্য প্রসঙ্গ

মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা গঠনের ক্ষেত্রে পরিবেশ ও সাথী-সংগীর ভূমিকা অনেক। এটা বয়স্কদের জন্য যেমন, শিশু-কিশোরদের জন্যও তেমন। বয়স্কদের ভাল হওয়ার জন্য যেমন নেককার লোকদের সোহবত গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রেও সেটা গ্রহণ করতে হবে। ভাল হওয়ার জন্য নেককার লোকদের সোহবত গ্রহণ, এটা অত্যন্ত জরুরী বিষয়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন,

﴿يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, (অর্থাৎ, মুত্তাকী-পরহেযগার হয়ে যাও) আর ভাল লোকদের সংগে ওঠা-বসা কর। (সূরা তাওবা: ১১৯)

এখানে মুত্তাকী-পরহেযগার হওয়া এবং ভাল লোকদের সোহবত গ্রহণ- এ কথা দু'টোকে পাশাপাশি বলা হয়েছে। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, এর কারণ হল ভাল হওয়ার জন্য তার পরিবেশ ভাল হওয়া, তার সাহচর্য ভাল হওয়া, তার সংগ ভাল হওয়া পূর্বশর্ত। একজন মানুষ যেমন লোকের সাথে ওঠা-বসা করবে, সে তেমন হয়েই গড়ে উঠবে। চোরের সাথে থাকতে থাকতে মানুষ চোর হয়। ডাকাতদের সাথে থাকতে থাকতে ডাকাত হয়। নেশাখোরদের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে করতে নেশাখোর হয়। মোটকথা সংগগুণেই মানুষ গড়ে ওঠে। এজন্যই প্রবাদ আছে– সৎসঙ্গে স্বর্গবাস অসৎসংগে সর্বনাশ। এ কথাটিকেই কবি ফার্সী ভাষায় এভাবে বলেছেন,

صحبت صالح ترا صالح کند + صحبت طالح ترا طالح کند

ভাল মানুষের সংস্রব তোমাকে ভাল বানাবে আর খারাপ মানুষের সংসর্গ তোমাকে খারাপ বানাবে। এটা আমাদের বয়ঙ্কদের ক্ষেত্রে যেমন প্রযোজ্য, শিশু-কিশোরদের বেলায়ও তেমনি প্রযোজ্য। শিশু-কিশোরদেরও তাই ভাল মানুষদের সঙ্গে ওঠা-বসা করাতে হবে। আমাদের সন্তানরা, আমাদের শিশু-কিশোররা কাদের সংগে ওঠা-বসা করে, তা খেয়াল রাখতে হবে, এমনকি তার খেলার সাথী কে হবে তার প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। ওলামায়ে কেরাম পরিবারনীতির ক্ষেত্রে, সন্তান লালন-পালন নীতির ক্ষেত্রে বলেছেন, শিশুর খেলার সাথী কে হবে তাও যাচাই-বাছাই করে নির্ধারণ করতে হবে। আমাদের সন্তান যদি বাজে ছেলে-মেয়েদের সংগে ওঠা-বসা করে, তাহলে ওদের খারাপ বুলি-বচন শিখবে, ওদের খারাপ মন-মানসিকতা আমাদের সন্তানের মধ্যে চলে আসবে।

গরীবদের সাথেই আমাদের শিশু-কিশোরদের বেশি বেশি ওঠা-বসা হওয়া দরকার। ধনীদের সাথে ওঠা-বসা করলে দুনিয়ার লোভ বাড়তে থাকে, আল্লাহ তাআলা যা দিয়েছেন তা নিয়েই তুষ্ট থাকার মনোভাব নষ্ট হয়ে যায়, শোকরের মনোভাব নষ্ট হয়ে যায়, না-শোকরীর মনোভাব সৃষ্টি হয়। এই গরীবদের সঙ্গে ওঠা-বসার বিষয়টা বয়স্কদের ক্ষেত্রে যেমন, শিশুদের ক্ষেত্রেও তেমনি।

শিশু-কিশোরদের খেলাধুলা প্রসঙ্গ

শিশু-কিশোরদের কিছু খেলাধুলা করতে দেয়া চাই। সারাক্ষণ লেখাপড়ার মধ্যে আবদ্ধ রাখলে তাদের মধ্যে মানসিক বদ্ধতা সৃষ্টি হবে। স্বাভাবিক খেলাধুলাও

না করতে দিলে তাদের সহজাতবৃত্তির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও শিশু-কিশোরদের খেলাধুলায় বাধা দেননি। ইবনে মাজা শরীফে হযরত হাছান ও হুছাইন (রা.)-এর ফাযায়েল বর্ণনার পরিচ্ছেদে একটি রেওয়ায়েত এসেছে এভাবে।

يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَهُمْ اَنَّهُمْ خَرَجُوْا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلٰى طَعَامٍ دُعُوْا لَهُ، فَإِذَا حُسَيْنٌ يَلْعَبُ فِي السِّكَّةِ، قَالَ: فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَامَ الْقَوْمِ وَبَسَطَ يَدَيْهِ، فَجَعَلَ الْغُلَامُ يَفِرُّ هٰهُنَا وَهٰهُنَا وَيُضَاحِكُهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى أَخَذَهُ، فَجَعَلَ إِحْدٰى يَدَيْهِ تَحْتَ ذَقَنِهٖ وَالْأُخْرٰى فِيْ فَأْسِ رَأْسِهٖ فَقَبَّلَهُ. (سنن ابن ماجة برقم ١٤٤، و في الزوائد: هذا إسناد حسن رجاله ثقات)

অর্থাৎ, হযরত ইয়া'লা ইবনে মুররা (রা.) বয়ান করেন যে, একদিন তারা (কতিপয় সাহাবী) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর সঙ্গে এক দাওয়াতে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে এক গলিতে হুছাইনকে দেখলেন খেলা করছে। (তিনি খেলাতে বাধা দিলেন না।) তিনি লোকদের আগে গিয়ে হুছাইনের দিকে দুই হাত প্রসারিত করে দিলেন (তাকে কাছে ডাকার জন্য)। কিন্তু সে এদিক ওদিক ভাগছিল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে হাসাচ্ছিলেন। অবশেষে তাকে ধরলেন। এক হাত তার চিবুকের নিচে আরেক হাত তার মাথার পেছনের উঁচু অংশে রেখে ধরে তাকে চুমু দিলেন।

শিশু-কিশোরদের খেলার সঙ্গী প্রসঙ্গ

শিশু-কিশোরদের স্বাভাবিক খেলাধুলায় বাধা না দেয়ার কথা পূর্বে আলোচিত হয়েছে। তবে তাদের খেলার সাথী কারা হবে, কাদের সঙ্গে তারা খেলাধুলা করবে, তার প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে। কারণ যাদের সঙ্গে তারা খেলাধুলা করবে, যাদের সঙ্গে মেলামেশা হবে, তাদের স্বভাব-চরিত্র ওদের মধ্যে আসবে। ছেলেরা যদি মেয়েদের সঙ্গে খেলাধুলা করে, তাহলে তাদের মধ্যে মেয়েলী স্বভাব আসতে পারে। মেয়েরা যদি ছেলেদের সঙ্গে খেলাধুলা করে, তাহলে মেয়েদের লজ্জাভাব কমে যেতে পারে, পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হতে পারে। বে-পর্দা-র মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে। এ বিষয়টার প্রতি লক্ষ না রাখলে ছেলে-মেয়েদের মধ্যে

এক সাথে নারী পুরুষে মেলামেশার মনোবৃত্তি সৃষ্টি হতে পারে। এর থেকে আস্তে আস্তে পর্দাহীনতার মনোভাব জন্ম নিবে। সাহচর্যের প্রভাব অনস্বীকার্য বিষয়। এ জন্যই ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, পুরুষ ছেলে পুরুষ ছেলের সাথে খেলাধুলা করবে, মেয়েদের সাথে নয়। মেয়ে আর ছেলে এক সাথে খেলাধুলা করবে না, আপন ভাই বোন বা আপন রক্তের মধ্যে হলে ভিন্ন কথা। অবাধ্য ও দুশ্চরিত্র শিশু-কিশোরদের সঙ্গে খেলাধুলা করতে দিবে না। তাহলে ঐ অবাধ্য ও দুশ্চরিত্রদের চরিত্রের কুপ্রভাব ওদের মনে আসতে পারে। তাই শিশু-কিশোরদের খেলার সাথী নির্বাচনের বিষয়েও সতর্ক থাকতে হবে।

শিশু-কিশোরদের বিনোদন প্রসঙ্গ

বিদোদনের ক্ষেত্রে বয়স্কদের জন্য যা যা নিষিদ্ধ, শিশু-কিশোদেরকেও তা থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন। বয়স্কদের জন্য অশ্লীল বিষয় দেখা, অশ্লীল কথাবার্তা বলা, অশ্লীল কথাবার্তা শোনা নিষিদ্ধ। শিশু কিশোরদেরও এসব থেকে বিরত রাখা প্রয়োজন। আমরা এসব বিষয়ে লক্ষ রাখছি না। আজ অনেক পরিবারে এক সাথে মাতা-পিতা ও সন্তানেরা মিলে অশ্লিল গান-বাদ্য শোনা হয়, অশ্লীল দৃশ্য দেখা হয়। আমাদের সন্তানরা নির্লজ্জ হবে না কেন? অথচ শরীয়তে পিতা-মাতা জন্য বিধান রাখা হয়েছে দুধের শিশুর সামনেও তারা কোনো যৌনবিষয়ক আচরণ করবে না। যৌনবিষয়ক কোনো কথাবার্তা বলবে না। দুধের শিশুর সামনে তারা এসব করবে না। কারণ তাতে শিশুর মনে অশ্লীলতার প্রভাব পড়বে। শিশু-কিশোরদের সামনে বা তাদের সঙ্গে কথাবার্তা ও আচার-আচরণ এমন হওয়া উচিত যাতে তাদের মনে খারাপ প্রতিক্রিয়া না হয় বরং ভাল প্রতিক্রিয়া হয়। মনে রাখতে হবে শিশুরা অবুঝ হলেও, তারা কোনো কথা ও আচরণ পূর্ণ উপলব্ধি করতে না পারলেও তার ভাল বা মন্দ প্রতিক্রিয়া তাদের মনে পড়বে এবং তাদের মন-মানসিকতা গঠনে সেটা ভূমিকা রাখবে। শিশুর মন ভিডিও-র ন্যায়, যা কিছুই তার সামনে বলা হবে বা করা হবে তার একটা চিত্র তার মনে অংকিত হয়ে যাবে। যদিও সে এখন তা প্রকাশ করতে সক্ষম নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে যখন সে প্রকাশ করতে সক্ষম হবে তখন দেখা যাবে শিশুকালে যেসব চিত্র তার মনে অংকিত হয়ে ছিল এখন তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটছে। তাই শিশু-কিশোরদের সামনে অবলিলায় সবকিছু বলা বা করা যাবে না বরং শধু এমন সবকিছুই তাদের সামনে বলা বা করা যাবে যাতে তাদের মন-মানসিকতা ভাল ও উন্নত হয়ে ওঠে। শরীয়ত যেখানে এমন বিধান রেখেছে, সেখানে আমরা সন্তানদের নিয়ে এক সাথে মিলে অশ্লীল ছায়াছবি দেখি। বরং অশ্লীলতার উপরে যা আছে তেমন নোংরা অনেক কিছুও দেখি। কীভাবে আমাদের সন্তান ভাল হবে?

শরীআতের দৃষ্টিতে জায়েয নয় টিভির এমন সব অনুষ্ঠান বড়দের ন্যায় ছোটদেরও দেখতে দেয়া নিষিদ্ধ। কারণ, এতে করে তারা এসব অনুষ্ঠান দেখা বৈধ– এমন একটা বিরূপ মানসিকতায় গড়ে ওঠে, বেড়ে ওঠে। সারকথা, বড়দের জন্য যা দেখা নিষিদ্ধ ছোটদেরও তা দেখানো নিষিদ্ধ।

শিশু-কিশোরদের কার্টুন ছবি দেখা প্রসঙ্গ

কার্টুন ছবি পুতুলেরই বিকল্প মাত্র। অতএব শিশুদেরকে কার্টুন ছবি দেখানো থেকে বিরত থাকা চাই। কার্টুন ছবি দেখার বহুরকম ক্ষতি রয়েছে। যেমন– (১) কার্টুন ছবি দেখে শিশুদের চিন্তা অলিক কল্পনার খাতে প্রবাহিত হয়, যা ভবিষ্যতে কোনো গঠনমূলক কাজে লাগবে না। অতএব এটা শিশুর মেধার অপচয়। (২) কার্টুন ছবি দেখে নানান রকম প্রাণীর মূর্তি তৈরির মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে, আর কোনো রকম প্রাণীর মূর্তি তৈরি করা শরীআতে বৈধ নয়। অতএব কার্টুন ছবি দেখা শরীআতবিরোধী মানসিকতা সৃষ্টির একটা উপাত্ত। (৩) কার্টুন ছবির মাধ্যমে শিশুর মনে মারামারি, প্রতারণা, লুকোচুরি ইত্যাদি নেতিবাচক মানসিকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে। (৪) কার্টুন ছবি দেখার নেশা শিশুকে পড়াশোনার একাগ্রতা থেকে বিচ্যুত করে থাকে। (৫) কার্টুন ছবির মাধ্যমে শিশুরা অস্বাভাবিক ভঙ্গি ও অস্বাভাবিক আচরণ শিখে থাকে, এভাবে শিশুর সুকুমার বৃত্তি ধ্বংস হয়ে থাকে।

শিশু-কিশোরদের জিদ ও দাবি-দাওয়া পূরণ প্রসঙ্গ

শিশু-কিশোরদের দাবি-দাওয়া পূরণের বিষয়টা খুবই স্পর্শকাতর। একদিকে তাদের দাবী দাওয়া পূরণ না করলে তাদের মন ছোট হয়ে পড়ে এবং তারা সংকীর্ণ মানসিকতার হয়ে উঠতে থাকে। আবার তাদের সব দাবি ও সব জিদ পূরণ করলে তাদের মধ্যে একগুঁয়েমি ও হঠকারিতার মনোভাব সৃষ্টি হয়। তাই তাদের কিছু কিছু দাবি পূরণ করতে হয়, সবটা নয়। বিশেষত দাবি যদি অবৈধ হয় তাহলে তা অবশ্যই পূরণ না করা চাই। তা পূরণ করা জায়েয নয়– হারাম। এরূপ জিদ থেকে বিরত না হলে প্রয়োজনে তাদের শাসন করতে হবে।

শিশু-কিশোরদের মধ্যে মানবিক গুণাবলী ও দ্বীনী চেতনা সৃষ্টির উপায়

* শিশু কিশোরদেরকে যতদূর সম্ভব নিজের কাজ নিজের হাতে করতে অভ্যস্ত করাবে, তাহলে তারা আত্মনির্ভরশীল মনোভাবাপন্ন হয়ে গড়ে উঠবে।

* শিশু-কিশোরদেরকে বাঘের ভয়, শিয়ালের ভয়, ভূতের ভয় ইত্যাদি দেখাবে না, তাহলে তারা ভীরু প্রকৃতির হয়ে পড়তে পারে।

* শিশু-কিশোররা অন্যায় করলে আল্লাহ্র ভয় দেখাবে, জাহান্নামের আযাবের ভয় দেখাবে, তাহলে তাদের মনে খোদাভীরুতা সৃষ্টি হবে। আর তাদের অন্যায় কাজে বাধা না দিলে অন্যায়কে তারা ন্যায় বলে ভাবতে শিখবে।

* ভাল কাজের জন্য আল্লাহ্র খুশি হওয়ার কথা এবং জান্নাতের নেয়ামত লাভের কথা শোনালে তাদের মনে পরকালের চিন্তা গড়ে উঠতে সহায়ক হবে।

* প্রত্যেকটা পদে পদে আল্লাহ সবকিছুই দেখেন ও জানেন– এ বিষয়টা তাদের সামনে তুলে ধরলে তাদের মধ্যে খোদামুখী চেতনা গড়ে উঠবে।

* শিশু-কিশোরদেরকে নেককার লোকদের কাহিনী শোনালে তাদের মধ্যে নেককার হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হবে এবং বীর বাহাদুরের কাহিনী শোনালে তাদের মধ্যে বীরত্বের মনোভাব জাগ্রত হবে।

* শিশু-কিশোরদেরকে তাগিদ সহকারে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন মুরব্বী ছাড়া কারও নিকট কিছু না চায় কিংবা কেউ কিছু দিলে মুরব্বীর অনুমতি ব্যতীত যেন গ্রহণ না করে। এরূপ না করলে তাদের মনে লোভ-লালসা জন্ম নিবে।

* গরীব মিসকীনকে দান-সদকা করতে হলে শিশুদের হাত দ্বারা সেটা দেওয়াবে, তাহলে শিশুদের মধ্যে দানের মনোভাব সৃষ্টি হবে।

* শিশু-কিশোররা ভাল কাজ করলে বা ভাল লেখা-পড়া করলে তাদেরকে সামান্য পুরস্কার প্রদান করবে এবং শাবাস দিবে, তাহলে ভাল কাজের প্রতি তাদের উৎসাহ সৃষ্টি হবে। এর বিপরীত মন্দ কাজ করলে অবস্থা অনুযায়ী সামান্য তিরস্কার ও সামান্য শাস্তি প্রদান করবে, তাহলে তাদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যাবে যে, এটা মন্দ। তবে মনে রাখতে হবে খুব বেশি সাবাশী দেওয়া বা খুব বেশি পুরস্কৃত করা ঠিক নয়, তাহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। পক্ষান্তরে খুব বেশি শাস্তি দিলে তারা খিটখিটে বা জেদী হয়ে যেতে পারে বা বেশি তিরস্কৃত করলে নিজের ব্যাপারে তার অনাস্থা জাগতে পারে। বস্তুত প্রশংসা বা পুরস্কার দান, কিংবা তিরস্কার ও শাস্তি প্রদানের বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর, এ ব্যাপারে খুব বিবেচনা সহকারে মেপে মেপে পদক্ষেপ নিতে হবে।

* শিশু-কিশোরদের যেকোনো খাদ্য-খাবার দিলে তারা যেন সকলের মধ্যে বণ্টন করে দিয়ে সকলে মিলে খায়– এরূপ অভ্যস্ত করে তুলতে হবে। তাহলে তাদের মধ্যে উদারতা ও সহমর্মিতার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

* শিশু-কিশোরদেরকে অভ্যস্ত করাবে তারা যেন কোনো কাজ গোপনে না করে। কেননা গোপনে সে এমন কাজই করবে যেটাকে সে অন্যায় বলে মনে করে, এভাবে গোপনে কাজ করতে অভ্যস্ত হওয়ার অর্থ অন্যায় কাজে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া।

* শিশু-কিশোরদেরকে যৌন বিষয়ক ও প্রেম-প্রীতি বিষয়ক বইপত্র ও নভেল নাটক পড়তে বা দেখতে দিবে না।

শিশু-কিশোরদের শিক্ষা প্রসঙ্গ

* শিশুকে সর্বপ্রথম কালিমায়ে তাইয়্যিবা শিক্ষা দিবে।

* নিয়মিত লেখাপড়া শুরু করানোর পূর্বেও সময় সুযোগে তার ধারণ ক্ষমতা অনুযায়ী ঈমানের কথা এবং ভাল-মন্দ সম্পর্কে শিক্ষা দিবে এবং মৌখিকভাবে দুআ দুরূদ ইত্যাদি শিখাবে।

* সর্বপ্রথম প্রয়োজনীয় দ্বীনী শিক্ষা দেয়া এবং কুরআন পাঠ শিক্ষা দেয়া কর্তব্য।

* শিশু-কিশোরদের জন্য আদর্শ শিক্ষক নির্বাচন করতে হবে, তাহলে তারা আদর্শবান হওয়ার চেতনা লাভ করবে।

* শিশু-কিশোরদেরকে কথা-বার্তা, চলা-ফেরা, উঠা-বসা, পান-আহার, সালাম- কালাম ইত্যাদির আদব-কায়দা ও চরিত্র শিক্ষা দেয়া পিতা-মাতার দায়িত্ব। এক হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا مِنْ نُحْلٍ أَفْضَلَ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ. (رواه الترمذي في أدب الولد برقم ١٩٥٢، وقال: هذا حديث غريب)

অর্থাৎ, সন্তানের প্রতি পিতার যত দান তার মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ট দান হল উত্তম আদব শিক্ষা দেয়া। (তিরমিযী)

শিশু-কিশোরদের শাসন প্রসঙ্গ

অনেক সময় নম্র কথায় এবং নম্র আচরণে শিশুর সংশোধন নাও হতে পারে। এরূপ মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন ও শাসনের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রয়োজনের মুহূর্তে কঠোরতা অবলম্বন পূর্বক বাচ্চাদের শাসন না করলে তাদের প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তাতে তারা লাগামহীন হয়ে যাবে। আর শাসন না করাই হবে তার কারণ।

* শাসন ও শাস্তি প্রদানের কয়েকটা পদ্ধতি হতে পারে। যথা–

(১) তিরস্কার করা (২) ধমক দেয়া (৩) কড়া কথা বলা। (৪) হাত বা লাঠি দিয়ে মারা (৫) আঁটক করে রাখা (৬) কান ধরে উঠা-বসা করানো (৭) ছুটি বন্ধ করে দেয়া। এই শেষোক্ত শাস্তিই সবচেয়ে উত্তম পদ্ধতি। শিশুদের মনে এর যথেষ্ট প্রভাব পড়ে। (تربیت اولاد)

* মারধর অতিরিক্ত করা হলে, উঠতে বসতে লাথি জুতো করতে থাকলে শিশুরা নির্লজ্জ হয়ে যায় এবং মারের ভয় তাদের অন্তর থেকে উঠে যায়। তারপর তাদের শাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এই মারধর–এর ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা অন্যায়। ফুকাহায়ে কিরাম স্পষ্টভাবে বলেছেন, যে মারপিট দ্বারা হাত ভেঙ্গে যায়, চামড়া ফেটে যায় বা চামড়ায় দাগ পড়ে যায়, সেরূপ মারপিট করা নিষিদ্ধ। কোনো পিতা বা উস্তাদ এরূপ মারধর করলে তিনি শাস্তির যোগ্য। (تربیت اولاد عن رد المحتار ج/۳) মনে রাখতে হবে– অতিরিক্ত শাস্তি প্রদান করা জুলুম।

* মারধরের ক্ষেত্রে সীমা অতিক্রম করা থেকে বাঁচার উপায় হল রাগের মুহূর্তে মারধর না করা। কেননা, রাগের মুহূর্তে ব্যালেন্স ঠিক থাকে না। রাগ ঠাণ্ডা হওয়ার পর কতটুকু অন্যায় এবং তার জন্য কতটুকু কীভাবে শাস্তি দেয়া উপযোগী তা চিন্তা-ভাবনা করে শাস্তি দিতে হবে। হাদীছেও রাগান্বিত অবস্থায় বিচার করতে নিষেধ করা হয়েছে।

* কখনও অতিরক্ত শাস্তি দেয়া হয়ে গেলে শাস্তি দেয়ার পর তাকে আদর-সোহাগ করে অনুগ্রহ করে তার মন থেকে কষ্ট দূর করে দিবে।

* বকাবকি ও ভর্ৎসনা করার ক্ষেত্রেও সীমা অতিক্রম করবে না, লাগামহীনভাবে মুখে যা আসে বলবে না, বরং পূর্বে চিন্তা করে নিবে কি কি শব্দ প্রয়োগ করা সমীচীন।

শিশু-কিশোরদের ইবাদত ও আখলাক-চরিত্রের প্রশিক্ষণ প্রসঙ্গ

* সাত বৎসর বয়স থেকেই শিশুকে নামাযের হুকুম দিবে এবং পুরুষ ছেলে হলে জামআতের সঙ্গে নামায পড়তে অভ্যস্ত করাবে। দশ বৎসর বয়স হলে প্রয়োজনে মারপিট করে তথা শাসন করে হলেও নামায পড়াতে হবে। এ সম্বন্ধে পূর্বে “ছোট থাকতেই নেক কাজে অভ্যস্ত করানোর গুরুত্ব” শিরোনামের অধীনে দলীলসহ বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হয়েছে।

* শিশু-কিশোরদের রোযার ক্ষেত্রে নামাযের ন্যায় সাত বৎসরের সীমা নির্ধারণ করে দেয়া হয়নি, তারা যখন যে কয়টা রোযা রাখতে সক্ষম হবে তখন তাদের দ্বারা তা রাখাতে হবে।

* শিশু-কিশোরদের নামায, রোযা ইত্যাদি ইবাদত ও আখলাক-চরিত্র গঠনের ব্যাপারে মাকেই বেশি খেয়াল রাখতে হবে, কেননা মায়ের কাছেই সন্তানরা বেশি সময় কাটায়।

* মায়ের পর বড় ভাই-বোনদের সাথেও শিশু-কিশোরদের উঠা-বসা বেশি হয়। তাই সন্তানদের সংশোধন, সন্তানদের আখলাক-চরিত্র গঠন এবং সন্তানদের ইবাদত-বন্দেগীর অভ্যাসে উঠে আসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে সন্তানদের মধ্যে যারা বড় তাদের বিশেষ ভূমিকা থাকে। এজন্য এসব ব্যাপারে প্রথম সন্তানকেই অধিক গুরুত্ব দেয়া প্রয়োজন। প্রথম সন্তানকেই গুরুত্বের সাথে ভাল করে গড়ে তোলা প্রয়োজন। কেননা পরবর্তী সন্তানরা প্রায়শঃই প্রথমজনের অনুকরণ করে থাকে।

* প্রতিদিন ঘরে একটা নির্ধারিত সময়ে দ্বীনী কথা-বার্তা আলোচনার বা দ্বীনী কিতাব তালীমের সিলসিলা জারী রাখতে হবে। এতে সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারের অন্য সদস্যদেরও উপকার হতে থাকবে। রাতে শুতে যাওয়ার পূর্বে এর জন্য সময় নির্ধারণ করা যেতে পারে, তখন সকলের সময় অবসর থাকে। প্রথম দিকে সকলে তালীম শুনতে না চাইলেও তালীম করে যেতে হবে, ধীরে ধীরে সকলে শুনতে অভ্যস্তও হবে এবং আছরও হতে থাকবে।

শিশু-কিশোরদের জন্য দুআ

শিশু-কিশোরদের জীবন গঠন করা প্রসঙ্গে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলা হল, সাধ্যমত তা করার পরও, সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও শিশু-কিশোররা খারাপ হতে পারে। হযরত নূহ (আ.)-এর মত এত বড় জলীলুল কদর নবীর পূত্রও সুপথে আসেনি। তাই সাধ্যমত চেষ্টা করার পরও সন্তান খারাপ পথে গেলে সবর করতে হবে। আল্লাহ পাক সবরের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে দিয়ে হয়তো আমাদের মর্যাদা বুলন্দ করতে চান। তাই সবর করতে হবে, আর চেষ্টা করা দায়িত্ব তাই চেষ্টাও চালিয়ে যেতে হবে। সেই সাথে সাথে সন্তানকে সুপথে আনার জন্য যে দুআ শিক্ষা দেয়া হয়েছে, সে দুআও করতে হবে। সন্তান যেন নেককার হয়- অসৎ না হয়, তার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা ও দু'আ করতে থাকবে। এরূপ কয়েকটি দুআ নিম্নে পেশ করা হল।

(১) ﴿رَبِّ اجْعَلْنِىْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِىْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَآءِ﴾

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাকে এবং আমার বংশধরকে নামায কায়েম করনেওয়ালা বানাও। হে আমার রব, আমার দুআ কবূল কর। (সূরা ইব্রাহীম: ৪০)

(২) ﴿وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের রব, আমাদের বিবি ও সন্তানদেরকে আমাদের জন্য সুখের বানাও এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের অগ্রণী বানাও। (সূরা ফুরকান: ৭৪)

(৩) ﴿اَللّٰهُمَّ اَصْلِحْ لِىْ فِىْ ذُرِّيَّتِىْ اِنِّىْ تُبْتُ اِلَيْكَ وَ اِنِّىْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ﴾

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার সন্তানদেরকে সংশোধন করে দাও। আমি তোমার দিকে ধাবিত হয়েছি এবং আমি আনুগত্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (এ দুআর প্রথম শব্দ ছাড়া বাকিটুকু সূরা আহকাফের ১৫ নং আয়াত)

(৪) ﴿رَبَّنَا وَ اجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنِ لَكَ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِنَآ اُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে বানাও তোমার অনুগত। এবং আমাদের বংশধর থেকেও তোমার অনুগত একদল বানাও। (এটি সূরা বাকারার ১২৮ নং আয়াত। একটি শব্দ مُسْلِمَيْنِ [দ্বিবচন]কে مُسْلِمِيْنَ [বহুবচন] বানানো হয়েছে মাত্র।)

(৫) (اَللّٰهُمَّ) بَارِكْ لَنَا فِيْ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ. (رواه الحاكم في المستدرک برقم ١٠٠٥ وقال: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের কান, চোখ, অন্তর এবং আমাদের বিবি ও সন্তানদের মধ্যে বরকত দান কর এবং আমাদের তওবা কবূল কর। তুমিই তো তওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু। (মুস্তাদরকে হাকিম)

(৬) اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ مِنْ صَالِحِ مَا تُؤْتِي النَّاسَ مِنَ الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَالْوَلَدِ غَيْرِ الضَّآلِّ وَلاَ الْمُضِلِ. (رواه الترمذي ٣٥٨٦ وقال: ليس إسناده بالقوي)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, তুমি মানুষকে যে ভাল সন্তান, সম্পদ ও বিবি দান করে থাক, আমি তোমার নিকট তদ্রূপের প্রার্থনা করছি, বিভ্রান্ত বা অন্যকে বিভ্রান্তকারী সন্তান ও বিবি নয়। (তিরমিযী)

(৭) اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُ بِكَ مِنْ مَالٍ يَكُوْنُ عَلَيَّ فِتْنَةً وَمِنْ وَّلَدٍ يَّكُوْنُ عَلَيَّ وَبَالًا إلخ. قال اليهثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه من لم أعرفهم.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমি তোমার নিকট এমন সন্তান থেকে পানাহ চাই যা আমার জন্য বিপদের কারণ হবে। (তাবারানী)

এসব দুআর অর্থ লক্ষ করলে দেখা যায় সুসন্তানের জন্য সন্তান জন্মের আগেও দুআ, জন্মের পরেও দুআ, বিপথে গেলে তখনও দুআ, সর্বাবস্থায় দুআ রয়েছে।

এতকিছুর পরও সন্তান খারাপ পথে চলে গেলে বুঝতে হবে হয়তো এর মধ্যে আমাদের জন্য কোনো না কোনোভাবে কল্যাণ রয়েছে। অন্তত এতটুকু কল্যাণ তো হবেই যে, আমরা ধৈর্য ধারণ করলে আমাদের ছওয়াব হতে থাকবে। আর কুরআনে কারীমের বর্ণনা মোতাবেক সত্যিকার ছবরকারীদের জন্য রয়েছে আল্লাহর বিশেষ রহমতের সুসংবাদ।

আল্লাহ তাআলা আমাদের শিশু-কিশোরদেরকে সুষ্ঠভাবে গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দ্বিতীয় অধ্যায়

যদি ছাত্র-জীবন গড়তে চান

দ্বিতীয় অধ্যায়

যদি ছাত্র-জীবন গড়তে চান

ছাত্র জীবনের সংজ্ঞা

যদিও এক হিসাবে গোটা জীবনই ছাত্র-জীবন। কারণ জ্ঞানার্জনের সময় হচ্ছে দোলনা থেকে মৃত্যু পর্যন্ত। তবে এখানে "ছাত্র-জীবন" বলতে বোঝানো হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখার সময়কে। আমরা আমাদের আলোচনাকে এ পর্যায়ের মধ্যেই সীমিত রাখব। আমরা ছাত্র-জীবন সম্পর্কিত আলোচনাকে দুভাগে ভাগ করব। (এক) মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য আলোচনা (দুই) স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য আলোচনা।

(এক) মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য আলোচনা

তালিবে ইলম কাকে বলে

সাধারণত দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রকে "তালিবে ইলম" বলা হয়। তালিব শব্দের অর্থ সন্ধানকারী। আর ইল্‌ম শব্দটি এখানে ইল্‌মে ওহী-র ব্যাপারে প্রযোজ্য, সেমতে ইল্‌ম হল কুরআন-হাদীছের জ্ঞান। অতএব তালিবে ইলম অর্থ কুরআন-হাদীছের জ্ঞান সন্ধানকারী।

এ হল তালিবে ইলম কথাটির সাদামাঠা ব্যাখ্যা। একটু গভীরভাবে "তালিবে ইলম" কথাটির ব্যাখ্যা এরূপ– তালিব (طالب) শব্দটি তলব (طَلَب) থেকে নিষ্পন্ন। তলব শব্দটি সাধারণত তালাশ, সন্ধান, ইচ্ছে, দাবি, চাহিদা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তলব শব্দটি আগ্রহ বা মনের টান অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (طَلَبَ يَطْلُبُ طَلَبًا اِلَيْهُ رَغِبَ اِلَيْهُ. معجم الأفعال) চেষ্টা/প্রচেষ্টা সহকারে কোনো কিছু অর্জন করার অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (الطَّالِبُ مَنْ حَاوَلَ الْحُصُوْلَ عَلَى الشَّيْءِ وَمِنْهُ طَالِبُ المتعدية الْعِلْمِ.) আর ইলম (علم) শব্দটি অজ্ঞতার বিপরীত অর্থাৎ, জানা, চেনা। নিশ্চিত বিশ্বাস ছাড়া সাধারণ জানা চেনা অর্থেও ব্যবহৃত হয়, আবার নিশ্চিতভাবে অর্থাৎ ইয়াকীনের সাথে জানার অর্থেও ব্যবহৃত হয়। (يُقَالُ : عَلِمَ يَعْلَمُ اِذَا تَيَقَّنَ، وَجَاءَ بِمَعْنَى الْمَعْرِفَةِ أَيْضًا. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير) অতএব বলা যায় নিশ্চিতভাবে জানা হল ইলমের নিশ্চিত স্তর। এখন সারকথা বের করতে চাইলে দেখা যাবে

তালিবে ইলমের মধ্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি বিষয় থাকতে হয়। অর্থাৎ, তালিবে ইলম হল সে যার মধ্যে ১. কুরআন হাদীছের ইলমের প্রতি মনের টান ও আগ্রহ থাকবে। ২. যে এই ইলম অর্জনের জন্য প্রয়োজনীয় চেষ্টা নিয়োগ করবে। ৩. যে এই ইলমের প্রত্যেকটা বিষয় এমনভাবে জানবে বুঝবে যে, তার মধ্যে কোনো রকম সংশয় সন্দেহ থাকবে না, নিশ্চিতভাবে সবকিছু জানবে বুঝবে। অতএব এই ৩টি গুণসম্পন্ন ব্যক্তি হল প্রকৃত তালিবে ইলম।

পর্যালোচনাঃ এখন কোন তালিবে ইলমের মনে যদি কুরআন-হাদীছের জ্ঞানের প্রতি টান না থাকে, পিতা-মাতা বা গুরুজন মাদ্রাসায় ভর্তি করে দিয়েছেন আর সে মনে না চাইলেও মাদ্রাসায় সময় পার করে দিচ্ছে, তাহলে সে প্রকৃত তালিবে ইলম নয়। এমনিভাবে কোন তালিবে ইলম যদি এই ইলমের বিষয়গুলো অস্পষ্টভাবে বুঝে চলতে থাকে তাহলে সেও প্রকৃত তালিবে ইলম নয়। যেমনঃ বেশ অনেক তালিবে ইলমকেই দেখা যায় কোন একটা সীগা বা কোন মাসআলা বা কোন বিষয়ে দলীল সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হলে সে হয়তো কোন একটা উত্তর দেয় কিন্তু যদি বলা হয় কী বললে? ঠিক বলছ তো? তখন সে টলোমলো হয়ে যায়, বিচলিত হয়ে যায়, সে পূর্বের অবস্থানে অটল থাকতে পারে না, আবার তার কথা ঘুরিয়ে দেয়। এতে বুঝা যায় বিষয়টি সম্বন্ধে সে সংশয়মুক্ত নয়। তাহলে বলতে হবে, এখনও সে বিষয়ে তার ইলম অর্জন হয়নি। যখন সে অটল মনে কোন কিছু বলতে সক্ষম হবে, তখন বুঝা যাবে সে বিষয়ে তার ইলম অর্জন হয়েছে এবং এভাবে ইলম অর্জন করলেই সে প্রকৃত তালিবে ইলম আখ্যায়িত হওয়ার যোগ্য হবে।

ইলম হাছেল করার সহীহ নিয়ত প্রসঙ্গ

খতীবে বাগদাদী তাঁর "আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি'" কিতাবে, বদরুদ্দীন ইবনে জামাআ তাঁর "তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম" কিতাবে এবং যারনূজী তাঁর "তালীমুল মুতাআল্লিম" কিতাবে ইলম হাছেল করার সহীহ নিয়ত প্রসঙ্গে যা বলেছেন, তার সারকথা হচ্ছে– ইলম হাছেল করার নিয়ত থাকবে (১) অর্জিত ইল্‌ম অনুযায়ী আমল করা এবং সে অনুযায়ী নিজেকে গঠন করা। (২) অর্জিত ইল্‌ম অন্যকে শিক্ষা দেয়া এবং প্রচার-প্রসার করার মাধ্যমে দ্বীন ও শরীয়তকে যেন্দা রাখা। (৩) সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি ও নৈকট্য অর্জন করার মাধ্যমে উভয় জগতের কামিয়াবী হাছেল করা।

ইলম হাছেল করার গলত নিয়ত ও তার ক্ষতি

উপরোক্ত ৩টি উদ্দেশ্যের বাইরে ইলম হাছেল করার উদ্দেশ্য যদি হয় দুনিয়ার সম্পদ অর্জন করা, মানুষের কাছে সম্মান লাভ করা, পদ বা নেতৃত্ব লাভ করা, মূর্খদের সঙ্গে বিতর্কে জয়ী হওয়া ইত্যাদি, তাহলে তা হবে গলত নিয়ত। নিম্নে উল্লেখিত দুটো হাদীছে এসব গলত নিয়ত সম্বন্ধে অবগতি ও সে সম্বন্ধে হুশিয়ারী প্রদান করা হয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغٰى بِهٖ وَجْهُ اللّٰهِ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهٖ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود في سننه باب في طلب العلم ٣٦٦١، وابن حبان برقم ٧٨)

অর্থাৎ, যে ইলম দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করা হয় সেই ইলম যে দুনিয়ার সামগ্রী অর্জন করার উদ্দেশ্যে শিক্ষা করে সে জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না। (আবূ দাঊদ ও ইবনে হিব্বান)

হযরত জাবের ইবনে আব্দিল্লাহ (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لا تَعَلَّمُوا العلمَ لِتُباهُوا بهٖ العُلَمَاءَ، ولا لِتُمَاروا بهٖ السُّفَهَاءَ، ولا تَخَيَّرُوْا بهٖ المَجالِسَ، فمن فَعَلَ ذلک فالنارُ فالنارُ. (رواه ابن ماجة برقم ٢٥٤. قال البوصيري في الزوائد: رجال إسناده ثقات. اهـ. وفي الإتحاف جـ/١: قال العراقي: هذا الإسناد على شرط مسلم.)

অর্থাৎ, তোমরা এ উদ্দেশ্যে ইলম শিক্ষা করো না যে, তার দ্বারা আলেমদের সাথে গৌরববাজি করবে, আর না এ উদ্দেশ্যে যে তা দ্বারা নির্বোধদের সাথে বিতর্ক করবে, আর না এ উদ্দেশ্যে যে তা দিয়ে মজলিসের বিশেষ স্থান সংরক্ষণ করবে। কেউ এমনটা করলে জাহান্নাম! জাহান্নাম!! (ইবনে মাজা)

উপরোক্ত হাদীছদ্বয় থেকে বুঝা গেল ইলম হাছেল করার পেছনে গলত নিয়ত থাকলে তা জান্নাত থেকে বঞ্চনা এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হয়ে দাঁড়াবে। তাহলে ইলমের জন্য ব্যয়িত সমস্ত অর্থ অর্থহীন হয়ে গেল, সমস্ত কষ্ট নিষ্ফল হল, সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ব্যর্থ হল, সমস্ত সময় নষ্ট হল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইলম হাছেল করার গলত নিয়ত থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

ইলমের গুরুত্ব ও ফযীলত

আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌ম হাছেল করা প্রত্যেক মুসলমান নর-নারীর উপর ফরযে আইন। আর ফরয তরক করা কবীরা গোনাহ।

আবশ্যক পরিমাণ ইল্‌ম বলতে বোঝায় নামায, রোযা ইত্যাদি ফরয বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল শিক্ষা করা এবং দৈনন্দিন জীবনে প্রত্যেক ব্যক্তির যেসব লেন-দেন ও কাজ-কারবার করতে হয়, সেসব বিষয়ের মাসআলা-মাসায়েল, হুকুম-আহকাম ও নিয়ম-কানূন সম্পর্কে যথাযথ অবহিত হওয়া।

হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه ابن ماجة في المقدمة – فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال المزي: هذا الحديث رُوِيَ من طرق تبلغ رتبة الحسن. كذا في حاشية السندي)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সমস্ত মুসলমান (নর-নারী)–এর উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয। (ইব্‌নে মাজা)

ইলমের ফযীলত অনেক বেশি। নিম্নে আমার রচিত "ফাযায়েলে যিন্দেগী" কিতাব থেকে ইলমের ফযীলত সম্বন্ধে কিছু বর্ণনা তুলে ধরা হল।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ.﴾

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে (কুরআন-হাদীছের জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাআলা তাদের মর্যাদা অনেক উঁচু করে দেন। (সূরা মুজাদালাঃ ১১)

কত উঁচু করে দেন আল্লাহ পাক সেটা বলেননি। হতে পারে তাঁদের মর্যাদা এত উঁচু করে দেন যা আমাদের কল্পনায়ও আসবে না, তাই সীমানা নির্ধারণ না করেই বলা হয়েছে, অনেক উঁচু করে দেন। এই মর্যাদা উঁচু করা হবে শুধু আখেরাতেই তা-ও নয়, দুনিয়াতেও আলেমদের মর্যাদা উঁচু করা হয়।

নফল ইবাদতের চেয়ে ইল্‌ম শিক্ষা করার ফযীলত বেশি। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ سَعَدِ بْنِ أَبِيْ وَقَّاصٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةَ، وَخَيْرُ دِيْنِكُمْ اَلْوَرَعُ. (رواه الحاكم في المستدرک في كتاب العلم حديث رقم ٣١٧، وقال: على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي في التلخيص: على شرطهما.)

অর্থাৎ, হযরত সাআদ ইব্‌নে আবী ওয়াক্কাস (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার নিকট ইবাদতের ফযীলতের চেয়ে ইলমের ফযীলত বেশি প্রিয়। আর তোমাদের দ্বীনী বিষয়ের মধ্যে পরহেযগারী একটি উত্তম বিষয়। (মুস্তাদরকে হাকিম)

ইল্‌মের ফযীলত বেশি হওয়ার কারণে প্রমাণিত হয় যে, যাকে ইল্‌ম দান করা হয় সে বেশি ফযীলতের অধিকারী, আল্লাহ তাকে বেশি ফযীলত তথা বেশি কল্যাণ দান করেছেন। অন্য এক হাদীছে এ কথাই ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ رضـ خَطِيْبًا يَقُوْلُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ يُرِدِ اللّٰهُ بِهٖ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّيْنِ. الحديث. (رواه البخاري في كتاب العلم – باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين برقم ٧١)

অর্থাৎ, হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন যে, আমি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি– আল্লাহ পাক যার কল্যাণ চান তাকে ধর্মীয় জ্ঞান দান করেন। (বোখারী)

ইলমে দ্বীন হাছেল করার ফযীলত বয়ান করে অপর এক হাদীছে বলা হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :... وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهٗ بَيْنَهُمْ إِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، وَحَفَّتْهُمُ الْمَلٰئِكَةُ،

وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهٗ، وَمَنْ بَطَّأَ بِهٖ عَمَلُهٗ لَمْ يُسْرِعْ بِهٖ نَسَبُهٗ. (رواه مسلم في كتاب الذكر - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের শেষাংশে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখনই কোনো একটি দল আল্লাহ্র ঘরসমূহের কোনো এক ঘরে (মসজিদে বা মাদ্রাসায়) একত্র হয়ে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পরে তার আলোচনা করতে থাকে, তখনই (আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে) তাদের উপর 'ছাকীনা' তথা স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হয় এবং আল্লাহ্র রহমত তাদেরকে ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেয় আর আল্লাহ তাআলা তাঁর নিকট যারা রয়েছে তাদের নিকট (অর্থাৎ, ফেরেশতাদের নিকট) তাদের উল্লেখ করেন। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "ছাকীনা" অর্থ কারও কারও মতে এক ধরনের খাছ রহমত, যার দ্বারা অন্তরে শান্তি পয়দা হয়। স্থিরতা, গাম্ভীর্য, ফেরেশতা ইত্যাদি অর্থও কেউ কেউ করেছেন। হাফেজ ইব্নে হাজার আসকালানী (রহ.) উল্লেখিত সব কয়টিকে সমষ্টিগত অর্থে এভাবে গ্রহণ করেছেন যে, উল্লেখিত সব কয়টি ফেরেশতাদের সঙ্গে অবতীর্ণ হয়।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِمَجْلِسَيْنِ فِيْ مَسْجِدِهٖ، فَقَالَ: كِلَاهُمَا عَلٰى خَيْرٍ، وَأَحَدُهُمَا أَفْضَلُ مِنْ صَاحِبِهٖ، أَمَّا هٰؤُلَآءِ فَيَدْعُوْنَ اللّٰهَ وَيَرْغَبُوْنَ إِلَيْهِ، فَإِنْ شَآءَ أَعْطَاهُمْ وَإِنْ شَآءَ مَنَعَهُمْ، وَأَمَّا هٰؤُلَآءِ فَيَتَعَلَّمُوْنَ الْفِقْهَ وَيُعَلِّمُوْنَ الْجَاهِلَ، فَهُمْ أَفْضَلُ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا. قَالَ: ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِم. (رواه الدارمي في باب فضل العلم حديث رقم ٣٤٩. وفي سنده ضعف يسير يتحمل في باب الفضائل.)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্নে আম্র (রা.) বর্ণনা করেন যে, একদিন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মসজিদে (অর্থাৎ, মসজিদে নববীতে সাহাবীদের) দুটো মজলিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করলেন। (তন্মধ্যে একটি

মজলিস ছিল দুআর, আর একটি ছিল ইল্‌মের।) তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করলেন, উভয় মজলিসই ভাল কাজে আছে; তবে একটি মজলিস অপরটি থেকে উত্তম। এই যে দলটি (যারা দুআয় মশগুল আছে) তারা আল্লাহকে ডাকছে, আল্লাহ্‌র প্রতি আগ্রহ ব্যক্ত করছে, আল্লাহ ইচ্ছে করলে তাদের আশা পূর্ণও করতে পারেন আবার ইচ্ছে হলে না-ও করতে পারেন। কিন্তু এই যে (অপর) দলটি যারা ফেকাহ বা (বর্ণনাকারীর সন্দেহ) ইল্‌ম শিক্ষা করছে এবং অজ্ঞ লোককে শিক্ষা দিচ্ছে এরা উত্তম। আর আমিও মুআল্লিম বা শিক্ষাদাতা হিসাবে প্রেরিত হয়েছি। অনন্তর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সঙ্গে বসে পড়লেন। (সুনানে দারিমী)

ইলমের ফযীলত বয়ান করে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ! لَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ ايَةً مِّنْ كِتَابِ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّکَ مِنْ أَنْ تُصَلِّيَ مِائَةَ رَكْعَةٍ، وَلَأَنْ تَغْدُوَ فَتَعْلَمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهٖ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَنْ تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكْعَةٍ. (رواه ابن ماجة في المقدمة – باب فضل من تعلم القرآن وعلمه برقم ٢١٩. وقال المنذري: إسناده حسن.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, হে আবূ যর! তুমি যদি সকাল বেলা গিয়ে কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা কর তাহলে তা তোমার জন্য একশত রাকআত নফল পড়া থেকেও উত্তম। আর যদি সকাল বেলায় গিয়ে ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা কর, –চাই তার উপর আমল করা হোক বা না হোক– তাহলে তা তোমার জন্য এক হাজার রাকআত নফল নামায থেকেও উত্তম। (ইবনে মাজা)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ رضـ رَفَعَهٗ: إِنَّ الْمَلٰئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًا بِمَا يَطْلُبُ. (رواه أحمد في مسنده حديث رقم ١٨٠٠٧. وإسناده صحيح، كذا

في هامشه. ورواه الترمذي في أبواب الدعوات – باب ما جاء في فضل التوبة والاستغفار إلخ وقال:

هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, হযরত সাফওয়ান ইব্‌নে আছ্ছাল (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তালিবে ইল্‌মের ইল্‌ম সন্ধানের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ফেরেশতাগণ তাদের জন্য নিজেদের পর বিছিয়ে দেন। (মুসনাদে আহমদ ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: তালিবে ইলমদের জন্য ফেরেশতাদের পর বিছিয়ে দেয়া দ্বারা এরূপ উদ্দেশ্য হতে পারে যে, ফেরেশতাগণ তাদের ইল্‌ম শিক্ষা করার মজলিসে হাজির হন, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেন এবং তাদের জন্য দুআ করেন। অথবা প্রকৃতই ফেরেশতাগণ তাদের সম্মানার্থে পর বিছিয়ে দেন।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهٗ بِهٖ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ.

الحديث. (رواه مسلم في كتاب الذكر – باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر.

ورواه أبو داود عن أبي الدرداء في أول كتاب العلم ٣٦٣٨ واللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইল্‌ম সন্ধানের উদ্দেশ্যে বের হয় আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথ সহজ করে দেন। (মুসলিম ও আবূ দাঊদ)

হযরত আবুদ্দারদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত অপর এক হাদীছের শেষাংষে এসেছে–

وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْحِيْتَانُ فِيْ جَوْفِ الْمَآءِ. (رواه أبو داود في أول كتاب العلم ٣٦٣٨.)

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এবং পানির গর্ভের মাছ (পর্যন্ত) আলেমের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে থাকে। (আবূ দাঊদ)

উলামায়ে কেরামের মর্যাদা ও ফযীলত বয়ান করে উপরোক্ত হাদীছের একাংশে রসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الْعُلَمَآءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَآءِ، وَإِنَّ الْأَنْبِيَآءَ لَمْ يُوَرِّثُوْا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ اَخَذَهُ اَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ. (رواه أبو داود في أول كتاب العلم ٣٦٣٨)

অর্থাৎ, হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিছ বা উত্তরাধিকারী। আর নবীগণ দেরহাম-দীনারের উত্তরাধিকার রেখে যান না, তাঁরা ইল্‌মের উত্তরাধিকার রেখে যান। অতএব যে ইল্‌ম (-এর হিস্‌সা) গ্রহণ করল সে (নবীর উত্তরাধিকার গ্রহণ করল বিধায়) একটা গুরুত্বপূর্ণ হিস্‌সা গ্রহণ করল। (আবূ দাঊদ)

হতাশা ও হীনম্মন্যতা দূর করার গুরুত্ব

অনেক তালিবে ইলম হীনম্মন্যতায় ভোগে। ইসলাম বিদ্বেষীরা বলে, এই ফকীরী বিদ্যা শিখে কী হবে? এই বিদ্যা শিখে সমাজে কোন প্রতিষ্ঠা পাওয়া যায় না, এই বিদ্যা শিখে রাষ্ট্রের কোন মর্যাদা পাওয়া যায় না, কোন পদ পাওয়া যায় না, টাকা-পয়সার লাইন হয় না, ইত্যাদি। এসব কথা শুনে কোন কোন তালিবে নিজের সম্বন্ধে হীনতাবোধের শিকার হয়, হীনম্মন্যতায় ভোগে। অথচ পূর্বে এই ইলমের যেসব মর্যাদার কথা বর্ণিত হয়েছে তা সামনে রাখলে একজন তালিবে ইল্‌ম কোনো রকম হীনম্মন্যতায় ভুগতে পারে না। তালিবে ইল্‌ম কেন হীনম্মন্যতায় ভুগবে? সে কেন নিজেকে ছোট মনে করবে? সে তো দু' জাহানের সরদার নবীয়ে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওয়ারিছ হতে যাচ্ছে। সে তো জান্নাতের পথে অগ্রসর হচ্ছে। সে তো দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে উঁচু মর্যাদা প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হচ্ছে। সে তো এত মর্যাদার অধিকারী যে, তার জন্য ফেরেশতারা তাঁদের পর বিছিয়ে দেয়। সে তো এত ভাগ্যবান যে, সে ইল্‌ম তলব করার সময় আল্লাহর পক্ষ থেকে তার উপর 'ছাকীনা' তথা স্বস্তি ও শান্তি অবতীর্ণ হয়, আল্লাহ্‌র রহমত তাকে ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাকে বেষ্টন করে নেয়। সে তো এত ভাগ্যবান ব্যক্তি (আলেম) হতে যাচ্ছে যার জন্য আসমান ও জমিনের অধিবাসীরা এমনকি পানির গর্ভের মাছ পর্যন্ত দুআ করবে, ক্ষমা প্রার্থনা করবে। সে তো এত ভাগ্যবান যে, কুরআনের একটি আয়াত শিক্ষা করে একশত রাকআত নফল পড়া থেকেও বেশি ফযীলত অর্জন করে থাকে। আর ইলমের একটি অধ্যায় শিক্ষা করে এক হাজার রাকআত নফল নামায থেকেও বেশি ফযীলত অর্জন করে থাকে। সে তো এত ভাগ্যবান যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তাকে এই সার্টিফিকেট দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহ তার জন্য কল্যাণ চেয়েছেন, অতএব সে কল্যাণময় ব্যক্তি, সে কল্যাণের প্রতীক!

তালিবে ইলম ও আলেমের চেয়ে সম্মানী ব্যক্তি আর কে হতে পারে? তাঁদের চেয়ে মর্যাদাবান ব্যক্তি আর কে হতে পারে? তাঁদের চেয়ে ভাগ্যবান ব্যক্তি আর কে হতে পারে? দুঃখ সেই তালিবে ইলমের প্রতি, এতসব মর্যাদা ও সৌভাগ্যের প্রতীক হয়েও যে নিজেকে ক্ষুদ্র মনে করে! দুঃখ সেই তালিবে ইলমের প্রতি এই বিদ্যা দিয়ে দুনিয়ার তুচ্ছ ধন-দৌলত কম অর্জন হবে বলে এই মহা মর্যাদার বিদ্যাকে যে তুচ্ছ জ্ঞান করে! দুঃখ সেই তালিবে ইলমের প্রতি এই ইলমের মর্যাদা ও প্রশংসায় আল্লাহ আল্লাহর রসূলের এতসব বাণী থাকা সত্ত্বেও কুরআন-হাদীছের জ্ঞান থেকে বঞ্চিত কিছু মূর্খের অবাস্তব কথায় প্রভাবিত হয়ে যে নিজেকে হীন মনে করে, হীনম্মন্যতার শিকার হয়!

ইলম অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি শর্ত

(১) ইলম অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের একটি হল উস্তাদের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে দেয়া এবং ইলম অর্জন সংক্রান্ত সবকিছু উস্তাদের দিকনির্দেশনা অনুসারে আঞ্জাম দেয়া। ইমাম গাযালী (রহ.) তাঁর “এহ্ইয়াউ উলুদ্দীন” কিতাবে আলোচনার এক পর্যায়ে লিখেছেন- “তালিবে ইল্‌মের জন্য জরুরি হল সে তার উস্তাদের হাতে সম্পূর্ণভাবে নিজের বাগডোর ছেড়ে দিবে, একজন রুগী যেমন সম্পূর্ণরূপে তার চিকিৎসকের হাতে নিজেকে সপে দেয়।” (ইসলামী সিয়াসাত) হেদায়া গ্রন্থকার বুরহানুদ্দীন (রহ.) বলেছেন, আগের যুগের তালিবে ইলমরা উস্তাদের হাতে নিজেকে সম্পূর্ণ সোপর্দ করে দিত। ফলে তারা ইলমের উদ্দেশ্যে সফল হত। আজ তালিবে ইলমরা নিজেদের খেয়াল-খুশিমতে চলার কারণে ইলমের মাকসাদে উপনীত হতে পারছে না। (তালীমুল মুতাআল্লিম) হযরত আলী (রা.) বলেছেন,

أَنَا عَبْدُ مَنْ عَلَّمَنِيْ حَرْفًا وَاحِدًا، إِنْ شَاءَ بَاعَ، وَإِنْ شَاءَ أَعْتَقَ، وَإِنْ شَاءَ اِسْتَرَقَّ. (تعليم المتعلم)

অর্থাৎ, আমি যার নিকট একটি অক্ষরও শিক্ষা করে থাকি, আমি তার গোলাম; ইচ্ছে করলে তিনি আমায় বিক্রিও করে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে আযাদও করে দিতে পারেন বা দাস অবস্থায় রেখেও দিতে পারেন। (তালীমুল মুতাআল্লিম)

ইমাম শু’বা বলেছেন, আমি যার থেকে একটা হাদীছ শিখেছি আমি তার গোলাম, যতদিন তিনি জীবিত থাকেন। (তাযকিরাতুস সামি’ ওয়াল মুতাকাল্লিম)

(২) ইলম অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ শর্তসমূহের আরেকটি হল একাগ্রচিত্ততা। ইলমের জন্য এক মন, এক দিল, এক ধ্যান হওয়া জরুরি, তন্ময়তা জরুরি। বাইরের

সব সম্পর্ক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া জরুরি। প্রয়োজনে বাড়ি-ঘর ছেড়ে দেওয়া, প্রয়োজনে সফর করা জরুরি। ইলমের জন্য ইলমের পরিবেশে পড়ে থাকা জরুরি। মোটকথা ইলম অর্জন ছাড়া আর সব ধরনের চিন্তা-ফিকির বর্জন করা জরুরি। কারণ মানুষের মন একটা, দিল একটা। ফলে একই সঙ্গে একাধিক জিনিসের প্রতি পূর্ণ মনোযোগ নিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِىْ جَوْفِهٖ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ কোন লোকের অভ্যন্তরে দুটো হৃদয় সৃষ্টি করেননি। (সূরা আহযাব: ৪)

তাই ইলম অর্জনের জন্য অন্য সব ধরনের চিন্তা-ফিকির বর্জন করে, অন্য সব ধরনের কাজ থেকে বিমুখ হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ইলমের জন্য নিবেদিত করে দেয়া চাই। এজন্যই বলা হয়েছে,

اَلْعِلْمُ لَا يُعْطِيْكَ بَعْضَهٗ حَتّٰى تُعْطِيَهٗ كُلَّكَ. (تذكره السامع والمتكلم وقيمة الزمن عند العلماء)

অর্থাৎ, ইলম তোমাকে তার কিছু অংশও দিবে না যতক্ষণ তুমি তাকে তোমার পুরোটা না দিবে। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

আমার এক উস্তাদ বলতেন,

اگر یکسوئی نہ ہو تو ایک سوئی بھی نہیں ملیگی

অর্থাৎ, যদি একছুয়ী (একাগ্রতা) না হয় তাহলে এক সুইও (এক সুই পরিমাণ ইলমও) জুটবে না।

যেসব কাজে ইলমের একাগ্রতা নষ্ট হয়, তা বর্জন করা জরুরি। ইলমের একাগ্রতা নষ্ট হওয়ার মত অনেক জিনিস রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটা বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল।

যেসব জিনিসে ইলমের একাগ্রতা নষ্ট হয়

১. বেশি বেশি বাড়ি গেলে বা বেড়াতে গেলে মনের একাগ্রতা নষ্ট হয়। বাড়ির পরিবেশ মনের ওপর কু-প্রভাব ফেলে এমন হলে এ থেকে বিরত থাকা চাই। নিতান্ত প্রয়োজন হলে তার কথা ব্যতিক্রম। এমনিভাবে ব্যতিক্রম যদি বাড়িতে ইলমের পরিবেশ থাকে।

আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া, বন্ধু-বান্ধবদের বাড়িতে বেড়াতে যাওয়া– নিতান্ত প্রয়োজন না হলে এসব থেকে বিরত থাকা চাই।

২. বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দেয়া, এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করা– এসব থেকে তো সমূলেই বিরত থাকা চাই। এসব থেকে এ কারণে বিরত থাকা চাই যে, এগুলো পড়ার একাগ্রতা নষ্ট করে দেয়, ইলমের প্রতি মনোযোগকে নষ্ট করে দেয়।

৩. সম্প্রতি বহু তালিবে ইলম মোবাইল ব্যবহার করার কারণে ইলমের প্রতি মনোযোগ আরোপ করা থেকে মারাত্মকভাবে বঞ্চিত হচ্ছে। মোবাইলে নানান জনের সাথে যোগাযোগ এবং সেই যোগাযোগের ফলে মস্তিষ্কে বহু রকমের চিন্তার অনুপ্রবেশ ঘটার কারণে ইলমের মনোযোগ নেই হয়ে যাচ্ছে। তার চেয়ে আরও দুঃখজনক হল মোবাইলে নানান রকম খারাপ কিছু দেখে পড়ার একাগ্রতা নষ্ট করার পাশাপাশি চরিত্রও ধ্বংশ করে ফেলছে।

আমাদের আকাবির মনীষীদের অনেকের ইতিহাস এরকম যে, ছাত্রজীবনে তাদের কাছে কোন চিঠিপত্র এলেও তারা বার্ষিক পরীক্ষার আগ পর্যন্ত সেগুলো খুলে দেখতেন না এই আশংকায় যে, কোন পত্রের কোন খবরের কারণে যদি মন অন্যদিকে চলে যায় বা বাড়িতে যেতে হয়! অথচ এখনকার ছাত্ররা প্রতিদিন মোবাইলের মাধ্যমে বহুবার শুধু বাড়ির খবর নয় নানান জনের খবর নিয়ে মস্তিষ্ক ভারাক্রান্ত রেখে চলছে। এব্যাপারে সকলেরই শুভ বুদ্ধির উদয় হোক।

৪. পত্র-পত্রিকা পাঠ করা দ্বারাও মনে নানান রকম চিন্তার উদ্রেক হয়। শুধু দেশের নয় গোটা দুনিয়ার চিন্তা মাথায় ঢোকে। ছাত্রের এখনও এতসব চিন্তা মাথায় ঢোকানোর সময় আসেনি। এতসবকিছু মাথায় ঢোকালে পড়ার একাগ্রতা সেই সবকিছুর মধ্যে হারিয়ে যাবে। ইলমের পোক্ততা সৃষ্টির পর সময় আসবে যখন যুগ-জগৎ সম্বন্ধে জানার ও সব বিষয়ে সচেতনতা অর্জনের প্রয়োজন পড়বে, তখন পত্র-পত্রিকা পাঠ করাতে এরূপ অসুবিধে থাকবে না। সেই সময়ের অপেক্ষা করুন। এখনই এতসব সচেতনতা অর্জন করতে গেলে আসল বিষয়ে সচেতনতায় ঘাটতি থেকে যাবে।

৫. সাংগঠনিক কার্যক্রমে জড়ানো।

৬. রাজনীতিতে জড়ানো। এই শেষোক্ত দুটো বিষয় সম্বন্ধে সামনে "ছাত্রজীবনে রাজনীতি ও সংগঠনে যোগদান" শিরোনামে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

সারকথা ইলমের খাতিরে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু এই ইলমের মধ্যেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে।

ইলমের খাতিরে অন্য সব চিন্তা বাদ দিয়ে শুধু এই ইলমের মধ্যেই মনোযোগ নিবদ্ধ রাখতে হবে– এর কিঞ্চিত বিবরণ দিতে গিয়ে খতীবে বাগদাদী বলেছেন, ব্যবসার দোকান লাটে উঠুক, ফসলের বাগান বিরাণ হয়ে যাক, আপনজন বন্ধু-বান্ধব পরিত্যাক্ত হোক, পরিবারের কেউ মারা গেলে অন্যরা তার জানাযা সম্পন্ন করুক, সে শুধু ইলম নিয়েই মশগুল থাকবে– এমন না হলে এই ইলমের ধরা-ছোয়া পাওয়া

যাবে না। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি') শায়খ বদরুদ্দীন ইবনে জামাআ বলেছেন, এখানে কথার মধ্যে একটু অতিরঞ্জন হলেও আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে একথা বোঝানো যে, ইলমের জন্য একাগ্রতা চাই, অন্যসব চিন্তা থেকে মুক্ত হওয়া চাই। কোন কোন মনীষী তালিবে ইলমকে এমন কথাও বলেছেন, রঙিন কাপড় পরিধান কর, তাহলে ধোয়ার চিন্তাও করতে হবে না। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

(৩) ইলম অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ আর একটি শর্ত হল সময়ের গুরুত্ব দেয়া। অর্থাৎ, সময় নষ্ট না করা, পূরো সময়কে কাজে লাগানো। সময়ের গুরুত্ব সম্বন্ধে ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে মনে করি না। কে না জানে জীবন মানেই হল কিছু মুহূর্তের সমষ্টি? একটা মুহূর্ত চলে যাওয়া অর্থ জীবনের একটা অংশ ফুরিয়ে যাওয়া। জনৈক কবি বলেছেন,

حَيَاتُكَ أَنْفَاسٌ تُعَدُّ فَكُلَّمَا + مَضٰى نَفَسٌ مِنْهَا اِنْقَضَتْ بِهٖ جُزْءًا

অর্থাৎ, তোমার জীবন তো হল হাতেগোণা কয়েকটা শ্বাস-প্রশ্বাসের সমষ্টি। একটা শ্বাস ছাড়ার অর্থ জীবনের একটা মুহূর্ত পার হয়ে যাওয়া।

জীবনে যারা বড় হয়েছেন, সময়ের গুরুত্ব দিয়েই বড় হয়েছেন। আকাবির উলামা ও সুলাহা কীভাবে জীবনের সময়ের মূল্য দিয়েছেন এবং সময়কে ইলমের কাজে ব্যয় করেছেন তার বহু ঘটনা হযরত শায়েখ আব্দুল ফাত্তাহ আবূ গুদ্দা (রহ.) তাঁর "কীমাতুয যামানি ইন্‌দাল উলামা" নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন। কলেবর বৃদ্ধির ভয়ে সেসব ঘটনা উল্লেখ করা গেল না। যারা আরবী বুঝতে সক্ষম তাদেরকে "কীমাতুয যামানি ইনদাল উলামা" কিতাবটি মুতালাআ করার জন্য অনুরোধ করছি। আমি উক্ত কিতাব থেকে সংক্ষেপে ১০টি ঘটনা উল্লেখ করছি।

সময়ের গুরুত্ব প্রদান বিষয়ে মনীষীদের কিছু ঘটনা

১. হযরত আমের ইবনে আবদে কায়েছ তাবিয়ীকে একলোক বলেছিলেন, আমার সঙ্গে একটু কথা বলবেন কি? তিনি বলেছিলেন, সূর্যের গতিকে থামাও তাহলে কথা বলব। (তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন সময় যে চলে যাচ্ছে।)

২. ইমাম আবূ হানীফা (রহ.)-এর প্রসিদ্ধ শাগরিদ ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে হাছান (মৃত: ১৮৯ হি.) কাপড় ময়লা হয়ে গেলে তা ধোওয়ারও সময় পেতেন না। ইলমের জন্যই পুরো সময় ব্যয় করতেন।

৩. মালিকী মজহাবের প্রসিদ্ধ আলেম মুহাম্মাদ ইবনে সুহনূন (মৃত: ২৫৬ হি.) খানা সামনে পড়ে থাকত, খাওয়ার সময় পেতেন না। একবার দাসী সামনে খানা রেখে গেল তিনি লেখার ব্যস্ততায় খাওয়ার দিকে মনোযোগ দিতে পারলেন না। দাসী এক

ফাঁকে মুখে তুলে খাইয়ে দিল। ফজরের আযান হয়ে গেলে তিনি দাসীকে বললেন, উম্মে মুদাম! খাবার কি আছে আন। সে জানাল তা যে আপনাকে খাইয়ে দিয়েছি। তিনি বললেন, আমি তো টেরই পাইনি।

৪. লুগাত ও নাহুর ইমাম ছা'লাব (মৃত: ২৯১ হি.)কে কেউ দাওয়াত দিলে তিনি এই শর্ত আরোপ করতেন যে, আমাকে মুতালাআর সুযোগ দিতে হবে।

৫. নাহুর ইমাম আবূ বকর ইবনুল খাইয়াত (মৃত: ৩২০ হি.) রাস্তা দিয়ে হাঁটার সময়ও মুতালাআ করতেন। অনেক সময় গর্তে পড়ে যেতেন বা কোন জানোয়ার তাকে আঘাত করত।

৬. খতীবে বাগদাদী (মৃত: ৪৬৩ হি.) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে তিনি রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, দেখা যাচ্ছে কোন একটি কিতাব পড়তে পড়তে হাঁটছেন।

৭. ইমাম ফখরুদ্দীন রাজী (মৃত: ৬০৬ হি.) সময়কে এত কাজে লাগাতেন, তিনি বলতেন, যে সময়টুকু খাওয়ার পেছনে ব্যয় হয় তার জন্য আফসুস লাগে, সেটুকু যে ইলমের জন্য লাগল না।

৮. হাফেজ আব্দুল আজীম মুনযিরী (মৃত: ৬৫৬ হি.) খানা খাওয়ার সময়ও পাশে কোন কিতাব রেখে তা দেখতে থাকতেন।

৯. ইমাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত: ৭২৮ হি.) সফরে থাকলেও মুতালাআ করতেন। (আমরা বাস, কার, প্লেনে আরোহণরত অবস্থায়ও মুতালাআ করতে পারি।)

১০. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (রহ.) সময় বাঁচানোর জন্য রাস্তায় চলার সময় খুব দ্রুত চলতেন। একদিন একজন তাঁকে জিজ্ঞাসা করল এই বাচ্চাদের সাথে দৌড়ে কোন্ দিকে যাচ্ছেন? তিনি জওয়াব দিলেন, মৃত্যুর দিকে। (তিনি বোঝাতে চেয়েছেন মৃত্যুর দিকেই আমরা এগিয়ে চলছি, অতএব মৃত্যুর পূর্বে যতটুকু সময় কাজে লাগানো সম্ভব লাগানো চাই, সময় নষ্ট না করা চাই।)

প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতি মেনে চলার গুরুত্ব

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্লাস সংক্রান্ত, দারুল ইকামা সংক্রান্ত, ছুটি-ছাটা সংক্রান্ত, বোর্ডিং সংক্রান্ত বহুরকম নিয়ম-কানুন থাকে। উস্তাদ ও কর্তৃপক্ষ সেসব নিয়ম-কানুন ও শর্ত-শরায়েত প্রবর্তন করে থাকেন। ছাত্রের কর্তব্য বিনা বাক্য ব্যয়ে তা মেনে চলা। ইমাম গাযালী বলেছেন, "ছাত্রের কর্তব্য নিজের মত ও বিবেচনা বাদ দিয়ে অন্ধভাবে এগুলো মেনে চলা। এসব নিয়ম-কানুনের ক্ষেত্রে যদি উস্তাদ ও মুরব্বীর ভুল হয়েও থাকে, তবুও ছাত্রের মতে যেটা সঠিক সেই সঠিকের চেয়ে উস্তাদ ও মুরব্বীর এই ভুল মেনে চলাই ছাত্রের জন্য বেশি উপকারী। হযরত মূসা ও খিজর (আ.)-এর ঘটনা থেকে একথাই প্রমাণিত হয়।" (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল

মুতাকাল্লিম) কুরআনে কারীমে এঘটনার বিবরণ রয়েছে। হযরত মূসা (আ.) হযরত খিজির (আ.)-এর কাছে থেকে কিছু ইলম শিক্ষা করতে চাইলে হযরত খিজির (আ.)-এর তার সঙ্গে থাকতে চাইলে কিছু নীতি মেনে চলার শর্ত আরোপ করেন। হযরত মূসা (আ.) তা মেনে নিয়েই সামনে অগ্রসর হন। এ থেকে প্রমাণিত হয়, উস্তাদ ছাত্রকে বিশেষ কিছু নিয়ম-নীতি মেনে চলার শর্ত আরোপ করতে পারেন। ছাত্রের কর্তব্য তা মেনে চলা।

দরসে হাজিরির আদব ও নিয়মনীতি

১. সবকে উস্তাদ যা পড়াবেন পূর্বাহ্নে তা মুতালা করা (পড়ে আসা) কর্তব্য। এটা উস্তাদের হকেরও অন্তর্ভুক্ত। এতে করে তাকে বোঝানোর জন্য উস্তাদকে অতিরিক্ত বেগ পেতে হবে না বা বাড়তি কোন প্রশ্নের জওয়াব দেয়ার পেরেশানী উস্তাদকে সইতে হবে না।

২. দরসে উযুর সাথে বসা উত্তম। কুরআন-হাদীছের ইলম হল নূর। উযুর দ্বারাও নূর অর্জিত হয়। উযু দ্বারা নিজের মধ্যে নূরানী অবস্থা সৃষ্টি হয়, যা এই নূরানী ইলমের সঙ্গে সাযুজ্য পয়দা করে। দরসে উযু সহকারে থাকলে পবিত্রতা ছাড়া কিতাব ধরা ও পাঠ করা থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়। সামনে "কিতাবের আদব-তাজীম প্রসঙ্গ" শিরোনামে এ সম্বন্ধে আরও কিছু কথা দেখে নিন।

৩. দরসে আদবের সঙ্গে বসতে হবে যেমন কেরাতখানার ছেলেরা কারী
সাহেবের সামনে আদবের সঙ্গে বসে। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম) একবার খলীফা মাহদীর এক পুত্র মুহাদ্দিস শরীক (রহ.)-এর মজলিসে এসেছিল। সে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসে শরীক (রহ.)-এর কাছে একটা হাদীছ সম্বন্ধে জানতে চাইলে তিনি তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করলেন না। সে বারবার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও তিনি তার প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপ করলেন না। সে বলল, আপনি সম্ভবত খলীফার সন্তানদের মানহানি করছেন। তিনি বললেন, ইলমওয়ালাদের নিকট ইলমের মান রয়েছে, তারা ইলমের মানহানি করতে পারেন না। তখন সে বুঝতে পেরে হাঁটু গেড়ে বসে জানতে চাইলে তিনি বললেন, হ্যাঁ এভাবেই ইলম তলব করতে হয়। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামি')

৪. দরসে পরে এলে পেছনেই যেখানে জায়গা হয় বসে পড়বে। অন্যদের
ডিংগিয়ে আগে যাবে না। তবে হাঁ তার ব্যাপারে উস্তাদ বা সাথী-সঙ্গীদের বিশেষ ছাড় আছে জানা থাকলে ভিন্নকথা। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

৫. দরসে উস্তাদের উপস্থিতিতে কেউ কোন অন্যায় করলে কেউ তাকে শাসন

করতে বা ধমক দিতে যাবে না। উস্তাদই তা করবেন। তবে হ্যাঁ উস্তাদের ইশারা বা হুকুম হলে তাঁর পক্ষ হয়ে সেটা করা যাবে। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

৬. দরসে উস্তাদের সামনে শান্ত হয়ে বসবে। হাত পা কাপড়-চোপড় নিয়ে খেলা করা, হাতের কাপড় গোটানো, মুখে গালে দাড়িতে হাত দেয়া, নাক বা দাঁতের ময়লা পরিষ্কার করা, হাত পা দিয়ে মাটিতে দাগানো, আঙ্গুল ফোটানো ইত্যাদি অশোভন কাজ থেকে বিরত থাকবে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন, উস্তাদের সামনে কাউকে হাত বা চোখ দিয়ে ইশারাও করবে না। এতখানি আদব রক্ষা করা উস্তাদের হক। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম) হাদীছে এসেছে সাহাবায়ে কেরাম নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে এমন শান্তভাবে বসে থাকতেন যেন তাদের মাথায় পাখি বসে আছে। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামি')

৭. দরসে উস্তাদ সবক শুরু করার পূর্বে এবং সবক শেষ করার পর উভয় সময় উস্তাদের জন্য দুআ করবে। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

সবক শোনা ও বুঝার নিয়মনীতি

ছাত্রের কর্তব্য মনোযোগের সাথে উস্তাদের বক্তব্য ও ভাষণ শ্রবণ করা, অন্যমনস্ক না হওয়া এবং উস্তাদের কথা ভাল করে বুঝে নেয়া। জহ্হাক ইবনে মুযাহিম বলেছেন,

أَوَّلُ بَابٍ مِنَ الْعِلْمِ اَلصَّمْتُ، وَالثَّانِي اِسْتِمَاعُهُ، وَالثَّالِثُ اَلْعَمَلُ بِهِ، وَالرَّابِعُ نَشْرُهُ وَتَعْلِيْمُهُ. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)

অর্থাৎ, ইলমের প্রথম পরিচ্ছেদ হল চুপ থাকা, দ্বিতীয় হল মনোযোগ দিয়ে শোনা, তৃতীয় হল ইলম অনুযায়ী আমল করা, আর চতুর্থ হল ইলমের প্রচার প্রসার করা। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামি')

পাঠ দানের সময় সম্পূর্ণ নিরব থাকা উচিত। কথা-বার্তা বলা বা হাসি তামাশায় লিপ্ত হওয়া সম্পূর্ণ বর্জনীয়। বিনা প্রয়োজনে ডানে বামে উপরে নিচে কোনো দিকে তাকাবে না। উস্তাদের দিকে নজর দিয়ে কান খাড়া করে উস্তাদের কথা শুনবে। অবশ্য যখন কিতাবের ইবারত লক্ষ করার প্রয়োজন তখন কিতাবের দিকেই নজর দিবে, তখন উস্তাদের দিকে নজর দিয়ে বসে থাকবে না। আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামি' কিতাবে আছে– প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হাম্মাদ ইবনে

যায়েদ বলতেন, যখন হাদীছ পড়া হয় তখন চুপ থাকা ওয়াজিব, যেমন কুরআন তেলাওয়াতের সময় চুপ থাকা ওয়াজিব।

উস্তাদ যদি বিশেষ কোন তথ্য বা তত্ত্ব বর্ণনা করেন যা ছাত্রের জানা আছে, তাহলে ছাত্র মুখে তা প্রকাশ করবে না বা এমন ভাব দেখাবে না যে, এটা আমার জানা আছে। বরং এমন উৎসুক ভাব নিয়ে শুনবে যেন কখনও সেটা শোনেনি। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত আতা (রহ.) বলেন, আমি কারও থেকে যদি এমন হাদীছ শুনি যা আমার জানা আছে, তবুও আমি এমন ভাব দেখাই যেন তার চেয়ে আমার ভাল জানা নেই। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম ও আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামি')

উস্তাদের মতের বিপরীত অন্য কারও মত তাঁর সামনে বয়ান না করা। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামি')

উস্তাদের কোন বক্তব্য সম্বন্ধে এরূপ বলবে না যে, এটা ঠিক নয়, অমুকে এরকম বলেছেন, বা অমুক কিতাবে এরকম আছে ইত্যাদি। উস্তাদ কোন কথা বা দলীলের উপর জোর প্রদান করলে ছাত্রের যদি সঠিক মনে না হয় বা বুঝে না আসে তবুও যেন চেহারা বিকৃত না হয় কিংবা অস্বীকৃতিজ্ঞাপক কোন হাবভাব তার থেকে প্রকাশ না পায়। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

উস্তাদের কোন বক্তব্য বোধগম্য না হলে প্রশ্ন করে সেটা বুঝে নেয়ার চেষ্টা করবে। উস্তাদ বারবার বোঝানো সত্ত্বেও যদি বুঝে না আসে সেজন্য উস্তাদের প্রতি কুধারণা পোষণ করবে না যে, উনি নিজেই বোঝেন না কিংবা বোঝানোর যোগ্যতা নেই, বরং বুঝতে না পারাকে নিজের বোধশক্তির ত্রুটি মনে করবে।

উস্তাদকে প্রশ্ন করার নীতিমালা

১. ছাত্রের কর্তব্য উস্তাদ থেকে ভাল করে বুঝে নেয়া। কোন কথা বুঝে না এলে প্রশ্ন করে বুঝে নেয়া। বোখারী শরীফের ইল্‌ম অধ্যায়ে হযরত আয়েশা (রা.) সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে,

كَانَتْ لاَ تَسْمَعُ شَيْئًا لاَ تَعْرِفُهُ إِلاَّ رَاجَعَتْ فِيْهِ حَتّٰى تَعْرِفَهُ. الحديث. (صحيح البخاري برقم ١٠٣)

অর্থাৎ, হযরত আয়েশা (রা.) রসূল থেকে কোন কথা শুনলে না বুঝে আসা পর্যন্ত বারবার প্রশ্ন করে হলেও বুঝে নিতেন।

২. ছাত্রের অধিকার রয়েছে যতক্ষণ কোন বিষয় বুঝে না আসে ততক্ষণ উস্তাদকে জিজ্ঞাসা করে তা বুঝে নেয়ার। তবে অমনোযোগিতার কারণে বুঝতে না পারলে

সে বিষয়ে প্রশ্ন করে উস্তাদকে কষ্ট দেয়া মুনাছেব নয়। হাঁ যদি সেরকম বিষয়ে জানার প্রয়োজনে প্রশ্ন করতেই হয়, তাহলে পরে নিজের দোষ স্বীকার করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে।

৩. উস্তাদের কথার মাঝে কথা কেটে দিয়ে কোনো প্রশ্ন করা মুনাছেব নয়। বরং উস্তাদ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কথা শেষ করার পর প্রশ্ন করবে। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

৪. কোন বিষয় যদি জানা থাকে তাহলে সে বিষয়ে প্রশ্ন করবে না। এতে একদিকে সময়ের অপচয় হয় অন্যদিকে ছাত্রের জানা আছে উস্তাদ তা টের পেলে উস্তাদের জন্য পেরেশানির কারণ হয় (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম) এই ভেবে যে, দেখ কত বড় ঔদ্ধত্ব– আমাকে পরীক্ষা করছে! কিংবা এই ভেবে পেরেশানি হয় যে, ওর তো বিষয়টা জানা আছে, এখন আমি যদি ওর চেয়ে ভাল করে বলতে না পারি তাহলে যে আমি ওর কাছে ছোট হয়ে যাব!

৫. উস্তাদ কোন বিষয়ে প্রশ্ন করতে নিষেধ করলে তা মান্য করা উচিত এবং কখনো তাকে অসুবিধেয় ফেলতে চেষ্টা না করা উচিত। কোন বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্ন করাও নিষেধ। নিজের মেধা প্রদর্শনের জন্য প্রশ্ন করা বা অস্পষ্ট কিংবা অর্থহীন প্রশ্ন করাও উচিত নয়।

৬. ছাত্রের কোন অসংগত প্রশ্ন বা অসংগত আচরণের কারণে উস্তাদ রাগ করলে, বকা দিলে বা মারধর করলে ছাত্রের কর্তব্য সেটা সহ্য করা।

৭. শুধু উস্তাদ নয় জানার জন্য যে কারও কাছে জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করা ইলমের জন্য একটা বড় প্রতিবন্ধক। এমনকি ছোটদের কাছেও জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে, যদি জানা থাকে যে, সে ছোট আমার চেয়ে ভাল জানে। এক্ষেত্রে কোনো লজ্জা বা অহংকার বোধ বাধা না হওয়া উচিত। যারা জিজ্ঞাসা করতে লজ্জাবোধ করে বা অহংকার করে তারা ইলম থেকে বঞ্চিত হয়। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী হযরত মুজাহিদ (রহ.) বলেছেন,

لَا يَتَعَلَّمُ الْعِلْمَ مُسْتَحْيٍ وَلَا مُسْتَكْبِرٌ. (صحيح البخاري باب الحياء في العلم)

অর্থাৎ, যারা লজ্জা করে বা অহংকার করে তাদের ইলম অর্জন করা হয়ে ওঠে না।

বোখারী শরীফে এসেছে- হযরত আয়েশা (রা.) বলেছেন, আনসারী নারীরা কত ভাল দ্বীনের জ্ঞান অর্জন করার ক্ষেত্রে লজ্জা তাদের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। (صحيح التخارى باب الحياء في العلم)

তবে হ্যাঁ কখনও যদি এমন হয় যে, বিশেষ লজ্জার কারণে উস্তাদ বিশেষকে নিজে জিজ্ঞাসা করা না যায়, তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ে জেনে নিতে হবে। যেমনঃ হযরত আলী (রা.) মযী সংক্রান্ত মাসআলা সম্বন্ধে নিজে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (শ্বশুর বিধায়) জিজ্ঞাসা করতে না পেরে হযরত মেকদাদ বা বেলাল (রা.)কে দিয়ে জিজ্ঞাসা করিয়ে নিয়েছিলেন।

কিতাবের আদব-তাজীম প্রসঙ্গ

কিতাবের তাজীম ইলমের তাজীমেরই অন্তর্ভুক্ত। তাই কিতাবের তাজীম করা কর্তব্য। পবিত্রতা ছাড়া কিতাব ধরা ও পাঠ করা থেকে বিরত থাকা উচিত। কিতাব ধরার সময় যেন উযূ থাকে। ইলম হল নূর। উযূর দ্বারা নূর হাছেল হয়। তাই উযূ দ্বারা ইলমের নূরে বৃদ্ধি ঘটে। হযরত ইমাম শামসুল আইম্মা হালওয়ানী বলেছেন, আমি এই যতটুকু যা ইলম পেয়েছি ইলমের তাজীমের ওছিলাতেই পেয়েছি। আমি পবিত্রতা ছাড়া কাগজও ধরিনি। ইমাম শামসুল আইম্মা সারাখ্ছীও পবিত্রতা ছাড়া কিতাব ধরতেন না। (তালীমুল মুতাআল্লিম)

কিতাবের প্রতি তাজীমের দাবি হল কিতাবের দিকে পা ছড়িয়ে বসবে না বা শোবে না। তাফসীরের কিতাব অন্যসব কিতাবের উপরে রাখবে। কোনো কিতাবের উপর অন্য কোনো জিনিস রাখবে না। (তালীমুল মুতাআল্লিম)

ইবনে জামাআ লিখেছেন, কিতাবকে কাগজপত্র রাখার ফাইল বানাবে না। কিতাব দিয়ে বাতাস নিবে না। কিতাবকে বালিশ বা হেলান দেয়ার তাকিয়া বানাবে না। কিতাবের পাতার কোণায় ভাজ দিবে না। কিতাবে নখ দিয়ে শক্তভাবে দাগ দিবে না। কোন কাঠি বা শক্ত খসখসে কিছু দিয়ে কিতাবের কোথাও নিশানা দিবে না, কাগজ দিয়ে সেকাজটি করা যেতে পারে। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

মাদ্রাসা বা কারও থেকে পড়ার জন্য ধার নেয়া কিতাবে কোন টীকা বা পাদটীকা লিখতে পারবে না। তবে হাঁ ব্যক্তি মালিকানার কিতাবে মালিকের পক্ষ থেকে সেরূপ লেখার অনুমতি থাকলে ভিন্ন কথা। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

পূর্বসূরী আকাবির উলামায়ে কেরাম কিতাবকে কীভাবে সম্মান করতেন তার ঘটনা রয়েছে প্রচুর। এই নিকট অতীতে হযরত আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী (রহ.) সম্বন্ধে বর্ণিত আছে, হযরত মাওলানা কারী তাইয়্যেব সাহেব রহ. বলেন, আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরীকে আমরা কখনও শুয়ে মোতালায়া করতে দেখিনি। কিতাবে কনুই ঠেকিয়েও মুতালাআ করতে দেখিনি। আল্লামা আনোয়ার শাহ কাশ্মিরী রহ. বলতেন, আমি মুতালাআয় কখনো কিতাবকে আমার অনুগত বানাইনি বরং আমি সর্বদা কিতাবের অনুগত থেকে মুতালাআ করেছি। তাঁর সম্পর্কে বর্ণিত আছে তিনি

কিতাবের হাশিয়া দেখতে হলে প্রয়োজনে নিজে ঘুরে গিয়ে বিপরীত দিক থেকে লেখা হাশিয়াগুলো পড়তেন, কিতাবকে ঘুরাতেন না।

উস্তাদের আদব-তাজীম প্রসঙ্গ

সব শাস্ত্রের ইমামগণ ইল্‌ম সন্ধানের মূলনীতি প্রণয়ন করতে গিয়ে উস্তাদের আদব তাজীমের বিষয়টাকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে উল্লেখ করে থাকেন। মুহাদ্দিসীনে কেরাম "আদাবে তালিবে ইল্‌ম" শীর্ষক একটা পৃথক অধ্যায়ে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। "আওজাযুল মাসালিক" গ্রন্থে এসংক্রান্ত বিশদ আলোচনা রয়েছে। আল্লামা জরনূযী তার "তালীমুল মুতায়াল্লিম" গ্রন্থে লিখেছেন- আমি অনেক ছাত্রকে ইল্‌মের উপকার থেকে বঞ্চিত দেখতে পাই, কারণ তারা ইল্‌ম অর্জনের শর্ত ও আদব রক্ষা করে না, ফলে তারা বঞ্চিত হয়।" এ পরম্পরায় "উস্তাদের তা'যীম জরুরি" সংক্রান্ত বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে তিনি লেখেন, "তালিবে ইল্‌ম তার ইল্‌ম দ্বারা ততক্ষণ পর্যন্ত উপকৃত হতে পারে না যতক্ষণ না সে তার ইল্‌ম ও উস্তাদের যথাযথ সমীহ করে। পক্ষান্তরে যে যতটুকু যেভাবে অমান্য করেছে, সে ততটুকু সেভাবে বঞ্চিত হয়েছে। অবশেষে তিনি বলেন, "পাপের দ্বারা যে মানুষ কাফের হয় না অথচ দ্বীনের সামান্য কোন অংশের অমর্যাদা করলেও সে কাফের হয়ে যায়, তার মূল রহস্য এটাই। "বা-আদব বা-নসীব, বে-আদব বে-নসীব" বলেও একটা কথা প্রসিদ্ধ আছে। মোটকথা যে কোনো ধরনের বিদ্যার ক্ষেত্রে বিদ্যা ও উস্তাদের আদব ও তাজীম রক্ষা না করে সংশ্লিষ্ট বিদ্যার উৎকর্ষ সাধন করা সম্ভব নয়, আর বিরুদ্ধাচারণ করলে তো তার কল্পনা করাই অসম্ভব।

অতএব উস্তাদের আদব তাজীম রক্ষা করা ছাত্রের জন্য এক জরুরি বিষয়। এমনকি উস্তাদের তাজীম সম্মানের খাতিরে উস্তাদের নিকটাত্মীয়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা, উস্তাদের বন্ধু-বান্ধব ও সমসাময়িক অন্যান্য শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়াও কর্তব্য। তালীমুল মুতাআল্লিম কিতাবে উস্তাদের আদব তাজীমের দাবির মধ্যে এটাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যে, উস্তাদের সন্তানকে পর্যন্ত সম্মান করবে।

কথা-বার্তা, শব্দ প্রয়োগ, আচার-আচরণ, উঠা-বসা, চলা-ফেরা ইত্যাদি সব ক্ষেত্রেই আদব রক্ষা করতে হবে। যেমন– উস্তাদের সামনে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জোরে কথা না বলা, উস্তাদের আগে বেড়ে কথা না বলা, তাঁদের দিকে পিছন দিয়ে না বসা, একসাথে চলার সময় তাঁদের সামনে না চলা, ইত্যাদি। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

يَاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تُقَدِّمُوۡا بَيۡنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوۡلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ سَمِيۡعٌ عَلِيۡمٌ ﴿۱﴾ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا لَا تَرۡفَعُوۡۤا اَصۡوَاتَكُمۡ فَوۡقَ صَوۡتِ النَّبِىِّ وَ لَا تَجۡهَرُوۡا لَهٗ بِالۡقَوۡلِ كَجَهۡرِ بَعۡضِكُمۡ لِبَعۡضٍ اَنۡ تَحۡبَطَ اَعۡمَالُكُمۡ وَ اَنۡتُمۡ لَا تَشۡعُرُوۡنَ ﴿۲﴾

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে কোন বিষয়ে অগ্রসর হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ মহা শ্রবণকারী, মহা জ্ঞানী। হে মুমিনগণ, তোমরা নবীর কন্ঠস্বরের উপর নিজেদের কন্ঠস্বরকে উঁচু করো না এবং তোমাদের একজন অপরজনের সাথে জোরে কথা বলার ন্যায় তাঁর সাথে জোরে কথা বলো না। তাহলে তোমাদের আমলসমূহ নষ্ট হয়ে যাবে এমনভাবে যে, তোমরা টেরও পাবে না। (সূরা হুজুরাত: ১-২)

এ দুই আয়াতের আলোকে মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে যেসব আদব, রসূলের নায়েব উলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও সেসব আদব।

ইমাম শাফিঈ (রহ.) উস্তাদের এতটা আদব রক্ষা করতেন, তিনি বলেছেন, আমি আমার উস্তাদ ইমাম মালেকের সামনে খাতা কিতাবের পাতা উল্টাতাম এত আলতোভাবে যে, উস্তাদের কানে যেন তার আওয়াজ না যায়। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

উস্তাদের এতটা আদব রক্ষা করা চাই যে, ছাত্র যেন তার গোলাম। পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে, হযরত আলী (রা.) বলতেন, আমি যার নিকট একটি অক্ষরও শিক্ষা করে থাকি, আমি তার গোলাম; ইচ্ছে করলে তিনি আমায় বিক্রিও করে দিতে পারেন, ইচ্ছে করলে আযাদও করে দিতে পারেন বা দাস অবস্থায় রেখেও দিতে পারেন। (তালীমুল মুতাআল্লিম) ইমাম শু'বা বলেছেন, আমি যার থেকে একটা হাদীছ শিখেছি আমি তার গোলাম, যতদিন তিনি জীবিত থাকেন। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

উস্তাদের আজমত শ্রদ্ধার দাবি হল উস্তাদের সাথে ভক্তি সহকারে কথা বলা, ভক্তি সহকারে তাঁদের দিকে দৃষ্টি দেয়া এবং হাবভাবে ভক্তি প্রকাশ করা। উস্তাদের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকানো থেকেও বিরত থাকা চাই। বোখারী শরীফের এক রেওয়ায়েতে সাহাবায়ে কেরাম সম্বন্ধে এরূপ বর্ণনা এসেছে,

وَمَا يُحِدُّوْنَ اِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيْمًا لَهٗ. (رواه البخاري في كتاب الشروط ٢٧٣١)

অর্থাৎ, তাঁরা (সাহাবায়ে কেরাম) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আজমত ও সম্মানবোধের কারণে তাঁর দিকে তেজ দৃষ্টিতেও তাকাতেন না। (বোখারী) আর পূর্বে বলা হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে যেসব আদব, রসূলের নায়েব উলামায়ে কেরামের ক্ষেত্রেও সেসব আদব।

উস্তাদের আজমত শ্রদ্ধার আরেকটা দাবি হল উস্তাদের সামনে তাওয়াজু' ও বিনয়ের সাথে থাকা। কথা-বার্তা ও আচার-আচরণ সব কিছুতেই বিনয় থাকতে হবে। দুনিয়ার সব ক্ষেত্রেই খোশামোদ তোষামোদ নিন্দনীয়; একমাত্র উস্তাদের সাথে তা প্রশংসনীয়। (তালীমুল মুতাআল্লিম)

ইমাম গাযালী বলেছেন,

لَا يَنَالُ الْعِلْمَ اِلَّا بِالتَّوَاضُعِ وَاِلْقَاءِ السَّمْعِ. (تذكرة السامع والمتكلم)

অর্থাৎ, তাওয়াজু ও মনোযোগ প্রদান ছাড়া ইলম অর্জিত হয় না। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

"আদাবুদ্দীন ওয়াদ্দুনিয়া" গ্রন্থে গ্রন্থকার লিখেছেন- তালিবে ইল্‌মের জন্য উস্তাদের খোশামোদ-তোষামোদ, তাঁদের সম্মুখে বিনয়ী ও নম্র থাকা একান্ত আবশ্যক। এ দুটো গ্রহণ করলেই উপকৃত হওয়া যাবে, অন্যথায় বঞ্চনাই হবে তার সুনিশ্চিত ভাগ্য।

উস্তাদের আজমত শ্রদ্ধার দাবি এও যে, উস্তাদের গা ঘেষে বসবে না, তাঁর মুসল্লায় বসবে না, তার তাকিয়ায় হেলান দিবে না। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম) উস্তাদের বিছানা বালিশে শোবে না।

শায়খ বদরুদ্দীন ইবনে জামাআর বর্ণনা মোতাবেক উস্তাদের আজমত শ্রদ্ধার আরেকটা দাবি হল উস্তাদের কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে সে জন্য উস্তাদের প্রতি ভক্তি হারিয়ে না বসা বরং তার এমন কোন সুব্যাখ্যা বের করা, যাতে উস্তাদ রক্ষা পান। এমনকি উস্তাদ অন্যায়ভাবে কিছু বললেও তার নিন্দা-শেকায়েত না করা এবং মন খারাপ না করা উচিত। (অবশ্য স্পষ্টতই উস্তাদ থেকে কোন অন্যায় সংঘটিত হলে তার সমর্থন না করা চাই। কিংবা পাপের কিছু বললে তার অনুসরণও না করা চাই।) উস্তাদের কোন ব্যাপারে মন যেন খারাপ হতে না পারে, উস্তাদের প্রতি যেন কুধারণা হতে না পারে- এজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা চাই। শায়খ বদরুদ্দীন ইবনে জামাআ বর্ণনা করেছেন, কোন কোন মনীষী উস্তাদের কাছে যাওয়ার পূর্বে এই দুআ করে নিতেন−

اَللّٰهُمَّ اسْتُرْ عَيْبَ شَيْخِيْ عَنِّيْ، وَلَا تُذْهِبْ بَرَكَةَ عِلْمِهٖ عَنِّيْ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমার থেকে আমার উস্তাদের দোষ গোপন রেখো, আমার থেকে তার ইলমের বরকত দূর করে দিয়ো না। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম)

উস্তাদের আজমত শ্রদ্ধার আরেকটা দাবি হল নিজের কোন ত্রুটি হলে উস্তাদের সামনে অকপটে তা স্বীকার করে নেয়া। অপব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়ে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত না হওয়া। এভাবে যেকোনো মূল্যেই নিজেকে নির্দোষ প্রমাণিত করার চেষ্টা থেকে জাহির হয় যে, সে ছোট হতে রাজি নয়। এভাবে প্রকারান্তরে উস্তাদকেই ছোট করা হয়। তাই নিজের কোন ত্রুটি হলে উস্তাদের সামনে অকপটে তা স্বীকার করে নিতে হবে।

উস্তাদের আজমত শ্রদ্ধার আরেকটা দাবি হল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন পোশাক পরিধান করে, পরিপাটি অবস্থায়, শ্রদ্ধা ও আজমতের সাথে উস্তাদের সামনে হাজির হওয়া। (তাযকিরাতুস সামি' ওয়াল মুতাকাল্লিম-এর আলোকে)

উস্তাদের খেদমত প্রসঙ্গ

উস্তাদের খেদমত করা ছাত্রের জন্য বহু উপকারী। এই উপকারসমূহের মধ্যে একটি হল উস্তাদের খেদমত দ্বারা উস্তাদের দুআ পাওয়া যায়। বোখারী মুসলিমে ঘটনা বর্ণিত আছে। একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতে ইস্তেঞ্জা সেরে বের হয়েছেন। দেখলেন বাইরে কাছেই লোটাভর্তি পানি। প্রয়োজনের মুহূর্তে যথাস্থানে পানি দেখে তিনি খুশি হলেন। জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলেন হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) তা রেখেছেন। তিনি ইবনে আব্বাস (রা.)কে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে দুআ করলেন,

اَللّٰهُمَّ عَلِّمْهُ الْكِتَابَ. (متفق عليه)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাকে কুরআনে কারীমের ইলম দান করো!

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর দুআ ব্যর্থ হওয়ার নয়। দুআ এমনই কবুল হল যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ইবনে আব্বাস (রা.)কে রইসুল মুফাস্‌সিরীন (মুফাসসিরদের সর্দার) বানিয়ে দিলেন। পরে তাফসীরের ব্যাপারে বড় বড় সাহাবী পর্যন্ত তাঁর স্মরণাপন্ন হতেন।

উস্তাদের খেদমতের মধ্যে শারীরিক আর্থিক সব ধরনের খেদমত অন্তর্ভুক্ত। উস্তাদ অভাবী এবং ছাত্র স্বচ্ছল হলে উস্তাদের বৈষয়িক সহযোগিতা করা এবং তাঁদেরকে হাদিয়া-তোহফা প্রদান করা এই খেদমতেরই অন্তর্ভুক্ত।

উস্তাদের শারীরিক খেদমতের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে তা যেন শরীয়তের আওতার মধ্যে থেকে হয়। কোনো রূপ গোনাহের পর্যায়ে না যায়। গোনাহের পর্যায়ের খেদমত থেকে অবশ্যই এড়িয়ে চলতে হবে। তাতে উস্তাদ অসন্তুষ্ট হলে তাতে কোনো ক্ষতি নেই। বরং এরূপ খেদমত এড়িয়ে যাওয়াই শরীয়তের নির্দেশ। হাদীছে এসেছে,

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ. (رواه أحمد برقم ٢٠٥٣١ في بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة برقم ٣٤٤٠٦)

অর্থাৎ, আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কোনো ক্ষেত্রে মাখলূকোর আনুগত্য চলবে না। (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে আবী শাইবা)

উল্লেখ্য, উস্তাদকে সন্তুষ্ট রাখা জরুরি, তবে কোনো গোনাহের ক্ষেত্রে তার অনুসরণ করে তাকে খুশি রাখতে হবে এমনটা অবশ্যই পরিত্যাজ্য। গোনাহ না হয়– এমন কোনো কারণে উস্তাদ অসন্তুষ্ট হলে বা উস্তাদের মেজাযের পরিপন্থী কোন কথা বলে ফেললে সাথে সাথে নিজের ত্রুটির জন্য ওজরখাহী করা এবং উস্তাদকে সন্তুষ্ট করা জরুরি।

উস্তাদের খেদমতে লিপ্ত হলে আদব হল তাঁর অনুমতি ব্যতীত চলে না যাওয়া। (অনুমতি প্রকাশ্য হোক বা লক্ষণ থেকে বুঝা যাক।)

এ বিষয়টাও উস্তাদের খেদমতের অন্তর্ভুক্ত যে, তাঁর আরাম রাহাতের দিকে খেয়াল রাখবে। উস্তাদ রোগাক্রান্ত হলে অথবা দুর্বল হয়ে পড়লে কিংবা অসুবিধাজনক অবস্থায় থাকলে উস্তাদের নিকট সবক বন্ধ রেখে তাঁকে আরাম গ্রহণের আবেদন জানাবে।

উস্তাদের শারীরিক মানসিক খেদমতের পাশাপাশি তাঁর রূহানী খেদমত করাও কর্তব্য। উস্তাদের রূহানী খেদমত হল উস্তাদের জন্য দুআ করা। উস্তাদ হলেন রূহানী পিতা। উস্তাদের হক অনেকটা পিতার হকের মত। তাই পিতার ন্যায় উস্তাদের হকও তাঁর মৃত্যুর পরেও বহাল থাকে। উস্তাদের মৃত্যুর পরও সর্বদা তাঁর জন্য দু'আ করা কর্তব্য।

মুহাক্কিক মুদাক্কিক আলেম হওয়ার উপায়

মুহাক্কিক বলা হয় যিনি প্রত্যেকটা কথা ও বিষয়কে দলীল সহকারে বোঝেন। আর মুদাক্কিক বলা হয় যিনি সেই দলীল সম্বন্ধেও বিস্তারিত জ্ঞান রাখেন। যেমন– ইলম শিক্ষা করা ফরয। একথাটি জানা হল সাধারণ ইলম। আর যিনি একথাটির

দলীল অর্থাৎ, ইলম শিক্ষা করা ফরয হওয়ার দলীল জানেন তিনি হলেন এ বিষয়ে মুহাক্কিক। দলীলটি হল নিম্নোক্ত হাদীছ–

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ. (رواه ابن ماجة في المقدمة – فضل العلماء والحث على طلب العلم. قال المزي: هذا الحديث رُوِيَ من طرق تبلغ رتبة الحسن. كذا في حاشية السندى.)

অর্থাৎ, প্রত্যেক মুসলমানের উপর ইল্‌ম শিক্ষা করা ফরয। (ইব্‌নে মাজা)

এই দলীল যে জানে সে হল এ ব্যাপারে মুহাক্কিক। আর এই দলীল সম্বন্ধে অনেক কথা রয়েছে। যেমন: এ হাদীছটি সনদের দিক থেকে জয়ীফ তবে আল্লামা মিয্‌যী বলেছেন, বহুবিধ সূত্র থাকা (تعدو طرق)-এর কারণে হাদীছটি হাছান দরজায় উন্নীত হয়েছে। ফলে এটি দলীলযোগ্য। আবার কেউ কেউ যে বলেন, عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (অর্থাৎ, মুসলমান নর ও নারী উভয় শ্রেণীর উপর) এভাবে কোন রেওয়ায়েতে আসেনি। (যদিও এ হাদীছে বর্ণিত "মুসলিম" শব্দটিই উভয় শ্রেণীকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য যথেষ্ট।) এভাবে এই দলীল জানার সাথে সাথে এই দলীল সম্বন্ধেও যিনি বিস্তারিত জানেন তিনি হলেন এ ব্যাপারে মুহাক্কিক হওয়ার সাথে সাথে মুদাদ্দিকও। একজন আলেমের জন্য প্রয়োজীয় সব কথাই যখন তিনি এভাবে জানবেন তখন তিনি হবেন মুহাক্কিক মুদাক্কিক আলেম।

পড়তে ইচ্ছে করে না– এ রোগের চিকিৎসা

পড়তে ইচ্ছে না করা একটা রোগ। এ রোগের চিকিৎসা হল পড়তে শুরু করা। পড়তে পড়তে পড়ার মধ্যে স্বাদ অনুভব হতে শুরু করবে, তারপরই পড়ার আগ্রহ হতে শুরু হবে। যদি কেউ বলে, আমার তো পড়তে ইচ্ছেই করে না, চিকিৎসা দেয়া হল পড়তে শুরু করা, রোগ যা চিকিৎসাও দেয়া হল তাই দিয়ে! তাহলে শুনুন, পড়ার ইচ্ছে তৈরি করার জন্য এ ছাড়া আর কোনো ব্যবস্থা নেই। আপনার শরীরে অলসতা বাসা বেঁধেছে, শরীর ম্যাজম্যাজ করছে, হাঁটতে ইচ্ছে করছে না, এর একমাত্র চিকিৎসা হল হাঁটতে শুরু করে দেয়া। হাঁটতে শুরু করুন, সব ম্যাজমেজে ভাব কেটে যাবে। পড়ার ইচ্ছে ও আগ্রহ তৈরি করার ব্যাপারটিও অনুরূপ। তবে হ্যাঁ যদি এরকম হয় যে, একটা বিষয় পড়তে পড়তে ত্যক্ততা এসে গেছে, আর তা পড়তে ইচ্ছে করছে না, তাহলে বিষয় পাল্টে নিন, অন্য একটা বিষয় পড়ুন তাতে আর ত্যক্ততা বোধ হবে না। "কীমাতুয যামানি ইন্‌দাল উলামা" কিতাবে হযরত

ইমাম মুহাম্মাদ (রহ.)-এর ঘটনা এরূপ লেখা হয়েছে। তিনি বিভিন্ন শাস্ত্রের কিতাব পাশে রাখতেন, এক শাস্ত্রের কিতাব পড়ে ত্যক্ততা বোধ হলে অন্য এক শাস্ত্রের কিতাব নিয়ে বসতেন।

কিতাব বুঝি না– এ রোগের চিকিৎসা

অনেক ছাত্র এই ভেবে হতাশ হয়ে পড়ে যে, বুঝি না। অথচ না বুঝার দুর্বলতা কেটে ওঠা তেমন কঠিন কিছু নয়, সহজ। নিয়ম হল পণ করতে হবে আজ এক শব্দ হলেও বুঝব। আর এক শব্দ বুঝা অবশ্যই কঠিন কিছু নয়। তারপরের দিন দুই শব্দ বুঝব, তারপরের দিন তিন শব্দ। এভাবে বাড়াতে থাকলে অতি সহজেই বুঝের পরিমাণ বাড়তে থাকবে। তারপর একবাক্য, দু বাক্য, তিন বাক্য, তারপর এক পৃষ্ঠা, দুই পৃষ্ঠা, তিন পৃষ্ঠা– এভাবে বুঝের পরিমাণ সহজেই বাড়তে থাকবে। পক্ষান্তরে কেউ যদি বুঝার ব্যাপারে অলসতাকে স্থান দেয় এভাবে যে, আজ কিছুই বুঝল না, অথচ তাতে কোনো পেরেশানী বোধ করল না। পরদিনও কিছুই বুঝল না, তাতেও কোনো পেরেশানী বোধ করল না, তাহলে এভাবে একসময় তার অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়াবে, অতি সহজ কোন বিষয়ও সে বুঝবে না। না বুঝা রোগের একমাত্র চিকিৎসা হল বুঝতে চেষ্টা করতে থাকা এবং ধীরে ধীরে এই চেষ্টার পরিমাণ বৃদ্ধি করতে থাকা।

এখানে উল্লেখ করা সংগত যে, অনেক ছাত্রের আরবী কিতাবপত্র না বুঝার পেছনে নাহু সরফের দুর্বলতা একটা বিশেষ কারণ। যদি নাহু সরফে দুর্বলতা থাকে তাহলে কোনোক্রমেই সে ভাল করে আরবী কিতাবপত্র বুঝতে সক্ষম হবে না। এরূপ ছাত্রের হতাশ হওয়ার কিছু নেই, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। অল্পদিনেই এ দুর্বলতা কেটে ওঠা সম্ভব। সরফের জন্য মীযান- মুনশায়িব ও ইলমুস সার্ফ (বা ইলমুস সীগা) আর নাহুর জন্য নাহবে মীর কিংবা পারলে হেদায়াতুন্নাহু– এ কয়টি কিতাব জবত করে নিলেই ইনশাআল্লাহ আরবী কিতাবপত্র বুঝার বুনিয়াদী শক্তি গড়ে উঠবে। মাত্র তিনটি কিতাব জবত করার কষ্টটুকুও যদি কোন তালিবে স্বীকার করতে না চায়, তাহলে তার জন্য করুণা করা বৈ কোনো গত্যন্তর নেই।

পড়ি কিন্তু মনে থাকে না– এ রোগের চিকিৎসা

যাকিছু পড়া হয় তা মনে রাখতে না পারলে হতাশা জাগে। অনেক ছাত্রকে এরূপ হতাশ দেখাও যায়। তারা বলে, পড়ি কিন্তু মনে থাকে না! কিন্তু শুধু পড়লেই মনে থাকবে তা নয়। অধীত বিষয় মনে বদ্ধমূল করানো এবং স্মৃতিতে তা সংরক্ষণেরও বিভিন্ন কৌশল রয়েছে। নিম্নে সে কৌশলগুলো সম্বন্ধেই আলোচনা পেশ

করছি। কৌশলগুলো অবলম্বন করুন, ইনশাআল্লাহ অধীত বিষয় মনে বদ্ধমূল করানো এবং স্মৃতিতে তা সংরক্ষণ সহজতর হবে।

পড়া ইয়াদ করা ও ইয়াদ রাখার উপায়

পড়া ইয়াদ করা ও ইয়াদ রাখা তথা অধীত বিষয় স্মৃতিতে সংরক্ষণের উপায় ৪টি। যথা:–

১. পুনরাবৃত্তি, পর্যালোচনা, তাকরার ও অন্যকে শেখানো:

শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু স্মৃতিতে সংরক্ষণের একটি উপায় হল পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা। একই বিষয়বস্তু বারবার পাঠ ও পরস্পর আলোচনা করলে স্মৃতি সক্রিয় হতে থাকে এবং তথ্যগুলো দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতি ভাণ্ডারে প্রক্রিয়াজাত হয়ে যায়। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তা'আলা বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একাধিক স্থানে পুনরাবৃত্তি করেছেন। সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) বলেন,

كُنَّا قُعُوْدًا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَسٰى أَنْ يَكُوْنَ قَالَ: سِتِّيْنَ رَجُلاً، فَيُحَدِّثُنَا الْحَدِيْثَ ثُمَّ يَدْخُلُ لِحَاجَتِهٖ فَنُرَاجِعُهٗ بَيْنَنَا هٰذَا ثُمَّ هٰذَا، فَنَقُوْمُ كَأَنَّمَا زُرِعَ فِيْ قُلُوْبِنَا. (قال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف. مجمع الزوائد جـ/ ١ صـ ١٦١)

অর্থাৎ, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট বসতাম, তিনি আমাদের নিকট হাদীছ বয়ান করতেন। তিনি যখন তাঁর প্রয়োজনে (মজলিস থেকে উঠে যেতেন আমরা শ্রুত হাদীছগুলো পরস্পর পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করতাম। তারপর যখন আমরা বৈঠক থেকে উঠে যেতাম, তখন আমাদের অন্তরে সব কিছু গেঁথে যেত। এ ধরনের প্রায় বৈঠকেই –সম্ভবত তিনি বলেছিলেন,– অন্তত ষাটজন লোক উপস্থিত থাকত। (মুসনাদে আবী ইয়া'লা)

অনেক সময় মনোযোগিতার স্বল্পতা, স্মৃতির গ্রহণ ক্ষমতার মন্থরগতি ইত্যাদি কারণে একবার শ্রবণ বা পঠনের ফলে বিষয়বস্তু অস্পষ্ট বা অবোধগম্য থেকে যেতে পারে, এরূপ অস্পষ্ট তথ্য স্মৃতিভাণ্ডারে সংরক্ষিত হয় না। এক্ষেত্রে বারবার পুনরাবৃত্তি বা পর্যালোচনা কিংবা বারবার শ্রবণই স্মৃতিতে সংরক্ষণের আনুকূল্য সৃষ্টি করে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাই শিক্ষাদানকালে অনেক গুরুত্বপূর্ণ কথা তিনবার বলতেন। সাহাবী হযরত আনাস (রা.) বলেন,

إِنَّهُ (النبيُّ) صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا تَكَلَّمَ بِكَلِمَةٍ أَعَادَهَا ثَلاَثًا حَتّٰى تُفْهَمَ عَنْهُ. (صحيح البخاري برقم ٩٥ في باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه)

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন কোন (গুরুত্বপূর্ণ) কথা বলতেন, তিনবার সেটার পুনরাবৃত্তি করতেন। যাতে তার কথা সবাই বুঝতে পারেন। (বোখারী: ১ম খণ্ড, ২০ পৃষ্ঠা)

শিক্ষণীয় বিষয় অন্যকে শিক্ষা দিলেও এ উপকারিতা লাভ হয়ে থাকে। এভাবে শিক্ষণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা হয় বিধায় এ পদ্ধতিটিও স্মৃতিতে শিক্ষণীয় বিষয় সংরক্ষিত ও সুদৃঢ় হওয়ার অনুকূল। একারণেই শিক্ষণীয় বিষয় অন্যকে শিক্ষাদান করলে নিজের জ্ঞান বৃদ্ধি পায়। অন্যকে শেখালে শিক্ষণীয় বিষয়ের পুনরাবৃত্তি হয়। এভাবে শিক্ষণীয় বিষয় স্মৃতিতে দৃঢ় হয়। আর স্মৃতিতে যা সুদৃঢ় হয় তা-ই তো ইলম। কোন বিষয় স্মৃতিতে সুদৃঢ় হওয়ার আগ পর্যন্ত তাকে ইলম বলা যায় না। অতএব বলা যায় অন্যকে শেখানো দ্বারা ইলম বৃদ্ধি পায়। এ সম্পর্কে হাদীছেও বর্ণনা পাওয়া যায়। একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে আছে, জনৈক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করেছিল,

تَذَاكَرُوا الْحَدِيْثَ فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوْا يَنْدَرِسْ. (رواه الحاكم في المستدرک برقم ٣٢٧)

অর্থাৎ, কিসের দ্বারা আমার ইলম বৃদ্ধি পাবে? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াবে বলেছিলেন, অন্যকে শিক্ষা দেয়া দ্বারা।

সাথী-সঙ্গীদের নিয়ে শিক্ষণীয় বিষয়ের তাকরার করলেও পুনরাবৃত্তি হয়। তাই তাকরার দ্বারাও ইলম সুদৃঢ় হয়। তাকরার না করলে শিক্ষণীয় বিষয় মন থেকে মুছে যেতে পারে। এভাবে ইলম মিটে যেতে পারে। হযরত আলী (রা.) বলেছেন,

تَذَاكَرُوا الْحَدِيْثَ فَإِنَّكُمْ إِلَّا تَفْعَلُوْا يَنْدَرِسْ. (رواه الحاكم في المستدرک برقم ٣٢٧)

অর্থাৎ, তোমরা পরস্পরে হাদীছ নিয়ে আলোচনা কর। তোমরা যদি এটা না কর তাহলে হাদীছ মিটে যাবে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

তাকরারের আরও বহু ফায়দা রয়েছে। যে তাকরার করায় তার যেহেন বৃদ্ধি পায়, শরহে সদর হয়।

অতএব ছাত্রদের তাকরার করানোর প্রতি যত্নবান হওয়া চাই। কোন ছাত্র যদি এমন হয় যে, তার তাকরারে অন্যরা বসে না, তাহলে সে অন্য লোকদের শোনানো সম্ভব হলে তা করবে। খতীবে বাগদাদী লিখেছেন, আতা আল-খোরাসানী হাদীছ শেখার পর কাউকে শোনানোর মত না পেলে ফকীর-মিসকীনদের জড়ো করে তাদেরকে হাদীছ শোনাতেন। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ও আদাবিস সামি') কোনভাবেই যদি তাকরার করা বা অন্যকে শোনানো না যায়, তাহলে নির্জনে বসে মনে মনে অন্যকে বোঝাবে, যেন সে তাকরার করাচ্ছে। এতে পূরো না হলেও কিছু ফায়দা অবশ্যই হবে।

অন্যের সাথে পর্যালোচনা ও তাকরার সম্ভব না হলে অন্তত বিষয়বস্তু শিক্ষা শেষে মনে মনে পুনরাবৃত্তি ও পর্যালোচনা করে নিতে হবে। মনে মনে বিষয়বস্তুকে আবার ঝালিয়ে নিতে হবে। এ হল নিজের সাথে নিজে তাকরার করা। এভাবেও তাকরারের কিছু ফায়দা অর্জিত হবে।

২. মুখস্থ করা:

শুধু শ্রবণ, অধ্যয়ন ও স্মৃতিশক্তিই শিক্ষণীয় বিষয়কে দীর্ঘদিন স্মৃতিতে ধরে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়। বরং শিক্ষণীয় বিষয়টিতে বারবার পুনরাবৃত্তি, সামগ্রিকভাবে আয়ত্তকরণ ও গভীর মনোযোগ প্রদান করে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিভাণ্ডারে তা সুদৃঢ়ভাবে প্রক্রিয়াজাত করে রাখা জরুরি। এই গভীর মনোযোগসহ বারবার পুনরাবৃত্তি ও সামগ্রিক আয়ত্তকরণের নামই হল মুখস্থ করা।

তদানিন্তন আরবদের অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ইতিহাস প্রসিদ্ধ। এসত্ত্বেও হাদীছকে স্মৃতিতে সংরক্ষণের জন্য সাহাবীগণ শুধু শ্রবণ ও স্মরণশক্তিকে যথেষ্ট মনে করেননি বরং তারা হাদীছ মুখস্থ করে রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন,

إِنَّمَا كُنَّا نَحْفَظُ الْحَدِيْثَ، وَالْحَدِيْثُ يُحْفَظُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه مسلم في مقدمة صحيحه)

অর্থাৎ, "আমরা হাদীছ মুখস্থ করতাম, আর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে হাদীছ মুখস্থ করারই বিষয়।" অর্থাৎ, এভাবেই হাদীছ সংরক্ষণ করা হত। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) হাদীছ মুখস্থ করে রাখতেন এ বিষয়টি পূর্বেই বর্ণনা করা হয়েছে। আব্দুল কায়ছ গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষাদানের পর নির্দেশ দেন যে,

اِحْفَظُوْهُ وَأَخْبِرُوْهُ مَنْ وَرَاءَكُمْ. (صحيح البخاري في كتاب العلم برقم ٨٧)

অর্থাৎ, তোমরা এটা মুখস্থ কর। অতঃপর অন্যদের কাছে পৌঁছে দাও। (বোখারী)

বলা বাহুল্‌- রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অর্থহীন ও নিষ্প্রয়োজনীয় কোনো কথাই বলতেন না। সুতরাং তাদেরকে মুখস্থ করার নির্দেশটিও অর্থহীন নয়।

সারকথা অধীত বিদ্যা স্মৃতিতে সংরক্ষণের জন্য মুখস্থ করতে হবে। তবে স্মরণ রাখা চাই যে, শুধু একবার মুখস্থ করে ছেড়ে দিলেই তা মুখস্থ থাকে না। প্রথমদিকে কিছুদিন মুখস্থ করা বিষয় প্রতিদিন অন্তত একবার করে দেখে নিতে হয়, পরে মাঝে মধ্যে দেখা অব্যাহত রাখলেই চলে।

৩. সংগঠন পদ্ধতি গ্রহণ:

সংগঠন পদ্ধতি অর্থ শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে বিভিন্নভাবে সংগঠিত করে নেয়া, যেমন সংকেতবদ্ধ, শ্রেণীবদ্ধ বা সংখ্যাবদ্ধ করা অথবা এলোমেলো তথ্যগুলোকে নির্দিষ্ট কতকগুলো ছত্রের অন্তর্গত করে সাজানো। এ ধরনের সংগঠন ও বিন্যাসের ফলে শিক্ষণ দ্রুততর হয়, মুখস্থ করা সহজ হয় এবং শিক্ষণীয় বিষয়বস্তু স্মৃতিভাণ্ডারে সুসংবদ্ধভাবে সংরক্ষিত হয়। ফলে প্রয়োজনের সময় স্মৃতিভাণ্ডার থেকে তথ্যগুলো আহ্বান করলে পূর্ব বিন্যাস অনুযায়ী ধারাবাহিকভাবে একের পর এক তথ্যগুলো আসতে থাকে। পরীক্ষায় দেখা গেছে একই বিষয়বস্তুকে একজন শিক্ষার্থী এলোমেলোভাবে স্মৃতিবদ্ধ করেছে আরেকজন সংগঠন পদ্ধতিতে তা করেছে, এই শেষোক্ত শিক্ষার্থীই সে বিষয়টি অধিকতর সংরক্ষণ করতে পেরেছে। উদাহরণ স্বরূপ কতকগুলো খনিজ পদার্থের নাম এলোমেলোভাবে মুখস্থ করার চেয়ে এগুলোকে ধাতু ও পাথর এই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়, আবার ধাতুগুলোকে বিরল ও সাধারণ এবং পাথরগুলোকে মূল্যবান ও গৃহ-সামগ্রী এই দুই দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। কিংবা কোন মনীষীর জীবনের অবদানগুলো এলোমেলো স্মরণ রাখার চেয়ে অবদানের ক্ষেত্রগুলোকে পৃথক পৃথক করে প্রতি ক্ষেত্রে কয়টা অবদান তা সংখ্যাবদ্ধ করে নেয়া যায়।

স্মৃতিতে সংরক্ষণের সুবিধার্থে হাদীছেও বহু বিষয়কে সংখ্যাবদ্ধ করে বলা হয়েছে। ঈমানের সাতাত্তর শাখা, ইসলামের পাঁচটি বুনিয়াদ, তিন শ্রেণীর লোকের আমলের প্রতিদান দ্বিগুণ হবে, তিন শ্রেণীর লোক কেয়ামতের দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে বেশি ক্রোধভাজন হবে প্রভৃতি অসংখ্য সংখ্যাবদ্ধ তথ্য তার প্রমাণ।

সংকেতবদ্ধ করার পর্যায়ে যেমন– UN, UNICEF, USA, KSA ইত্যাদি দীর্ঘ নামকে সংক্ষেপে সংকেতবদ্ধ করে মনে রাখা হয়। ফেকাহ শাস্ত্রের কুয়া সম্পর্কিত একটি মতভেদপূর্ণ মাসআলাকে সংক্ষেপে مسئلة البئر جحط এবং হাত উঠানোর অনেকগুলো ক্ষেত্রকে সংক্ষেপে فقعس صمعج দ্বারা সংকেতবদ্ধ করা হয়েছে। আরবীতে যারা ফেকাহশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছেন তাদের কাছে বিষয়টি সুবিদিত। এরূপ আরও বহু উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে।

শিক্ষণীয় বিষয় অধ্যয়ন ও শ্রবণ শেষে সেগুলোর সারসংক্ষেপ ও নির্যাস বের করে নিলেও এক ধরনের সংগঠন হয়ে থাকে।

৪. সংযোজন-পদ্ধতি গ্রহণ:

সংযোজন পদ্ধতি বলতে বোঝানো হচ্ছে শিক্ষণীয় বিষয়বস্তুকে অন্য কোন জ্ঞাত ও স্মৃতিবদ্ধ বিষয়ের সাথে সংযোগ বা সম্পর্ক স্থাপন করে সেগুলোর সাথে একে সংযোজিত ও শৃংখলিত করে রাখা। যেমন– অপরিচিত কোন লোকের নাম স্মরণ রাখার সুবিধার্থে ঐ নামে নিজের কোন একান্ত পরিচিত ও জ্ঞাত ব্যক্তি থাকলে তার নামের সাথে এই নামটি সংযোজিত করে রাখলে পরবর্তীতে স্মরণ করতে সুবিধে হয়ে থাকে। উপমা ও উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে কোন বিষয়কে স্মৃতিবদ্ধ করা হলেও এ উপকারিতা লাভ হয়ে থাকে। এটিও সংযোজন পদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত। উপমা-উৎপ্রেক্ষার মাধ্যমে বহু কঠিন এবং দুর্বোধ্য বিষয়ও যেমন বুঝতে সুবিধে হয়, তেমনি স্মৃতিতে সংরক্ষণের ক্ষেত্রেও তা খুবই ফলদায়ক।

অধীত বিষয় তথা যাকিছু পড়া হয় তা মনে রাখার জন্য এই চারটি পদ্ধতি অবলম্বন বিশেষ উপকারী। তবে যাকিছু পড়া হয় তা মনে রাখার পশ্চাতে মেধা এবং স্মৃতিশক্তির ভূমিকাও অনস্বীকার্য। অধীত বিষয় মনে গাঁথা এবং মনে রাখার পেছনে মুতালাআ তথা অধ্যয়ন-পদ্ধতিরও বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। তাই নিম্নে মেধা বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি তেজ করার উপায় এবং মুতাআলা বা অধ্যয়নের পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

মেধা বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি তেজ করার উপায়

মেধা বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি তেজ করার জন্য নিম্নের ৫টি কাজ করা যেতে পারে।

(এক) গোনাহ হতে মুক্ত থেকে নেক কাজ বেশি বেশি করা। ইমাম শাফিয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের উস্তাদ ওয়াকী' ইবনুল জার্‌রাহকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির ওষুধ কী? তিনি বলেছিলেন, গোনাহ বর্জন করা। স্মৃতিশক্তি বৃদ্ধির জন্য এর চেয়ে বেশি পরীক্ষিত আর কিছু পাইনি। (কীমাতুয যামানি ইনদাল উলামা)

ইমাম শাফিয়ী (রহ.) সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ আছে– তিনি বলেছেন,

شَكَوْتُ اِلٰى وَكِيْعٍ سُوْءَ حِفْظِيْ فَأَوْصَانِيْ اِلٰى تَرْكِ الْمَعَاصِيْ.

অর্থাৎ, আমি ওয়াকী' (রহ.)কে বলেছিলাম, আমি ভুলে যাই। তিনি আমাকে গোনাহ বর্জন করার জন্য তাগিদ দিয়েছিলেন। (তালীমুল মুতাআল্লিম ও মিরআতুল জিনান)

(দুই) ফিকিরের সাথে মুতালাআ করা এবং একমন একদিল হয়ে একাগ্রতার সাথে মুতালাআ করা। ইমাম আজম আবূ হানীফা (রহ.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, কী দ্বারা মুখস্থ রাখার ব্যাপারে সহযোগিতা লাভ হয়? তিনি বলেছিলেন, একাগ্রতা দ্বারা। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, একাগ্রতা আসে কীভাবে? তিনি বলেছিলেন, অন্য সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে দেয়া দ্বারা। আবার জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, অন্য সবকিছুর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার উপায় কী? তিনি বলেছিলেন, প্রয়োজন ছাড়া কিছু গ্রহণ করবে না, প্রয়োজন পুরণ হয়েছে, ব্যস। (কীমাতুয যামানি ইনদাল উলামা)

(তিন) মেধা বা যেহেনকে বেশি বেশি কাজে লাগানো। মেধাকে বেশি বেশি কাজে লাগানোর অর্থ নিয়মিত মুতালাআ করা, নিয়মিত দরসে হাজির হওয়া, নিয়মিত সবক ইয়াদ করা, অব্যাহত পড়াশোনা চালিয়ে যেতে থাকা। এভাবে অনবরত যেহেনে ঘর্ষণ চলতে থাকে। আর সকলেরই জানা আছে একটা ভোঁতা অস্ত্রকেও অব্যাহতভাবে ঘর্ষণ দিতে থাকলে তা ধারালো হয়ে ওঠে। পক্ষান্তরে ধারালো অস্ত্রকেও দীর্ঘদিন ব্যবহার না করলে তাতে মরিচা ধরে, তা ভোঁতা হয়ে পড়ে। তদ্রূপ দুর্বল মেধার অধিকারী ছাত্র অব্যাহত মুতালাআর মাধ্যমে তার মেধাকে শাণিত করে তুলতে পারে। পক্ষান্তরে তেজ মেধার অধিকারীও পড়াশোনা ও মেধাচর্চা থেকে বিমুখ থাকলে তার মেধায় মরিচা পড়ে যায়। তালীমুল মুতাআল্লিম কিতাবে বর্ণিত আছে, হযরত ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) ইমাম আবূ ইউসুফকে একদিন বলেছিলেন,

كُنْتَ بَلِيْدًا فَأَخْرَجَتْكَ الْمُوَاظَبَةُ فِى الدَّرْسِ. (تعليم المتعلم)

অর্থাৎ, তোমার মেধা তো দুর্বল ছিল, নিয়মিত দরসে উপস্থিতি তোমাকে এ থেকে বের করে এনেছে। অর্থাৎ, নিয়মিত দরসে উপস্থিতি তোমার মেধাকে ধারালো করে দিয়েছে।

(চার) যেহেন বৃদ্ধির জন্য দুআ করা। নিম্নোক্ত দুটো দুআ বিশেষভাবে সর্বদা করা চাই।

﴿رَبِّ اشْرَحْ لِيْ صَدْرِيْ وَ يَسِّرْ لِيْٓ اَمْرِيْ وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِيْ يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমার বক্ষ উন্মোচন করে দাও, আমার কাজ সহজ করে দাও এবং আমার যবান থেকে জড়তা দূর করে দাও যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে। (সূরা তাহা: ২৫–২৮)

এখানে "বক্ষ উন্মোচন করা" বলে মনে এমন প্রশস্ততা দান করাকে বোঝানো হয়েছে যাতে মন ইলমে নবুয়ত ও ইলমে ওহী আয়ত্ত করার উপযোগী হয়ে ওঠে।

﴿رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا.﴾

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমার ইলম বৃদ্ধি করে দাও। (সূরা তাহা: ১১৪)

(পাঁচ) মেধাশক্তি বৃদ্ধির পক্ষে কিছু কিছু খাদ্য-খাবার বেশ উপকারী। আমি এ ব্যাপারে ঢাকার বিশিষ্ট হাকিম মাওলানা আব্দুল হামিদ কাসেমীর কাছে জানতে চেয়েছিলাম, কি কি খাদ্য-খাবার মেধা বৃদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি তেজ করার অনুকুল? তিনি বলেছিলেন, আখরুট ফল খাওয়া দ্বারা মেধা সবল হয়। প্রতিদিন একটা ফলের অর্ধেক খাওয়া যথেষ্ট। আঙ্গুর ফলও উপকারী।

মুতালাআ বা অধ্যয়নের পদ্ধতি

(১) মুতালাআ বা অধ্যয়নের পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রথম কথা হল মুতালাআ করতে হবে চিন্তা-ভাবনার সাথে। শব্দে শব্দে হরফে হরফে চিন্তা-ভাবনা করে মুতালাআ করতে হবে। "মুতালাআ" শব্দের অর্থও আমাদেরকে তা-ই বলে। হযরত মাওলানা শাহ মসিহুল্লাহ খান শেরওয়ানী বলেছেন, মুতালাআ শব্দটি طلوع থেকে নির্গত, যার অর্থ উদিত হওয়া। বাবে مفاعلة –এর একটি বৈশিষ্ট্য হলো تعديه এই হিসাবে এর অর্থ হবে উদিত করা বা বের করা। এ বাবের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো

مبالغة এই হিসাবে অর্থ দাঁড়ায় বেশি বেশি বের করা। কারণ বই-পুস্তকের লেখা ও মর্ম সম্পর্কে মানব মস্তিষ্ক শুরুতে অন্ধকারে থাকে। এই লেখার মর্মোদ্ধার করতে নানাভাবে চিন্তাশক্তিকে কাজে লাগাতে হয়। প্রথমে লুগাত ও সরফ বিষয়ক চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। বাক্যের মাঝে কোন্টা কোন্ সিগাহ্, অর্থ কি? দ্বিতীয়ত নাহু ও তারকীব সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা। ভেবে দেখতে হবে, তারকীবে কোন্টা ফায়েল, কোন্টা মাফউল, এ'রাব কী হবে, তানবীনসহ না তানবীন ছাড়া। তৃতীয়ত চিন্তা করতে হয় পূর্বাপর বক্তব্যের আলোকে কোন্ অর্থটা সঠিক এবং এখানে উদ্দেশ্য কী? মুসান্নেফ কী বোঝাতে চেয়েছেন? বিভিন্ন সম্ভাবনা বের করে এই তিন স্তর অতিক্রম করার নামই হল মুতালায়া। শুধু কিতাবে নজর বোলানো আর যেনতেনভাবে পড়ে নেয়ার নাম কখনো মুতালাআ হতে পারে না। এই পদ্ধতিতে মুতালায়া করবে। এজন্য মনের একাগ্রতা যত বেশি হবে চিন্তা-ফিকির তত গভীর হবে। এভাবে চিন্তা করে মুতালায়া করতে প্রথম প্রথম হয়ত কিছুটা কষ্ট হবে, সময় বেশি লাগবে। অনেক সময় ব্যয় করে হয়ত এক আধ লাইন বুঝে আসবে। কিন্তু প্রতিদিন করতে থাকলে চিন্তাশক্তি বেড়ে যাবে। মুতালাআর গতি ও পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। (তালিবে ইলমের জীবন গঠন)

(২) মুতালাআ বা অধ্যয়নের পদ্ধতির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কথা হল একইসঙ্গে একটা বিষয় মুতালাআ করতে হবে কয়েকবার কয়েকভাবে। সাধারণত আমরা যেকোনো কিতাবের যেকোনো বিষয় একাধারে পড়ে যাই। এভাবে মুতালাআর অর্থ হল একবার পড়া। সাধারণ সহজ ও হালকা বিষয় এবং গল্প, কাহিনী ও নসীহত ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে একবার পাঠের এই পদ্ধতি চলবে। কিন্তু একটু ভারী বা জটিল বিষয়ের মুতালাআ এরকম চালানো নয় বরং সেরকম বিষয়ের প্রত্যেকটা ইবারত বা অনুচ্ছেদ মুতালাআ করতে হবে অর্থাৎ, পড়তে হবে তিনবার। একবার হল কিতাবে লেখা ইবারত পড়তে হবে এবং মুসান্নিফ কী বোঝাতে চেয়েছেন তা সহজে বুঝে নেয়ার চেষ্টা করতে হবে। দ্বিতীয়বার মুতালাআ হল ফিকির করে বাক্যে বাক্যে নয়, শব্দে শব্দে নয় বরং হরফে হরফে বোঝার চেষ্টা করতে হবে। তারপর তৃতীয়বার মুতালাআ হল পঠিত বিষয়টি কিতাব না দেখে (চোখ বন্ধ করেও হতে পারে।) মনে মনে আওড়ানো। এভাবে প্রত্যেকটা বিষয়কে তিনবার মুতালাআ করলে অর্থাৎ, তিন রকম করে পড়লে যথার্থ মুতালাআ হয় এবং তা মনে রাখার জন্যও সহজ হয়।

এ ছাড়াও আরেকটা মুতালাআ আছে পর্যালোচনা ও গবেষণার জন্য মুতালাআ। এ পর্যায়ের মুতালাআ হলে সবশেষে একবার লেখকের বক্তব্য

সমালোচনার দৃষ্টিতে বিবেচনা করা, তারপর সে সম্বন্ধে মন্তব্য করা বা তা থেকে কোন কথা উদ্ধৃত করা।

কোন্ কিতাবের জন্য কোন্ শরাহ মুতালাআ করা ভাল।

কোন্ কিতাবের জন্য কোন শরাহ মুতালাআ করা ভাল তা একবাক্যে বলা কঠিন। কারণ এক এক শরাহর এক এক সৌন্দর্য ও বৈশিষ্ট্য থাকে। এক শরায় যা পাওয়া যায় অন্যটিতে হয় তো তা পাওয়া যায় না। আবার সেই অন্যটিতে হয়তো এমন কিছু রয়েছে যা এটিতে পাওয়া যাচ্ছে না। তদুপরি শরাহ সব যুগেই নতুন নতুন আরও লেখা হচ্ছে। অতএব কোন্ কিতাবের জন্য কোন্ শরাহ কোন্ দিক থেকে ভাল বিজ্ঞ ও মাহের উস্তাদ তখনকার সর্বশেষ অবস্থা অনুসারে তা বলে দিতে পারবেন।

দক্ষতার সাথে তর্জমা/অনুবাদ করার তরীকা

দক্ষতার সাথে তর্জমা/অনুবাদ করার জন্য প্রত্যেকটা শব্দের তাহকীক জানার সাথে সাথে তারকীবও বুঝতে হবে, এমনকি শব্দের বালাগাত ফাছাহাতও বুঝতে হবে। বক্তব্যের পূর্বাপর সম্পর্ক এবং বক্তব্যের পেক্ষাপটও বুঝতে হবে। যে ভাষার লেখা অনুবাদ করা হচ্ছে সে ভাষা ভালভাবে বোঝার সঙ্গে সঙ্গে যে ভাষায় অনুবাদ করা হচ্ছে সে ভাষা সম্বন্ধেও ভাল জ্ঞান থাকতে হবে।

বস্তুত তর্জমা তথা অনুবাদ কর্মের জন্য রয়েছে বেশ কিছু শর্ত ও মূলনীতি। তর্জমা তথা অনুবাদ হচ্ছে একটা বিশেষ শিল্প। এ শিল্পের রয়েছে কাঠামো, কৌশল, সৌন্দর্য অনেক কিছু। এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন আমার রচিত "ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ" নামক পুস্তকের চতুর্থ অধ্যায়।

লেখার গুরুত্ব

লেখার গুরুত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। লেখা আর পড়া দুটো মিলেই তো হচ্ছে লেখাপড়া। কিন্তু সম্প্রতি লেখার ব্যাপারে ব্যাপক উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। আমি অনেক সময় ছাত্রদের বলি, আগের যুগে বলা হত লেখাপড়া। তখন "লেখা" কথাটা আগে বলা হত। তখন পড়ার চেয়ে লেখার প্রতি গুরুত্ব ছিল বেশি। কারণ কিতাবপত্র তেমন মুদ্রিত ছিল না। না লিখে রাখলে সম্পূর্ণ বঞ্চনার কারণ হতে পারত। তারপর কিতাবপত্র ব্যাপকভাবে মুদ্রিত হয়ে যাওয়ায় লেখার প্রতি গুরুত্ব হ্রাস পায়। তখন হয়তো বলা শুরু হয় পড়ালেখা। "লেখা"টা পিছে পড়ে যায়। তবুও লেখা একেবারে বাদ যায়নি। তারপর এমন সময় এল যে, লেখা একেবারে বাদ পড়ে গেল। হয়ে গেল পড়াশোনা। অর্থাৎ, নিজে পড়বে আর উস্তাদ যা বলেন তা শুনবে,

লেখা বাদ। সম্প্রতি বোধ হয় পড়াশোনা কথাটির ব্যাখ্যাও পাল্টে গেছে– এখন এর অর্থ বুঝি এরকম দাঁড়িয়েছে, উস্তাদ পড়বেন আর ছাত্র শুধু শুনবে, তার নিজের পড়ারও দরকার নেই, যেন পড়াশোনা অর্থ হল উস্তাদের পড়া শোনা। উস্তাদ পড়বে বা বলবে আর ছাত্র শুধু শুনবে, ব্যস। আফসুসের বিষয়!

উস্তাদের কথা নোট করার গুরুত্ব

বস্তুত উস্তাদের কথা নোট করার বহুমুখী ফায়দা অনস্বীকার্য। একজন ছাত্র যখন উস্তাদের কথা নোট করতে থাকে তথা লিখতে থাকে তখন লেখার সময় তার উপলব্ধি হয় সে কোন্ কথাটা ভাল করে বুঝেছে কোন্টা বোঝেনি। লিখতে গিয়ে তো আর গোলমেলে লেখা যায় না। এভাবে লেখা তাকে বুঝার ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়। ছাত্র নিজে যখন কিতাব মুতালাআ করে এবং পঠিত বিষয়ের সারাংশ নোট করে, তখনও নোট করতে গিয়ে তার বুঝে আসে কোন্ বিষয়টা বা কোন্ কথাটা বোঝায় তার অসুবিধে রয়ে গেছে। তাছাড়া কিতাবপত্রে ব্যাপকভাবে যত বিষয় লেখা থাকে এত ব্যাপকভাবে বিষয়গুলো মনে রাখা কঠিন। এক্ষেত্রে সংক্ষেপে লেখা থাকলে তা বারবার দেখে বিষয়গুলো সহজে আয়ত্তে আনা যায়। পরীক্ষার সময়েও এই সংক্ষিপ্ত নোট দেখে সহজে অল্প সময়ে সব বিষয় যেহনে উপস্থিত করা যায় এবং পরীক্ষায় ভাল ফল করা যায়।

সম্প্রতি কিছু ছাত্রকে দেখা যাচ্ছে তারা মোবাইলে উস্তাদের বক্তব্য রেকর্ড করে রাখে এবং পরে তা আবার শুনে ইয়াদ করার চেষ্টা করে। কিন্তু মনে রাখা চাই লেখার যে ফায়দাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হল মোবাইলে রেকর্ড করার দ্বারা সে ফায়দাগুলো অবশ্যই অর্জিত হল না। তাই এ পদ্ধতি বর্জনীয়।

সম্প্রতি ব্যাপকভাবে কম্পিউটারের ব্যবহার শুরু হয়েছে, কম্পিউটারের সিডিতে বহু কিতাব শরাহ শুরূহাত আছে। এখন কোন ছাত্র যদি ভাবে উস্তাদের বক্তব্য খুব একটা মনোযোগ দিয়ে শোনা বা লেখার প্রয়োজনটা কী? পরে সিডিতে দেখে নেব। এরূপ ছাত্রকে আবার স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি তাতে কিন্তু লেখার ফায়দাসমূহ অর্জিত হবে না। তাছাড়া উস্তাদ থেকে সরাসরি শেখা আর সিডি থেকে শেখা দুটো যদি এক পর্যায়েরই হয়ে থাকবে তাহলে আপনি মাদ্রাসায় ভর্তি হয়েছেন কেন? সিডি দেখেই বিদ্যার্জনের কাজটা সহজে সেরে নিতেন। মাদ্রাসা-পাশ মৌলভী না হয়ে সিডি-পাশ মৌলভী হয়ে গেলেই তো পারতেন।

ছাত্রদের আরও মনে রাখা চাই উস্তাদ যা বলেন তা তার দীর্ঘ জীবনের মুতালাআ থেকে বলেন, হয়তো অনেক কিতাবের সারনির্যাস বলেন, সেইসব কিতাব মুতালাআ সম্পন্ন করতে হয়তো ছাত্রের বহু বৎসর লেগে যাবে কিংবা হতে পারে

সেগুলো সব মুতালাআ করা জীবনে হয়েই উঠবে না। তাই পরে পড়ে নেব এই চিন্তায় এখন উস্তাদের বক্তব্য শ্রবণে অবহেলা করা হয়তো বিরাট প্রাপ্তি থেকে বঞ্চনা।

হাতের লেখা সুন্দর করার গুরুত্ব

হস্তাক্ষর সুন্দর না থাকলে বহু ধরনের ক্ষতি। পক্ষান্তরে হস্তাক্ষর সুন্দর থাকলে বহু ধরনের ফায়দা। নিম্নে হস্তাক্ষর সুন্দর না থাকার ক্ষতির দিকগুলো তুলে ধরা হল, তা থেকেই হস্তাক্ষর সুন্দর থাকার ফায়দাগুলো প্রতীয়মান হবে।

১. পরীক্ষায় নম্বর কম পাওয়া যায়।

২. উস্তাদের তাকরীর বা কারও ওয়াজ বয়ান ইত্যাদি লিখে রাখা থেকে বঞ্চিত হতে হয়। হস্তাক্ষর অসুন্দর হওয়ায় এগুলো লেখার উৎসাহই জন্মায় না।

৩. হাতের লেখা খারাপ দেখায় বলে খাতায় বা ডাইরিতে কিছু লিখে বা নোট করে রাখতে অনুৎসাহ সৃষ্টি হয়। ফলে জীবনের অনেক কিছু নোট করে রাখা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

৪. মানুষের সামনে কিছু লিখতে লজ্জা বোধ হয়।

৫. উস্তাদ হলে ছাত্রদের লেখা এসলাহ করতে গিয়েও লজ্জা বোধ হয়। যার ফলে অনেক সময় ছাত্রদের খাতা এসলাহ করা থেকে বিরত থাকা হয়। এতে একদিকে ছাত্রকে ফায়দা থেকে বঞ্চিত করা হয়, অন্যদিকে নিজেও দায়িত্বশীলতার পরিচয় দেয়া যায় না।

৬. হাতের লেখা ভাল না থাকলে কর্মজীবনে যেসব কর্ম লেখানির্ভর সেসব কর্ম থেকে বঞ্চিত হতে হয়।

৭. হাতের লেখা অসুন্দর দেখলে ব্যক্তির জ্ঞান সম্বন্ধে কুধারণা জন্মায়। তার ব্যক্তিত্ব ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

হাতের লেখা ভাল না থাকলে ভাল করার জন্য সারা বৎসর চেষ্টা করুন। হাতের লেখা আকর্ষণীয় এমন কোন উস্তাদ বা ছাত্র থেকে প্রতিদিন খাতায় এক লাইন করে লিখে নিয়ে সারা পৃষ্ঠায় তা দেখে লিখুন এবং পরের দিন তাঁকে দেখান হয়েছে কি না। সেই উস্তাদ বা ছাত্র লেখার সময় কলম কীভাবে ধরেন, কোথা থেকে কোন হরফ কীভাবে লেখা শুরু করেন সবকিছু লক্ষ করুন এবং সেভাবে নিজে লিখতে অভ্যাস করুন।

সম্প্রতি হাতের লেখা সুন্দর করার জন্য আরবী বাংলা হস্তাক্ষরের নমুনাসহ অনুশীলনের খাতা বের হয়েছে, উস্তাদ বা সাথী-বন্ধুদের কারও হস্তাক্ষর সুন্দর পাওয়া না গেলে সেই অনুশীলন-খাতা সংগ্রহ করেও অনুশীলন করতে পারেন। তবে ব্যক্তি থেকে হাতের লেখা শেখা সহজ হয়, দ্রুততর হয়, নিয়ম-কানুন সহজে আয়ত্ত হয়।

পরীক্ষায় ভাল ফল করার উপায়

পরীক্ষায় ভাল ফল করা যদিও লেখাপড়ার মূল উদ্দেশ্য নয়, তবে পরীক্ষায় ভাল ফল করার চিন্তা লেখাপড়াকে উন্নত ও গতিশীল করে থাকে নিঃসন্দেহে। পরীক্ষায় ভাল ফল লেখাপড়ার উৎসাহ বৃদ্ধিরও সহায়ক হয়ে থাকে। এ হিসাবে পরীক্ষায় ভাল ফল করার চিন্তা একটি কাম্য বিষয়। তাছাড়া পরীক্ষায় ভাল ফল কর্মজীবনেও প্রভাব ফেলে থাকে। পরীক্ষায় ছাত্রের ভাল ফল তার উস্তাদদের মুখ এবং প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তিও উজ্জ্বল করে থাকে। এসবকিছু বিবেচনায় পরীক্ষায় ভাল ফল করার জন্য সব ছাত্রেরই সচেষ্ট হওয়া কাম্য। নিম্নে পরীক্ষায় ভাল ফল করার ১০টি টিপ্‌স উল্লেখ করে দেয়া হল।

১. পঠিত কিতাবের যেসব বিষয়ে প্রশ্ন আসতে পারে পড়ার সময়ই সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের খাতায় নোট রাখা। এবং সময় সুযোগে ফাঁকে ফাঁকে সেগুলো বারবার দেখা। পরীক্ষার সময় সংক্ষেপে সেগুলো দেখে ইয়াদকে ঝালাই করে নেয়া। পরীক্ষার সময় আসন্ন হলে এতকিছু সাজানো গোছানোর বা ভালমত ইয়াদ করার সময় থাকে না।

পরীক্ষায় কিতাবের কোন কোন বিষয়ে প্রশ্ন হতে পারে তা উস্তাদ পড়ানোর সময়ই বুঝা যায়, অনেক সময় উস্তাদ বলেও দেন, এখান থেকে প্রশ্ন আসতে পারে। বিগত বৎসর যারা এই জামাতে পড়েছে তাদের কাছ থেকে বিগত বছরের প্রশ্নগুলো সংগ্রহ করেও জানা যায়। মাদ্রাসার দফতরে তা'লীমাত থেকেও এ ব্যাপারে সহযোগিতা নেয়া যায়।

২. শুধু গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোই নয় সব কিতাবই যত্নের সঙ্গে জবত করা চাই। অনেক ছাত্র গুরুত্বপূর্ণ কিতাবগুলোতে ভাল নম্বর লাভ করে কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ কিতাবের ব্যাপারে যত্ন না নেয়ার কারণে তাতে নম্বর কম পাওয়ায় কাংখিত ভাল রেজাল্ট অর্জনে ব্যর্থ হয়।

৩. হাতের লেখা ভাল করা চাই। ভাল হাতের লেখা একদিকে পরীক্ষকের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়, ফলে তার খাতা ভাল ছাত্রদের তালিকাভুক্ত জ্ঞান করা হয় এবং যত্নের সঙ্গে দেখা হয়। পক্ষান্তরে যাদের হাতের লেখা ভাল নয়, তাদের খাতা দেখলেই যেহেতু মনে হয় বাজে, তাই সেগুলো তেমন যত্নের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে।

৪. পরীক্ষার হলে গিয়ে প্রশ্নপত্র পাওয়ার পর শুরুতেই খাতায় নাম, রোল নং, জামাআত ইত্যাদি লিখে নিন। শুরুতে এগুলো না লিখলে শেষে তাড়াহুড়োর মুহূর্তে এগুলো লিখতে ভুল হয় বা আকর্ষণহীন হয়ে পড়ে।

৫. পরীক্ষার খাতার অন্তত প্রথম পৃষ্ঠার লেখা খুব আকর্ষণীয় হওয়া চাই। এটা শুরুতেই পরীক্ষকের দৃষ্টি কাড়তে সহায়ক হয়।

৬. পরীক্ষার খাতার লেখা লাইন সোজা করে প্রত্যেক পৃষ্ঠায় নির্দিষ্ট পরিমাণ মার্জিন রেখে সাজানো ও পরিপাটি হওয়া চাই।

৭. যে প্রশ্নগুলোর উত্তর ভাল জানা আছে সেগুলো আগেভাগে লিখে নেয়া চাই। যেগুলো ভাল জানা নেই শুরুতেই সেগুলো নিয়ে চিন্তা করতে করতে সময় পার করে দিলে পরে জানা বিষয়গুলোরও উত্তর লেখার সময় থাকবে না।

৮. প্রশ্ন ভাল করে না বুঝে লিখবেন না, যতটুকু চাওয়া হয়েছে তার চেয়ে বেশি লিখবেন না।

৯. সব প্রশ্নেরই উত্তর দেয়া চাই। কোন প্রশ্ন বা কোন প্রশ্নের কোন বিশেষ অংশ সম্বন্ধে ভালভাবে জানা নেই বলে একেবারে সে সম্বন্ধে না লেখা ভুল। পুরোপুরি না পারলেও যতটুকু পারা যায় তা লিখলেও কিছু নম্বর অবশ্যই তাতে যোগ হবে।

১০. প্রত্যেকটা বিষয়ে উত্তর লেখার আগে উপরে সে সম্পর্কিত শিরোনাম লেখা চাই। যেমন: ১নং প্রশ্নের উত্তর বা ১নং প্রশ্নের "ক"য়ের উত্তর ইত্যাদি। কোন ইবারতের অনুবাদ চাওয়া হলে অনুবাদ লেখার আগে উপরে শিরোনাম দিন "অনুবাদ"। তারকীব চাওয়া হলে শিরোনাম লিখুন "তারকীব"। কোন আয়াতের তাফসীর চাওয়া হলে শিরোনাম লিখুন "তাফসীর" ইত্যাদি।

ছাত্রদের বহুমুখী যোগ্যতা অর্জন প্রসঙ্গে

নিয়মিত পাঠ্যতালিকাভুক্ত কিতাবপত্র লেখাপড়ার বাইরে ছাত্রদের আরও কয়েকটি বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের বিশেষ প্রয়োজন রয়েছে। এ রকম বিষয় রয়েছে অনেক। অনেকেই অনেক বিষয়ে যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজন অনুভব করেন। তবে আমি এ পর্যায়ে মাত্র ৩টি বিষয় প্রসঙ্গে আলোচনা পেশ করছি। ১. ওয়াজ ও বক্তৃতা শেখা প্রসঙ্গ। ২. সাহিত্য ও লেখালেখি প্রসঙ্গ। ৩. দরসিয়াতের বাইরে খারিজী মুতালাআ প্রসঙ্গ।

ওয়াজ ও বক্তৃতা শেখা প্রসঙ্গ

ওয়াজ ও বক্তৃতা শেখার গুরুত্ব বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না। কুরআন হাদীছের ইলম শিক্ষা করার পর তা সুন্দরভাবে প্রচারের দায়িত্ব পালন করতে গেলে মানুষের সামনে বয়ান করার ও বক্তৃতা দিয়ে বোঝানোর প্রয়োজন পড়বে। তখন ওয়াজ

শেখার প্রশিক্ষণ উপকার দিবে। আল-হামদু লিল্লাহ এখন বহু মাদ্রাসাতেই নিয়মিত বক্তৃতা মজলিসের মাধ্যমে ছাত্রদের ওয়াজ শেখানোর প্রশিক্ষণ হয়। এ মজলিসগুলোতে যত্নের সাথে উপস্থিত থাকা চাই।

ওয়াজ ও বয়ান শেখার ক্ষেত্রে ছাত্রদের বিশেষ কয়েকটা বিষয়ে সতর্ক থাকা চাই। তা হল–

১. কথার মধ্যে যেন ফাঁকে ফাঁকে বিশেষ কোন শব্দ ব্যবহারের বাতিক সৃষ্টি না হয়। যেমনঃ কাউকে কাউকে দেখা যায় কথার ফাঁকে ফাঁকে "তাই বলছিলাম" কথাটা বারবার বলে থাকে। কাউকে কাউকে কথার ফাঁকে ফাঁকে "যাই হোক" বলতে শোনা যায়। কেউ কেউ "তাহলে শুনুন", কেউ কেউ "মোটকথা" ইত্যাদি অনেকেই বিশেষ কোন শব্দ বা বাক্য বারবার বলে থাকে। এটা একটা বাতিক। এটা শ্রুতিকটু। এরূপ অভ্যাস যেন গড়ে না ওঠে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখা চাই।

২. ভাষা প্রয়োগে কুশলী হওয়া চাই। খুব বেশি ভারী শব্দ বা অতি সাহিত্য প্রয়োগ না করা চাই। এরূপ করতে গেলে লৌকিকতা এসে যায়। আর লৌকিকতা বয়ানের আছরকে ক্ষতিগ্রস্ত করে। আবার কোন গেঁয়ো ভাষা বা নিতান্ত আঞ্চলিক শব্দ ব্যবহার করা থেকেও বিরত থাকা চাই, এতে ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে না। ভাষা হওয়া চাই মধ্যম ধরনের, সহজ-সাবলীল।

৩. ওয়াজ ও বয়ানের সময় বক্তব্যে ভাব ফুটিয়ে তোলার স্বার্থে বিশেষ কোন স্থানে বিশেষ কোন অংগভঙ্গি প্রদর্শনের প্রয়োজন পড়তে পারে। তবে সর্বক্ষণ প্রয়োজনে অপ্রয়োজনে হাত নাচাতে থাকা বা কোন অংগভঙ্গি প্রদর্শনের বা বিশেষ কোন ভংগিতে সর্বদা শরীর মোচড়ানোর মত কোন বদ অভ্যাস যেন গড়ে না ওঠে সে ব্যাপারে সজাগ থাকা চাই।

৪. বক্তব্যের বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুসারে কখনও আওয়াজ জোর করতে হয়, কখন মোলায়েম সুরে বলতে হয়, কখন রাগত স্বরে বলতে হয়, কখনও ঝাজালো করে বলতে হয়, কখন রসালো করে বলতে হয়। এসব কিছুই করতে হয় বক্তব্যের বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুসারে। চাহিদার দিকে খেয়াল করা ছাড়াই সর্বদা কোন একটা বিশেষ আওয়াজের অভ্যাস গড়ে তোলা ঠিক নয়। সর্বদাই বিকট আওয়াজে বলতে থাকা ঠিক নয়, তাতে শ্রোতাদের মস্তিষ্ক গরম হয়ে ওঠে। সর্বদাই রাগত স্বরে বলতে থাকলে শ্রোতাদের মন বিগলিত হয় না, নরম ও কমল সুরেই মন বিগলিত ও আপ্লুত হয়ে থাকে। সর্বদাই রসালো ভংগিতে বললে বক্তব্যের গাম্ভীর্য নষ্ট হয়ে যায়। অথচ অনেক স্থানে বিষয়বস্তু অনুপাতে গাম্ভীর্যেরই প্রয়োজন থাকে।

৫. শুধু সুর দিয়ে শ্রোতাদেরকে মাতিয়ে রাখার চিন্তা বর্জন করা চাই। সুর দিয়ে নয় বরং বক্তব্যের বিষয়বস্তু ও তথ্য উপাত্ত দিয়ে শ্রোতাদের প্রয়োজন পূর্ণ করার দিকে

খেয়াল দেয়া চাই। এমন যেন না হয় শ্রোতারা শুধু সুরই শুনল, তাদের ঘটে আর কিছুই পড়ল না।

৬. বাজারী কোন বক্তার সুর নকল না করে আল্লাহর দেয়া নিজের সুরের ভিত্তিতেই কথা বলার অভ্যাস করুন। অন্যের সুর নকল করলে তাকাল্লুফ বা লৌকিকতা হচ্ছে বলে মনে হয়। এতে করে অনেক সময় নাজুক মেজাযের শ্রোতাদের কাছে বক্তার ওজনহ্রাস পায়। তাছাড়া শিক্ষিত সমাজের কাছে সুরের নয় বরং বক্তব্যের বিষয়বস্তুর কদর বেশি।

ওয়াজ, বয়ান ও দ্বীনী বিষয়ের বক্তৃতা আম্র বিল মারূফ ও নাহি আনিল মুন্কার তথা দাওয়াত ও তাবলীগের অন্তর্ভুক্ত। অতএব পরবর্তীতে বাস্তব জীবনে যখন ওয়াজ, বয়ান ও দ্বীনী বিষয়ের বক্তৃতা দিবেন তখন আম্র বিল মারূপ ও নাহি আনিল মুন্কার তথা দাওয়াতের নিয়মনীতি, শর্ত, সুন্নাত ও আদব ইত্যাদি পালন করেই তা দিবেন। এখন প্রশিক্ষণ নেয়ার সময়ও যতটুকু সম্ভব এদিকে খেয়াল করার অভ্যাস গড়ে তুলুন। এ সম্পর্কে আমার রচিত "আহকামে যিগেন্দী" কিতাবটি থেকে কিছু বর্ণনা তুলে ধরছি।

আম্র বিল মা'রূফ ও নাহী আনিল মুন্কার তথা দাওয়াত, তাবলীগ এবং ওয়াজ-নছীহত ও বয়ান করার সুন্নাত, আদব ও শর্তসমূহ

* আল্লাহ্র কথা এবং হক কথা বলার কারণে যে অসুবিধা দেখা দিতে পারে তার উপর ধৈর্য ধারণের জন্য মনকে প্রস্তুত করে নিবে।

* শ্রোতাদেরকে তাদের কাজ থেকে এবং কথা-বার্তা থেকে ফারেগ করে নিবে।

* আউযু বিল্লাহ, বিসমিল্লাহ পড়ে নিবে।

* ওয়াজ-নছীহত ও বয়ানের পূর্বে আল্লাহ্র হাম্দ ও দুরূদ শরীফ পড়ে নিবে। তবে ওয়াজের মজলিসে সকলের সম্মিলিতভাবে সমস্বরে দুরূদ শরীফ পাঠ করাটা রছমে পরিণত হয়েছে, তাই এটা পরিত্যজ্য।

* যে বিষয় বিশুদ্ধভাবে জানা আছে একমাত্র সেটাই বলবে। নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি বা নির্ভরযোগ্য কিতাব থেকে যেটা জানা হয়নি, তাহকীক ছাড়া সেটা বর্ণনা করা মিথ্যা বয়ান করার শামিল।

* হেকমত, যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কথা বলা জরূরী।

* নরমীর সাথে কলা বলা, কঠোরতা পরিহার করা। মোস্তাহাব পর্যায়ের বিষয় হলে সর্বদাই নরমীর সাথে বলা, আর ওয়াজিব ও ফরয পর্যায়ের বিষয় হলে প্রথমে নরমীর সাথে তারপর কঠোরতার সাথে বলবে।

* অন্যকে যে বিষয়ের দাওয়াত ও নছীহত প্রদান করবে, প্রথমে নিজে সেটার উপর আমল শুরু করতে পারলে উত্তম। অন্যথায় মানুষের মনে তার দাওয়াত ও নছীহতের আছর কম হবে।

* এত ঘন ঘন বা এত দীর্ঘ সময় ওয়াজ-নছীহত না করা, যাতে শ্রোতাদের মনে বিরক্তির উদ্রেক হয়।

* শ্রোতাদের ধারণ ক্ষমতা লক্ষ রেখে কথা বলা জরুরি।

* তারগীব (উৎসাহমূলক কথা), তারহীব (ভয় ও সতর্কতামূলক কথা, ফাযায়েল ও আহকাম সব বিষয়ের সমন্বয়ে বয়ান করা। এমনিভাবে ঈমান ও ইবাদতের বিষয়ের সাথে ইসলামের মু'আমালাত, মুআ'শারাত এবং আখলাক-চরিত্র সম্পর্কেও বয়ান রাখা জরুরি।

* শ্রোতাদের মন-মেজায লক্ষ্য রেখে কথা বলা জরুরি।

* যে বিষয় শ্রোতাদের জন্য বেশি প্রয়োজনীয় সে বিষয়ের বয়ানকে অগ্রাধিকার দেয়া জরুরি।

* দাওয়াত ও নছীহতের বিনিময়ে পার্থিব বিনিময় গ্রহণ না করা নবীগণের সুন্নাত।

* শ্রোতাদের খায়ের খাহীর জয্‌বা নিয়ে দাওয়াত দিবে ও বয়ান করবে।

* পরকালমুখী করে বয়ান করা অর্থাৎ, মুখ্যত আল্লাহ্‌র হুকুম ও দ্বীন মানা না মানার পরকালীন লাভ ক্ষতিকে তুলে ধরেই বয়ান করা। কখনও কখনও পার্থিব লাভ-লোকসানকেও গৌণভাবে উল্লেখ করা যায়।

* দ্বীনকে সহজভাবে পেশ করা নিয়ম, যেন শ্রোতারা দ্বীনকে কঠিন মনে করে না বসে।

* পর্যায়ক্রমে জরুরী হুকুম-আহকামের চাপ দেয়া, যাতে এক সঙ্গে অনেকগুলো বিষয়ের চাপ মনে করে শ্রোতাগণ বিগড়ে না যায়।

* দোষ-ত্রুটির নেছবত নিজের দিকে করা, যেমন বলা যে, আমরা কেন ইবাদত করব না? আমরা এই পাপ পরিত্যাগ করি ইত্যাদি। এরূপ না বলা যে, আপনারা কেন ইবাদত করেন না? আপনারা এই পাপ পরিহার করুন ইত্যাদি।

* দায়ী (দাওয়াত দানকারী) নিজের অবস্থানকে পরিষ্কার রাখবে। এমন কোন কাজ করবে না যা প্রকৃতপক্ষে তার জন্য বৈধ হলেও বাহ্যিকভাবে সেটা দেখে তার ব্যাপারে কেউ সন্দিহান হয়ে পড়তে পারে। অন্যায়ভাবে তার উপর কোন অপবাদ আরোপিত হলে সমাজের সামনে সে তার সঠিক অবস্থান ব্যাখ্যা করে দিবে।

* বয়ান এবং ওয়াজের মধ্যে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে উদ্দেশ করে নছীহত না করা। এতে উক্ত ব্যক্তি লজ্জিত হয়ে বক্তার প্রতি মনে মনে ক্ষীপ্ত হয়ে উঠতে পারে এবং হিতে বিপরীত হতে পারে।

(قرآنی اصول دعوت کے ودینی مفاتیح الجنان، شرعة السلام، معارف القرآن، اصلاح انقلاب امت، প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে গৃহীত।)

সাহিত্য ও লেখালেখি প্রসঙ্গ

লেখক হওয়ার জন্য চাই নিরন্তর প্রচেষ্টা আর আল্লাহর পক্ষ থেকে কবূলিয়ত। একথা সত্য যে, লেখক তৈরি করা যায় না বা লেখক হওয়া যায় না, লেখক জন্ম নেয়। লেখার উদ্ভাবনী প্রজ্ঞা, লেখার সৃজনীশক্তি, লেখার প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ব্যক্তির সত্তায় মিশে থাকা সুপ্ত প্রতিভা। যার মধ্যে এরূপ সুপ্ত প্রতিভা থাকে, ঘষামাজা করতে করতে, অনুশীলন করতে করতে একদিন সে-ই হয়ে দাঁড়ায় লেখক, হয়তোবা বড় মাপের লেখক। ডাইরির পাতায় লেখা ছোট্ট ছোট্ট রোজনামচা, টুকিটাকি বিষয়ের বিবরণ সম্বলিত দিনলিপি, আরও একটু আগে বেড়ে দেয়াল পত্রিকায় লেখা– এসবকিছুই জন্মসূত্রে প্রাপ্ত লেখার সেই সুপ্ত প্রতিভাকে এগিয়ে নিয়ে যায় সামনের দিকে। তবে যাদের মধ্যে লেখার এই সুপ্ত প্রতিভা না থাকে তাদের চেষ্টা-সাধনা, তাদের অনুশীলনও অর্থহীন নয়। তারা এই চেষ্টা-সাধনা ও অনুশীলন দ্বারা প্রতিভাবান লেখক হতে না পারলেও আটপৌরে লেখক তো অন্তত হতে পারবে।

লেখক হওয়ার উপায় ও লেখার নিয়ম-নীতি সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন আমার রচিত "ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ" নামক বইটি। তবে যারা লেখক হওয়ার চেষ্টা করছে, সাহিত্য ও লেখালেখির অঙ্গনে সফলতা অর্জনের স্বপ্ন দেখছে তাদের উদ্দেশে সংক্ষেপে ৬টি বিশেষ বিষয় উল্লেখ করছি।

১. সাহিত্য ও লেখালেখি শিখতে গিয়ে কখনও যেন দরসী কিতাব অধ্যয়নে ব্যাঘাত না ঘটে। দরসী কিতাব কুরআন-হাদীছের জ্ঞানে পারদর্শিতা অর্জনের মূল উপাত্ত। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি রেখে সাহিত্য চর্চা নিয়ে ব্যস্ত হওয়া নির্বুদ্ধিতা, ঠিক যেমন নির্বুদ্ধিতা পাগড়ীর ফযীলত শুনে দিগম্বর হয়ে পাগড়ী পরিধানে ব্রতী হওয়া।

২. সাহিত্য ও লেখালেখির অঙ্গনে সফলতা লাভ করতে হলে অনেক লেখকেরই অনেক লেখা পাঠ করতে হয়, যাদের অনেকেই নীতি- নৈতিকতা ও আদর্শিক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ নয়। নীতি-নৈতিকতা ও আদর্শিক মানদণ্ডে অনুত্তীর্ণ এরূপ লেখকদের লেখা পাঠ করার সময় এ মর্মে সতর্ক থাকতে হবে যে, তাদের লেখা পাঠ করা হবে শুধু ভাষা ও বর্ণনাশৈলী শিক্ষা করার জন্য, অবশ্যই তা থেকে কোন অবাঞ্ছিত চিন্তা-চেতনা কিংবা বিরূপ কোন মন-মানসিকতা গ্রহণ করার জন্য নয়।

৩. লেখক হওয়া চাই অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে নয়, দ্বীনের প্রচার-প্রসার ও খেদমতে খাল্কের উদ্দেশ্যে। যারা অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে লেখা-চর্চা করে, বাস্তবে দেখা যায় মকবূল লেখক হওয়া তাদের ভাগ্যে জোটে না।

৪. লেখার নিয়ম-নীতি শেখা চাই। অনেককেই দেখা যায় শুধু লেখকই হতে চায় লেখার নিয়ম-নীতি শিখতে চায় না। তাদের লেখা মানসম্পন্ন লেখা হয় না, তাদের লেখা সর্বস্তরে মকবূল হয় না।

৫. লেখক হওয়ার জন্য চাই প্রচুর পড়াশোনা ও চিন্তা-ভাবনা। সে পড়াশোনা অবশ্যই যেন হয় উপযুক্ত উস্তাদের দিকনির্দেশনা মোতাবেক।

৬. যা কিছুই লেখা হোক পূর্ণাঙ্গ না জেনে, ভালভাবে না জেনে না বুঝে যেন লেখা না হয়। প্রত্যেকটা বাক্য নয়, প্রত্যেকটা শব্দ নয় প্রত্যেকটা অক্ষর যেন বুঝে লেখা হয়।

ছাত্র-জীবনে খারিজী মুতালাআ প্রসঙ্গে নীতিমালা

খারিজী মুতালাআর বিষয়বস্তু দু ধরনের হতে পারে। এক. দরসী কিতাবে পঠিত বিষয়ের বিশদ ব্যাখ্যা বিবরণ জানার জন্য খারিজী মুতালাআ। যেমন: কুরআনে কারীমে আসহাবে কাহাফের ঘটনা সংক্ষেপে পাঠ করা হল, যুল কারনাইন ও ইয়াজূজ মাজূজের ঘটনা সংক্ষেপে পাঠ করা হল, তারপর উস্তাদ তাদেরকে এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য বিভিন্ন রেছালার নাম বলে দিলেন আর ছাত্র সেগুলো পাঠ করল। এরূপ খারিজী মুতালাআয় তেমন ক্ষতির দিক নেই। দুই. দরসী কিতাবপত্রের সঙ্গে সংশ্রবহীন বিষয়ে খারিজী মুতালাআ, যেমন: মাতৃভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বইপত্র পাঠ, সাপ্তাহিক মাসিক বা দৈনিক পত্রিকা পাঠ ইত্যাদি।

এই দ্বিতীয় প্রকার খারিজী মুতালাআর বিষয়টা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিপদসঙ্কুল। কিছু ছাত্র আবেগে বা উম্মাদনায় সাহিত্য শেখার নেশায় এমন সব নভেল উপন্যাসও পড়তে শুরু করে দেয় যা তাদের চরিত্রকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে নায়। অনেক সময় কোন বাতিল ভণ্ডের বই পাঠ তাদের গোমরাহীর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। পত্র-পত্রিকা পাঠে মগ্ন হয়ে রাজ্যের চিন্তা এমনভাবে মাথায় ঢোকায় যে, মূল পড়ার একাগ্রতাই বিনষ্ট হয়ে যায়। এজন্যই এরূপ খারিজী মুতালাআর বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হল এরূপ খারিজী মুতালাআ অবশ্যই বিজ্ঞ উস্তাদের দিকনির্দেশনা মোতাবেক হওয়া চাই। উস্তাদ যদি কোন ছাত্রের জন্য কোন বিশেষ বিষয় বা বিশেষ কিতাব/বই বা পত্র-পত্রিকা পড়া ক্ষতিকর মনে করে নিষেধ করেন তাহলে ছাত্রের তা হতে বিরত থাকা উচিত।

ছাত্র জীবনে রাজনীতি ও সংগঠনে যোগদান প্রসঙ্গ

(এ সম্বন্ধে আমি আমার লেখা একটি প্রবন্ধের সিংহভাগ তুলে ধরছি। প্রবন্ধটির শিরোনাম ছিল "ছাত্রাবস্থায় রাজনীতি: প্রতিভা বিকৃতির অন্যতম কারণ"। প্রবন্ধটি মাসিক আল জামেয়া মার্চ/১৯৮৫ইং এবং মালিবাগ জামেয়া থেকে প্রকাশিত স্মরণিকা "অন্বেষা"/১৯৮৮ইং তে প্রকাশিত হয়েছিল। প্রবন্ধটি শায়খুল হাদীছ মাওলানা মুহাম্মাদ যাকারিয়্যা সাহারানপূরী [রহ.] রচিত "ইসলামী সিয়াসাত" নামক গ্রন্থের একটি পরিচ্ছেদের ভিত্তিতে লিখিত।)

ইল্‌মী এবং আমলী সবদিক দিক থেকে নিজেদেরকে গড়ে তোলাই হল একজন ছাত্রের ছাত্রজীবনের মূল দায়িত্ব। জীবনের এ সময়টুকু লাগামহীনভাবে কিংবা যথেচ্ছাচারিতার সাথে পরিচালিত হলে সে এমন একটা ক্ষতির সম্মুখীন হবে যার প্রতিকার সে করতে পারবে না কখনও। ছাত্রজীবনের প্রতিটি মুহূর্ত বেঁধে দেয়া হয় জীবন গড়ার উপযোগী কতগুলো সহায়ক মূলনীতির স্নেহ-কঠিন বন্ধনে। ছাত্রজীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে পরিচালিত করা হয় একটি সুনির্ধারিত দৈনন্দিন কর্মসূচীর অধীনে। শিক্ষকদের সজাগ সতর্ক দৃষ্টির সম্মুখে সযত্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিণত স্তরে পৌঁছানো হয় তার জ্ঞানের মৌলিক যোগ্যতাকে, জ্ঞান-জীবনের সুদীর্ঘ পথ পরিক্রমায় যে জ্ঞানের প্রয়োজন পড়ে তার। ছাত্রকে খেয়াল রাখতে হবে অধ্যয়ন ও অধ্যাবসায় যেন শুধু পড়া আর পুনরাবৃত্তি এবং বইয়ের মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলো গোগ্রাসে গিলতে থাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে, যেখানে চিন্তার এবং বাস্তব জীবনে প্রয়োগের উদ্দীপনা থাকবে না। তেমনিভাবে অধীত বিদ্যাগুলোর বাস্তবায়ন চিন্তা যেন তাকে এতখানি আচ্ছন্ন করতে না পারে, যাতে সে "অধ্যয়নই ছাত্রের তপস্যা" নীতিকে বিসর্জন দিয়ে বসে তার কর্মের মুখরতায়। ভারসাম্য রক্ষার প্রতি থাকতে হবে তার সুক্ষ্ম সযত্ন দৃষ্টি– এমন একটি দৃষ্টি যার মধ্যে থাকবে যুগপৎ উদ্দীপনা এবং সংযম।

এই আলোকে ছাত্র-রাজনীতি তথা শিক্ষানবীশ অবস্থায় যে কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক তৎপরতার সাথে জড়িত হওয়ার বিষয়টা বিবেচ্য। অভিজ্ঞজনদের ধারণা হল এটা "যাহ্‌রে কাতেল" (প্রাণঘাতী বিষ)। কেউ এ ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করতে পারেন, তবে আমরা দীর্ঘদিন যাবত বাস্তবতার নিরিখে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেছি। নিরবচ্ছিন্ন সেই চিন্তার পরিণতিতে যে ধারণাটি আমার মধ্যে জন্ম নিয়েছে তা-ই অধ্যাবধি বদ্ধমূল হয়ে আছে মনে। শুধু আবেগ নয় বাস্তবতা এবং অভিজ্ঞতার আলোকে চিন্তা করলে ভিন্নমত পোষণকারীরাও আমাদের সাথে একমত হবেন সে বিশ্বাসও রয়েছে।

যাহোক, যেসব কারণের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ছাত্রাবস্থায় ছাত্রদের রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের ব্যাপারে উক্ত ধারণা পোষণ করি তার কয়েকটা দিক সম্পর্কে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করব।

এক: প্রজ্ঞাবান নয়, অভিজ্ঞজন –যারা আবেগতাড়িত না হয়ে বাস্তবতার নিরিখে বিচার করতে অভ্যস্ত– তাদের কাছে আমার জিজ্ঞাসা সারা বিশ্ব, নয়তো নিদেনপক্ষে ভারত উপমহাদেশের উপর একবার চোখ বুলিয়ে দেখুন যে সমস্ত মহান ব্যক্তিবর্গ আজ জাতির কর্ণধার, জ্ঞান-রাজ্যের অধিপতি, তাদের ছাত্র জীবনটা কেমন কেটেছে– প্রত্যক্ষ রাজনীতির কর্ম-তৎপরতায় চঞ্চল-মুখর না কি তন্ময়ভাবে একনিষ্ঠ চিত্তে অধ্যয়নে আত্মনিমগ্নতায়? নিশ্চয় আপনার উত্তর হবে এবং তা হতেই হবে যে, আজ প্রচারণার ক্ষেত্র হতে নীরব থেকে ইলমী তৎপরতায় একমাত্র তারাই নিয়োজিত আছেন যাদের ছাত্র জীবন নিরবছিন্নভাবে এবং একনিষ্ঠভাবে অধ্যয়নের মধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা ছাত্রজীবনে অন্যদিকে লিপ্ত ছিল, আজ তাদের যত বড় সুখ্যাতিই হোক না কেন, সত্যিকার অর্থে হাদীস, তাফসীর ও ফিকাহ বিষয়ক ইলমী সুক্ষ্মাতিসুক্ষ্ম বিচার-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাদের দৃষ্টি অনেক পশ্চাতে দেখতে পাবেন। অতি সাধারণ কোন মাসআলা বা ইলমী কোন তাহকীকের প্রয়োজন পড়লে তাদের পা আর সম্মুখে অগ্রসর হবে না। কোন যুক্তিতর্কের অবতারণা ছাড়াই চোখের সম্মুখে উপমহাদেশে যে সব উলামায়ে কেরাম রয়েছেন বা নিকট অতীতে চলে গেছেন, তাঁদের প্রতি একটু পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি মেললেই আমার কথার যথার্থতা আঁচ করা যাবে।

দুই: আমাদের আকাবির ও পূর্বসূরী এবং তাদেরও পূর্বসূরীদের নিকট সর্বদাই আধ্যাত্মিক সাধনা ছিল প্রাণ সমতুল্য। ইল্মী কর্মকাণ্ডের অবিচ্ছেদ্য বা পরিপুরক অংশ রূপে পরিগণিত হয়ে আসছে তা সর্বদা। কিন্ত তা সত্ত্বেও ছাত্রদের বায়আত গ্রহণ করাকে তাঁরা অস্বীকৃতি জানিয়ে আসছেন যুগের পর যুগ ধরে একের পর এক সকলেই। এর কারণ আর কী হতে পারে একমাত্র এ ছাড়া যে, প্রত্যক্ষ আধ্যাত্মিক সাধনার সাথে ছাত্রদের জড়িত হওয়া একটা অবাঞ্ছিত ছেদ টেনে দিতে পারে তার নিরবছিন্ন অধ্যাবসায়ে, কিংবা তার চিন্তাকে ক্ষণিকের জন্য হলেও একটু অন্যত্র সরিয়ে নিতে পারে তার একটানা গতিপথ থেকে। যার ফলে আধ্যাত্মিক সাধনার এ অধ্যায় তাঁদের নিকট অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও তালিবে ইলমের জন্য সেটিকে প্রতিকূল মনে করে আসছেন। এমতাবস্থায় রাজনীতির ন্যায় ঝঞ্ঝা-বিক্ষুব্ধ একটা কর্মকাণ্ড ছাত্রজীবনের সাধনার সাথে জড়িত হলে কি সুফল (!) বয়ে আনবে তা সহজেই অনুমেয়। পূর্বসূরীদের এই চিন্তা-চেতনাকে শুধু বারবার পুনরাবৃত্তি

না করে তাকে বিকশিত করতে হবে তার ধারাবাহিকতা বজায় রাখা এবং তার প্রতি উৎসাহিত হওয়ার মাধ্যমে।

তিন: কোন সভা-সমিতিতে ছাত্রদের যোগদান একটা সাময়িক ব্যাপার মনে হলেও বস্তুত এটা তার অধ্যাবসায়ের মাঝে টেনে দেয় একটা দীর্ঘ ছেদ। কোন সভা-সমিতিতে তাদের যোগদানের পর মাস বা পক্ষকালব্যাপী না হলেও অন্তত কয়েক দিন যাবৎ তা নিয়ে তাদের মাঝে চলতে থাকে আলোচনা-পর্যালোচনা। তার ভাল-মন্দের বিতর্ক একটা উপজীব্য বিষয়ে পরিণত হয়ে ওঠে তাদের কাছে। অতঃপর একত্রে তাদের জীবন যাপন, ছাত্রাবাসে সহাবস্থান ও ২৪ ঘণ্টা মেলামেশার ফলে এই বিতর্কমূলক আলাপ আলোচনার ভাবটা তারা কাটিয়ে উঠতে পারে না, ক্ষণে ক্ষণে মোচড় দিয়ে ওঠে এই সব আলোচনা ও পারস্পরিক বিতর্ক। ফলে শুধু ছাত্রদের লেখাপড়ার পরিবেশই নষ্ট হয় না, লেখাপড়া, তাকরার ছবক ইত্যাদি সব একাকার হয়ে যায়। সামান্য চিন্তা বা অভিজ্ঞতার আলোকে সবার কাছেই এটা ধরা পড়বে।

আর এই বিতর্ক ও মতবিরোধটাই একটা পর্যায়ে ঝগড়া এবং পরস্পর হানাহানির রূপ পরিগ্রহ করে। তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ ও প্রভাবশালী পক্ষ প্রথমত শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে, না পারলে প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের নিকট সত্য মিথ্যা রটনা দ্বারা অপর পক্ষকে জব্দ করার পথ বেছে নেয়। আর জবাবী হামলায় প্রতিপক্ষ পরিকল্পিত সত্য-মিথ্যা অপবাদ অভিযোগের মাধ্যমে হলেও অন্য পক্ষকে ঘায়েল করার জন্য প্রাণপণ অপচেষ্টায় বেসামাল হয়ে ওঠে। আর সাধারণত শক্তিশালী পক্ষের সাক্ষী-সাবুদও জুটে যায় অনেক। পক্ষান্তরে পরাজিতদের পক্ষে সত্য সাক্ষী দিতেও কাউকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর হয়ে পড়ে। ফলে এরূপ পরিস্থিতিতে অনিবার্য কারণেই প্রকৃত দোষীর দোষ ঢাকা পড়ে, আর নির্দোষরা নির্ঘাত আঁটকে পড়ে। কারণ কর্তৃপক্ষ তো অন্তর্যামী নন। হয়ত কেউ ভাববেন আমি নিছক কতগুলো কল্পনাকে সাজিয়ে পেশ করছি। বস্তুত এ হল প্রতিদিনকারই বাস্তব ঘটনা, যার জন্য আমাদের ভোগান্তিরও শেষ নেই, আমি শুধু তার শাব্দিক রূপায়ন করছি।

এ ধরনের মতবিরোধ সাধারণের মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়, তবে পার্থক্য এখানে যে, সাধারণের মধ্যকার বিবাদ বিতর্ক কনেকটা সাময়িক ব্যাপার এই অর্থে যে, নিদিষ্ট সময়ের সম্মেলন শেষে যার যার পথ ধরলেই ঘটনার অবসান হয়ে গেল। কিন্তু ছাত্রদের ব্যাপারটা ভিন্ন– মাদ্রাসাই তাদের মজলিস, মাদ্রাসাই তাদের ঘর, সর্বক্ষণ এখানেই তাদের অবস্থান করতে হয়। আর তাই সার্বক্ষণিক এই সহাবস্থানের ফলে সামান্যতম মতবিরোধও ধীরে ধীরে বাড়তে বাড়তে বিরাট আকার ধারণ করে। ফুলে ফেপে শাখা প্রশাখায় বিস্তারিত হয়ে এক একটি বিন্দু তখন হয়ে দাঁড়ায় এক একটা বিরাট ঘটনা, যার প্রবাহ চালু থাকে মাসাধিক কাল কিংবা বৎসর কাল ধরে।

চার: শুধু তাই নয়, কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সব শিক্ষক সাধারণত এক চিন্তাধারার হন না। এটাই স্বাভাবিক। এমতাবস্থায় ক্লাসে পড়ানোর মুহূর্তে অপ্রাসঙ্গিকভাবে হলেও প্রায়শই রাজনৈতিক বিতর্ক এসে পড়ে। যার ভেতর নানান ধরনের মন্তব্যও করা হয়। সম চিন্তাধারার লোকদের প্রশংসা, তাদের গুণকীর্তন, পক্ষান্তরে অন্যদের সমালোচনা, উপহাস ও নিন্দাবাদ ইত্যাদি স্বাভাবিকভাবেই কিছু না কিছু হয়ে থাকে। আর ক্লাসের সব ছাত্রই যে কোন একজন শিক্ষকের একই মতের (হাম খেয়ালের) হবে না তাই স্বাভাবিক। অনেক সময় এমনও হয় যে, উস্তাদ হয়তো এমন লোকেরই প্রশংসা করে বসেছেন, সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রের নিকট যিনি সমালোচনার যোগ্য, কিংবা উস্তাদ যাকে বিভ্রান্ত বলেছেন ছাত্রদের সিংহভাগ না হলেও একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হয়তো তার পক্ষ সমর্থন করে। তখন শুরু হয় ছাত্র শিক্ষকের মাঝে মানসিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত। এমনকি এক পর্যায়ে তা পৌঁছতে পারে বাহ্যিক সংঘাতেও। নিদেনপক্ষে ছাত্রদের নিকট উক্ত উস্তাদের মর্যাদা ক্ষুণ্ন হয়ে পড়ে। আর রাজনীতির চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে এই মন কষাকষির দরুন ছাত্ররা তখন উক্ত উস্তাদকে মনে করতে থাকে স্থুল বুদ্ধির বা গোঁড়া প্রকৃতির, যার চিন্তা সরস নয় কিংবা যার চিন্তা পরিচালিত হয় একপেশেভাবে। বস্তুত কোন উস্তাদ সম্পর্কে ছাত্রের এই-ই যদি হয় ধারণা, তাহলে সেই উস্তাদ থেকে অর্জিত বিদ্যা কতটুকু ফল বয়ে আনবে তা সকলেরই জানা থাকার কথা।

এ পেক্ষাপটে আমাদের বর্তমান ছাত্র শিক্ষকদের অবস্থাটা একটু পর্যবেক্ষণ করা দরকার। ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে রাজনৈতিক মাতানৈক্য সৃষ্টি হলেই সেখানে কথা কাটাকাটি, একে অন্যকে হেয় করা ও একে অপরের দোষ অন্বেষণে লিপ্ত হওয়া অতি স্বাভাবিক।

আধুনিক শিক্ষাকেন্দ্রগুলোতেও দেখা যায় যারা ছাত্রজীবনে উস্তাদের ভক্তি করে তারাই জীবনে উন্নতি লাভ করতে পারে, বিদ্যার্জনের মূল উদ্দেশ্য এবং তার উপকার লাভে সক্ষম হয় তারা। অপর দিকে ছাত্রজীবনে যারা আত্মম্ভরিতা এবং অহমিকা নিয়ে থাকে, ডিগ্রী অর্জন বা চাকরির খাতিরে তাদেরকেই সুপারিশের জন্য ধর্ণা দিতে হয়। আর ঘটনাচক্রে একটা চাকরি জুটলেও ভবিষ্যত হয় তার অশান্তিপূর্ণ এবং আঁধারাচ্ছন্ন। আমরা মনে করি আজ শিক্ষা তথা ব্যাক্তিত্ব গঠন ও পাণ্ডিত্ব অর্জনের ক্ষেত্রে যে বন্ধাত্ব দেখা দিয়েছে তার জন্য প্রধাণত দায়ী রাজনৈতিক হুলস্থুলের সঙ্গে ছাত্রসমাজের জড়িয়ে পড়া। সম্প্রতি রাজনীতির নামে নানান রকম সভা-সমিতি, মিছিল ও শোভাযাত্রায় ছাত্রদের যোগদান ও হৈ-হুল্লোড় দ্বারা শিক্ষার পরিবেশ বিঘ্নিত হওয়ার সাথে সাথে তাদের শিক্ষা জীবনের উপর যে অশুভ ছায়া নেমে এসেছে এবং আসছে ছাত্র-রাজনীতিই যে এর অন্যতম কারণ তা এখন

ভুক্তভোগীদের আর ব্যাখ্যা করে বোঝাতে হবে না। শুভবুদ্ধির উদয় হোক তাদের, যারা শুধু তাড়িত হয় ক্ষণিকের আবেগ ও অন্ধ মোহে।

ছাত্র-জীবনে স্বাস্থ্য রক্ষা প্রসঙ্গ

লেখাপড়ার জন্য স্বাস্থ্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একবার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে তা উদ্ধার করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়লে লেখাপড়ার মেজাযও নষ্ট হয়ে যায়। তাই স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে সচেতন থাকা চাই। কোন রোগ-ব্যধি হলে পিতা মাতা বা গুরুজনদের অবহিত করতে লজ্জা করবেন না, বরং তাদের অবহিত করে দ্রুত চিকিৎসার উদ্যোগ নিবেন। রোগ হওয়ার পর চিকিৎসা গ্রহণ করার চেয়ে রোগ যেন না হয় সে ব্যাপারে সচেতন থাকা বেশি উত্তম পন্থা। খাদ্য, পানি, নিদ্রা এবং থাকা ও চলাফেরার পরিবেশের ব্যাপারে খুব বেশি সচেতন থাকা চাই, তাহলেই বহু রকম রোগ-ব্যধি থেকে নিরাপদ থাকা যায়। সংক্ষেপে স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য নিম্নের ৬টি টিপ্‌স মেনে চলুন, ইনশাআল্লাহ স্বাস্থ্য ভাল থাকবে, বহু রোগ থেকে নিরাপদ থাকবেন।

১. যে খাদ্য-খাবারে পেট নষ্ট হয় কিংবা যাতে মেদ বা কফ বৃদ্ধি পায় এমন খাদ্য-খাবার থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকা উত্তম।

২. পানি বিশুদ্ধ হওয়া চাই। পানিতে সমস্যা থাকলে বহুরকম রোগ-ব্যধি হতে পারে। বিশুদ্ধ পানি পান করুন। প্রয়োজনে পানি ফুটিয়ে পান করুন। পানি ফোটানোরমত ব্যবস্থা বা সময়-সুযোগ না থাকলে ওয়াটার পিয়োরিফাই টেবলেট দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করে নিন।

৩. ঘুম পরিমিত হওয়া চাই। ঘুম ৮ ঘণ্টার চেয়ে যেন বেশি না হয়। এর চেয়ে কম ঘুমিয়েও যদি স্বাস্থ্য মেজায ঠিক থাকে তাহলে তা করা যেতে পারে। আল্লামা নববী, তাহের আল-জাযায়েরী প্রমুখ অনেক মনীষীর জীবনীতে দেখা যায় তাঁরা নিতান্ত বেহাল হয়ে না পড়লে ঘুমাতেন না। এবং ঘুমাতেনও নিতান্তই অল্পসময়। স্বাস্থ্য ও মেজাযে সহনীয় হলে এ নীতি গ্রহণ করা যেতে পারে।

৪. প্রতিদিন কিছু সময় (অন্তত ৩৫−৪০ মিনিট) হাঁটাচলা করা স্বাস্থ্যের জন্য খুব উপকারী। এতে শরীরের বাড়তি মেদ ও তাপ হ্রাস পায়, হজম ভাল হয়, রোগ-ব্যধি কম হয়, আলস্য দূর হয়, শরীর ও মন সবই ঝরঝরে থাকে।

৫. শরীর, ব্যবহার্য কাপড়-চোপড়, খাকার জায়গা, বিছানাপত্র, ব্যবহার্য থালা-বাটি ইত্যাদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা চাই। নোংরা অবস্থার কারণে অনেক রোগ-ব্যধি হয়ে থাকে।

৬. যৌনশক্তির অপচয় বা অপব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।

অনেকের স্বপ্নদোষ বা হস্তমৈথুনের কারণে স্বাস্থ্যহানি ঘটে থাকে। তাই নিম্নে এ দুটো প্রসঙ্গে আলোচনা পেশ করা হল।

স্বপ্নদোষ প্রসঙ্গ

বয়সকালে স্বাভাবিক নিয়মেই মাঝে মধ্যে স্বপ্নদোষ হয়ে থাকে। মাঝে মধ্যে স্বপ্নদোষ হওয়া খারাপ কিছু নয়। বরং এতে শরীরের বাড়তি ধাতু বেরিয়ে যাওয়ায় দেহমনে প্রশান্তি আসে। তবে ঘনঘন স্বপ্নদোষ হতে থাকলে তাতে শরীর ও মনের নানান রকম ক্ষতি দেখা দিতে পারে। স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়তে পারে, মন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যেতে পারে, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পেতে পারে। মাথা ধরা, মাথা ঘোরা, অবসাদ, বুক ধড়ফড়ানি, স্নায়ুবিক দুর্বলতা ইত্যাদি হাজারো উপসর্গ দেখা দিতে পারে। তাই স্বপ্নদোষের পরিমাণ বেড়ে গেলে শারীরিক চিকিৎসার সাথে সাথে কিছু অন্য পদ্ধতিও গ্রহণ করতে হবে। যথা:–

১. স্বপ্নদোষের মূল কারণ হল অশ্লীল ও কামোত্তেজক চিন্তা-ভাবনা। তাই যৌন উত্তেজনা ও কামভাব জাগ্রত হয় এমন সব আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকবে। নাচ-গান, ছায়াছবি, অশ্লীল নভেল-নাটক পড়া থেকে বিরত থাকবেন। সব ধরনের অশ্লীল ছবি, অশ্লীল চিত্র ও ভিডিও দেখা থেকে বিরত থাকবেন। যাদের সংসর্গে গেলে কামোত্তেজনা বৃদ্ধি পায় তাদের সংসর্গ এড়িয়ে চলতে হবে।

২. স্নায়ু উত্তেজক খাদ্য-খাবার যথাসম্ভব কম খাবেন। যেমন– বেশি তেল- মশলার খাবার, মাংস, ডিম, পোলাও, বিরিয়ানি ইত্যাদি গুরুখাবার– এগুলো থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকবেন। বিশেষ করে রাতে গুরুভোজন থেকে বিরত থাকবেন।

৩. ভরা পেটে শোয়া থেকে বিরত থাকবেন। রাতে ঘুমাতে যাওয়ার কয়েক ঘণ্টা পূর্বে খাওয়া-দাওয়া সেরে নিবেন।

৫. শোয়ার আগে গোছল করে নিতে পারলে ভাল। অন্তত ঠাণ্ডা পানিতে
হাত, পা, মুখ, ঘাড় ও যৌনাঙ্গ ধুয়ে নিবেন।

৬. শোয়ার আগে পেশাব-পায়খানার জরুরত সেরে নিতে হবে। ঘুমের মধ্যে পেশাব-পায়খানার বেগ হলে অলসতা না করে সেরে নিতে হবে। অনেক সময় পেশাব পায়খানার বেগ থেকে স্বপ্নদোষ হয়।

৭. যে কোন এক পার্শ্বে শোওয়া। চিৎ বা উপুড় হয়ে না শোয়া।

কয়েকটা বদ অভ্যাস ও তা থেকে বাঁচার উপায়

হস্তমৈথুন প্রসঙ্গ

বয়স্কালে বাড়তি ধাতুর চাপ অনেক সময় যুবকদেরকে কৃত্রিম উপায়ে ধাতু বের করে ফেলার জন্য হস্তমৈথুনে উদ্বুদ্ধ করে। এটা করতে করতে অনেকের এটা এমন বদঅভ্যাসে পরিণত হয় যে, তখন ধাতুর চাপ না থাকলেও এমনকি শরীর দুর্বল হয়ে পড়লেও অবলীলায় হস্তমৈথুন চালিয়ে যেতে থাকে। আর এভাবে শরীরের মৌলিক শক্তি হ্রাস পাওয়ায় শরীর আরও দুর্বল হয়ে পড়ে, স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, মন দুর্বল হয়ে পড়ে, মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, স্মৃতিশক্তি হ্রাস পায়।

এ থেকে বাঁচার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিম্নের ৪টি পন্থা মেনে চলুন। ইনশাআল্লাহ উপকার হবে।

১. যৌন উত্তেজনা ও কামভাব জাগ্রত হয় এমন সব আলোচনা ও চিন্তা-ভাবনা থেকে বিরত থাকবেন। নাচ-গান, ছায়াছবি, অশ্লীল নভেল-নাটক পড়া থেকে বিরত থাকবেন। সব ধরনের অশ্লীল ছবি, অশ্লীল চিত্র ও ভিডিও দেখা থেকে বিরত থাকবেন।

২. স্নায়ু উত্তেজক খাদ্য-খাবার যথাসম্ভব কম খাবেন। যেমন– বেশি তেল-মশলার খাবার, মাংস, ডিম, গুরুপাক ইত্যাদি। এগুলো থেকে যথাসম্ভব বিরত থাকবেন।

৩. অনেক সময় ইস্তেঞ্জাখানায় গেলে বা গোসলের জন্য গোসলখানায় গেলে তখন হস্তমৈথুনের চেতনা এমন প্রবল হয়ে দাঁড়ায় যে, আগে থেকে বিরত থাকার প্রতিজ্ঞা করে গেলেও কেমন যেন অবলীলায় আবার হস্তমৈথুন করে বসে। এরূপ হলে একাকী গোসল করতে যাবেন না। অবশ্যই কাউকে না কাউকে সাথে নিয়ে একসাথে গোসল করবেন। ইস্তেঞ্জাখানায় যাওয়ার সময়ও একজনকে বাইরে দাঁড়িয়ে রাখবেন যে, ভাই আমার এই বদ অভ্যাস আছে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে একটু সাড়া শব্দ করতে থেকো। অনেকের অভ্যাস আছে রাতের বেলায় বিছানায় যেয়ে হস্তমৈথুন করে। এরূপ হলে পাশের সাথীকে বিষয়টা অবগত করিয়ে তাকে খেয়াল রাখার অনুরোধ জানিয়ে রাখবে। একাকী কোন কামরায় ঘুমালে পাশের কামরার সাথে জানালা দরজা খোলা রেখে বাতি জালিয়ে ঘুমাবে। মনের সাথে মোজাহাদা করে এগুলো করবে। এভাবে কিছুদিন বিরত থাকতে পারলেই বদ অভ্যাসের তীব্রতা হ্রাস পাবে ইনশাআল্লাহ। আর সবচেয়ে বড় কথা মানুষ এ থেকে বিরত থাকার প্রতীজ্ঞা করলে কেন পারবে না- এমন মনোবল রাখলে ইনশাআল্লাহ বিরত থাকতে পারবেন। আল্লাহর কাছেও দুআ করতে থাকবেন তিনি যেন মনোবল দান করেন।

৪. যৌন উত্তেজনা ও কামভাব বিষয়ক চিন্তা জাগ্রত হতে চাইলেই চিন্তাকে অন্য দিকে ঘুরিয়ে দিবেন। এ কাজটি যত্নের সঙ্গে করলে ইনশাআল্লাহ খুব উপকার পাওয়া যাবে। তারপরও কোন কারণে যদি চিন্তাকে ঘুরিয়ে দিতে না পারেন এবং হস্তমৈথুনের চেতনা জাগ্রত হয়েই দাঁড়ায় তাহলে হস্তমৈথুনের ক্ষতিগুলো বারবার স্মরণ করবেন।

বিশেষত এভাবে যৌনশক্তি ক্ষয় করে ফেললে ভবিষ্যতে স্ত্রীর কাছে লজ্জিত হতে হবে, তখন কী উপায় হবে? আর খোদা না খাস্তা এভাবে হস্তমৈথুনের ফলে যদি ধ্বজভঙ্গ বা পুরুষত্বহীনতা দেখা দেয় তাহলে যে ভবিষ্যত জীবন সম্পূর্ণই অনুশোচনার জীবন হয়ে দাঁড়াবে! হেকিম, কবিরাজ, ডাক্তার কারও কাছে দৌড়েও কোনো লাভ হবে না। তখন যে সমাধানহীন মনোপীড়ায় ভুগতে হবে– এসব কথা স্মরণে জাগ্রত রাখলে ইনশাআল্লাহ হস্তমৈথুনের চেতনা হ্রাস পাবে। এ প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের "যৌবন ও প্রেম" শীর্ষক আলোচনাটুকুও মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন।

অশ্লীল ছবি, ভিডিও, অশ্লীল উপন্যাস ইত্যাদি প্রসঙ্গ

অনেক ছাত্র/ছাত্রী অশ্লীল উপন্যাস, নভেল, নাটক, পেশাদার অপরাধীদের কাহিনী অথবা অশ্লীল কবিতা পাঠের বদ অভ্যাসে অভ্যস্ত। অনেকে টেলিভিশন, ভিডিও, ভিসিআরে অশ্লীল ছায়াছবি দেখতে অভ্যস্ত। আজকাল বহু ছাত্র-ছাত্রী মোবাইলে এতসব বাজে জিনিস দেখার বদ অভ্যাসে আক্রান্ত যার বিবরণ দিতেও লজ্জা বোধ হয়। এসব বদ অভ্যাস থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য বিশেষত ৩টা কাজ করতে হবে।

১. মনের চাওয়ার বিরুদ্ধে এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে। মন এগুলো দেখার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেও কোনোক্রমেই দেখা হবে না এমন শক্ত মনোভাব পোষণ করে এগুলো থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. এসবের উপকরণ থেকে দূরে থাকতে হবে। যেমন– মেমোরি কার্ডযুক্ত মোবাইল নিজের কাছে রাখা বন্ধ করুন। তাহলে মোবাইলে যেসব খারাপ জিনিস দেখতে অভ্যস্ত তা থেকে বিরত থাকা হবে। এমনিভাবে অন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করে খারাপ কিছু দেখা হয় তা দূরে রাখুন, বা নিজে তা থেকে দূরে থাকুন। কিছুদিন এরূপ করলেই মনের এসব চাহিদা দুর্বল হয়ে যাবে।

৩. এগুলোর পাপ ও ক্ষতিগুলো স্মরণ করে মনকে এগুলো থেকে বিরত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে। পাপ হল এগুলো গোনাহে কবীরা, যার কারণে জাহান্নামের কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে যদি না আল্লাহ ক্ষমা করেন। আর এগুলোর মধ্যে রয়েছে ছয় ধরনের ক্ষতি। (১) সময় নষ্ট (২) সম্পদ নষ্ট (৩) স্বভাব-চরিত্র নষ্ট (৪) স্বাস্থ্য নষ্ট (৫) ঈমান ও আমল নষ্ট (৬) চিন্তা-চেতনা নষ্ট।

অবৈধ প্রেম প্রসঙ্গ

এ প্রসঙ্গে তৃতীয় অধ্যায়ের "যৌবন ও প্রেম" শীর্ষক আলোচনাটুকু মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন।

বি: দ্রঃ ছাত্রদের অনেকেই যুবক। যুবক জীবনের সাথেও তাদের সম্পর্ক রয়েছে। তাই প্রত্যেক ছাত্রকে যুবক জীবন সঠিকভাবে গড়ার জন্য পরবর্তী অধ্যায় (যদি যুবক জীবন গড়তে চান) পাঠ করে নিতে হবে।

(দুই) স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য আলোচনা

স্কুল-কলেজের ছাত্ররা পূর্বে মাদ্রাসা ছাত্রদের জন্য আলোচনা প্রসঙ্গে যেসব বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হয়েছে তা দেখে নিলে তার মধ্যেই তারা তাদের ছাত্র জীবন গড়ার বহু তথ্য উপাত্ত পেয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ! সেসব বিষয় ছাড়াও স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্য আরও বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা পেশ করা হল।

পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান শেখার সহীহ নিয়ত প্রসঙ্গ

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মনে রাখা চাই কুরআন হাদীছের জ্ঞান ছাড়া অন্য কোনো জ্ঞান শিক্ষা করার পশ্চাতে উদ্দেশ্য ভাল থাকলেই কেবল তা শিক্ষা করা বৈধ, অন্যথায় তা শিক্ষা করা বৈধ নয়। বর্তমান যুগের পার্থিব জ্ঞান-বিজ্ঞান যেমন–স্বাস্থ্যবিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রকৌশলবিজ্ঞান, অর্থবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, কৃষিবিজ্ঞান, প্রাণীবিজ্ঞান, উদ্ভিদবিজ্ঞান, বিদ্যুৎবিজ্ঞান, ভূ-তত্ত্ববিজ্ঞান, নক্ষত্রবিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ববিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়গুলো শিক্ষা করা যদি ইসলামের উৎকর্ষ সাধন ও মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে হয় তাহলে তা বৈধ, কেননা ভাল উদ্দেশ্যে তা শিক্ষা করা হচ্ছে। এর বিপরীত কোনো মন্দ উদ্দেশ্যে এগুলো শিক্ষা করা বৈধ নয়। ফিকহের পরিভাষায় এগুলোকে 'হারাম লি গাইরিহী' বলে। অর্থাৎ, প্রকৃত প্রস্তাবে এগুলো নিজে হালাল, জায়িয ও মুবাহ, কিন্তু অন্য হারাম কাজের ওছীলা ও মাধ্যম হওয়ার কারণে তা হারাম হয়ে যায়। পক্ষান্তরে উদ্দেশ্য ভাল হলে এগুলোই তখন অনেক নেকীর কাজে পরিণত হয়। (ইংরেজী পড়ি বনা কেন? মূল- হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী, অনুবাদ হযরত মাওঃ শামসুল হক ফরিদপুরী) এরই ভিত্তিতে হযরত থানবী (রহ.) লিখেছেন (উক্ত গ্রন্থের পরিশিষ্ট্য দ্র:) " যদি কেউ ইঞ্জিনিয়ারিং শিখে সততা সহকারে মানব সমাজের সেবার মনোবৃত্তি নিয়ে রাস্তা, পুল, ঘর/বাড়ী তৈরি করে মানুষের উপকার করতে পারে, চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষা করে মানুষের সেবা করতে পারে, তাহলে তা উচ্চদরের নেকীর কাজ ও ছওয়াবের কাজ হবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে যদি ইঞ্জিয়ারিং পড়ে চোরামী ধোঁকাবাজী করে, ব্লাকমার্কেটিং করে, আমানতে খেয়ানত করে, মানুষের বাড়ি-ঘর, পুল, রাস্তা ইত্যাদি নষ্ট করে এবং চিকিৎসাবিজ্ঞান পড়ে গরীব রোগীদের সেবার পরিবর্তে শুধু অর্থগৃধ্নুতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গরীবদের রক্ত শোষণ এবং গরীবদের প্রতি দুর্ব্যবহার করে, নতুন

আবিষ্কারের মেশিন দ্বারা নিরীহ মানুষদের হত্যা করে, অর্থশোষণ করে তাদেরকে কঙ্কালসার করে দেয়, তবে সেটা কুরআন হাদীছের সাধারণ সূত্র অনুসারে হারাম হবে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

অতএব যারা স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করছে তারা যেন তাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য সহীহ (বিশুদ্ধ) করে নেয়। তারা তাদের অধীত বিদ্যা মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করবে-এমন নিয়ত করে নিবে। তাহলে যা কিছুই শিক্ষা করবে তা নেকির আমলে পরিণত হবে।

স্কুল-কলেজ ও শিক্ষক নির্বাচন করার নীতিমালা

শিক্ষক নির্বাচনের বিষয়টি অতিব গুরুত্বপূর্ণ। মূলত শিক্ষকের ছাঁচেই শিক্ষার্থী গড়ে ওঠে। শিক্ষকের যোগ্যতা, তার সততা, তার চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতা এবং তার অন্তর্নিহিত ভাব সুষমা সবকিছুরই একটা মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব পড়ে থাকে শিক্ষার্থীর উপর। প্রখ্যাত তাবিয়ী জগদ্বিখ্যাত আলেমে দ্বীন হযরত ইবনে সিরীন (রহ.) বলেন,

اِنَّ هٰذَا الْعِلْمَ دِيْنٌ، فَانْظُرُوْا عَمَّنْ تَأْخُذُوْنَ دِيْنَكُمْ. (رواه مسلم فى مقدمة صحيحه)

অর্থাৎ, নিশ্চয় এই ইল্‌ম হল দ্বীন। কাজেই কার কাছ থেকে তোমরা দ্বীন (ইল্‌ম) গ্রহণ করছ তা যাচাই করে নাও। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম)

তাই শিক্ষকের মধ্যে বহুবিধ গুণাবলীর সমাবেশ থাকতে হয় এবং সেগুলো লক্ষ করারও বিষয়। যদিও এ বক্তব্যে ইলমে দ্বীনের শিক্ষকের বিষয়ে বলা হয়েছে। তবে জাগতিক বিদ্যা শিক্ষার ক্ষেত্রেও শিক্ষকের বিষয়টা লক্ষ্যণীয়। কারণ শিক্ষার্থীর উপর শিক্ষকের গুণাবলীর মনস্তাত্ত্বিক যে প্রভাব রয়েছে তা সব ধরনের শিক্ষার ক্ষেত্রেই রয়েছে। যে ধরনের বিদ্যাই হোক শিক্ষকের প্রভাব শিক্ষার্থীর ওপর পড়বেই। নাস্তিক গোছের শিক্ষকদের কাছে পড়াশোনা করলে শিক্ষার্থীর মনে নাস্তিকতার বীজ রোপিত হতে পারে। ইসলাম-বিদ্বেষী শিক্ষকদের ছাত্ররা সহজেই ইসলাম-বিদ্বেষের শিকার হয়ে পড়তে পারে। এমনিভাবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিবেশ ও পারিপার্শ্বিকতাও শিক্ষার্থীর মন ও চরিত্রে প্রভাব ফেলে থাকে। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নের কয়েকটা বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখা চাই।

১. যে প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ নাস্তিক গোছের বা ইসলাম বিদ্বেষী সে প্রতিষ্ঠান ও সেই ধরনের শিক্ষক নির্বাচন না করাই হল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষক নির্বাচনের মূল কথা। এ বিষয়টার প্রতি লক্ষ না রেখে শুধু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সুনাম বা মান দেখে নিজের জন্য সে প্রতিষ্ঠান নির্বাচন করলে সেখান থেকে অর্জিত সার্টিফিকেটের মান যাই হোক না কেন দ্বীন ধর্ম বরবাদ হয়ে যেতে পারে। দ্বীন ধর্ম বরবাদ হয়ে যাওয়া মুসলানদের

বিবেচনায় এমন এক অপূরণীয় ও স্থায়ী ক্ষতি যা আর কোনোভাবেই পুষিয়ে নেয়া সম্ভব নয়।

২. যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মকর্ম নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার পরিবেশ বিরাজমান, ভবিষ্যত জীবন ও চরিত্র সম্বন্ধে সচেতন ছাত্রের কর্তব্য সে ধরনের প্রতিষ্ঠান নিজের জন্য নির্বাচন না করা। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া যাই হোক না কেন চরিত্র গঠনের ব্যাপারে অবশ্যই এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ক্ষতিকর। ধর্মকর্ম নিয়ে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য শুনতে শুনতে ও দেখতে দেখতে শিক্ষার্থীর মন নিজের অজান্তেই বিকৃতির শিকার হয়ে পড়তে পারে।

৩. কিছু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানের পরিবেশ নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা ও নোংরামিতে আচ্ছন্ন, কিংবা যেখানের শিক্ষার্থীরা রাজনীতি ও দলাদলীর সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত থাকতে পারে না, মুসলমান ও সচেতন শিক্ষার্থীদের উচিত এ ধরনের প্রতিষ্ঠান বর্জন করা।

৪. যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মকর্মের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের মনোভাব অনুকূল বা অন্তত সহনশীল, যে প্রতিষ্ঠানে নামায পড়ার ব্যবস্থা আছে, যেখানে মেয়েদের পর্দা করতে গেলে কোন বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয় না, মুসলমান শিক্ষার্থীদের নিজেদের জীবন গড়ার জন্য এ ধরনের প্রতিষ্ঠানই নির্বাচন করা উচিত।

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ধর্মকর্ম শিক্ষা প্রসঙ্গে করণীয়

স্কুল-কলেজে সাধারণত ধর্মীয় শিক্ষা থাকে না বললেই চলে। কোথাও নামমাত্র কিছু থাকলেও তা প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত অপ্রতুল। তাই স্কুল-কলেজের ছাত্রদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব পূরণ করার জন্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ব্যবস্থা না থাকলেও নিজেদের উদ্যোগে কিছু কাজ করা উচিত। তাহলে আশা করা যায় তাদের ধর্মীয় জ্ঞানের অভাব কিছুটা হলেও দূর হবে। এ পর্যায়ে তারা নিম্নের কয়েকটি কাজ করবেন।

১. উলামায়ে কেরামের লিখিত দ্বীন সম্পর্কিত বই-পত্র পাঠ করবেন। এ ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাবধান থাকা চাই যেন যাচাই-বাছাই ছাড়াই বাজার থেকে নিজের পছন্দমত বই-পত্র ক্রয় করে তা পাঠ করা না হয়। বরং কোন বিজ্ঞ ও হকপন্থী আলেমের পরামর্শক্রমে বই নির্বাচিত করে শুধু সে বইই পাঠ করবেন।

দ্বীনী জ্ঞানের মধ্যে জরুরি আকীদা-বিশ্বাস, মাসায়েল, ফাযায়েল ও আত্মিক সংশোধন সংক্রান্ত– এই চারটি সম্বন্ধে অবশ্যই জ্ঞান অর্জন করুন। “আহকামে যিন্দেগী” ও “ফাযায়েলে যিন্দেগী” নামক কিতাব দুটি এসব ব্যাপারে জানার জন্য প্রাথমিক পড়ার মধ্যে রাখতে পারেন।

২. ছুটি বা অবসরের সময় কোন হক্কানী আলেমের সাহচর্যে কিছু সময় কাটাবেন। তাঁদের থেকে দুআ চেয়ে নিবেন, তাঁদের থেকে জীবন গড়ার দিকনির্দেশনা ও নসীহত চেয়ে নিবেন।

৩. সময় সুযোগমত হক্কানী উলামায়ে কেরামের বয়ান শুনবেন, তাঁদের কারও তাফসীর মাহফিলে ও হাদীছের দরসে শরীক হবেন।

৪. যেসব সভা সমিতি বা অনুষ্ঠানে প্রকাশ্যে দ্বীনধর্মের বিরুদ্ধে কথা হয় সেসব স্থানে যাওয়ার প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা না থাকলে সেখানে যাওয়া থেকে বিরত থাকবেন। আর প্রাতিষ্ঠানিক বাধ্যবাধকতা থাকলে সেখান গিয়ে সেসব কথায় মনোযোগ না দিয়ে মনে মনে যিকির-আযকার করতে থাকবেন। কোন ধর্মবিরোধী কথা কানে এসে পড়লে "লা হাওলা ওয়া কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ" পড়বেন। মনে সেই কথার প্রভাব যেন না পড়ে সেজন্য আল্লাহর কাছে দুআ করে নিবেন।

৫. যেসব বন্ধু-বান্ধবের সাহচর্য খারাপ পথে নিয়ে যায় তাদের সাহচর্য সযত্নে এড়িয়ে চলবেন। প্রকাশ্যে তাদের বিরুদ্ধে বলে তাদেরকে বিগড়াবেন না। তাহলে তারা জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে। পারলে খুব হেকমতের সাথে তাদেরকে ভাল হওয়ার দিকনির্দেশনা প্রদান করবেন।

৬. আদর্শ বর্জিত সাহিত্য বিষয়ক বইপত্র বা নীতি-নৈতিকতা বিবর্জিত নভেল উপন্যাস পাঠ করা থেকে অবশ্যই বিরত থাকবেন।

ধর্মকর্মের পথে বাধা ও তা থেকে উত্তরণের উপায়

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের মধ্যে যারা ধর্মকর্ম বজায় রেখে চলতে চায়, ধর্মকর্মের পথে এগুতে চায়, তাদের অনেককেই বিশেষ দুটো বাধার সম্মুখীন হতে হয়।

১. অনেকের পিতা-মাতা, গুরুজন, শিক্ষক বা আত্মীয়-স্বজন তাদের ধর্মকর্মের দিকে অগ্রসর হওয়াকে অপছন্দ করে, তাদেরকে ধর্মকর্মে বাধা দেয় বা ধর্মকর্ম বর্জন করার জন্য চাপ সৃষ্টি করে। এক্ষেত্রে প্রকাশ্যে তাদের সঙ্গে বিতর্কে লিপ্ত না হয়ে চুপচাপ নিজের কাজ করে যেতে থাকুন। আর পড়াশোনা অবশ্যই ভালমত চালিয়ে যান। রেজাল্ট ভাল দেখলে তাদের অখুশি ও আপত্তির মাত্রা হ্রাস পাবে। মনে রাখতে হবে অনেক গার্জিয়ানই মনে করে থাকে ধর্মকর্মে অগ্রসর হলে পড়াশোনায় পিছিয়ে যাবে। এরূপ ভেবেই তারা ধর্মকর্মে বাধা দেয়, আপত্তি তোলে। তাই ধর্মকর্মের সাথে সাথে পড়াশোনাও যদি ভাল চালিয়ে যাওয়া হয়, রেজাল্ট ভাল দেখানো যায়, তাহলে সেই গার্জিয়ানদের ধর্মবিরোধী মনোভাব এবং বাধা আপত্তিও হ্রাস পাবে।

যদি কখনও এমন হয় যে, ধর্মকর্ম করার কারণে গার্জিয়ান শারীরিক নির্যাতন করে কিংবা বাসা থেকে বের করে দেয়, কিংবা লেখাপড়ার খরচ দেয়া বন্ধ করে দেয়, তাহলে শিক্ষার্থীর উচিত হবে নির্যাতন করলে কিংবা বাসা থেকে বের করে দিলে নীরবে বের হয়ে যাওয়া। খরচ দেয়া বন্ধ করে দিলে নিজে কিছু উপার্জন করে তা দিয়ে চলবেন। তবুও ধর্মকর্ম ছেড়ে দেয়ার অবকাশ নেই। মনে রাখতে হবে পিতা-মাতার আনুগত্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন ক্ষেত্রে পিতা-মাতার আনুগত্য চলবে না। পাপ হয় এমন কোন হুকুমই মান্য করা যাবে না, তাই সে হুকুম যারই হোক না কেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হাদীছে এসেছে,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللهِ. (رواه أحمد برقم ٢٠٥٣١ في بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة برقم ٣٤٤٠٦)

অর্থাৎ, আল্লাহর নাফরমানী হয় এমন কোনো ক্ষেত্রে মাখলূকের আনুগত্য চলবে না। (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে আবী শাইবা)

২. ধর্মকর্ম করতে গেলে বন্ধু-বান্ধবসহ অনেকেই টিকা-টিপ্পনী কাটে, মোল্লা হুজুর বলে উপহাস করে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে, সেকেলে অন্ধ গোঁড়া ইত্যাদি বুলিবচনে বিভূষিত করে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে ধর্মকর্ম করতে গিয়ে নবী রসূল এবং পূর্বসূরী মনীষীদের অনেককেই এরূপ বিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এখনও এই ধারার লোকদের এরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়। এই টিকা-টিপ্পনী কাটা উপহাসকারীরা অবুঝ, তাই তারা এমনটা করে থাকে। তাদের অবুঝের কারণে তাদের প্রতি করুণা করুন, তাদের বুঝ হয়ে যাওয়ার দুআ করুন। আর তাদের এইসব টিকা-টিপ্পনী ও তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের কারণে আপনার যে কষ্ট হচ্ছে তার জন্য আপনার ছওয়াব হবে এই ভেবে নিজেকে আত্মস্থ করুন।

যারা আপনাকে দেখে টিকা-টিপ্পনী কাটে, তাদেরকে যদি আপনি ভাল পথে দাওয়াত দিতে শুরু করেন তাহলে ভাগ্যে থাকলে তাদের হেদায়েত হবে। আর হেদায়েত ভাগ্যে না থাকলে অন্তত তারা আপনার দাওয়াতের ভয়ে আপনাকে এড়িয়ে চলবে এবং এভাবে তাদের টিকা-টিপ্পনী থেকে আপনি রক্ষা পাবেন।

স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জরুরি দ্বীনী আমলের সংক্ষিপ্ত তালিকা

দ্বীনের ওপর চলতে গেলে অনেক আমল করার রয়েছে। তবে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের পক্ষে সব আমল করা সম্ভবপর হয়ে উঠতে নাও পারে। তাই তাদের জন্য

বিশেষ জরুরি কয়েকটি বিষয় নিম্নে উল্লেখ করা হল। এগুলোর ব্যাপারে কোন ত্রুটি রাখবেন না।

১. প্রথমে ঈমান-আকীদা দোরস্ত করে নিন। এ জন্য এ পুস্তকের একাদশ অধ্যায়টি মনোযোগ সহকারে পড়ে নিন। সম্ভব হলে আহকামে যিন্দেগী কিতাব থেকে আরও বিশদভাবে জেনে নিন।

২. ঈমানের পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত হল নামায। যত্ন সহকারে পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করুন। সুন্দরভাবে নামায আদায় করলে নামাযই আপনাকে অন্য বহু অন্যায় ও পাপ থেকে বিরত রাখবে। কখনও জামাতে নামায পড়তে না পারলে যেকোনো স্থানে হোক পড়ে নিন।

৩. কোন একজন উস্তাদ ধরে তার কাছ থেকে কুরআন শরীফ সহীহভাবে পাঠ করা শিখে নিন। যত্নসহকারে মেহনত করলে মাত্র কয়েক মাসেই সহীহভাবে কুরআন পাঠ শেখা যায়। নামায, তেলাওয়াত, দুআ, যিকির ইত্যাদি সহীহভাবে আদায় করার স্বার্থে সহীহ তেলাওয়াত অবশ্যই শিখতে হবে।

৪. নামায, রোযা, উযু, গোসল ইত্যাদি যাবতীয় ফরয ওয়াজেব বিষয়ের
জরুরি মাসায়েল শিখে নিন এবং সে অনুযায়ী আমল করুন। প্রাথমিক পর্যায়ে "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবটি পাঠ করলে আপনার প্রয়োজনীয় মাসায়েল মোটামুটি জানার জরুরত পুরণ হবে ইনশাআল্লাহ।

৫. নিম্নের ৬টা গোনাহ থেকে অবশ্যই বিরত থাকুন। এই ৬টা গোনাহ বর্জন
করলে অন্যান্য গোনাহ থেকে দূরে থাকা সহজ হয়ে যাবে বরং আশা করা যায় আপনা আপনিই দূর হয়ে যাবে।

১. গীবত। ২. জুলুম। ৩. নিজেকে বড় মনে করা এবং অন্যদের ছোট মনে করা। ৪. ক্রোধ। ৫. বেগানা নারী-পুরুষের সাথে যে কোন ধরনের (অবৈধ) সম্পর্ক রাখা। ৬. হারাম খাওয়া।

৬. নিম্নের ৩টি সুন্নাত যত্নের সঙ্গে পালন করুন। বুযুর্গানে দ্বীন বলেছেন, তাহলে এর বরকতে আরও বহু সুন্নাতের আমল আপনার মধ্যে আসবে ইনশা আল্লাহ।

১. সব ভাল কাজ ডান দিক থেকে শুরু করা। ২. সব ভাল কাজ বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা। ৩. বেশি বেশি সালাম করা।

৭. সম্ভব হলে সকাল সন্ধায় ১০০ বার সুবহানাল্লাহ, ১০০ বার আলহামদু লিল্লাহ, ১০০ বার লাইলাহা ইল্লাল্লাহ, ১০০ বার আল্লাহু আকবার, ১০০ বার আস্তাগফিরুল্লাহাল্লাযী লা ইলাহা ইল্লা হুয়াল হাইয়্যুল কাইয়্যুম ওয়া আতুবু ইলাইহি ও ১০০ বার যেকোনো দুরুদ শরীফ পাঠ করুন। এতে আপনার মধ্যে দ্বীনের উপর চলার এবং আমল করার জযবা অটুট থাকবে, বৃদ্ধি পাবে।

৮. সম্ভব হলে উলামায়ে কেরাম ও বুযুর্গানে দ্বীনেরমত লেবাস-পোশাক গ্রহণ করুন। এই লেবাস বহু অন্যায় থেকে আপনাকে বিরত রাখবে।
৯. ঈমান ও আমলের ব্যাপারে অটল থাকুন।
১০. আল্লাহর কাছে দ্বীনের উপর অটল থাকার জন্য সর্বদা দুআ জারি রাখুন।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দ্বীনের উপর চলার ও অটল থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

তৃতীয় অধ্যায়

যদি যুবক জীবন গড়তে চান

তৃতীয় অধ্যায়

যদি যুবক জীবন গড়তে চান

যুবক-পরিচিতি

সাধারণত ১৬ থেকে ৪০ বৎসর পর্যন্ত বয়সকে যৌবনকাল ধরা হয়ে থাকে। এ বয়সের মানুষ হল যুবক বা যুবতী। তবে শারীরিক সক্ষমতা ও গঠনগত শক্তি-সুঠামতার ভিত্তিতে পঞ্চাশ পার হওয়া সত্ত্বেও কাউকে যুবক আখ্যায়িত করা যেতে পারে। যেমন বোখারী ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে,

أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللّٰهِ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ، قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُوْلُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ. إلخ. (البخاري ٣٩١١ وأحمد ١٣١٣٨)

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার দিকে আসছিলেন। তিনি আবূ বকর (রা.)কে সওয়ারীর পিছনে রেখে চলছিলেন। আবূ বকর ছিলেন বৃদ্ধ, যাকে সকলে চিনত। আর আল্লাহর নবী, তিনি ছিলেন যুবক, যাকে লোকেরা চিনত না। তখন কেউ সম্মুখে পড়লে জিজ্ঞাসা করত, হে আবূ বকর! তোমার সম্মুখস্থ

লোকটি কে? তিনি বলতেন, ইনি আমার পথপ্রদর্শক। (লোকেরা মনে করত বুঝি রাস্তা চেনানোর লোক, অথচ হযরত আবূ বকর [রা.]–এর উদ্দেশ্য ছিল তিনি দ্বীনের পথপ্রদর্শক।)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হিজরতের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল ৫৩, তা সত্ত্বেও হযরত আনাস (রা.) তাঁকে যুবক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আবূ মানসূর ছাআলিবী বলেছেন, ৩০ থেকে ৪০ বৎসর পর্যন্ত বয়স হল যৌবনকাল। (ফিকহুল লুগাহ ওয়া আসরারুল আরাবিয়্যাহ) সম্ভবত তিনি সুঠাম ও পরিণত যৌবনকাল বোঝাতে চেয়েছেন। নইলে ৩০ বৎসরের কম বয়স্ক মানুষকেও রেওয়ায়েতে যুবক আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ نَافِعٍ قال أخبرني عَبْدِ اللّٰهِ (بْنِ عُمَرَ) أَنَّهُ كَانَ يَنَامُ وَهُوَ شَابٌّ أَعْزَبُ لَا أَهْلَ لَهُ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَفِيْ رِوَايَةِ النَّسَاءِيْ: عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. (رواه البخاري برقم ٤٤٠ والنساءي برقم ٧٢٢)

অর্থাৎ, হযরত নাফে' হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ছিলেন অবিবাহিত যুবক, তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন। নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়েতে আছে এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর যুগে। (বোখারী ও নাসায়ী)

উল্লেখ্য, তৃতীয় হিজরীতে সংঘটিত ওহুদ যুদ্ধের সময় হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.)–এর বয়স ছিল ১৪ বৎসর। এ হিসাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের সময় তার বয়স ছিল ২১ বৎসর। অথচ তার সম্বন্ধে বলা হচ্ছে তিনি মসজিদে নববীতে ঘুমাতেন আর তিনি ছিলেন যুবক। তাহলে অবশ্যই এ রেওয়ায়েতে ২১ বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে যুবক আখ্যায়িত করা হয়েছে।

যৌবন: উচ্ছৃঙ্খলতা ও রূঢ় ব্যবহার

যৌবনে শক্তির উম্মাদনায় অনেক যুবক এতখানি উদ্ধত ও অসহিষ্ণু হয়ে হয়ে ওঠে যে, তারা অনেকের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে, কর্কষ ও ঝাঝালো স্বরে কথা বলে। চলাফেরা, উঠা-বসায় উচ্ছৃঙ্খল ভাব দেখা যায়। রাস্তা-ঘাটে মেয়েদেরকে উত্যক্ত

করে। সম্মানী লোকদেরকে টিকা-টিপ্পনী কাটে। ভদ্রতা, বিনয় ও ধীরতার মূল্য তারা অনুভব করে না। বিশেষত গুরুজনদের সঙ্গে তারা রূঢ় ও কর্কষ ব্যবহার করে থাকে। যুবকদের মনে রাখা চাই এখন তারা বখাটে আখ্যায়িত হলে ভবিষ্যত জীবনেও এগুলো স্মরণ করে মানুষ তাদেরকে সম্মান করবে না, বলবে, ও কেমন ছিল তা আমাদের জানা আছে।

যুবকদের রূঢ় ব্যবহারের মানসিকতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ইসলাম যৌবনে গুরুজনদের সঙ্গে সম্মানজনক আচার-ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধ করেছে। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكْرَمَ شابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إِلاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ. (رواه الترمذي برقم ٢٠٢٢ وقال: حديث غريب)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন যুবক কোন বৃদ্ধের সঙ্গে তার বার্ধক্যে সম্মানজনক আচার-ব্যবহার করলে তার এই বয়সেও আল্লাহ তার জন্য এমন লোক নিয়োজিত করবেন যে তার সঙ্গে সম্মানজনক আচার-ব্যবহার করবে। (তিরমিযী)

যুবকদের মনে রাখতে হবে অযথা আস্ফালন তাদেরকে বড় করবে না, অন্যকে হীন ও ছোট প্রতিপন্ন করে তারা বড় হতে পারবে না। বরং বড় হওয়ার জন্য ছোট হতে হয়। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ. (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب - باب استحباب العفو والتواضع)

অর্থাৎ, কেউ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে তাওয়াযূ অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উঁচু করে দেন। (মুসলিম)

তাকাব্বুর তথা বড়ায়ী ও অহংকারের কারণে মর্যাদার পতন ঘটে। যেমন– শয়তান তাকাব্বুরের কারণে মহান আল্লাহর দরবার থেকে মারদূদ বা বিতাড়িত হয়েছিল। এর বিপরীত তাওয়াযু'-র ফলে আল্লাহ্‌র দরবারে মর্যাদা বৃদ্ধি পায়।

যারা অন্যের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করে তাদেরকে নিম্নোক্ত হাদীছ স্মরনে রাখতে হবে।

عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهَبٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَلْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ. قَالَ: اَلْجَوَّاظُ: اَلْغَلِيْظُ اَلْفَظُّ. (رواه أبو داود في كتاب الأدب - باب في حسن الخلق ٤٧٩٣)

অর্থাৎ, হযরত হারেছা ইব্‌নে ওয়াহাব (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কঠোর চিত্ত ও রূঢ় ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না। (আবূ দাঊদ)

যৌবন ও সম্পদের অপব্যয়

কিছু যুবক এমন আছে যারা তেমন ধনীর সন্তান নয়, তাদের পিতা-মাতা হয়তো খুব কষ্টে সংসার চালান। কিন্তু ঐ যুবকরা দায়িত্ব- জ্ঞান-হীনের মত অবলীলায় টাকা-পয়সা খরচ করে বেড়ায়। টাকা-পয়সার জন্য তারা পিতা-মাতাকে অবাঞ্ছিত চাপ দিয়ে পেরেশান করে। পিতা-মাতা মনের কষ্ট বুকে চাপা দিয়ে ঐ সন্তানদের দাবীমত টাকা-পয়সার জোগান দেন আর ঐ দায়িত্বজ্ঞানহীন সন্তানেরা বড়লোকী চালে সেই টাকা-পয়সা উড়ায়, ফূর্তি করে। কিছু যুবক এমন আছে যারা লেখা-পড়াও করে না আবার কোন আয়-উপার্জনের কাজেও লাগে না, খাওয়ার সময় খেতে আসে, বাকি সময় বন্ধু-বান্ধব নিয়ে আড্ডা দিয়ে বেড়ায়, কিংবা ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়ায়।

এ প্রসঙ্গে যুবকদের কয়েকটা কথা মনে রাখা উচিত:−

(এক) সন্তান বালেগ হওয়ার পর তার ভরণ-পোষণ দেয়া পিতা-মাতার আইনী দায়িত্ব নয়, এ ব্যাপারে পিতা-মাতা যতটুকু করেন, যা ভরণ-পোষণ বা টাকা-পয়সা দেন সবটুকুই তাদের অনুগ্রহ। অতএব টাকা-পয়সার ব্যাপারে পিতা-মাতাকে কোনরূপ চাপ দেয়া তাদের জন্য বৈধ নয়। পিতা-মাতা তাদেরকে যতটুকু যা দেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকা চাই, তাতেই পিতা-মাতার শোকর আদায় করা চাই। যে ব্যক্তি বান্দার শোকর আদায় করল না, সে আল্লাহরও শোকর আদায় করল না। হে যুবক, অকৃতজ্ঞ বান্দা হয়ো না।

(দুই) সন্তান তার পিতা-মাতার সঙ্গে যেমন আচরণ করবে, ঐ সন্তানও একদিন পিতা-মাতা হবে, তখন তাদের সন্তানও তাদের সঙ্গে অনুরূপ আচরণ

করবে। অতএব যুবকদের উচিত নিজেদের ভবিষ্যতের কথা স্মরণ রেখে সাবধানে পিতা-মাতার সঙ্গে আচরণ করা। যেন নিজেদের আচরণের জন্য নিজেদেরই ভবিষ্যতে অশান্তির মধ্যে পড়তে না হয়। হে যুবক! সময় থাকতে বুঝার চেষ্টা কর।

(তিন) যৌবনে অপব্যয়ের অভ্যাস গড়ে তুললে ভবিষ্যতে যখন নিজেরা নিজেদের দায়িত্বে চলা শুরু করবে, তখন এই অভ্যাস ছাড়া কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তখন পুরাতন অভ্যাস অনুযায়ী চলার মত নিজেদের উপার্জন গড়ে না উঠলে সেই ভোগান্তি পিতা-মাতা নয় বরং তোমাদের নিজেদেরকেই ভুগতে হবে। আর যদি ভবিষ্যতে সচ্ছল হতেও পার, তবুও অপব্যয়ের অভ্যাস গোনাহের অভ্যাস, গোনাহ থেকে বেঁচে থাকো, তোমাদের জীবন সুন্দর হবে।

যৌবন ও যৌনশক্তির অপব্যয়

যৌবনকালে যুবকদের শিরায় শিরায় রক্তের উত্তেজনা এবং সেই উত্তেজনাপ্রসূত পাপপ্রবৃত্তি জাগ্রত হয়। এই প্রবৃত্তি তাকে যেনা-ব্যাভিচার ও অবৈধ যৌনমৈথুনের দিকে ধাবিত করে। যুবকদের এই সময়টা নিয়ন্ত্রণের সময়। এসময় একটু নিয়ন্ত্রণহারা হলেই যুবকরা পাপ-পঙ্কিলতার গহ্বরে পতিত হবে। যুবকদের মনে রাখতে হবে তাদের যৌবনশক্তি আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত এক মহা নেয়ামত। এই নেয়ামতের অপব্যবহার না করা চাই। অন্যান্য নেয়ামতের ন্যায় এই নেয়ামতকেও অ-জায়গায় ব্যবহার না করা চাই। অ-জায়গায় ব্যবহার করলে জায়গামত এসে ঘাটতি দেখা দিবে। তখন অনুতপ্ত হয়েও কোনো লাভ হবে না। অনেক যুবককে দেখা যায় অ-জায়গায় তার যৌনশক্তি ব্যবহার করার ফলে বৈবাহিক জীবনে এসে স্ত্রীর কাছে লজ্জিত হয়। তখন ডাক্তার হেকীমদের কাছে চিকিৎসার জন্য দৌড়ায়, হুজুরদের কাছে তাবীজের জন্য দৌড়ায়, কিন্তু নষ্ট হয়ে যাওয়া যৌনশক্তি আর ফিরে আসে না। তখন স্ত্রীর কাছে সারাজীবন ছোট হয়ে থাকার গ্লানী সহ্য করে নিরবে কাঁদা ছাড়া আর কোনো পথ থাকে না। এহেন পরিস্থিতিতে অনেককে আত্মহত্যার পথও বেছে নিতে দেখা যায়। তাই যৌবনের তাড়নায় বে-সামাল হওয়া থেকে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করা চাই। যৌনসুড়সুড়ি জাগ্রত হয় এমন নভেল-নাটক পড়া থেকে বিরত থাকা চাই। যৌনসুড়সুড়ি জাগ্রত হয় এমন চিত্র বা ছায়াছবি ভিডিও দেখা থেকে বিরত থাকা চাই। যৌন সুড়সুড়িমূলক কথাবার্তা হয় এমন পরিবেশও বর্জন করা চাই। যুবক সমাজকে বলি, তোমাদের যৌনশক্তিকে অক্ষুণ্ন রাখ, তাহলে বৈবাহিক জীবনে অনাবিল শান্তি উপভোগ করতে পারবে। সাময়িক উম্মাদনায় ভবিষ্যতের দীর্ঘ জীবনকে অশান্তি বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিও না। সাময়িক কলুষময় প্রাপ্তির চিন্তায় ভবিষ্যতের অনাবিল প্রাপ্তিকে ধ্বংস করো না। এখন যদি একথাগুলো বুঝতে চেষ্টা না

কর, নিজেদেরকে যৌনপাপে অবলীলায় ছেড়ে দাও, যৌবনের জোয়ারে গড্ডলিকা প্রবাহের মত ভেসে যাও, তাহলে একটা সময় আসবে যখন বুঝবে, কিন্তু সেই বুঝায় কোনো লাভ হবে না। তখন আত্মগ্লানি, রোদন, দীর্ঘ নিঃশ্বাস ও আফসুস ছাড়া আর কোনো বিকল্প থাকবে না। সাবধান হে যুবক! নিজের ভবিষ্যতকে কণ্টকময় করো না, নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরো না।

যৌনশক্তির অপব্যয় শরীয়তে নিষিদ্ধ। যেনার মাধ্যমে যৌনশক্তির অপব্যয় হয়। যেনা শরীয়তে নিষিদ্ধ। হস্তমৈথুনের মাধ্যমে যৌনশক্তির অপব্যয় হয়। হস্তমৈথুন শরীয়তে নিষিদ্ধ। কোনভাবেই যৌনশক্তিকে নষ্ট করা বা যৌনশক্তির অপব্যয়ের অনুমতি নেই।

রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত জাবের (রা.) বয়ান করেন,

جَاءَ شَابٌّ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَتَأْذَنُ لِيْ فِي الْخِصَاءِ؟ فَقَالَ: صُمْ وَسَلِ اللّٰهَ مِنْ فَضْلِهِ. (قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه أحمد عن رجل عن جابر وبقية رجاله ثقات.)

অর্থাৎ, এক যুবক এসে বলল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে খাসি হওয়ার অনুমতি দিবেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, না। তুমি রোযা রাখ এবং আল্লাহর কাছে তার অনুগ্রহ (স্বচ্ছলতা) চাও।

নাসায়ী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.)ও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আবেদন করেছিলেন যে, ইয়া রসূলাল্লাহ আমি যুবক মানুষ, বিবাহ করার মত স্বচ্ছলতা নেই, আমি পাপে পড়ে যাওয়ার আশংকা করছি, আমাকে খাসি হওয়ার অনুমতি দিন। তাকেও রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনুমতি দেননি।

এ সব রেওয়ায়েত থেকে বুঝা যায় যৌনশক্তি নষ্ট করার অনুমতি নেই। অতএব সমূলে নষ্ট করার যেমন অনুমতি নেই, ক্ষয় করা বা অপব্যয় করারও অনুমতি নেই।

যৌবন ও প্রেম

যৌবন উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে যুবকদের শিরায় শিরায় রক্তে এক ধরনের উত্তেজনা চলতে থাকে, তাদের রক্তের কণায় কণায় এক ধরনের ঝড় বইতে শুরু করে। এই উত্তেজনা ও ঝড় তাদেরকে পাপের পথে ঠেলে নিয়ে যেতে চায়। তখন

যুবতী নারী যুবকের সঙ্গ পেতে চায়, যুবক পুরুষ যুবতীর সঙ্গ পেতে চায়। আরও আগে বেড়ে তারা একে অপরের সঙ্গে দৈহিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে চায়। এভাবে যৌবনের তাড়নাকে নিবৃত্ত করতে চায়। আর এই তাড়না নিবৃত্ত করার পথ সুগম করতে যুবক যুবতীর সঙ্গে আর যুবতী যুবকের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ার যে পদক্ষেপ নেয়, সেটাকেই সাধারণত বলা হয় প্রেম। যদিও প্রেম কথাটির পবিত্র অর্থও রয়েছে। আল্লাহর সঙ্গে বান্দার প্রেম, নবীর সঙ্গে উম্মতীর প্রেম- এসব প্রেম তো নিঃসন্দেহে পবিত্র অর্থের প্রেম। কিন্তু যুবক যুবতীর প্রেম কি পবিত্রতার সীমানায় থেকে চর্চিত হয়? শরীয়তের সীমানায় থেকে চর্চিত হয়? নিশ্চয় এ প্রশ্নের উত্তর হবে নেতিবাচ্যতায়। যার সঙ্গে বিবাহ হতে পারে- এমন নারী বা পুরুষের সঙ্গে তো পর্দাহীনভাবে দেখা-সাক্ষাত হওয়াই জায়েয নয়, যৌনসুড়সুড়িমূলক কথা-বার্তাও জায়েয নয়, তাহলে কীভাবে শরীয়তের সীমানার মধ্যে থেকে প্রচলিত প্রেম চর্চিত হবে। প্রেম শব্দের আভিধানিক অর্থে পবিত্রতার যত দিকই থাকুক না কেন, বাস্তবে যুবক যুবতীর প্রেমের সিংহভাগই পবিত্রতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে পাপ পয়মালীর পথে নিক্ষিপ্ত হয়। তাই এহেন প্রেম পবিত্র নয়, এটা সর্বনাশা যৌনতাড়নার মহড়া। যুবক যুবতীদেরকে বলি সাময়িক আবেগ চরিতার্থ করতে গিয়ে নিজেদের ভবিষ্যত নষ্ট করার পথে পা বাড়িও না। সাময়িক লাভের নেশায় ভবিষ্যতের দীর্ঘ জীবনকে গ্লানিময় করার পথে অগ্রসর হয়ো না। আল্লাহর ভয়, আল্লাহর আযাবের ভয় মনে জাগ্রত রাখ। তাহলে প্রেমের পাপ-পঙ্কিল দাবীকে উপেক্ষা করতে সক্ষম হবে। আল্লাহর ভয়ে প্রেমের পাপ-পঙ্কিল দাবীকে উপেক্ষা করার যে ফযীলত রয়েছে তা স্মরণে রাখ, তাহলে প্রেমের পাপ-পঙ্কিল দাবীকে উপেক্ষা করতে মন উদ্বুদ্ধ হবে।

আল্লাহর ভয়ে প্রেমের পাপ-পঙ্কিল দাবীকে উপেক্ষা করে গোনাহ থেকে বিরত থাকার অনেক ফযীলত। যারা এরূপ করতে পারবে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাদের তাঁর ছায়া দান করবেন। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেদিন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তার মধ্যে এক শ্রেণী হল–

وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ: إِنِّي أَخَافُ اللّٰهَ. (متفق عليه. رواه البخاري في باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ٦٦٠. ورواه مسلم في كتاب الزكاة – باب فضل إخفاء الصدقة ١٠٣١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তিকে কোনো বংশীয় সুন্দরী নারী কু-কর্মের দিকে আহবান জানায় আর সে বলে আমি আল্লাহকে ভয় করি। (বোখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য, অবশিষ্ট ছয় শ্রেণী হল (১) ইনসাফগার শাসক, (২) যে যুবক তার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়, (৩) যে ব্যক্তির অন্তর মসজিদের সঙ্গে লাগানো থাকে, (৪) যে দুই ব্যক্তি আল্লাহর জন্য একে অপরকে ভালবাসে– এরই ভিত্তিতে তারা একত্র হয় আবার এরই ভিত্তিতে তারা পৃথক হয়ে যায়। (৫) যে ব্যক্তি এমন গোপনে দান করে যে, তার বাম হাত জানতে পারে না তার ডান হাত কী ব্যয় করে। (৬) আর সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহর যিকির করে আর তার চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে থাকে।

আল্লাহর ভয়ে প্রেমের পাপসর্বস্ব দাবীকে উপেক্ষা করতে গিয়ে যদি কারও মৃত্যু হয়ে যায় সে মৃত্যু বড় বরকতময় মুত্যু। হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

مَنْ عَشَقَ وَكَتَمَ وَعَفَّ وَصَبَرَغَفَرَ اللّٰهُ لَهُ وَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ. (رواه ابن عساكر عن ابن عباس كذا في جامع الأحاديث للسيوطي ٢٢٩٥٢)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি কারও প্রেমাসক্ত হয়, আর সে তা গোপন রাখে, পবিত্র থাকে এবং ধৈর্যধারণ করে, আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করান। (ইবনে আসাকির)

হযরত হাসান (রহ.) বয়ান করেছেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে এক যুবক সারাক্ষণ ইবাদতে লিপ্ত থাকত। সে মসজিদেই পড়ে থাকত। এক মেয়ে তার প্রতি আসক্ত হল। মেয়েটি গোপনে তার সঙ্গে সাক্ষাত করে কথাবার্তা বলল। যুবকটি এ বিষয় নিয়ে মনের সঙ্গে একটু বোঝাপড়া করার পর এক চিৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। তার এক চাচা এসে তাকে ঘরে তুলে নিয়ে গেল। হুঁশ ফিরে আসার পর সে তার চাচাকে বলল, আপনি (খলীফা) ওমরের কাছে গিয়ে আমার পক্ষ থেকে সালাম জানান এবং তাকে জিজ্ঞাসা করুন যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের সামনে দাঁড়ানোর ভয় পায়, তার পুরস্কার কী? কথামত তার চাচা হযরত ওমর (রা.)–এর কাছে গিয়ে তাঁকে সব বৃত্তান্ত শোনাল। ইতিমধ্যে যুবকটি আর একটা চিৎকার দিয়ে মৃত্যুবরণ করল। হযরত ওমর (রা.) মৃত যুবকটির কাছে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর বললেন,

لَكَ جَنَّتَانِ لَكَ جَنَّتَانِ. (رواه البيهقي في شعب الايمان ٤٦٨/١ برقم ٨٣٦.

كذا في جامع الأحاديث للسيوطي برقم ٣٠٧٢٩)

অর্থাৎ, তোমার জন্য দুই জান্নাত, তোমার জন্য দুই জান্নাত। (শুআবুল ঈমান)

যৌবন ও পিতা-মাতার অজান্তে বিবাহ

অনেক যুবক যুবতী প্রেমে পড়ে অবশেষে পিতা-মাতা রাজী হবেন না বুঝতে পেরে পিতা-মাতার অজান্তেই বিবাহ সেরে নেয়। যদিও বালেগ সন্তান পিতা-মাতার অজান্তে বিবাহ করলে যদি বিবাহের নিয়ম-কানুন (শর্ত-রুকন) রক্ষা করে বিবাহ সম্পাদিত হয়, তাহলে সে বিবাহ জায়েয হয়ে যায়, কিন্তু তা ভাল নয়। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি কথা মনে রাখা চাই।

(এক) পিতা-মাতার অজান্তে বিবাহ করলে পিতা-মাতা তাতে কষ্ট পাবেন। পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া পাপ। আর যে কাজে পাপ জড়িত থাকে সে কাজে বরকত হয় না। অতএব পিতা-মাতার অজান্তে বিবাহ করলে সেই বিবাহে বরকত হবে না। সেই বিবাহের ফলে যে দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠবে তাতে বরকত হবে না। অভিজ্ঞতায়ও দেখা গেছে এরূপ বিবাহে শান্তি হয় না।

(দুই) যুবক যুবতী যখন প্রেমে পড়ে, তখন তারা একরকম পাগল হয়ে যায়, তাদের হীতাহীত জ্ঞান লোপ পায়। তখন জীবনের সব সাইড ভাল করে বুঝার মত মানসিক পরিস্থিতি থাকে না। তাই প্রেমজনিত বিবাহে প্রেমিক প্রেমিকার দুই পরিবারের এমন বহুদিক বিবেচনার বাইরে থেকে যায় যা বিবাহের ক্ষেত্রে বিবেচনায় আনা অপরিহার্য। এসব বিষয় বিবেচনা ছাড়াই প্রেমজনিত বিবাহ সংঘটিত হয়ে যাওয়ার ফলে পরবর্তীতে তাদের দাম্পত্য জীবনে বহু সমস্যার সৃষ্টি হয়। যে জন্য পরবর্তীতে মনের গ্লানিতে দগ্ধ হওয়া আর আক্ষেপ করা ছাড়া কোন পথ থাকে না। এমনকি এসব সমস্যার কারণে এ জাতীয় বিবাহের অনেকটা ভেঙ্গেও যায়। ফলে ঐ যুবক যুবতীর জীবনে একটা কলঙ্ক, একটা মানসিক অশান্তি স্থায়ী হয়ে থাকে। এরূপ মানসিক অশান্তির ফলে অনেক যুবক যুবতী আত্মহত্যার পথ পর্যন্ত বেছে নেয়।

(তিন) পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজন বৈবাহিক জীবনের যে অভিজ্ঞতা রাখেন, প্রেমে পড়া যুবক যুবতী অবশ্যই সে অভিজ্ঞতা এখনও অর্জন করে পারেনি। পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজন জীবনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করার পর, বহু ঘাটের পানি যাচাই-বাছাই করার পর কোথায় বিবাহ করা সমীচীন কোথায় সমীচীন নয় তা

যতখানি বুঝতে সক্ষম, প্রেমে পড়া অভিজ্ঞতাহীন যুবক যুবতী অবশ্যই তা বুঝতে সক্ষম নয়। তাই বিবাহের ক্ষেত্রে গুরুজনকে বাদ দিয়ে নিজেরা সিদ্ধান্ত নিলে যে ক্ষতি হয়ে যেতে পারে তা থেকে বাঁচার জন্য পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজনের পরামর্শ অনুসারেই বিবাহ করা বা বিবাহ বসা উচিত।

(চার) পিতা-মাতা বা গুরুজনদের অজান্তে বা তাদের সম্মতি ব্যতীত বিবাহ করা এক ধরনের অবাধ্যতা। এরূপ অবাধ্যতা করার ফলে এবং প্রেমের কাছে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে জীবনে যে কলঙ্কের ছাপ লেগে যায়, এ কলঙ্ক কোনদিন মুছে যায় না। সারা জীবন এজন্য তাদেরকে লজ্জায় থাকতে হয়, অনুশোচনা করতে হয়, আত্মগ্লানীতে ভুগতে হয়। এমনকি এ কলঙ্ক তাদের সন্তানাদির গায়েও লেগে যায়। ভবিষ্যতে তাদের সন্তানাদিকেও মানুষ এজন্য কুনজরে দেখে। আরও কষ্টের হয় যখন ভবিষ্যতে সন্তানাদিকে বিবাহ দিতে গেলে মানুষ ঐ পুরাতন কথা স্মরণ করে ফিরে যায় যে, এদের মা-বাপের ইতিহাস ভাল নয়। এভাবে সমাজ তাদেরকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে। এমনকি তাদের সন্তানাদিও এক সময় তাদের পিতা-মাতার কাণ্ড সম্বন্ধে জেনে পিতা-মাতাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখে থাকে। সন্তান পিতা-মাতাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখবে, সন্তানের কাছে হেয় হয়ে থাকতে হবে, এর চেয়ে আর মানসিক কষ্টের কী থাকতে পারে। অতএব হে যুবক-যুবতীগণ! হীতাহীত- জ্ঞান-শূন্য হয়ে পিতা-মাতার অজান্তে বিবাহ করার মত মহা ভুল করে বসো না। এরূপ ভুল করে বসলে সারা জীবন তার খেসারত দিতে হবে।

যৌবন ও পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজনের অবাধ্যতা

শুধু বিবাহের ক্ষেত্রে নয় যৌবনকালে অনেক যুবক-যুবতী অনেক ক্ষেত্রেই পিতা-মাতা প্রমুখ গরুজনের অবাধ্যাচারণ করে থাকে। তারা পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজনের চেয়ে নিজেদেরকে বেশি বুদ্ধিমান বা বুদ্ধিমতী মনে করতে থাকে। একটু লেখাপড়া শিখেই পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজনকে মূর্খ অবুঝ মনে করতে থাকে। তাদের আদেশ-নির্দেশ, তাদের বুদ্ধি-পরামর্শ কোনকিছুকেই তারা মূল্য দিতে চায় না। তারাই যেন বেশি বোঝে, তাদের বিবেক-বুদ্ধি যেন বেশি এমন এক ভাব নিয়ে তারা চলে। কথায় কথায় দপ করে জ্বলেও ওঠে। কথায় কথায় গুরুজনদের তাচ্ছিল্যও করে। অথচ তাদের চিন্তা করে দেখা উচিত তাদের পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজন কিন্তু তাদের এই বয়স পার হয়ে এসেছেন। এখন তারা কী ভাবছে তা-ও তাদের পিতা-মাতা প্রমুখ গুরুজন বোঝেন। তারা কীভাবে বিভ্রান্তির দিকে ধাবিত হওয়ার উপক্রম তা-ও গুরুজন বোঝেন। কিন্তু যুবক যুবতী এতই বিমূঢ় যে, তারা গুরুজনদের উপলব্ধির বিষয়ে কিছুই বুঝতে সক্ষম হয় না। বরং উল্টোটা বুঝতেই তারা পারঙ্গম।

যৌবন ও খেলাধুলা

আজকাল খেলাধুলার প্রতি সমাজের এত ঝোক, খেলাধুলা নিয়ে আজকের বিশ্ব এতটা মেতে উঠেছে, খেলাধুলাকে এত উৎসাহিত করা হচ্ছে যে, এখন খেলাধুলার বিরুদ্ধে বলতে গেলে যেন সমাজে অপয়া হয়ে যেতে হয়। অথচ এই দুই হাজার সালের আগ পর্যন্তও খেলাধুলাকে একটা বাজে কাজ মনে করা হত। লেখাপড়া ছেড়ে খেলাধুলায় মেতে উঠলে গুরুজনরা মনে করত তাদের ছেলেরা উচ্ছন্নে যাচ্ছে। অথচ এখন অনেক গার্জিয়ানই মনে করছে তাদের ছেলেরা খেলাধুলায় পারদর্শী হতে পারলেই যেন অনেক কিছু। এটা যে সমাজের একরকম মানসিক বিকৃতি, এই বিকৃতির ঘোর কেটে যাওয়ার পর নিশ্চয় তা একদিন স্বীকৃতি পাবে। নিশ্চয় একদিন খেলাধুলা নিয়ে বর্তমান বিশ্বের এই মাতামাতিকে মতিবিভ্রম বলে আখ্যায়িত করা হবে।

স্বাস্থ্য চর্চার জন্য সামান্য খেলাধুলা ভিন্ন কথা, কিন্তু খেলাধুলাকে আজ যেভাবে পেশা, নেশা, আনন্দ, উচ্ছাস ও মাতামাতির বিষয়ে পরিণত করা হয়েছে, যেভাবে এটাকে জাতীয় সুনাম-সুখ্যাতির উপাত্ত বানিয়ে নেয়া হয়েছে, তা কোনক্রমেই ইসলামে স্বীকৃত নয়।

খেলাধুলা সম্পর্কে "আহকামে যিন্দেগী" গ্রন্থ থেকে ইসলামের দৃষ্টিভংগী তুলে ধরা হল– "যে খেলা শারীরিক ব্যায়াম তথা স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য অথবা কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে অথবা কমপক্ষে মানসিক অবসাদ দূর করার লক্ষ্যে হয়, সে খেলা শরীয়ত অনুমোদন করে, যদি তাতে বাড়াবাড়ি করা না হয়, শরীয়তের কোন হুকুম লংঘন করা না হয় এবং তাতে ব্যস্ত থাকার কারণে প্রয়োজনীয় কাজ-কর্ম বিঘ্নিত না হয়। পক্ষান্তরে যে খেলায় কোন ধর্মীয় বা পার্থিব উপকারিতা নেই, কিংবা যে খেলায় শরীয়তের বিধান লংঘন হয় যেমন সতর খোলা হয়, বা যাতে মত্ত হয়ে নামায রোযা ইত্যাদি ফরয কর্ম বিঘ্নিত হয় অথবা জুয়ার ভিত্তিতে হার জিতে যে সকল প্রকার খেলা হয়ে থাকে সেগুলো শরীয়তে নিষিদ্ধ-কতক তো পরিষ্কার হারাম।"

অতএব এখন চিন্তা করে দেখুন বর্তমান বিশ্বে যেখানে খেলাধুলা নিয়ে এত মাতামাতি, যেখানে খেলাধুলায় শরী'আতের বিধান লংঘন হচ্ছে, যেখানে খেলাধুলায় মত্ত হওয়ার কারণে নামায রোযা ইত্যাদি ফরয কর্মসহ জাগতিক প্রয়োজনীয় কাজকর্মের বিঘ্ন ঘটছে, সেই খেলাধুলার শরীয়তে অনুমতি আছে কি না।

খেলাধুলা করার ও দেখার বদ অভ্যাসে যারা অভ্যস্ত তাদের এই বদ অভ্যাস পরিত্যাগের জন্য নিম্নোক্ত পন্থাসমূহ গ্রহণ করতে হবে-

১. মনে চাইলেও ইচ্ছাকৃত তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২. খেলাধুলার আলোচনা করা ও আলোচনা শোনা থেকে বিরত থাকতে হবে।
৩. খেলাধুলার উপকরণ ও পরিবেশ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিছুদিন এরূপ করলে মন থেকে খেলাধুলার আকর্ষণ হ্রাস পেতে থাকবে।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ لَيَعْجَبُ مِنَ الشَّابِّ لَيْسَ لَهٗ صَبْوَةٌ. (السنة لابن أبن عاصم ٥٨٣ واسناده ضعيف لابن لهيعة)

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক ঐ যুবকের প্রতি বিস্মিত হন যে যুবকের ক্রিড়াকৌতুক, অজ্ঞতাসূলভ কাজ ও তারুণ্যসূলভ কাজের প্রবণতা থাকে না। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

এখানে আল্লাহ যুবকের প্রতি বিস্মিত হন দ্বারা বোঝানো হয়েছে আল্লাহ তার প্রতি খুশী হন, তাকে ভালবাসেন, আল্লাহর নিকট তার মর্যাদা অনেক বড়।

যৌবন ও জ্ঞানার্জন

যৌবন মূলত জ্ঞানার্জনের সময়। ইমাম বায়হাকী রচিত আল-মাদখাল নামক কিতাবে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ فِيْ شَبِيْبَتِهٖ اِخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهٖ وَدَمِهٖ. (البيهقي في المدخل كذا في المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, যৌবনে যে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার রক্ত মাংসে মিশে যায়। (আল-মাদখাল)

আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَهُوَ شَابٌّ كَانَ كَوَشْمٍ فِيْ حَجَرٍ، وَمَنْ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ بَعْدَ مَا يَدْخُلُ فِي السِّنِّ كَانَ كَالْكَاتِبِ عَلٰى ظَهْرِ الْمَاءِ. (جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি যুবক বয়সে ইলম শিক্ষা করে সেটা পাথরের উপর অঙ্কনের ন্যায় হয়ে থাকে। আর বয়স হয়ে যাওয়ার পর যে ইলম শিক্ষা করে সে হল ঐ ব্যক্তির মত যে পানির উপর লেখে। (জামিউ বয়ানিল ইলমি ওয়া ফাযলিহী)

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِيْ شَبِيْبَتِهِ اِخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فِيْ كِبَرِهِ فَهُوَ يَتَفَلَّتُ مِنْهُ فَلاَ يَتْرُكُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. (السنن الصغرى لأحمد البيهقي برقم ٩٦٥)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যৌবনে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার রক্ত মাংসে মিশে যায়। আর যে ব্যক্তি বার্ধক্যে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার থেকে ছুটেও যায় কিন্তু সে তাকে ছাড়ে না, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব। (আস-সুনানুস সুগ্‌রা)

হযরত আলক্বামা (রহ.) বলেছেন,

مَا حَفِظْتُ وَأَنَا شَابٌّ كَأَنِّيْ أَنْظُرُ إِلَيْهِ فِيْ قِرْطَاسٍ أَوْ وَرَقَةٍ. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)

অর্থাৎ, যুবক বয়সে আমি যা মুখস্থ করি তার অবস্থা এমন যেন আমি তা কাগজে বা পত্রে লেখা অবস্থায় চোখে দেখছি। (আল-জামি’ লিআখলাকির রাবী ওয়াস সামি’)

হযরত উমর (রা.) বলেছেন,

تَفَقَّهُوْا قَبْلَ أَنْ تُسَوَّدُوْا. (رواه البخاري تعليقا في باب الاغتباط في العلم والحكمة)

অর্থাৎ, তোমরা নেতৃত্ব অর্পিত হওয়ার পূর্বেই শিক্ষা গ্রহণ কর। (বোখারী)

হযরত ওমর (রা.)-এর এ উক্তিটি ঐসব যুবকদের বিশেষভাবে লক্ষ করা উচিত যারা যৌবনে লেখাপড়ার প্রতি মনোযোগ না দিয়ে সময়টা কাটায় বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃত্বের পেছনে। অথচ এখন নেতৃত্বের সময় নয় এখন সময় লেখাপড়ার। এখন লেখাপড়া, তারপর আসবে নেতৃত্ব প্রদানের পর্ব।

এক সময় কুফায় গড়ে উঠেছিল জগদ্বিখ্যাত উলামায়ে কেরামের জামাত। এর পেছনে ছিল তখনকার যুব সমাজের ইলমের দিকে অগ্রসর হওয়া। হযরত ইবনে সীরীন (রহ.) বলেছেন,

أَدْرَكْتُ بِالْكُوْفَةِ أَرْبَعَةَ آلَافِ شَابٍّ يَطْلُبُوْنَ الْعِلْمَ. (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)

অর্থাৎ, আমি কুফা নগরীতে এক হাজার যুবক পেয়েছি যারা ইলম সন্ধানে তৎপর ছিল। (আল-জামি' লিআখলাকির রাবী ওয়া আদাবিস সামি')

খতীবে বাগদাদী "আল-ফকীহ ওয়াল মুতাফাক্কিহ" কিতাবে সনদ সহকারে উল্লেখ করেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন, আল্লাহ প্রত্যেক নবীকে যুবক অবস্থায়ই নবী বানিয়েছেন। আর যুবক অবস্থায় আলেমকে যে ইলম দেয়া হয়েছে, তার চেয়ে আর উত্তম নেই। (কীমাতুয যামানি ইনদাল উলামা)

হযরত লুকমান হাকীম তার পুত্রকে বলেছিলেন,

يَا بُنَيَّ! اِبْتَغِ الْعِلْمَ صَغِيْرًا، فَإِنَّ اِبْتِغَاءَ الْعِلْمِ يَشُقُّ عَلَى الْكَبِيْرِ.

অর্থাৎ, বৎস! বয়স কম থাকতেই ইলম সন্ধান করে নাও, বৃদ্ধদের পক্ষে ইলম সন্ধান করা কঠিন। (প্রাগুক্ত)

যৌবন ও আন্দোলন সংগঠনে জড়িত হওয়া

অনেক যুবক নেতৃত্বের লোভে লেখাপড়ার প্রতি প্রয়োজনীয় মনোযোগ না দিয়ে সাংগঠনিক ক্রিয়াকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। পূর্বেই বলা হয়েছে যৌবনের সময় নেতৃত্বের সময় নয়, লেখাপড়ার সময়। এখন লেখাপড়া ও নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জনের সময়, তার পর আসবে নেতৃত্ব প্রদানের পর্ব। যারা গুরুজন তাদেরও উচিত যুবকদের তারুণ্যকে ভারসাম্যের সঙ্গে ব্যবহার করা, যুবকদের তারুণ্য ও শক্তিমত্তাকে শুধু উচ্ছলতার কাজেই ব্যবহার না করা। বরং যুবকদের জন্য যেটা বেশি প্রয়োজন সে কাজেই তাদেরকে নিয়োজিত রাখা। অতএব সাংগঠনিক কাজের চেয়ে যখন লেখাপড়ার কাজ যুব সমাজের জন্য বেশি জরুরি বলে বিবেচিত, তাহলে লেখাপেড়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে তাদেরকে সাংগঠনিক কাজের জন্য প্ররোচিত করা সংগত নয়। এক হাদীছে এ দিকে ইংগিত পাওয়া যায়। আল-মাতালিবুল আলিয়া কিতাবে রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ক্ষুদ্র জেহাদে সৈন্য প্রেরণ করবেন। তখন এক যুবক জেহাদে যাওয়ার অনুমতি

প্রার্থনা করলে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন তোমার পরিবারে তত্ত্বাবধান করার মত সামর্থবান লোক রেখে যাচ্ছো তো? সে বলল, এমন কাউকে আমি জানি না, ওরা সবাই ছোট। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

اِرْجِعْ إِلَيْهِمْ، فَإِنَّ فِيْهِمْ مُجَاهَدًا حَسَنًا. (المطالب العالية برقم ١٧٦٠)

অর্থাৎ, তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও। তাদের মধ্যেই রয়েছে উত্তম জেহাদের (মেহনত করার) স্থান।

যুবকদের মনে রাখতে হবে, তাদেরকে বুদ্ধি দেয়ার অনেক লোক রয়েছে, কিন্তু সেই বুদ্ধিদাতাদের অনেকেই তাদের হীতাকাংখী নয়। যুবকদের অনেক পরামর্শদাতা জোটে, কিন্তু সেই পরামর্শদাতাদের মধ্যে হীতাকাংখীর সংখ্যা কম। তাদের অনেক বন্ধু জোটে, কিন্তু প্রকৃত বন্ধুর সংখ্যা কম। এইসব বুদ্ধিদাতা ও পরামর্শদাতাদের অনেকেই যুবকদের যৌবনের শক্তি ও উচ্ছলতাকে ব্যবহার করে নিজেদের দলীয় স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়, নিজেদের হীন স্বার্থ উদ্ধার করতে চায়। যুব সমাজের শক্তি ও তারুণ্যকে ব্যবহার করার জন্য যুব সমাজকে তারা নানান চটকদার কথা বলে প্ররোচিত করে। কখনও বলে, যুব সমাজই শক্তি, যুগে যুগে যুবসমাজই রক্ত দিয়ে সমাজের পরিবর্তন এনেছে, যুগে যুগে তারাই প্রাণ দিয়েছে, অপশক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে। এসব কথা শুনে যুবসমাজের রক্ত টগবগ করে ওঠে। তারা তাদের তারুণ্যকে বিসর্জন দিতে পতঙ্গের ন্যায় ঝাপিয়ে পড়ে। তারপর স্বার্থ উদ্ধার হয়ে গেলে ঐ স্বার্থবাদী প্ররোচনাদাতারা তাদেরকে কলার ছোবড়ার ন্যায় আস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করে। যুব সমাজকে মনে রাখতে হবে এখন তাদের আন্দোলনের সময় নয়, এখন তাদের লেখাপড়ার সময়। এখন তাদের জীবন বিসর্জন দেয়ার সময় নয় এখন তাদের জীবন গড়ার সময়। এখন তাদের নেতৃত্বের সময় নয় এখন তাদের নেতৃত্বের যোগ্যতা অর্জনের সময়। যুবসমাজকে সাবধান সতর্ক থাকতে হবে কোনরূপ কুমন্ত্রণায় পড়ে তাদের জীবন যেন বিচ্যুতির পথে ধাবিত না হয়। তাদেরকে সাবধান থাকতে তাদের তারুণ্যকে কেউ যেন তার হীন স্বার্থ উদ্ধারের কাজে ব্যবহার করে তাদের জীবনকে ধ্বংস করে দিতে না পারে। হে যুবক! পরের বুদ্ধিতে চলো না, স্বার্থান্বেষী মহলের বুদ্ধিতে চলো না, বরং তোমার গুরুজন, তোমার হীতাকাংখী শিক্ষক ও মঙ্গলকামীরা তোমার আপন, তাদের থেকে বুদ্ধি গ্রহণ কর, তাদের পরামর্শে চলো, তোমার জীবন সাফল্যমণ্ডিত হবে ইনশাআল্লাহ!

যৌবন ও ইবাদত-বন্দেগী

মনে রাখতে হবে যৌবন বয়সই ইবাদত-বন্দেগীতে সাধনা করার সময়। তখন যত ইচ্ছে ইবাদত-বন্দেগীতে মেহনত করা যায়, যত ইচ্ছে ত্যাগ স্বীকার করা যায়। বার্ধক্যে শরীরে তাকত থাকে না, মনে ফূর্তি থাকে না। তখন চাইলেও অনেক কিছু করা যায় না। তাই হাদীছে বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের সময়কে কাজে লাগাতে বলা হয়েছে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَکَ قَبْلَ هَرَمِکَ، وَصِحَّتَکَ قَبْلَ سَقَمِکَ، وَغِنَائَکَ قَبْلَ فَقْرِکَ، وَفَرَاغَکَ قَبْلَ شُغْلِکَ، وَحَيَاتَکَ قَبْلَ مَوْتِکَ. (رواه الحاكم في المستدرک في كتاب الرقاق برقم ٨٠١٠ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, পাঁচটা জিনিস আসার পূর্বে অন্য পাঁচটা জিনিসের মূল্যায়ন কর। বার্ধক্য আসার পূর্বে যৌবনের মূল্যায়ন কর, অসুস্থতা আসার পূর্বে সুস্থতার মূল্যায়ন কর, অভাব আসার পূর্ব সচ্ছলতার মূল্যায়ন কর, ব্যস্ততা আসার পূর্বে অবসরের মূল্যায়ন কর এবং মৃত্যু আসার পূর্বে জীবনের মূল্যায়ন কর। (তিরমিযী)

যৌবনে ইবাদতের ফযীলত বেশি। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সাত শ্রেণীর লোককে আল্লাহ তাঁর ছায়ায় আশ্রয় দিবেন সেদিন, যেদিন তার ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তার মধ্যে এক শ্রেণী হল–

وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ رَبِّهِ. (متفق عليه. رواه البخاري في باب من جلس فى المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد ٦٦٠. ورواه مسلم في كتاب الزكاة – باب فضل إخفاء الصدقة ١٠٣١)

অর্থাৎ, যে যুবক তার প্রতিপালকের ইবাদতের জন্য দণ্ডায়মান হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

যৌবন ইবাদতের সময়। যৌবন আমলের সময়। আমাদের অনেকে মনে করে বৃদ্ধ বয়স হল আমলের সময়। তারা যৌবনকালে আমলের প্রতি মনোযোগ দেয় না, ভাবে বয়স বাড়লে তখন দেখা যাবে। অথচ বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেকের নানানমুখী ব্যস্ততাও বেড়ে যায়, তখন ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়াও কঠিন হয়ে

পড়ে। তাছাড়া বৃদ্ধ বয়সে চাইলেও সুন্দরভাবে এবং বেশি পরিমাণে ইবাদত করা যায় না। এ অবস্থায় কীকরে সুন্দরভাবে এবং বেশি পরিমাণে ইবাদত করা সম্ভব? কমরে বাতের ব্যাথা, হাঁটুতে বার্ধক্যের ব্যাথা, শরীর চলতে চায় না, গিরায় গিরায় পেনশনের সুর বেজে ওঠে। বৃদ্ধবয়সে শিশুবয়সের মত দুর্বল হয়ে পড়তে হয়। বৃদ্ধকালের এসব দুর্বলতার দিকে একটি আয়াতেও ইংগিত করে দেয়া হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِى الْخَلْقِ.﴾

অর্থাৎ, আমি যাকে দীর্ঘ বয়স দান করি, তাকে সৃষ্টিগত পূর্বের অবস্থায় (দুর্বল অবস্থায়) ফিরিয়ে দেই। (সূরা ইয়াছীন: ৬৮)

বস্তুত যৌবনকালই ইবাদতের সময়। প্রসিদ্ধ তাবিয়ী মহিলা হযরত হাফসা বিনতে সিরীন বলেছেন,

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ! خُذُوْا مِنْ أَنْفُسِكُمْ وَأَنْتُمْ شَبَابٌ، فَإِنِّيْ مَا رَأَيْتُ الْعَمَلَ إِلاَّ فِي الشَّبَابِ. (قيمة الزمن عند العلماء)

অর্থাৎ, হে যুব সমাজ! তোমরা যুবক থাকতেই তোমরা জীবনকে কাজে লাগাও, আমি মনে করি যৌবনকালই আমলের সময়। (কীমাতুয যামানি ইনদাল উলামা)

যৌবনে পাপের মাত্রা বেশি

যৌবনে ইবাদতের মর্যাদা যেমন বেশি, যৌবনে পাপের মাত্রাও তেমনি বেশি। এ দিকে ইংগিত করে এক রেওয়ায়েতে এসেছে—

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ شَابٌّ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ مُخْتَالاً فَخُوْرًا إِذْ اِبْتَلَعَهُ الْأَرْضُ، فَهُوْ يَتَجَلْجَلُ فِيْهَا إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. (جامع الأحاديث للسيوطي عن كنز العمال برقم ٤٢٣٤٦)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তীদের মধ্যে এক যুবক (বিলাসী) পোশাক পরিধান করে অহংকারবশে চলছিল, ইত্যবসরে মাটি তাকে গিলে ফেলল। কেয়ামত পর্যন্ত সে মাটিতে ধসতে থাকবে। (জামিউল আহাদীছ)

যৌবনে পাপের মাত্রা বেশি হওয়ার কারণে কোন যুবক যখন পাপ থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করে তখন শয়তান অত্যন্ত মর্মাহত হয়। যেমন এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا شَابٍّ تَزَوَّجَ فِيْ حَدَاثَةِ سِنِّهٖ عَجَّ شَيْطَانُهٗ يَا وَيْلَهٗ! يَا وَيْلَهٗ!! يَا وَيْلَهٗ!!! عَصَمَ مِنِّيْ دِيْنَهٗ. (رواه أبو يعلى في مسنده ٢٠٤٤ والمطالب العالية برقم ١٥٨٤. وإسناد الحديث ضعيف)

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন যুবক যখন তারুণ্যেই বিয়ে করে নেয়, শয়তান আর্তচিৎকার করে ওঠে যে, হায় হায় ও তো আমার থেকে দ্বীনকে রক্ষা (করার ব্যবস্থা) করে নিল! (আল-জামিউস সাগীর, তাবারানী ও আল- মাতালিবুল আলিয়া)

যৌবন ও আল্লাহর ভয়

হযরত সাহ্‌ল ইবনে সা'দ (রা.) থেকে বর্ণিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এক যুবক জাহান্নামের কথা স্মরণ করে কাঁদত। এরকম কাঁদার ফলে সে ঘরের বাইতে যেতে পারত না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে যুবকটির কথা আলোচনা করা হল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুবকটির কাছে আসলেন। যুবকটি যখন তাঁকে দেখল, দাঁড়িয়ে গেল। তাঁর গলা জড়িয়ে ধরল। তার প্রাণ বেরিয়ে গেল এবং মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তার জানাযার ব্যবস্থা কর। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন,

إِنَّ الْفَرَقَ مِنَ النَّارِ فَلَّذَ كَبِدَهٗ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ لَقَدْ أَعَاذَ اللّٰهُ مِنْهَا، مَنْ رَجَا شَيْئًا طَلَبَهٗ، وَمَنْ خَافَ مِنْ شَيْءٍ هَرَبَ مِنْهُ. (المستدرک للحاکم ٣٨٧٨ وقال: صحيح الإسناد، وشعب الإيمان للبيهقي ٩٣٦، ولكن في إسنادهما محمد بن إسحاق البخاري وأبوه، قال الذهبي في التلخيص: لا يُدرى من هما، والخبر شبه موضوع.اهـ. ولكن في لسان الميزان في ترجمة إسحاق بن حمزة: إسحاق ذكره ابن حبان في

الثقات... روى عن أبي حمزة والغنجار. روى عنه أبو بكر بن حريث وأهل بلده. وذكره الخليلي في الإرشاد وقال: كان من المكثرين من أصحاب غنجار...ورضيه محمد بن إسماعيل البخاري وأثنى عليه لكن لم يخرجه في تصانيفه)

অর্থাৎ, জাহান্নামের ভয় তার কলিজাকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছে। ঐ সত্তার কছম যার হাতে আমার জীবন! আল্লাহ তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। কেউ কোন কিছুর আশা করলে সে তা সন্ধান করে, আর কেউ কোন কিছুকে ভয় করলে তা থেকে সে ভেগে যায়। (মুস্তাদরকে হাকিম)

যৌবন ও তাওবা

عَنْ أَنَسٍ رضـ مَرْفُوْعًا: مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى اللّٰهِ مِنْ شَابٍّ تَائِبٍ. (أخرجه الديلمي ٤٨/٤ برقم ٦١٥٣ وأخرجه ابن عدي ١١٨/٤. كذا في جامع الأحاديث لجلال الدين السيوطي برقم ٢٠٥١٣)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন, তওবাকারী যুবকের চেয়ে আল্লাহর কাছে বেশি প্রিয় আর কিছু নেই। (জামিউল আহাদীছ)

মালেক ইবনে দীনার বর্ণনা করেছেন, বনী ইসরাঈলের লোকেরা এক ঈদের দিনে মসজিদে প্রবেশ করেছিল। তখন মসজিদের দরজার বাইরে এক যুবক দাঁড়িয়ে কাঁদছিল। সে চিৎকার করে বলছিল, আমার মত লোক কি আপনাদের কাছে আসতে পারে? আমি এমন এমন (পাপী)! এরপর তখনকার নবীর বাচনিক জানানো হল যে, ঐ যুবককে সিদ্দীকদের তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। (কিতাবুয যুহ্দ, আহমদ ইবনে হাম্বল)

যৌবনে দাড়ি-টুপি ও ইসলামী লেবাস

যৌবনে দাড়ি রাখতে, টুপি পরতে, ইসলামী লেবাস গ্রহণ করতে অনেক যুবক কুণ্ঠিত হয়। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে এই কুণ্ঠার মূল কারণ হল তারা মনে করে দাড়ি রাখলে, টুপি পরলে, ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করলে মেয়েরা তাদের কাছে ঘেষবে না, জীবনের অনেক রোমাঞ্চ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। তারা মনে করে দাড়ি রাখলে, টুপি পরলে, ইসলামী লেবাস-পোশাক পরিধান করলে অনেকে তাদেরকে হুজুর বলে টিটকারি দিবে। কিন্তু যুব সমাজকে মনে রাখতে হবে

তারা যদি পবিত্র জীবনের অধিকারী হতে ও থাকতে চায়, তাহলে এমন পদ্ধতিই তো গ্রহণ করা চাই যাতে মেয়েরা তাদের কাছে না ঘেষে। এভাবেই তো তাদের পক্ষে পবিত্র থাকা সহজতর হবে। মেয়েরা কাছে ঘেষলেই তো তাদের জীবন পাপ-পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত হয়ে যেতে পারে। আর হুজুর বলে টিটকারী দিলে কী এসে যায়? না-বুঝ লোকেরা তো কত কিছুই বলতে পারে এবং বলে থাকে। যারা ধর্মীয় জীবন-পদ্ধতির সমালোচনা করে তারা না-বুঝ, অজ্ঞ কিংবা সজ্ঞান পাপী। যারা ধর্মীয় বেশভূষা নিয়ে টিটকারি দেয় তারা না-বুঝ অজ্ঞ কিংবা সজ্ঞান পাপী। এমন না-বুঝ, অজ্ঞ ও সজ্ঞান পাপীদের কথায় কি আমরা আমাদের আদর্শ বিসর্জন দিয়ে দিব? না-বুঝ ও অজ্ঞ লোকদের কথায় উঠাবসা করা কি বোকামী নয়? যেসব পিতা-মাতা বা গুরুজন যুবকদেরকে যৌবনকালে দাড়ি, টুপি, ইসলামী লেবাস-পোশাক গ্রহণের বিরুদ্ধে বলে, তারাও না-বুঝ কিংবা অজ্ঞ। তারা যুক্তি দেখায় এখনও এসব ধর্মকর্ম করার বয়স হয়নি, বয়স হলে এগুলো করবে। তারা ভুল ব্যাখ্যা দেয়, তারা গোনাহের কথা বলে। আর কুরআন সুন্নাহর আলোকে গোনাহের বিষয়ে কোন মানুষের আনুগত্য করা চলে না, তা সেই গোনাহের নির্দেশদাতা পিতা-মাতা কিংবা অন্য যতবড় গুরুজনই হোন না কেন। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لاَ طَاعَةَ لِمَخْلُوْقٍ فِيْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ. (رواه أحمد برقم ٢٠٥٣١ في بقية حديث الحكم بن عمرو الغفاري وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة برقم ٣٤٤٠٦)

অর্থাৎ, কোনো পাপ কাজে কোনো মাখলূকের আনুগত্য করা চলবে না। (মুসনাদে আহমদ ও ইবনে আবী শাইবা)

অতএব কোনো ফরয, ওয়াজিব বা সুন্নাতে মুয়াক্কাদা লংঘনের ব্যাপারে তথা হারাম বা মাকরূহ তাহরীমী করার ব্যাপারে কেউ হুকুম দিলে বা বললে তা মান্য করা যাবে না, তার বিরোধিতা করতে হবে। আর উল্লেখ্য যে, দাড়ি রাখা ওয়াজিব, ইসলামী লেবাস-পোশাক গ্রহণ করা ওয়াজিব পর্যায়ের জরুরী বিষয়।

আমরা মুসলমান। ইসলাম আমাদের আদর্শ। যে যা-ই বলুক আমরা আমাদের আদর্শে অটল থাকব। এ-ই তো হল ধর্মীয় অটলতা। আমরা আমাদের আদর্শে অটল থাকব, আমাদের আদর্শের ব্যাপারে আমরা কখনও হীনম্মন্যতার শিকার হব না। নিজেদের ধর্মীয় আদর্শে এমন অটল থাকতে পারলেই আমরা লাভ করতে পারব ফেরেশতাদের বাচনিক সুসংবাদ, জান্নাতের সুসংবাদ। জান্নাত হল স্বাধীন উপভোগের জগত, যা মনের চাওয়া তা-ই পাওয়ার জগত। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ۝۳۰ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ فِى الْاٰخِرَةِ ۚ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ۝۳۱ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ۝۳۲﴾

অর্থাৎ, যারা বলে আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ, তারপর অটল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় এবং বলে, তোমরা ভয় করো না, চিন্তা করো না। তোমরা ঐ জান্নাতের সুসংবাদ গ্রহণ কর যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে। আমরা পার্থিব জীবনেও তোমাদের বন্ধু আখেরাতেও। তোমাদের জন্য এই জান্নাতে রয়েছে যা তোমাদের মনে চাইবে এবং সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা দাবী করবে। দয়াময় ক্ষমাশীল আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ন স্বরূপ। (সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ: ৩০–৩২)

যৌবনে বোরকা ও পর্দা

নারী বালেগ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার উপর বিশেষ বিশেষ যে বিধান এসে যায় তার মধ্যে অন্যতম হল পর্দা। আর পর্দার জন্য ব্যবহৃত হয় বোরকা। নিম্নে আমার রচিত “ফিকহুন নিছা” গ্রন্থ থেকে বোরকা পর্দা সম্পর্কিত আলোচনাটুকু তুলে ধরা হল। নারীদের জন্য পর্দা করা ফরয। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমে সূরা আহযাবের ৩৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ قَرْنَ فِىْ بُيُوْتِكُنَّ وَ لَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُوْلٰى وَ اَقِمْنَ الصَّلٰوةَ وَ اٰتِيْنَ الزَّكٰوةَ وَ اَطِعْنَ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ﴾

অর্থাৎ, (হে নারীগণ!) তোমরা গৃহের মধ্যে অবস্থান করবে, অজ্ঞ যুগের নারীদের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করবে না। আর নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে।

উক্ত সূরার ৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَ بَنٰتِكَ وَ نِسَآءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ﴾

অর্থাৎ, হে নবী! তুমি তোমার স্ত্রীদেরকে, কন্যাদেরকে এবং মুমিনদের নারীদেরকে বলে দাও, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়।

রিওয়ায়াতে বর্ণিত আছে এই চাদর উড়নার উপর পরিধান করা হত। এবং চেহারার উপর তা ঝুলিয়ে দিয়ে মুখমণ্ডল ঢেকে দেয়া হত। হযরত ইব্‌নে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত আছে– এই চাদর মাথা থেকে পা পর্যন্ত লম্বা হত এবং মাথার উপর দিয়ে ছেড়ে দিয়ে চেহারা ঢেকে দেয়া হত।

এ দুই আয়াতসহ আরও কয়েকটি আয়াত ও একাধিক হাদীছের ভিত্তিতে পর্দা ফরয সাব্যস্ত হয়েছে। পর্দার এই ফরয বিধানকে লংঘন করে নারী সমাজ আজ সব অঙ্গনে অবাধে বিচরণ করা শুরু করেছে। এক শ্রেণীর মানুষ নারী সমাজকে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতিসহ সব অঙ্গনেই টেনে আনছে। সম্প্রতি এমন কোনো অঙ্গন অবশিষ্ট থাকছে না, যেখানে নারীদেরকে টেনে আনা না হচ্ছে। রাজনৈতিক নেতৃত্বে নারীকে সামনের সারিতে টেনে আনা হয়েছে এবং হচ্ছে। অফিস-আদালতের ছোট-খাট পদ থেকে শুরু করে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ পদে পর্যন্ত তাদেরকে টেনে আনা হয়েছে এবং হচ্ছে। ব্যবসা-বাণিজ্যকে চাঙ্গা করার জন্য মডেলিং ও এ্যাডভারটাইজিংয়ের নামে নারীর কমনীয় অভিব্যক্তিকে কাজে লাগানো হচ্ছে এবং তার মাত্রা ক্রমশ বৃদ্ধিই পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অঙ্গনেও তাদের অন্তর্ভূক্তি ঘটানো হচ্ছে। এভাবে শরীআতের পর্দা-বিধান লংঘনের ব্যবস্থা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এর মধ্যে পর্দা বিধানের উপর টিকে থাকতে হলে নারী সমাজকে অত্যন্ত মজবূত মনোবলের অধিকারিণী হতে হবে।

পর্দার বহুবিধ ফায়দা রয়েছে। পক্ষান্তরে পর্দা তরক করার ক্ষতিও রয়েছে বহুবিধ। এ পর্যায়ে নিম্নে কয়েকটা বিষয় উল্লেখ করা হল।

১. পর্দা ব্যবস্থা দ্বারা নারী ও পুরুষ নিজেদের যিনা ও ব্যভিচার থেকে হেফাজত করতে পারে। পর্দা ব্যবস্থা নারীর সতীত্ব রক্ষার প্রতীভূ।

২. পর্দা করলে পূত-পবিত্র মেয়ে ও মহিলাদের প্রতি বাজে নোংরা লোকদের কুদৃষ্টি পড়তে পারে না।

৩. পর্দা ব্যবস্থা থাকলে সম্ভ্রান্ত ও বংশীয় নারী পুরুষের বংশ তালিকায় কোনো কলঙ্করেখা অঙ্কিত হতে পারে না। কোনো বাজে লোক কোনো মহিলার সন্তান

সম্পর্কে সামান্যতম সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে না এবং সন্তানের পিতা নিশ্চিত বিশ্বাসের সঙ্গে এ কথা বলতে পারে যে, এ আমারই সন্তান, অন্য কারও সন্তান নয়। বেপর্দা মহিলা –যার পর্দাহীনভাবে পর পুরুষের সঙ্গে উঠাবসা বিদ্যমান– তার সন্তানের বেলায় এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয় যে, এটি তার স্বামীরই পক্ষ থেকে সন্তান।

৪. পর্দা ব্যবস্থা দ্বারা পুরুষ ও নারী প্রত্যেকের অন্তর শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে পবিত্র থাকে। পর্দাহীন চলাফেরায় যখন পুরুষ ও নারী একে অপরের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করে, তখন শয়তান তাদের অন্তরে কুকথা উদয়ের সুযোগ পায়।

৫. পর্দা রক্ষা করে চললে নারীর চরিত্র নিয়ে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ থাকে না। পক্ষান্তরে কোনো নারী যখন পর পুরুষের সঙ্গে বেপর্দা চলাফেরা, খোলামেলা সাক্ষাৎ, হাসাহাসি ও রঙ্গতামাশা করে, তখন তার চরিত্র নিয়ে সন্দেহ দেখা দিতে পারে।

(سیرت مصطفیٰ থেকে সংক্ষেপিত)

পর্দার বিধান লংঘন করার ফলে আজ সমাজে যেনা ব্যাপক আকার ধারণ করেছে। এক শ্রেণীর লোক যারা নারীদেরকে অবাধে ভোগ করতে চায়, তারাই পর্দার বিপক্ষে অপপ্রচার চালিয়ে নারী সমাজকে বিভ্রান্ত করছে। তারা বলছে পর্দা ব্যবস্থা সেকেলে প্রথা, আধুনিক যুগে এই সেকেলে ব্যবস্থা চলতে পারে না, পর্দা ব্যবস্থা নারী সমাজকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। ইত্যাদি। এভাবে অপপ্রচার চালিয়ে তারা নারী সমাজকে পর্দার বাইরে এনে যেনার দিকে ঠেলে দিচ্ছে। সরলমতি নারী সমাজের অনেকে তাদের অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যাচ্ছে। যার ফলে অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজের বহু স্থান আজ যেনার ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। আল্লাহ সকলকে সুস্থ বিবেক দান করুন। পর্দার ফায়দা বুঝার তাওফীক দান করুন। আমীন!

অনেক নারী নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি বিধান পালন করাকে জরুরি মনে করে, কিন্তু পর্দা মানাকে জরুরি মনে করে না। অথচ পর্দার বিধান ফরয। পর্দা লংঘন করা হারাম। পর্দা লংঘন করলে কবীরা গোনাহ হয়।

অনেক নারী ভাবে পর্দা মেনে চলতে গেলে দম আঁটকে মরে যাব। অথচ তারা কি ভেবে দেখে না যারা পর্দা মেনে চলছে তারা কি দম আঁটকে মরে যাচ্ছে? আসলে নিজেকে যেভাবে অভ্যস্ত করানো যাবে, তা-ই সহজ হয়ে যায় এবং ভাল লাগে।

অনেক নারী পর্দাকে খুব কঠিন মনে করে। তারা ভাবে পর্দা মেনে চলা সম্ভব নয়। অথচ তারা ভেবে দেখে না যারা পর্দা মেনে চলছে তাদের পক্ষে কী করে সম্ভব

হচ্ছে? বরং যারা মেনে চলছে তাদের পক্ষে পর্দা লংঘন করাই অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। পর্দা মেনে চলতেই তাদের ভাল লাগে, পর্দা লংঘন করতে তাদের কাছে খারাপ লাগে। বুঝা গেল অভ্যাস করলে পর্দা বিধান মেনে চলা কষ্টকর থাকে না। যেমন শরীয়তের অন্যান্য আমল শুরু করার পর কষ্টবোধ লাঘব হয়ে যায়।

অনেক নারী মনে করে পর্দা মেনে চলতে গেলে আত্মীয়-স্বজনরা অসন্তুষ্ট হয়ে যায়, তারা মনে করে সে বাড়িতে বেড়াতে যাওয়ার মধ্যে কোনো আনন্দ নেই। কারণ সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত করা যায় না। কিন্তু কোনো আত্মীয়-স্বজনকে খুশি করা বড় কথা নয়, বড় কথা আল্লাহ্‌কে খুশি করা। আল্লাহ্‌র হুকুম মানার কারণে যদি কোনো আত্মীয় অখুশী হয়, তাহলে সেই অখুশির কোনো পরওয়া করা চাই না।

অনেক নারী মনে করে পর্দা মেনে চলতে গেলে ইচ্ছেমত এখানে সেখানে যাওয়া যাবে না, ইচ্ছেমত সকলের সঙ্গে মেলামেশা করা যাবে না। ফলে জীবনের আনন্দ ফূর্তি সব শেষ হয়ে যাবে। অথচ তারা ভেবে দেখে না যারা পর্দা মেনে চলছে তাদের জীবন কি আনন্দহীন? বরং পর্দা মেনে চললে তাদের পারিবারিক জীবনের আনন্দ অটুট থাকে। পর্দা মেনে না চললে পর পুরুষদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ও মেলামেশা করলে অনেক সময় স্বামীর মনে সন্দেহ দেখা দেয় এবং তার থেকে স্বামী-স্ত্রীর পারিবারিক জীবনে অশান্তি আসে। আবার অনেক সময় পর্দাহীনভাবে পর পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, হাসি-তামাশা ও অবাধ মেলামেশার ফলে অবৈধ মেলামেশা পর্যন্ত হয়ে যায়। পর্দায় থাকলে এ সমস্ত অঘটন হতে পারে না। পর্দা হল তাই নারীর সতীত্ব রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায়। পর্দা পারিবারিক জীবনে সন্দেহ সৃষ্টির পথকে রুদ্ধ করে দেয়। পর্দা লংঘন পারিবারিক জীবনে অশান্তির সূত্রপাত করে থাকে।

পক্ষান্তরে পর্দা রক্ষা করলে স্বামী স্ত্রীর জীবনে সন্দেহ আসতে পারে না, স্ত্রীর মন অন্য কোনো পুরুষের দিকে যেতে পারে না, স্বামীর দিকেই তার সব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, স্বামীও শরীয়তসম্মত পর্দার বিধান মেনে চললে এবং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি না দিলে তার মনও অন্য নারীর দিকে ঝুকতে পারে না বরং স্ত্রীর দিকেই তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকে। এভাবে পর্দার বিধান রক্ষা করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টি নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং তাদের ভালবাসা অটুট থাকে, তাদের পারিবারিক জীবন শান্তিময় থাকে। পর্দার বিধান তাই ইহকাল পরকাল উভয় জগতের বিচারে একটি সুন্দর বিধান।

কোন কোন বিভ্রান্ত লোক বলে থাকে যে, পর্দা হল মনের ব্যাপার; মন ঠিক থাকলে সব ঠিক। এভাবে তারা বুঝাতে চায় যে, মন ঠিক হয়ে গেলে আর বাইরের পর্দার দরকার হয় না। এটা একটা বিভ্রান্তিকর কথা। এটাও পর্দা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত

ধারণা। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিবি এবং কন্যাদেরকে পর্দা করতে বলতেন, তাহলে কি তাদের মন ঠিক হয়েছিল না? নাউযু বিল্লাহ! মহিলা সাহাবীগণ পর্দা করেছেন, তাদের কি মন ঠিক হয়েছিল না? বুযুর্গ নারীরা পর্দা করেছেন তাদের কি মন ঠিক হয়েছিল না? এসব বিভ্রান্তিকর কথা বলে মানুষকে হয়তো চুপ করানো যাবে, কিন্তু আল্লাহ্র কাছে পার পাওয়া যাবে না। কুরআন-হাদীছে কোথাও এ কথা নেই যে, মন ঠিক হয়ে গেলে পর্দার দরকার হয় না, মন ঠিক হয়ে গেলে পর্দার হুকুম উঠে যায়। পর্দা মনের বিষয় নয়, পর্দা হল শরীরের বিষয়, চেহারার বিষয়। মনের বিষয় হল সবর, তাকওয়া, তাওয়াক্কুল, ইখলাস প্রভৃতি।

যারা বলে, পর্দা হল মনের বিষয়, মন ঠিক থাকলে পর্দা করার দরকার পড়ে না, তারা বিভ্রান্ত, তারা গোমরাহ। এই শ্রেণীর লোকেরাই বলে থাকে, নামায মনের বিষয়, মন ঠিক থাকলে নামাযের দরকার হয় না। এই শ্রেণীর লোকেরাই বলে, ধর্মকর্ম মনের বিষয়, মন ঠিক থাকলে সব ঠিক। এগুলো সবই ভ্রান্ত কথা, কুরআন-হাদীছ বিরোধী কথা। এগুলো পর্দা সম্পর্কে ও ধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ও ভ্রান্ত প্রচারণা।

পর্দা সম্পর্কে এরূপ আরও অনেক ভ্রান্ত প্রচারণা রয়েছে। নিম্নে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

যখন "নারী প্রগতি", "নারী মুক্তি", "নারী স্বাধীনতা" ইত্যাদি নামে নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, উলঙ্গপনা ও বেলেল্লাপনার বিরুদ্ধে বলা হয় এবং নারীদের ইসলামী পর্দা রক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে বলা হয়, তখন এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা বলে ওঠে, এগুলো প্রগতি-পরিপন্থী, এগুলো সেকেলে পদ্ধতি, বিজ্ঞানের যুগে এগুলো অচল। এগুলো দিয়ে উন্নতি করা যাবে না, এভাবে আমাদের সমাজকে অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। তারা পাশ্চাত্যের উদাহরণ তুলে ধরে থাকে যে, তারা এই সমস্ত সেকেলে আদর্শ ছেড়ে দিয়েছে, তাই তারা উন্নতি করেছে। তারা বলে, নারী পুরুষের অবাধ মেলা-মেশা, উলঙ্গপনা, নারী পুরুষের কাধে কাধ মিলিয়ে কাজ করে যাওয়া– এসবের ফলেই পাশ্চাত্য সমাজ উন্নতি করেছে। কিন্তু একথা আদৌ ঠিক নয়। নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশা, উলঙ্গপনার দ্বারা আসলে কোনো উন্নতি হয় কি? এর দ্বারা কি অর্থনীতির উন্নতি হবে? এর দ্বারা কি অফিস আদালতের অনিয়ম দূর হবে? এর দ্বারা কি দুর্নীতি দূর হবে? এর দ্বারা কি কর্ম দক্ষতা বাড়বে? এর দ্বারা কি কাজের নিষ্ঠা বাড়বে? এর দ্বারা কি দায়িত্ব বোধ বাড়বে? একজন নারীকে অফিস-আদালতে উলঙ্গ করে রাখলে তাতে কি পুরুষদের কর্মের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে না কুকর্মের চিন্তা বৃদ্ধি পাবে? একটু বিবেক দিয়ে মুক্তমনে চিন্তা করে দেখলে খুব সহজেই বুঝা যায় আসলে উন্নতি হয় নিষ্ঠা, সততা, দায়িত্ববোধ এইসব

গুণের কারণে। এইসব গুণের দ্বারাই উন্নতি আসে। এগুলো তো ইসলামের শিক্ষা দেয়া নীতি। পশ্চিমারা এই ইসলামী শিক্ষা ও নীতি গ্রহণ করেছে, ফলে তারা উন্নতি করেছে। অথচ আমরা ভাবছি তারা উন্নত হয়েছে উলঙ্গপনা ও বেহায়া-বেলেল্লাপনার কারণে। কিন্তু আদৌ উলঙ্গপনার কারণে, বেহায়া, বেশরম হয়ে যাওয়ার কারণে তারা উন্নত হয়নি। যেগুলো ইসলামের শিক্ষা দেয়া উন্নতির মূলনীতি, সেগুলো অবলম্বন করার ফলেই তারা উন্নতি করেছে। আমরা মুসলমান জাতি সেসব অবলম্বন করছি না বিধায় উন্নতি করতে পারছি না। এ হিসাবে বলা যায় পাশ্চাত্যের লোকেরা উন্নত হয়েছে ইসলাম অর্থাৎ, ইসলামী নীতি গ্রহণ করার ফলে। অথচ আমরা মনে করছি তারা উন্নত হয়েছে ইসলাম বর্জন করার ফলে। এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীরা তা-ই সমাজকে গলাধকরণ করানোর চেষ্টা করছে। মানুষকে ইসলাম থেকে সরানোর জন্যই পরিকল্পিতভাবে এরূপ করা হচ্ছে। ইসলামী আদর্শের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধ করে তোলার জন্যই এরূপ বলা হচ্ছে। ইসলামী আদর্শে মানুষ উন্নতি করতে পারে না, এগুলো মানুষকে পিছনের দিকে নিয়ে যায়। এসমস্ত কথা বলে মানুষকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে। অথচ খাঁটিভাবে চিন্তা-বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় উন্নতি হয় ইসলামের নীতিমালা অনুসরণ করলে। যে ক্ষেত্রে ইসলামের যে নীতিমালা রয়েছে, সে ক্ষেত্রে উন্নতি চাইলে ইসলামের সেই নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে। অথচ মানুষকে বিভ্রান্তিমূলক কথা বলে বোঝানো হয় যে, ইসলাম বর্জন করার মধ্যেই উন্নতি। আর কিছু মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে তাদের সুরে সুর মিলাচ্ছে। অবলা মুসলিম নারী সমাজ তাদের কথায় সরল বিশ্বাসে নিজেদের অমূল্য সম্পদ সতীত্ব বিসর্জনের পথে পা বাড়াচ্ছে। তারা তাদের নারীত্ব ও সহজাত বৃত্তির বিনাস সাধনের পথে পা বাড়াচ্ছে। তারা মুসলিম মাতৃজাতির কলঙ্কের পথে পা বাড়াচ্ছে। তারা সর্বনাশা পথে পা বাড়াচ্ছে।

আজ মুসলিম নারী সমাজকে ভেবে দেখতে হবে নারী মুক্তির মোহময় শ্লোগানে মোহিত হয়ে বেহায়া বেলেল্লার মত রাস্তা-ঘাট আর ক্লাব-পার্কে চলাফেরার পথ বেছে নিয়ে তথা নৈতিক নিরাপত্তার আশ্রয় ছেড়ে মান-ইজ্জত, সতীত্ব ও সহজাত বৃত্তির সর্বনাশ সাধনের পথে পা বাড়ানো কতটুকু বুদ্ধিমত্তা হবে।

নারী সমাজকে মনে রাখতে হবে তাদের সহজাত বৃত্তির সুষ্ঠু বিকাশসাধন ও তাদের সতীত্ব রক্ষার অধিকারকে সংরক্ষণ করার লক্ষ্যেই তাদের জন্য পুরুষ থেকে ভিন্ন কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করা হয়েছে। এ লক্ষ্যেই পর্দা ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়েছে। এ লক্ষ্যেই পুরুষের প্রতি নির্দেশ এসেছে গায়র মাহরাম নারী থেকে দৃষ্টিকে নত রাখার। এ লক্ষ্যেই পুরুষদের জন্য হারাম করা হয়েছে গায়র মাহরাম নারীদের দিকে নজর দেয়া, যাতে তাদের মনে পর নারীর সতীত্ব হরণের লোভ উদ্বেলিত হতে না

পারে। এ লক্ষ্যেই পুরুষদের প্রতি হারাম করা হয়েছে পরনারীর সংসর্গ বা কোনো উপপত্নী রাখাকে।

নারী সমাজকে সুস্থ মস্তিষ্কে বুঝতে হবে যে, ইসলাম তাদেরকে কোণঠাসা করার জন্য বহিরাঙ্গন থেকে দূরে রাখতে চায় না। বরং প্রথমত কথা হল তাদের সহজাত বৃত্তির বিকাশ সাধনের স্বার্থেই তাদের জন্য কর্মক্ষেত্র রাখা হয়েছে পর্দার অন্তরালে। বহিরাঙ্গন তাদের সহজাত বৃত্তির অনুকূল নয়। দৈহিক, মানসিক কোনোভাবেই বহিরাঙ্গন নারীত্বের অনুকূল নয়। নারীদের ঘরের বাইরে কর্মসংস্থানের পক্ষে এককালে যে সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণ পেশ করা হত স্বয়ং সেই সোভিয়েত রাশিয়ার পতনের প্রাক্কালে তদানিন্তন কম্যুনিষ্ট নেতা গরবাচেভ সাহেবও এটা স্বীকার করেছিলেন যে, নারীরা বহিরাঙ্গনকে কর্মক্ষেত্র বানিয়ে তাদের নারীত্ব হারাতে বসেছে, গৃহই তাদের কর্মসংস্থান হওয়া উচিত বলে তিনি মত ব্যক্ত করেছিলেন।

তদুপরি জাতির ভবিষ্যত আজকের শিশুকে দৈহিক ও মানসিক সব দিক থেকে গড়ে তোলার গুরু দায়িত্ব পালনের জন্য পুরুষদের থেকে তাদের কর্মক্ষেত্রকে ভিন্ন রাখা হয়েছে। নারীদের সতীত্ব ও চরিত্র রক্ষার সব ব্যবস্থা জাতির বৃহত্তর স্বার্থে। কেননা, সন্তানের চরিত্রে মায়ের চরিত্রের বিরাট ভূমিকা থাকে। মায়ের মন-মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনা যেমন, সন্তানের মন- মানসিকতা ও চিন্তা-চেতনাও তেমনিই গড়ে ওঠে। ইতিহাস সৃষ্টিকারী, সুস্থ্য সমাজ বিনির্মাতা, সৎ ও মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী লক্ষ্য করলে দেখা যায় তাদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্র গঠনে মায়েদের চিন্তা-চেতনা ও চরিত্রের উল্লেখযোগ্য প্রভাব রয়েছে। সুতরাং মায়েরা তাদের চরিত্র ও মন-মানসিকতা সুস্থ্য রাখার মাধ্যমে সুস্থ্য সবল ও আদর্শ সমাজ গঠনে অলক্ষ্যে যে অবদান রাখতে পারেন, তা পুরুষদের বহিরাঙ্গনে অবদানের চেয়ে কোনো অংশেই খাটো নয়।

নারী সমাজকে আরও মনে রাখতে হবে মানবতার মুক্তি, সর্বোপরি পরকালের মুক্তিই হল প্রকৃত মুক্তি। প্রয়োজন অনুপাতে অর্থনৈতিক মুক্তির প্রয়োজনও উপেক্ষার নয়, কোনো নারী কোনো ক্ষেত্রে স্বামী কর্তৃক নির্যাতিত হলে তা থেকেও তাকে মুক্তির সুষ্ঠু পন্থা গ্রহণ করতে হবে বৈকি? তবে এই সব মুক্তির অজুহাতে কোনোক্রমেই যেন নারী সমাজ তাদের আসল মুক্তি থেকে বঞ্চনার পথ রচনা করে না বসে।

অতএব সব রকম ওয়াসওয়াসা ও ভ্রান্ত ধারণা পরিত্যাগ করে এবং সব রকম ভ্রান্ত প্রচারণাকে উপেক্ষা করে পর্দার ফরয বিধান পালন করার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত হতে হবে এবং পর্দার বিস্তারিত মাসাইল জেনে সে অনুযায়ী আমল করতে হবে।

পর্দা সম্পর্কিত কয়েকটি মাসআলা

* শরীআতে গায়র মাহরাম পুরুষের সঙ্গে পর্দা করা ওয়াজিব। নারীর পক্ষে কামভাব নিয়ে কোনো বেগানা পুরুষের প্রতি দৃষ্টিপাত করা হারাম। তবে অনিচ্ছাকৃতভাবে হঠাৎ যে দৃষ্টি পড়ে যায় তা মাফ; তবে সে দৃষ্টিকে দীর্ঘায়িত করা যাবে না।

* নারীদের চেহারাও পর্দার হুকুমের অন্তর্ভুক্ত।

* দাড়িবিহীন বালকের প্রতিও বদনিয়ত ও কামভাব সহকারে দৃষ্টিপাত করা হারাম।

* চলা-ফেরা ও কাজকর্মের সময় বা লেন-দেনের সময় প্রয়োজন হলে নারীর জন্য মুখমণ্ডল, হাতের তালু, আঙ্গুল ও পদযুগল খোলারও অনুমতি রয়েছে। কিন্তু পুরুষের জন্য বিনা প্রয়োজনে নারীর এগুলোর প্রতি দৃষ্টিপাত করা জায়িয নয়। (معارف القرآن وبيان القرآن)

* যাদের সঙ্গে নারীকে পর্দা করতে হয় না অর্থাৎ, যাদের সামনে নারীগণ যেতে পারেন তাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদান করা হল।

১। নিজ স্বামী (যার নিকট স্ত্রীর কোনো অঙ্গের পর্দা নেই। তবে বিনা প্রয়োজনে বিশেষ অঙ্গ দেখা অনুত্তম)।
২। পিতা (আপন হোক বা সৎ। দুধ পিতাও এর অন্তর্ভুক্ত)।
৩। দাদা (দাদার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)।
৪। নানা (নানার পিতা বা আরও যত উপরে যাক এর অন্তর্ভুক্ত)।
৫। চাচা (আপন হোক বা সৎ)।
৬। ভাই (আপন হোক বা বৈমাত্রেয় বা বৈপিত্রেয়) তবে চাচাত মামাত খালাত ফুফাতো ভাইয়ের সঙ্গে পর্দা করতে হবে। দুধ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা দেয়া যায়।
৭। ভ্রাতুষ্পূত্র (আপন ভাইয়ের পুত্র হোক বা বৈমাত্রেয় ভাইয়ের বা বৈপিত্রেয় ভাইয়ের)।
৮। ভাগিনা (আপন বোনের ছেলে হোক বা সৎ বোনের)।
৯। ছেলে (আপন হোক বা সৎ)।
১০। আপন শ্বশুর, আপন দাদা শ্বশুর ও আপন নানা শ্বশুর ব্যতীত অন্য সকল প্রকার শ্বশুরের সঙ্গে পর্দা করতে হবে।
১১। মামা (আপন হোক বা সৎ)।
১২। নাতী (আপন ছেলের ঘরের হোক বা মেয়ের ঘরের হোক)।
১৩। জামাই (আপন মেয়ের জামাই)।

* নির্বোধ, ইন্দ্রিয়বিকল ধরনের লোক বা ঐসব বালক যারা বিশেষ কাজ কারবারের দিক দিয়ে নারী পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্য বুঝে না, তাদের সঙ্গে পর্দা করা জরূরী নয়– তারাও পর্দার হুকুম থেকে ব্যতিক্রম।

আল্লাহ যুবসমাজকে সবকিছু আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন!

চতুর্থ অধ্যায়

যদি বৃদ্ধ জীবন গড়তে চান

চতুর্থ অধ্যায়

যদি বৃদ্ধ জীবন গড়তে চান

বৃদ্ধ-পরিচিতি

হাফেজ ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)–এর বর্ণনামতে সাধারণত ষাট সত্তর বৎসর বয়সের ব্যক্তিকে বৃদ্ধ ধরা হয়। (ফাতহুল বারী) আল্লামা সানআনী বলেছেন, সাধারণত পঞ্চাশ বা পঞ্চাশোর্ধ বয়সের ব্যক্তিকে বৃদ্ধ ধরা হয়ে থাকে। (সুবুলুস সালাম) তবে শারীরিক সক্ষমতা ও গঠনগত শক্তি-সুঠামতার ভিত্তিতে পঞ্চাশ পার হওয়া সত্ত্বেও কেউ বৃদ্ধ নয় বরং যুবক আখ্যায়িত হতে পারে। যেমন বোখারী ও মুসনাদে আহমদের রেওয়ায়েতে হযরত আনাস (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে,

أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ وَهُوَ مُرْدِفٌ أَبَا بَكْرٍ، وَأَبُوْ بَكْرٍ شَيْخٌ يُعْرَفُ وَنَبِيُّ اللّٰهِ شَابٌّ لاَ يُعْرَفُ، قَالَ: فَيَلْقَى الرَّجُلُ أَبَا بَكْرٍ فَيَقُوْلُ: يَا أَبَا بَكْرٍ! مَنْ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْكَ؟ فَيَقُوْلُ: هٰذَا الرَّجُلُ يَهْدِيْنِي السَّبِيْلَ. إلخ. (البخاري ٣٩١١ وأحمد ١٣١٣٨)

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদীনার দিকে আসছিলেন। তিনি আবূ বকর (রা.)কে সওয়ারীর পিছনে রেখে চলছিলেন। আবূ বকর ছিলেন বৃদ্ধ যাকে সকলে চিনত। আর আল্লাহর নবী? তিনি ছিলেন যুবক যাকে লোকেরা চিনত না। তখন কেউ সম্মুখে পড়লে জিজ্ঞাসা করত, হে আবূ বকর! তোমার সম্মুখস্থ লোকটি কে? তিনি বলতেন, ইনি আমার পথপ্রদর্শক। (লোকেরা মনে করত বুঝি রাস্তা চেনানোর লোক, অথচ আবূ বকর [রা]–এর উদ্দেশ্য ছিল তিনি দ্বীনের রাস্তার প্রদর্শক।)

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, হিজরতের সময় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বয়স ছিল ৫৩। তা সত্ত্বেও হযরত আনাস (রা.) তাঁকে যুবক বলে আখ্যায়িত করেছেন।

বৃদ্ধ বয়সের ফযীলত

বৃদ্ধ ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষের কাছেও সম্মানীত, আল্লাহর কাছেও সম্মানীত, যদি বৃদ্ধ ব্যক্তি খাঁটি মানুষ হয়। দুনিয়াতে সম্মানীত তার প্রমাণ হল নিম্নোক্ত হাদীছ–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ إلاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ. (رواه الترمذي برقم ٢٠٢٢ وقال: حديث غريب)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন যুবক কোন বৃদ্ধের সঙ্গে তার বার্ধক্যে সম্মানজনক আচার-ব্যবহার করলে তার এই বয়সেও আল্লাহ তার জন্য এমন লোক নিয়োজিত করবেন যে তার সঙ্গে সম্মানজনক আচার-ব্যবহার করবে। (তিরমিযী)

এ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, বৃদ্ধ ব্যক্তি সম্মানের পাত্র। তাই বৃদ্ধকে সম্মান করার বিশেষ ফযীলতও রাখা হয়েছে।

বৃদ্ধ ব্যক্তি আল্লাহর কাছেও সম্মানীত, তার প্রমাণ হল নিম্নোক্ত রেওয়ায়েত–

عَنْ أَنَسٍ رضـ أَنَّ اللّٰهَ يَسْتَحْيِيْ مِنْ ذِي الشَّيْبَةِ إِذَا كَانَ مُسَدَّدًا لُزُوْمًا لِلسُّنَّةِ أَنْ يَسْأَلَهُ فَلَا يُعْطِيَهُ. (رواه الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي (١٤٩/١٠) وفيه صالح بن راشد وثقه ابن حبان وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات.)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, সুন্নাতকে আঁকড়ে থাকা খাঁটি বৃদ্ধ আল্লাহর কাছে কোন আবেদন করলে আল্লাহ তাকে তা না দিতে শরম বোধ করেন। (তাবারানী)

বৃদ্ধ বয়স ও অতি আশা

মানুষ বৃদ্ধ হলেও অনেক ব্যাপারে তার মন বৃদ্ধ হয় না। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَلْبُ الشَّيْخِ شَابٌّ عَلٰى حُبِّ اِثْنَيْنِ: حُبِّ الْعَيْشِ –أَوْ قَالَ: طُوْلِ الْحَيَاةِ– وَحُبِّ الْمَالِ. (رواه مسلم في كتاب الزكاة باب كراهة الحرص على الدنيا ١٠٤٦ ورواه الترمذي ٢٣٣٨ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বৃদ্ধ মানুষের মন দুই ব্যাপারে যুবক:– আরাম-আয়েশ প্রীতি (অথবা বর্ণনাকারী বলেন, দীর্ঘ বাঁচার আশা) ও সম্পদ প্রীতি। (মুসলিম ও তিরমিযী)

এ হাদীছে বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ বাঁচার আশা ও সম্পদ প্রীতির বিষয়ে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়েছে। বোঝানো হয়েছে বৃদ্ধ বয়সে দুনিয়াতে আরও বেশি দিন থাকার চিন্তা না করে বেশি বেশি আখেরাতের চিন্তা করা উচিত। বৃদ্ধ বয়সে সম্পদের লোভ বর্জন করে দেয়া উচিত। আর মন থেকে সম্পদের মোহ দূর করার উপায় হল মৃত্যুর চিন্তা, আখেরাতের চিন্তা। তাই মৃত্যুর চিন্তা ও আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি করতে হবে। এক রেওয়ায়েতে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكْثِرُوْا ذِكْرَ هَاذِمِ اللَّذَّاتِ. يَعْنِيْ اَلْمَوْتَ. (رواه الترمذي ٢٣٠٧ وقال: حديث حسن)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বয়ান করেন যে, তোমরা বেশি বেশি দুনিয়ার স্বাদ কর্তনকারী জিনিস অর্থাৎ, মৃত্যুকে স্মরণ কর। (তিরমিযী)

বৃদ্ধ বয়স ও ইবাদত-বন্দেগী

বৃদ্ধ বয়স আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি করার বয়স। বৃদ্ধ বয়স ইবাদত-বন্দেগী বৃদ্ধি করার বয়স। বৃদ্ধ বয়সে চুল-দাড়ি পেকে আসে, শরীরের শক্তি কমে আসে। যেন এগুলো দেখে বৃদ্ধের মধ্যে মৃত্যুর স্মরণ বৃদ্ধি পায়, আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি পায়, আমল বৃদ্ধি পায়। এভাবে বৃদ্ধ বয়স হল আখেরাতের চিন্তা বৃদ্ধি করার বয়স। বৃদ্ধ বয়স হল ইবাদত-বন্দেগী ও আমল বৃদ্ধি করার বয়স।

বৃদ্ধ বয়সে চুল দাড়ি পাকিয়ে, শরীরের শক্তি কমিয়ে আখেরাতের চিন্তা ও আমলের চিন্তা বৃদ্ধি করে দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। বার্ধক্য হল নেক আমলের চেতনা বৃদ্ধি করার একটা উপকরণ। মানুষের উপকারের জন্যই আল্লাহর পক্ষ থেকে এই উপকরণ দান করা হয়। এ সত্ত্বেও যদি কেউ বৃদ্ধ বয়সে পাপ করে তাহলে তার পাপের মাত্রা বেড়ে যায়। কারণ তাকে পাপ থেকে বেঁচে থাকার যে উপায়-উপকরণ দেওয়া হয়েছে সেই উপায়-উপকরণকে সে কাজে লাগায় না। যেমন এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ (قَالَ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ: وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ) وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ: شَيْخٌ زَانٍ، وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ. (رواه مسلم في باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار برقم ١٠٧)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তিন শ্রেণীর লোক এমন রয়েছে কেয়ামতের দিন যাদের সঙ্গে কথাও বলবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের দিকে সু-নজরও

দিবেন না। আর তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তারা হল বৃদ্ধ যেনাকারী, মিথ্যুক সম্রাট ও দরিদ্র অহংকারী। (মুসলিম)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, বৃদ্ধ বয়স যেনা থেকে বিরত থাকার বয়স, যেনা করার মত ততটা উম্মত্ততা তার মধ্যে নেই, তা সত্ত্বেও যেনা করলে সেটা আল্লাহর কাছে এত বেশি অপছন্দনীয় যে, কেয়ামতের দিন এরূপ লোকের সঙ্গে আল্লাহ কোন দয়ার কথা বলবেন না, তাদের প্রতি কোন করুণার দৃষ্টি দিবেন না, তাদের গোনাহ মাফ করে দিয়ে তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। তদ্রূপ সম্রাটের মিথ্যা বলার কোনই স্থূল কারণ নেই, তা সত্ত্বেও যদি সে মিথ্যা বলে, দরিদ্রের অহংকার করার মত বাহ্যিক কোন প্রেষণা নেই, তা সত্ত্বেও যদি সে অহংকার করে তাহলে তাদের প্রতিও আল্লাহ এত অসন্তুষ্ট হন যে, কেয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে আল্লাহ কোন দয়ার কথা বলবেন না, তাদের প্রতি কোন করুণার দৃষ্টি দিবেন না, তাদের গোনাহ মাফ করে দিয়ে তাদেরকে পবিত্রও করবেন না, বরং তাদের জন্য থাকবে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

এ হাদীছ থেকে একটা মূলনীতি এই বুঝে আসল যে, বৃদ্ধ বয়সে পাপ করলে পাপের মাত্রা বেড়ে যায়। কারণ বৃদ্ধ বয়সে পাপ করার মত স্থূল প্রেষণা কম থাকে, পাপের উস্কানী কম থাকে, বরং নেক কাজের প্রেষণা বলবতী হওয়ার মত উপকরণ তার মধ্যে বিদ্যমান থাকে।

বৃদ্ধ বয়স ও জ্ঞানচর্চা

বৃদ্ধ বয়সে জ্ঞানচর্চা করে সময় কাটান। অনেকে মনে করে এই বয়সে আর জ্ঞানচর্চা করে কী হবে? এই বয়সেও জ্ঞানচর্চার ছওয়াব অব্যাহত থাকে বরং বার্ধক্যে জ্ঞানচর্চার ছওয়াব দ্বিগুণ। এক রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন,

مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فِيْ شَبِيْبَتِهِ اِخْتَلَطَ الْقُرْآنُ بِلَحْمِهِ وَدَمِهِ وَمَنْ تَعَلَّمَهُ فِيْ كِبَرِهِ فَهُوَ يَتَفَلَّتُ مِنْهُ فَلَا يَتْرُكُهُ فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَّتَيْنِ. (السنن الصغرى لأحمد البيهقي برقم ٩٦٠)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি যৌবনে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার রক্ত মাংসে মিশে যায়। আর যে ব্যক্তি বার্ধক্যে কুরআন শিক্ষা করে, কুরআন তার থেকে ছুটেও যায় কিন্তু সে তাকে ছাড়ে না, তার জন্য রয়েছে দ্বিগুণ ছওয়াব। (আস-সুনানুস সুগ্‌রা)

বৃদ্ধ বয়স ও চুল দাড়িতে কলপ লাগানো

বৃদ্ধ বয়সে চুল-দাড়ি পেকে আসে, শরীরের শক্তি কমে আসে। এটাও আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এক ধরনের নেয়ামত। কেননা, এর দ্বারা তার দ্বীনী উপকার সাধিত হয়। চুল দাড়ি পাকিয়ে, শরীরের শক্তি কমিয়ে তার মধ্যে মৃত্যুর স্মরণ বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। আর মৃত্যুর স্মরণ বাড়লে মানুষের মধ্যে গোনাহ বর্জন ও নেক কাজ বেশি বেশি করার চিন্তা বৃদ্ধি পায়। এভাবে চুল দাড়ি পাকা দ্বারা মানুষের দ্বীনী উপকার সাধিত হয়। তাই পাকা চুল-দাড়িকে এক ধরনের নূর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ, এর দ্বারা মানুষের মধ্যে হেদায়েত আসতে থাকে আর হেদায়েত হল নূর। পাকা চুল দাড়ি নূর– এ সম্বন্ধে এক হাদীছে এসেছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ. (رواه الترمذي في باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب وقال: هذا حديث حسن. حديث رقم ٢٨٢١)

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা চুল তুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা তো মুসলমানের নূর। (তিরমিযী)

পাকা চুল দাড়ি দ্বারা দুনিয়াতে যেমন নূর হবে, তেমনি কেয়ামতেও নূর হবে। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.حديث رقم ١٦٣٥)

অর্থাৎ, হযরত আমর ইবনে আবাছাহ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শুভ্র হবে এটা কেয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে। (তিরমিযী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,

وَمَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي الْإِسْلَامِ كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ، وَرُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ. (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ٢٥٣)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মুসলমান অবস্থায় শুভ্র হবে, এর ওছীলায় তার জন্য একটি নেকী লেখা হবে, এর ওছীলায় তার একটা গোনাহ মাফ হবে এবং এর ওছীলায় তার একটা মর্যাদা বুলন্দ হবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

পাকা চুল দাড়ি যেহেতু নূর, তাই পাকা চুল দাড়িতে এমনভাবে কলপ লাগানো ঠিক নয় যাতে চুল দাড়ি পেকেছে তা বোঝাই না যায়। অর্থাৎ, চুলের রংয়ের মত কাল কলপ না লাগানো। চুলের মত কাল রং ছাড়া অন্য যে কোন রংয়ের খেযাব লাগানো যায়, মেহেদী দিয়েও রাঙানো যায়, কারণ তাতে পাকার আলামত থেকে যায়। ফলে বার্ধক্যের চেতনা অবশিষ্ট থাকে। আর এই বার্ধক্যের চেতনাই মানুষের মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা এবং আমলের ফিকির বৃদ্ধি করে দেয়। ফলে তার দ্বীনী উপকার সাধিত হয়। কাল কলপ লাগালে যেহেতু বার্ধক্যের ছাপ মুছে যায়, তাতে করে বার্ধক্যের চেতনা আসতে পারে না, তাই তাতে মানুষের দ্বীনী উপকার লাভের একটা পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। এ কারণেই শরীয়তে চুলের রংয়ের মত কাল কলপ লাগানো মাকরূহ। তবে হাঁ যুদ্ধের ক্ষেত্রে শত্রুর মনে ভীতি সৃষ্টির কৌশলী উদ্দেশ্যে চুলের মত কাল খেযাবও লাগানো যায়। এক্ষেত্রে একটা দ্বীনী ফায়দা অর্জনের উদ্দেশ্যেই কাল খেযাব লাগানোর অনুমতি রয়েছে।

অতএব আপনি যে বয়সেরই হোন না কেন শুভ্র চুল দাড়ি তুলে ফেলবেন না, তাহলে আখেরাতের চেতনা উদ্রেককারী এক নেয়ামতকে উপড়ে ফেলা হবে। শুভ্র চুল দাড়িকে শুভ্রই থাকতে দিন। কালো করে আখেরাতমুখী চেতনা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন না। আর সমূলে দাড়ি শেভ করলে তো আখেরাতমুখী চেতনা জাগ্রত হওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওয়াজিব তরকের পাপেও জর্জরিত হবেন।

যারা পাকা চুল দাড়িকে কাল করে নিজেদেরকে যুবক-যুবতী প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে থাকেন, তাদের চিন্তায় রাখা চাই এভাবে তারা নিজেদের বয়স সম্বন্ধে অন্যকে বিভ্রান্ত করছেন। এটাও এক ধরনের প্রতারণা বৈ কি? অল্পবয়সী তরুণীদের প্রতি তরুণরা আকৃষ্ট হয়, এমনিভাবে অল্পবয়সী তরুণদের প্রতি তরুণীরা আকৃষ্ট হয়। এরকম আকর্ষণ সৃষ্টির কুমতলব ছাড়া অন্যদের সামনে নিজেকে তরুণ তরুণী প্রতিপন্ন করার পেছনে আর কী উদ্দেশ্য থাকতে পারে? তবে হাঁ স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আকর্ষণ থাকা কাম্য। তাই স্বামী স্ত্রী একে অপরের সামনে নিজেকে আকর্ষণীয় রাখার মানসে অল্প বয়সে চুল দাড়ি পাকলে তা কালো করে রাখতে পারে। এটাকে কুমতলব নয় বরং সুমতলব আখ্যায়িত করা যায়।

অনেকে বলেন, চুল দাড়ি পাকা দেখলে নিজেকে অক্ষম ও দুর্বল মনে হয়, নিজেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা অনুভব হয়। এতে কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে পাকা চুল

দাড়িকে কাল করে রাখলে নিজেকে সক্ষম সবল প্রতিপন্ন হয় এবং কর্মস্পৃহা বেশি থাকে। এ যুক্তিতেই তারা পাকা চুল দাড়ি কাল করে রাখেন। অনেকে তো সমূলে দাড়ি শেভই করে ফেলেন। এতে নাকি নিজেকে সবল সক্ষম মনে হয়, কর্মস্পৃহা অক্ষুণ্ন থাকে। কিন্তু এই যুক্তি দর্শনের বাস্তবতা কতটুকু? কে কতটুকু সক্ষম বা অক্ষম তা তো তার নিজের অনুভূতির ব্যাপার। এ ক্ষেত্রে চুল দাড়ির রঙ কি আসলেই মনকে চাঙ্গা করতে বা রাখতে পারে? মন তো সর্বক্ষণ নিজের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে অবগত। এভাবে মনকে ধোঁকা দিয়ে কি তাকে চাঙ্গা করা বা চাঙ্গা রাখা সম্ভব? তা ছাড়া আপনার বয়স হয়েছে, আপনি পরিণত বয়সে উপনীত হয়েছেন, আপনি স্বাভাবিকতার বিচারেও মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়েছেন– এসব চেতনা পার্থিব কাজ-কর্মের ব্যাপারে আপনাকে কিছুটা নিস্পৃহ করে তুললেও আপনার মধ্যে আখেরাতমুখী কর্মের স্পৃহা বৃদ্ধি করবে নিঃসন্দেহে। আখেরাতে বিশ্বাসী মুমিন-মুসলমানের কাছে আখেরাতমুখী কর্মের স্পৃহা বৃদ্ধি পাওয়া অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ মনে হওয়া উচিত।

বৃদ্ধ বয়সের কিছু বিভ্রান্তি

বৃদ্ধ বয়সে অনেকে বেশ কিছু স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে থাকেন। সেই বিভ্রান্তিগুলোর মধ্যে রয়েছে–

(এক) অনেকে বৃদ্ধ বয়সে সময় কাটে না বলে সারাদিন পেপার-পত্রিকা নিয়ে পড়ে থাকেন। পেপারের অ, ক, খ থেকে ক্ষ পর্যন্ত বারবার পড়তে থাকেন। তার মধ্যে খেলার খবর, পাত্র-পাত্রী নির্বাচন, দোকান ভাড়া, ঘর ভাড়ার বিজ্ঞপ্তিসহ প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয়, আজে-বাজে কোন কিছু পড়াই বাদ যায় না। অথচ কুরআন তেলাওয়াত করা, কুরআনের তাফসীর, মাসায়েলের কিতাব, ফাযায়েলের কিতাব ও অন্য আরও অনেক বিষয়ে লিখিত দ্বীনী কিতাবাদি পড়ার মধ্যে সময় ব্যয় করা যেত। তাতে ছওয়াবও হত, আমলও বৃদ্ধি পেত, সময়টা নেক কাজেও লাগত।

(দুই) অনেকের বই কিতাব পড়তে ভাল লাগে না বা কেউ কেউ আছেন যারা পড়তে পারেন না। তারা দোকানে, হাট-বাজারে, বাড়িতে বা বিভিন্ন আসরে বসে বসে গল্প-গুজব ও আড্ডায় সময় কাটান। এতে সময় অপচয়ের গোনাহ হয়, গল্প-গুজবের ফাঁকে ফাঁকে যে গীবত-শেকায়েত হয় তার গোনাহ হয়। অথচ নিয়মিত দাওয়াত-তাবলীগের কাজে সময় লাগানো, ওয়াজ ও তাফসীরের মজলিসে সময় লাগানো, যিকিরের মজলিসে যোগদান ইত্যাদি অনেকভাবে সময়কে কাজে লাগানো যেতে পারত। এত রকম নেক কাজে সময় লাগানোর অবকাশ রয়েছে যাতে সময় আর বেঁচে থাকবে না বরং সময়ের অভাব দেখা দিবে।

(তিন) অনেকে বৃদ্ধ বয়সে সময় কাটানোর জন্য আর কোন কিছু না পেয়ে সারা দিন রাত টেলিভিশন ও ভিডিও ভিসিআর দেখার কাজকেই বেছে নেন। আল্লাহ হেফাজত করুন। এভাবে যে প্রতিদিন কত গোনাহ কামাই করা হচ্ছে, বৃদ্ধ বয়সটা যে কত গোনাহের কাজে ব্যয় হচ্ছে, এটা তারা খেয়াল করছেন না। অথচ এ বয়সটা বেশি নেকী কামাই করার বয়স।

বৃদ্ধ বয়স ও আখেরাতের প্রস্তুতি

জীবনের সব সময়ই মানুষের মৃত্যুর জন্য এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। কারণ, মৃত্যু কখন আসবে তা কারও জানা নেই। তবে বৃদ্ধ বয়সে মৃত্যু আসন্ন হওয়ার বাহ্যিক আলামতও যেহেতু সুস্পষ্ট, তাই বৃদ্ধ বয়সে অবশ্যই সর্বক্ষণ মুত্যুর জন্য এবং আখেরাতের জন্য প্রস্তুত থাকা চাই। মৃত্যু ও আখেরাতের জন্য প্রস্তুতি স্বরূপ নিম্নের কয়েকটি আমল যত্নের সঙ্গে বেশি বেশি করা চাই।

১. বেশি বেশি তওবা করা।

২. সাধারণ কাযাসহ উমরী কাযা (যদি থাকে) আদায় করা।

৩. কাযা রোযা (থাকলে) আদায় করা। না পারলে ফেদিয়া আদায় করে দেয়া।

৪. অনাদায়ী হজ্জ থাকলে তা আদায় করা। শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়লে বদলী হজ্জ আদায় করানো।

৫. অসুস্থতার সময়ে যেসব দুআ ইত্যাদি আমল করতে হয় তা করা।

৬. মৃত্যুর পূর্বে যে যেসব দুআ ইত্যাদি আমল করতে হয় তা ভালভাবে মুখস্থ করা। (উল্লেখ্য, উপরোক্ত বিষয়াদি সম্বন্ধে জানার জন্য 'আহকামে যিন্দেগী' কিতাবখানি দেখা যেতে পারে।

৭. ওছিয়তনামা তেরি করে রাখা।

নিম্নে ওছিয়ত ও ওছিয়তনামা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হল।

ওছিয়তনামা প্রসঙ্গ

প্রত্যেক মুমিনের ওছিয়ত লিখে রাখা উচিত। পূর্বে ওছিয়ত লেখা না থাকলে মৃত্যু আসন্ন বুঝলে অবশ্যই ওছিয়ত লিখে রাখা চাই। উম্মত থেকে এ আমলটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। এ আমলটি যিন্দা করা চাই। হাদীছে এ বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا حَقُّ اِمْرِاٍ مُسْلِمٍ لَهٗ شَيْءٌ يُوْصِيْ فِيْهِ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهٗ مَكْتُوْبَةٌ عِنْدَهٗ. (متفق عليه. رواه البخاري في أول كتاب الوصايا حديث رقم ٢٧٣٨ ورواه مسلم في أول كتاب الوصية حديث رقم ١٦٢٧ واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোনো মুসলমানের উচিত নয় যে, তার কোনো ওছিয়ত লিখে রাখার থাকা সত্ত্বেও সে দুটি রাত এমনভাবে কাটাবে যখন তার ওছিয়তনামা তার কাছে লিপিবদ্ধ নেই। (বোখারী ও মুসলিম)

যেসব বিষয়ে ওছিয়ত করে যাওয়া চাই, নিম্নে তার বিবরণ পেশ করা হল।

* ঋণ থাকলে তা পরিশোধ এবং নামায রোযার ফিদইয়া প্রদান বা যে কোনো মালী ইবাদত অনাদায়ী থাকলে তা আদায় করার ওছিয়ত করবে। সে যদি এতটুকু সম্পদ রেখে যায় যা দ্বারা এসব আদায় করা সম্ভব, তাহলে মৃত্যুর পূর্বে এ ওছিয়ত করা ওয়াজিব। (احکام میت از در مختار)

* মৃত্যুর পর জানাযা, কবর নির্মাণ, দাফন-কাফন, ঈছালে ছওয়াব ইত্যাদির ক্ষেত্রে যে সব অনিয়ম, বিদআত ও রছম পালন করা হয়, তা থেকে ওয়ারিছ ও আপনজনকে বিরত থাকার ওয়াছিয়্যাত করে যাওয়া ওয়াজিব।

(احسن الفتاوی جـ/٤)

* পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের মধ্যে মাদ্রাসা, মসজিদ, গরীব আত্মীয়-স্বজন ইত্যাদির জন্য ওয়াছিয়্যাত করে যাওয়া মুস্তাহাব, যদি তার ওয়ারিছগণ এমনিতেই সম্পদশালী হয়ে থাকে বা এমন হয় যে, তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির মাধ্যমে তারা অনেক ধনবান হয়ে যাবে– এরূপ ক্ষেত্রেই এরকম ওছিয়ত করে যাওয়া মুস্তাহাব। অন্যথায় এরকম ওয়াছিয়্যাত না করাই উত্তম। (احکام میت)

* যদি কেউ ওছিয়ত করে যে, অমুক ব্যক্তি আমার জানাযা পড়াবে বা আমাকে অমুক স্থানে দাফন করবে, তাহলে এসব ওছিয়ত পূরণ করা ওয়াজিব নয়, তবে অন্য কোনো শরীআতসম্মত বাধা না থাকলে পূরণ করাতে কোনো অসুবিধা নেই।

* কারও অনাদায়ী যাকাত, অনাদায়ী হজ্জ থাকলে তা আদায় করার বা নামায রোযা বাকী থাকলে তার ফেদিয়া আদায় করার ওছিয়ত করে যাওয়া ওয়াজিব।

এরূপ ওয়াছিয়্যাত করে গেলে তার দাফন-কাফন ও ঋণ পরিশোধের পর যে পরিমাণ সম্পদ উদ্বৃত্ত থাকবে তার এক তৃতীয়াংশের মধ্য হতে তা আদায় করা হবে। যদি এক তৃতীয়াংশের মধ্যে তা আদায় না হয় তাহলে তা আদায় করা না করা ওয়ারিছদের ইচ্ছাধীন থাকবে। 'নামাযের ফিদইয়া', 'রোযার ফিদইয়া', 'বদলী হজ্জ' ইত্যাদি পরিচ্ছেদে এসব সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

* নিজের কাছে কারও অর্থ বা অন্য কোনো কিছু আমানত থাকলে সে বিষয়ে অবহিত করে যাওয়া চাই।

* ওয়ারিছ ও অনুসারীদেরকে দ্বীনের জরুরি বিষয়ে ওছিয়ত করে যাওয়া উত্তম।

উপরোক্ত বিবরণ অনুযায়ী সবকিছুর ওছিয়ত কীভাবে লিখে রাখতে হবে, তা অনেকের কাছে একটু কঠিন মনে হতে পারে। তাদের সুবিধার জন্য এখানে ওছিয়তনামার একটি নমুনা পেশ করা হল। একটি কাগজে এরূপ একটি নমূনা তৈরি করে বা এ কিতাব থেকে এই নমুনাটির ফটোকপি করে তা পুরণ করে রাখা যেতে পারে। লেখার পর কখনও ওয়াছিয়তনামা থেকে কোনো বিষয় কেটে দিলে তার পাশে স্বাক্ষর দিয়ে রাখা চাই। এমনিতেও ওছিয়তনামায় স্বাক্ষর দিয়ে রাখলে ভাল হবে, যেন মৃত্যু পরবর্তীতে এ বিষয়ে কোনোরূপ সন্দেহ বিরোধ সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ না থাকে।

ওছিয়তনামা

بسم الله الرحمن الرحيم

আমি ....

পিতা : .... স্বেচ্ছায় সজ্ঞানে ওছিয়ত সংক্রান্ত শরীয়তের বিধানের উপর আমল করার জন্য নিম্নোক্ত ওছিয়ত সম্পন্ন করে গেলাম। আমার উত্তরসূরীদেরকে এই মোতাবেক আমল করার জন্য নির্দেশ/অনুরোধ জানিয়ে গেলাম। আল্লাহ তাআলা আমার উত্তরসূরীদেরকে এর উপর আমল করার তাওফীক দান করেন। আমীন!

ইবাদত সংক্রান্ত:

অনাদায়ী নামায	অনাদায়ী রোযা	অনাদায়ী হজ্জ
ওয়াক্ত	টি	আছে/নেই
অনাদায়ী যাকাত	অনাদায়ী কুরবানী	অনাদায়ী ফিতরা

..........টাকা	.... বৎসরের	.... বৎসরের

আমার মৃত্যুকে কেন্দ্র করে করণীয়/বর্জনীয় বিষয় সংক্রান্ত:

১. মৃত্যুর পর যেন আমার ছবি তুলে রাখা না হয়।

২. মৃতুর পর আমার ছবি যেন ঘরে টানিয়ে রাখা না হয়।

৩. জানাযার নামাযে যেন বিলম্ব করা না হয়।

৪. যেখানে আমার মৃত্যু হয় সেখানের আশপাশের পাবলিক গোরস্থানে আমাকে দাফন করবে।

৫. আমাকে যেন সুন্নাত মোতাবেক দাফন করা হয়।

৬. আমার কবর যেন পাকা করা না হয়।

৭. আমার কবরে যেন শামিয়ানা টানানো না হয়, ফুল দেওয়া না হয়।

৮. আমার জন্য মৃত্যুর চারদিন পর কুলখানী, চল্লিশা ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদি বেদআতী অনুষ্ঠান যেন পালন করা না হয়। বরং সবসময় নিজেরা নফল নামায পড়ে, কুরআন তিলাওয়াত করে, দান-সদকা করে ঈছালে ছওয়াব করার চেষ্টা করবে।

৯. আমার মৃত পুত্র/কন্যা .... এর সন্তান/সন্তানদেরকে আমার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে .... ভাগ/........................টাকা প্রদান করবে।

১০. আমার পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থেকে মসজিদ/মাদ্রাসা/ .... কাজ–এর জন্য .... ভাগ সম্পত্তি/ .... টাকা দান করবে।

আমানত সংক্রান্ত:

যার আমানত রয়েছে তার নাম	পরিচয়	টাকা/জিনিস

যারা আমার নিকট টাকা পাবে:

পাওনাদারের নাম	পরিচয়	টাকার পরিমাণ

আমি যাদের নিকট টাকা পাব:

যার নিকট পাব তার নাম	পরিচয়	টাকার পরিমাণ

দ্বীনের জরুরী বিষয়ে ওছিয়ত:

১. তোমরা ঈমান আমলের উপর অটল থাকবে।

২. তোমরা সকলে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ঠিকমত আদায় করবে।

৩. ইসলামের অন্যান্য ফরয ও ওয়াজেবসমূহ যথাযথভাবে আদায় করবে।

৪. আমার রেখে যাওয়া অর্থসম্পদ শরীয়তের নিয়ম অনুযায়ী সঠিকভাবে বন্টন করবে। কারও প্রতি কোনোরূপ জুলুম যেন না হয়।

৫. আমার মৃত্যুর পর .... কে তোমাদের দ্বীনী মুরব্বী মেনে চলবে।

৬. বড়রা ছোটদের লেখাপড়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

৭. .... -এর প্রতি বিশেষভাবে সকলে খেয়াল রাখবে।

৮. ....

৯. ....

১০. ....

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে বৃদ্ধ জীবন সঠিকভাবে গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

পঞ্চম অধ্যায়

যদি বরকতময় জীবন গড়তে চান

পঞ্চম অধ্যায়

যদি বরকতময় জীবন গড়তে চান

বরকত শব্দের অর্থ

"বরকত" (بَرَكَة) শব্দের অর্থ হল মঙ্গল, কল্যাণ ও প্রাচুর্য। কোন জিনিসে বরকত হওয়ার অর্থ সে জিনিসের মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তায় প্রাচুর্য সাধন ও তার স্থায়িত্ব লাভ। অর্থাৎ, কোন জিনিসের ইতিবাচক দিকের গুণগত মান বৃদ্ধি পাওয়াই হচ্ছে সেই জিনিসের বরকত। যেমন– টাকা-পয়সায় বরকত হওয়ার অর্থ টাকা-পয়সা মঙ্গলময় ও কল্যাণময় কাজে ব্যবহৃত হওয়া, যে কাজে টাকা-পয়সা ব্যয়িত হবে সে কাজের মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তায় প্রাচুর্য সাধিত হওয়া এবং তার মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তা স্থায়িত্ব লাভ করা। টাকা-পয়সায় বরকত হওয়ার অর্থ পরিমাণে টাকা-পয়সা বেড়ে যাওয়া নয়, তবে কখনও সেভাবেও বরকত সাধিত হতে পারে। খাদ্য-খাবারে বরকত হওয়ার অর্থ খাদ্য-খাবার দ্বারা কাংখিত মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তা অর্জিত হওয়া এবং সেই মঙ্গলময়তা ও কল্যাণময়তা স্থায়িত্ব লাভ করা। জীবনের বয়সে বরকত হওয়ার অর্থ মঙ্গলময় ও কল্যাণময় কাজে জীবনের সময় ব্যয়িত হওয়া এবং অল্প সময়ে অনেক ভাল কাজ করতে পারা। এভাবে জীবনের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে এবং প্রত্যেকটা কাজের মধ্যে বরকত সাধিত হতে পারে। বরকতময় জীবন গড়ে উঠতে পারে, যদি আমরা বরকতময় জীবন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নির্দেশিত কুরআন-হাদীছের পন্থাসমূহ অবলম্বন করি। নিম্নে জীবনের বেশ কিছু দিকের বরকত অর্জন করার কুরআন-হাদীছ-নির্দেশিত পন্থাসমূহ উল্লেখ করা হল।

জীবনের সময়ে বরকত অর্জনের পন্থা

জীবনের সময়ে বরকত অর্জিত হয় নেক আমলের দ্বারা। যে যত বেশি নেক আমল করবে, তার জীবনের সময়ে তত বেশি বরকত হবে। হযরত ছওবান (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ ثَوْبَانَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزِيْدُ فِي الْعُمْرِإِلَّا الْبِرُّ، وَلَا يَرُدُّ الْقَدْرَ اِلَّا الدُّعَآءُ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزْقَ بِخَطِيْئَةٍ يَعْمَلُهَا. رواه ابن ماجة في باب فى القدر، والحديث حسن كذا في الزوائد، ورواه الترمذي عن سلمان في أبواب القدر – باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء برقم ٢١٣٩، وقال: حديث حسن غريب. واللفظ لابن ماجة.

অর্থাৎ, হযরত ছওবান (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুআ ব্যতীত অন্য কিছু ভাগ্যকে ফিরাতে পারে না, নেক কাজ ব্যতীত অন্য কিছু বয়সকে বাড়াতে পারে না। আর মানুষ তার কৃত পাপের কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। (ইবনে মাজা ও তিরমিযী)

ব্যাখ্যা: দুআ দ্বারা ভাগ্য পরিবর্তন হয়– এ কথার অর্থ হল ভাগ্যের যেসব বিষয় সম্পর্কে লেখা আছে যে, দুআ করা হলে তা পরিবর্তন হবে, সেগুলোরই পরিবর্তন হয়, নইলে ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না। কিংবা এখানে দুআর ক্ষমতা বোঝানো হয়েছে যে, দুআর এমন ক্ষমতা, তার ভাগ্যকে পর্যন্ত পরিবর্তন করে দিতে পারে।

তদ্রূপ বয়স বাড়ার ক্ষেত্রেও ব্যাখ্যা এই যে, যদি মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে এরূপ লেখা থাকে যে, অমুক নেক আমল করলে তার বয়স বৃদ্ধি পাবে, সে ক্ষেত্রে সেই নেক আমলের দ্বারা তার বয়স বৃদ্ধি পাবে। কিংবা এখানে বয়স বৃদ্ধি পাওয়া দ্বারা বয়সের মধ্যে বরকত হওয়ার কথা বোঝানো হয়েছে। নেক আমল দ্বারা যিন্দেগীর সময়ে বরকত হয়ে থাকে।

সম্পদে বরকত অর্জনের পন্থা

সম্পদে বরকত অর্জিত হয় সম্পদের ব্যাপারে নির্লোভ থাকার দ্বারা। সম্পদের প্রতি লোভ ও ঔৎসুক্য থাকতে পারবে না, বরং সম্পদের ব্যাপারে এই মনোভাব থাকবে যে, সম্পদ এলে তা অকাতরে দান করে দিব। এরূপ মনোভাব

থাকলে সম্পদ আসার পর তাতে বরকত হয়। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ هٰذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ، فَمَنْ اَخَذَهٗ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهٗ فِيْهِ، وَمَنْ اَخَذَهٗ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهٗ فِيْهِ. الحديث. (رواه البخاري في كتاب الزكاة باب الاستعفاف عن المسئلة برقم ١٤٧٢)

অর্থাৎ, এই সম্পদ হল বাহ্যিকভাবে আকর্ষণীয় এবং ভিতরগতভাবে মজাদার। যে ব্যক্তি মনের দানশীলতা সহকারে সম্পদ গ্রহণ করবে, তার সম্পদে বরকত হবে। আর যে ব্যক্তি মনের লোভ ও চাপে সম্পদ গ্রহণ করবে তার সম্পদে বরকত হবে না। (বোখারী)

সম্পদে বরকত অর্জিত হয় দান-সদকা দ্বারা। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করলে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করলে, দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদে বরকত হয়। এতে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। এর বিপরীত অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দেন না। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ.﴾

অর্থাৎ, সূদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

এক হাদীছে এসেছে−

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللّٰهُ. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب – باب استحباب العفو والتواضع ٢٥٨٨، ورواه الترمذي في أبواب البر والصلة – باب

ما جاء في التواضع ٢٠٢٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সদকা সম্পদকে হ্রাস করে না, ক্ষমা করা দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করেন; আর কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাওয়াজু বা বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উচুঁ করে দেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীছ থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহর রাস্তায় দান-সদকা করা হলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলে –ফরয ব্যয় হোক বা নফল ব্যয় হোক, যে পর্যায়ের ব্যয়ই হোক না কেন এই ব্যয় করলে– সম্পদ কমে না বরং আল্লাহ পাক সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। কখনও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন, কখনও সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে দেন। যখন যেভাবে বৃদ্ধি করা আল্লাহ পাক মোনাছেব মনে করেন, সেভাবেই বৃদ্ধি করে দেন। এর বিপরীত যারা সূদ বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের সম্পদকে আল্লাহ বরকতহীন করে দেন, তাদের সম্পদে বরকত হয় না। সম্পদ দ্বারা যে উদ্দেশ্য -সুখ শান্তি অর্জন করা, তা তাদের ভাগ্যে জোটে না।

হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত আর এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ إِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلَانِ فَيَقُوْلُ أَحَدُهُمَا: اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا، وَيَقُوْلُ الْاٰخِرُ: اَللّٰهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا. متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الزكاة – باب قول الله عزوجل: (فاما من اعطى واتقى إلخ) ١٤٤٢، ورواه مسلم في كتاب الزكاة – باب في المنفق والممسك ١٠١٠.

অর্থাৎ, যখনই আল্লাহ্র বান্দাগণ ভোরে ওঠে, আকাশ থেকে দুজন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাঁদের একজন বলেন হে আল্লাহ, দাও তুমি দাতাকে প্রতিদান এবং অপরজন বলেন, হে আল্লাহ, দাও তুমি কৃপণকে সর্বনাশ! (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ: أَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. متفق عليه. رواه البخاري في كتاب النفقات ٥٣٥٢، ورواه مسلم في كتاب الزكاة – باب الحث على النفقة وتبشير المنفق الخلف ٩٩٣. واللفظ للبخاري.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি ব্যয় কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত অর্জনের পন্থা

ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হয় সততার দ্বারা। একজন ব্যবসায়ী মিথ্যা বলে অচল মাল চালিয়ে দিলে বা মালের গুণগত মান সম্পর্কে মিথ্যা তথ্য দিয়ে সাময়িকভাবে বেশি লাভ করতে সক্ষম হলেও পরবর্তীতে ক্রেতা সঠিক অবস্থা অবগত হওয়ার পর উক্ত ব্যবসায়ীকে বর্জন করে থাকে। ফলে উক্ত ব্যবসায়ী উক্ত ক্রেতা থেকে ভবিষ্যতে আরও বহু দিনে যেসব লাভ অর্জন করতে সক্ষম হত তা থেকে বঞ্চিত হয়। এভাবে সততা বর্জনের কারণে সে বঞ্চিত হয়। এটাই হল তার বরকত মোচন। ক্রেতাও অসততার ফলে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়। বোখারী শরীফে হযরত হাকীম ইব্‌নে হিযাম (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَام رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:... فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. متفق عليه. رواه البخاري في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ٢٠٧٩، ورواه مسلم في كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان ١٥٣٢.

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তারা (ক্রেতা ও বিক্রেতা) উভয়ে যদি সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি পরিষ্কার করে ব্যক্ত

করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মোচন হয়ে যাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করতে যেয়ে অনেক সমফ মিথ্যা কছম করা হয় যে, এ মাল অমুক দেশের বা অমুক কোম্পানীর, অথচ সেটা সেই দেশ বা সেই কোম্পানীর নয়। এরূপ করে মালের কাটতি বাড়াতে পারলেও ব্যবসা-বাণিজ্যের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

إن أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اَلْحَلِفُ مُنَفِّقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْبَرَكَةِ. (رواه البخاري في كتاب البيوع- باب (يمحق الله الربوا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار اثيم) برقم ٢٠٨٧)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করতে শুনেছি, কছম মালের কাটতি করে তবে বরকত নষ্ট করে দেয়। (বোখারী)

খাদ্য-খাবারে বরকত অর্জনের পন্থা

খাদ্য-খাবারে বরকত অর্জন করার উদ্দেশ্যে যখন রান্না করার জন্য খাদ্য-শস্য স্টক থেকে নিবে তখন মেপে নিবে, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত না যায়। তবে স্টকে কি পরিমাণ রইল তা মেপে দেখবে না। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كِيْلُوْا طَعَامَكُمْ يُبَارَكْ لَكُمْ. (رواه البخاري في كتاب البيوع- باب ما يستحب من الكيل ٢١٢٨)

অর্থাৎ, হযরত মিক্বদাম ইবনে মা'দীকারিব (রা.) বর্ণনা করেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা তোমাদের খাদ্য-শস্য মেপে নিয়ো, তাহলে তোমাদের বরকত হবে। (বোখারী)

আল্লাহ সুয়ূতী (রহ.) বলেছেন, এর অর্থ হল খাদ্য-শস্য স্টক থেকে নেয়ার সময় মেপে নিবে, যাতে প্রয়োজনের অতিরিক্ত না যায় বা প্রয়োজনের চেয়ে কম না হয়। তবে স্টকে কি পরিমাণ রইল তা মেপে দেখবে না– সেটাকে মাপা ছাড়াই রেখে দিবে।

খাদ্য-খাবারে বরকত অর্জন করার জন্য খাবার শুরু করার পূর্বে আল্লাহর নাম নিয়ে ও আল্লাহ কর্তৃক বরকত দানের বিষয়ে দুআ করে খাবার শুরু করার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। খাদ্য-খাবার সামনে আসলেও এরূপ দুআ রয়েছে। খাদ্য-খাবার শুরু করার সময়ও এরূপ দুআ রয়েছে।

খাদ্য-খাবার সামনে এলে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করা সুন্নাত। এই দুআ পাঠ করলে খাদ্য-খাবারে বরকত হবে।

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (كتاب الأذكار عن ابن السني باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে আমাদেরকে বরকত দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (কিতাবুল আযকার)

খাদ্য-খাবার শুরু করার পূর্বে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করে নিবে। তাহলে খাদ্য-খাবারে বরকত হবে।

بِسْمِ اللّٰهِ وَبَرَكَةِ اللّٰهِ. (رواه الحاكم في المستدرک برقم ٧٢٣٦ وقال: صحيح الإسناد وأقره عليه الذهبي في التلخيص: صحيح)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র বরকতের উপর খাওয়া শুরু করছি। (মুস্তাদরকে হাকিম)

উপরোক্ত দুআটি জোরে পড়া মোস্তাহাব, যাতে অন্যরাও শুনতে পারে। (تكملة جـ/٤)

দুআটি শুরুতে পড়তে ভুলে গেলে এবং খাওয়ার মাঝে স্মরণ হলে পড়বে–

بِسْمِ اللّٰهِ أَوَّلَهٗ وَاٰخِرَهٗ. (أبو داود في كتاب الأطعمة – باب التسمية على الطعام. وفي رواية الترمذي بل في أكثر الروايات بسم الله في أوله وآخره)

অর্থাৎ, আমি এর প্রথমে ও শেষে আল্লাহ্‌র নাম নিলাম। (আবূ দাউদ)

দুধ, চা, কফি, মাঠা পান করার সময় নিম্নোক্ত দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهِ وَزِدْنَا مِنْهُ. (رواه الترمذي في أبواب الدعوات - باب ما يقول إذا اكل طعاما. وقال: حديث حسن.)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের জন্য এতে বরকত দাও এবং আমাদেরকে এটা আরও বেশি করে দাও। (তিরমিযী)

খাদ্য-খাবারে আরও বরকত হয় একত্রে খাওয়া দ্বারা। এক হাদীছে আছে–

عَنْ وَحْشِيِّ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ أَنَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! إِنَّا نَأْكُلُ وَلَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُوْنَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ. قَالَ: فَاجْتَمِعُوْا عَلٰى طَعَامِكُمْ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللّٰهِ عَلَيْهِ يُبَارَكْ لَكُمْ فِيْهِ. (رواه أبو داود في كتاب الأطعمة – باب في الاجتماع على الطعام ٣٧٦٠، ورواه ابن ماجة في أبواب الأطعمة ومتعلقاتها – باب الاجتماع على الطعام.

অর্থাৎ, হযরত ওয়াহ্শী ইব্নে হার্ব (রা.) থেকে বর্ণিত– তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর কতিপয় সাহাবী জিজ্ঞাসা করলেন ইয়া রসূলাল্লাহ! আমরা খানা খাই কিন্তু তৃপ্তি হয় না যে? তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা সম্ভবত ভিন্ন ভিন্নভাবে খানা খাও? তারা বললেন, জী। তখন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা একত্রে মিলে খানা খাও এবং আল্লাহ্র নাম নিয়ে খানা খাও, তাতে তোমাদের খাবারে বরকত দান করা হবে। (আবূ দাঊদ ও ইব্নে মাজা)

খাদ্য-খাবারে আরও বরকত হয় পড়ে যাওয়া খাদ্যের টুকরা উঠিয়ে (প্রয়োজনে ধুয়ে) খেলে। এক হাদীছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ফায়দা বয়ান করে বলেছেন, "তোমাদের জানা নেই তোমাদের খাদ্যের কোন্ অংশে বরকত রয়ে গেছে।" সেমতে হতে পারে যে অংশ পড়ে গিয়েছে, তার মধ্যেই বরকত রয়ে গেছে। অতএব সেটা তুলে খেয়ে নাও। আরও উল্লেখ্য যে, খানা খাওয়ার শেষে বরতন ও আঙ্গুল চেটে খেলে বরকত হয়। হাদীছে এসেছে–

عَنْ جَابِرٍ رضـ أَئَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَر بِلَعْقِ الْأَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ: إِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِيْ أَيِّ طَعَامِكُمْ اَلْبَرَكَةُ. رواه مسلم في

كتاب الأشربة – باب استحباب لعق الأصابع والقصعة إلخ ٢٠٣٣.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙ্গুল ও বরতন পরিষ্কার করে চেটে খেতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং বলেছেন, তোমাদের জানা নেই তোমাদের খাদ্যের কোন অংশে বরকত রয়ে গেছে। (মুসলিম)

খাদ্য-খাবারে বরকত না থাকার কারণেই আজ আমরা পূর্বের যুগের তুলনায় খাদ্য-খাবারের ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতনতা অবলম্বন করা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে খাদ্যজনিত অনেক বে-বরকতি দেখা যাচ্ছে। খাদ্য-খাবার আমাদের অনেক রকম প্রতিকূলতা বয়ে আনছে। খাদ্য-খাবার দ্বারা আমরা কাঙ্খিত সুফল লাভ করতে পারছি না। এটা খাদ্য-খাবারে বে-বরকতির পরিচয়। এই বে-বরকতির পেছনে অনেক কারণ থাকতে পারে। তার মধ্যে বে-বরকতিও একটা কারণ হয়ে থাকতে পারে।

রিযিকে বরকত অর্জনের পন্থা

রিযিকে বরকত হয় আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা দ্বারা। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সু-সম্পর্ক বজায় রাখতে গেলে তাদের জন্য অর্থ ব্যয় করতে হয়, এতে বাহ্যিকভাবে মনে হতে পারে সম্পদ হ্রাস পাবে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাতে সম্পদ হ্রাস পায় না। বাহ্যিক পরিমাণে হ্রাস পেলেও তাতে বরকত হয়। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ رضـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فيْ رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق

عليه. رواه البخاري في كتاب البيوع – باب من أحب البسط في الرزق

۲۰٦۸، ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب – باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ۲۰۰۷. واللفظ للبخاري.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজ জীবিকার বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে। (বোখারী ও মুসলিম)

এখানে উল্লেখ্য যে, আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহারের অর্থ হল তাদের হক আদায় করা। আরও উল্লেখ্য– রিযিক দ্বারা শুধু খাদ্য-খাবার উদ্দেশ্য নয়। বরং মানুষ জীবনে খাদ্য-খাবার, ধন-দৌলত, পোশাক-পরিচ্ছদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, শান্তি-নিরাপত্তা যা কিছুই ভোগ করে সবকিছুই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত।

বিবাহ-শাদিতে বরকত অর্জনের পন্থা

বিবাহ-শাদিতে বরকত হয় অতিরঞ্জিত ব্যয় বর্জন করা দ্বারা। শুআবুল ঈমান গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে–

إِنَّ أَعْظَمَ النِّكَاحِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُ مَؤُوْنَةً. (شعب الإيمان حديث رقم ٦٥٦٦)

অর্থাৎ, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, "নিশ্চয় সে বিবাহ বেশি বরকতময় যে বিবাহে ব্যয় কম।"

সম্প্রতি বিবাহ-শাদিতে বিপুল পরিমাণ সম্পদের অপচয় হয়। সেই সাথে গান-বাদ্য, ভি ডি ও বেপর্দেগী ইত্যাদি বিভিন্ন রকম পাপ কাজ করা হয়। এ সব কারণে বিবাহ-শাদির বরকত নষ্ট হচ্ছে। সাম্প্রতিক দাম্পত্য জীবনের সুখ শান্তি ব্যাপকভাবে হ্রাস পাওয়া এই বরকতহীনতার বহিঃপ্রকাশও। এছাড়াও দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তির জন্য যে নীতি গ্রহণ করা উচিত তা না করাও অন্যতম কারণ।

ইলম ও দ্বীনী চিন্তাধারায় বরকত অর্জনের পন্থা

ইলম ও দ্বীনী চিন্তাধারায় বরকত অর্জনের পন্থা হল আকাবির তথা হকপন্থী বড়দের সঙ্গে থাকা, অর্থাৎ, তাদের দ্বীনী জ্ঞান ও তাদের দ্বীনী চিন্তাধারার মধ্যে থাকা। এক হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْبَرَكَةُ مَعَ أَكَابِرِكُمْ. رواه الحاكم في المستدرك حديث رقم ٢١٠ وقال: صحيح على شرط البخاري. وأقره عليه الذهبي في التلخيص.

অর্থাৎ, হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের পূর্বসূরী হকপন্থী বড়দের সঙ্গে বরকত রয়েছে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

আকাবির তথা হকপন্থী বড়দের সঙ্গে থাকলে কীভাবে ইলম ও দ্বীনী চিন্তাধারায় বরকত হয় তার একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা শুনুন। যারা আকাবির তথা পূর্বসূরী হকপন্থীদের দ্বীনী ইলম ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি আস্থা রাখেন, তাদেরকে পূর্বসূরীদের কৃত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ব্যাপারে নতুন করে আবার ভাবতে হয় না। যেসব বিষয়ে পূর্বসূরীগণ গবেষণা ও ইজতেহাদ করে গেছেন সেসব বিষয়ে তাদেরকে আবার নতুন করে গবেষণা ইজতেহাদ করতে হয় না। ফলে তারা আরও সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃত করে যেতে পারেন। এভাবে তাদের ইলম ও দ্বীনী চিন্তাধারায় বরকত হয়। পক্ষান্তরে যারা আকাবির তথা পূর্বসূরী হকপন্থীদের দ্বীনী ইলম ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রতি আস্থা রাখেন না, পূর্বসূরীদের গবেষণা ইজতেহাদের প্রতি আস্থা রাখেন না, তাদেরকে সবকিছুই গোড়া থেকে শুরু করতে হয়, তাদের সবকিছুই আবার নতুন করে অ, ক, খ থেকে শুরু করতে হয়। যেসব বিষয়ে পূর্বসূরীগণ চিন্তা গবেষণা ও ইজতেহাদ করে গেছেন, সেসব বিষয়েও তাদেরকে নতুন করে ভাবতে হয়। ফলে তাদের জ্ঞানের পরিধি খুব বিস্তৃত হতে পারে না। তারা এ ক্ষেত্রে বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।

বস্তু ও জিনিসপত্রে বরকত হওয়ার একটি পন্থা

বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের ব্যবহৃত জিনিসপত্র, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র ও বস্তুতে বরকত হয়ে থাকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মুবারক, তাঁর জুব্বা মুবারক, ইত্যাদি বরকতের জিনিস। বিদায় হজ্জে চুল মুণ্ডনের পর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চুল মুবারকগুলো সাহাবাদের মাঝে বন্টন করে দিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরাম ভক্তিভরে সেগুলো নিজেদের কাছে হেফাজত রেখেছেন, পরবর্তীদের কাছে তা পৌঁছেছে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চুল মুবারক কাটার পর তা সাহাবাদের মধ্যে বণ্টনের কথা এবং তাঁর

উযূর পানি সাহাবাগণের গায়ে মাখানোর কথা সহীহ্ হাদীছের বর্ণনায় বিদ্যমান। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে, নবী রসূল, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের ব্যবহৃত জিনিসপত্র বরকতময়। তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট জিনিসপত্র ও বস্তুতে বরকত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে উম্মতের কারও কোনো মতবিরোধ নেই।

স্থান ও ঘর-বাড়িতে বরকত হওয়ার একটি পন্থা

নবী রসূল, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানও বরকতময়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর জন্মস্থান, তাঁর উপর প্রথম ওহী আগমন ও তাঁর সুদীর্ঘ ধ্যানমগ্ন থাকার স্থান হেরা গুহা, হাজার বার ওহী আগমনের স্থান খাদীজা (রা.)-এর গৃহ, হিজরতের সময় তাঁর আত্মগোপন থাকার স্থান গারে ছাওর, দারে আরকাম, আবূ বকর ওমর প্রমুখ সাহাবীদের গৃহ ইত্যাদি সবস্থানকেই বরকতময় জ্ঞান করা হয়। এ বিষয়েও উম্মতের মাঝে অতীতে কোনো মতবিরোধ ছিল না। সর্বপ্রথম ইব্নে তাইমিয়া (রহ.) ও তার শাগরেদ ইব্নে কাইয়্যেম (রহ.) এ বিষয়ে মতবিরোধের সূচনা করেন। তার পর সালাফিয়াগণ এ বিষয়টা প্রচারে তৎপর ভূমিকা রাখতে শুরু করেন। তাদের মতে নবী ও ওলী-আউলিয়ার স্মৃতি-বিজড়িত বস্তু দ্বারা বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ্, তবে তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভের বিষয়টি সহীহ নয় বরং তা বিদআত।

নবী, সাহাবী, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান থেকে বরকত লাভের বিষয়টির পক্ষে কুরআন, হাদীছ, ইজমা' ও কিয়াস- এই সব প্রকার দলীল বিদ্যমান। আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" কিতাবটি থেকে এ ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত কিছু তথ্য তুলে ধরছি।

কুরআন থেকে দলীল

﴿سُبْحٰنَ الَّذِیْۤ اَسْرٰی بِعَبْدِهٖ لَیْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَی الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِیْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ. الآية﴾

অর্থাৎ, মহান ঐ সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় ভ্রমণে নিয়ে যান মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত, যার আশ-পাশকে আমি বরকতময় করেছি। (সূরা বানী ইসরাঈল: ১)

﴿وَ نَجَّیْنٰهُ وَ لُوْطًا اِلَی الْاَرْضِ الَّتِیْ بٰرَكْنَا فِیْهَا لِلْعٰلَمِیْنَ.﴾

অর্থাৎ, আর আমি লূতকে উদ্ধার করে এমন এলাকায় নিয়ে যাই, যাতে জগৎবাসীর জন্য আমি বরকত রেখেছি। (সূরা আম্বিয়া: ৭১)

এই উভয় আয়াতে শাম ও বায়তুল মুকাদ্দাস এলাকাকে রবকতময় এলাকা বলে অভিহিত করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, এ এলাকা বহুসংখ্যক নবী রসূলের আগমনের এলাকা হওয়ার কারণেই সেটিকে বরকতময় এলাকা হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে। এ আয়াতদ্বয়ই আম্বিয়ায়ে কেরাম, বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি-বিজড়িত স্থান বরকতময় হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

হাদীছ থেকে দলীল

বোখারী শরীফের হাদীছে এসেছে–

عن عتبان بن مالک أنه أتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال: قد أنكر بصري وأنا أُصلي لقومي، فإذا كانت الأمطار سال الوادي الذي بيني وبينهم، لم استطع أن اتي مسجدهم فأصلي، و وددت يا رسول الله إنک تأتيني فتصلي في بيتي فأتخذه مصلى، قال: فقال له رسول االله صلى الله عليه وسلم: سأفعل إن شاء الله. قال عتبان: فغدا رسول االله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر حين ارتفع النهار... فصلى ركعتين. الحديث. متفق عليه. رواه البخاري في باب المساجد في البيوت ٤٢٥ ومسلم في كتاب الإيمان برقم ٥٤–(٣٣)

অর্থাৎ, হযরত ইত্বান ইব্নে মালেক (রা.) একবার রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম- এর কাছে এসে বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার দৃষ্টিশক্তি খারাপ হয়ে গেছে। আমি আমার গোত্রের লোকদের সঙ্গে নামায পড়তাম। বৃষ্টি হলে সেখানে যাওয়ার পথ পানিতে সয়লাব হয়ে যায়। যার ফলে আমি তাদের মসজিদে নামায পড়তে যেতে পারি না। ইয়া রসূলাল্লাহ! আমার আন্তরিক কামনা- আপনি আমার গৃহে তাশরীফ এনে (এক জায়গায়) নামায পড়বেন, সেই স্থানকে আমি আমার নামাযের স্থান বানাব। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, অচিরেই আমি তা করব। হযরত ইত্বান ইব্নে মালেক (রা.) বলেন, পরের দিন সকাল বেলা আলো পরিষ্কার হতেই আবূ বকর সিদ্দীক (রা.)কে সঙ্গে নিয়ে রসূল

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার গৃহে তাশরীফ আনলেন এবং দুই রাকআত নামায আদায় করলেন ...। (বোখারী ও মুসলিম)

এ রেওয়ায়েত থেকে স্পষ্টতই বুঝা যায় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামায পড়া স্থানে নামায পড়ে বরকত লাভ করার জন্যই তিনি এমন আবেদন করেছিলেন এবং রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা সমর্থন পূর্বক তাকে সেরূপ বরকত লাভ করার সুযোগ দিয়েছিলেন, এবং সেমতে তার বাড়িতে গিয়ে তার ইচ্ছেমত স্থানে তিনি নামায আদায় করে এসেছিলেন।

বোখারী শরীফের হাদীছে আরও এসেছে−

হযরত ইব্‌নে উমার (রা.) মক্কা মদীনার পথে সফরকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেসব স্থানে নামায পড়েছেন সেসব স্থান খুঁজে খুঁজে সেসব স্থানে নামায পড়তেন। (صحيح البخاري. باب المساجد في طريق مكة والمدينة) বলা বাহুল্য, বরকত লাভ করা ছাড়া এরূপ করার পিছনে ইব্‌নে উমার (রা.)-এর আর কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।

নাসায়ী শরীফের হাদীছে এসেছে−

عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أُتِيْتُ بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى طرفها، فركبت ومعي جبرئيل عليه السلام، فسرت فقال: انزل فصل. ففعلت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال: انزل فصل. فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله موسى عليه السلام. ثم قال: انزل فصل. فصليت. فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت إلى بيت المقدس. الحديث. (رواه النسائي في أول كتاب الصلاة حديث رقم ٤٥٠)

এ হাদীছে মে'রাজের রাতে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস যাওয়ার পথে হযরত জিব্রাঈল (আ.) কর্তৃক রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তূর পর্বতে

আল্লাহ তাআলা যেখানে মূসা (আ.)-এর সঙ্গে কথা বলেছিলেন সেখানে এবং হযরত ঈসা (আ.)-এর জন্মস্থান বাইতে লাহামে (বেতেলহামে) বোরাক থেকে অবতরণ করিয়ে নামায পড়ানোর উল্লেখ এসেছে। এটা স্পষ্টতই এসব স্থানের বরকতের কারণে। অতএব এটা স্থানের বরকতময় হওয়ার স্পষ্ট দলীল।

মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (রহ.) বলেছেন, এ হাদীছটি নাসাঈ শরীফ ছাড়াও ১০টি হাদীছের কিতাবে সহীহ সনদে বর্ণিত আছে। তার মধ্যে রয়েছে বায্যার, ইব্নে আবী হাতিম, তাবারানী, বায়হাকী প্রভৃতি। আল্লামা সুয়ূতীর খাসায়েসে কুব্রা, ঝুর্কানীর মাওয়াহেব প্রভৃতিতেও হাদীছটি উল্লেখিত হয়েছে। (ملفوظات محدث كشميرى) এসত্ত্বেও ইব্নে কাইয়্যেম যাদুল মা'আদ গ্রন্থে বলেছেন, বেতেলহামে নেমে নামায পড়ার রেওয়ায়েত মোটেই সহীহ নয়। তিনি কি নাসাঈ শরীফের সনদকেও অনির্ভরযোগ্য বলতে চান যা উম্মতের কেউ বলেননি? বরং নাসাঈ শরীফের কোন কোন সনদকে সহীহ হওয়ার ক্ষেত্রে বোখারী শরীফ থেকেও উপরের স্বীকার করা হয়েছে।

ইজমা' থেকে দলীল

ইব্নে তাইমিয়ার পূর্ব পর্যন্ত এ বিষয়ে উম্মতের ইজমা' তথা ঐক্যমত্য চলে আসছিল। অতঃপর তিনি এবং পরবর্তীতে তাঁর শাগরেদ ইব্নে কাইয়্যেম এ বিষয়ে নতুন মতের সূচনা করেন। এভাবে এক দু'জনের বিরোধ উম্মতের ইজমা'কে ক্ষতিগ্রস্ত করে না। তদুপরি তাঁদের মত কোন শক্তিশালী দলীলের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হচ্ছে।

কিয়াস থেকে দলীল

স্থান থেকে বরকত লাভের বিষয়কে বস্তু দ্বারা বরকত লাভ-এর উপর কিয়াস করা হবে। বুযুর্গানে দ্বীন ও ওলী আল্লাহ্দের স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার কারণে বস্তু যদি বরকতময় হতে পারে, তাহলে তাঁদের স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার কারণে স্থান কেন বরকতময় হতে পারবে না? তদুপরি শরীআতে স্থান বরকতময় হওয়ার নমুনাও রয়েছে। হযরত মাওলানা আনওয়ার শাহ্ কাশমীরী (রহ.) বলেন, হজ্জের সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানগুলো আম্বিয়া ও সুলাহাদের স্মৃতি-বিজড়িত হওয়ার কারণেই সেগুলো আজমত ও মর্যাদার স্থান পেয়েছে। নতুবা এ স্থানগুলোর পবিত্রতা ও মর্যাদার আর কী কারণ থাকতে পারে? এটাকে স্থানের মর্যাদাপূর্ণ হওয়া ও স্থান থেকে বরকত লাভ করা ছাড়া আর কী বলা যায়? (ملفوظات محدث كشميرى) এ কারণেই সমস্ত আকাবিরে

উম্মত ফয়সালা করেছেন যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেহেতু সমগ্র মাখলূকের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তাই তাঁর চির শায়িত থাকার পবিত্র স্থানটিও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান। অথচ ইব্‌নে তাইমিয়া (রহ.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সমগ্র মাখলূকের চেয়ে শ্রেষ্ঠ স্বীকার করা সত্ত্বেও তাঁর চির শায়িত থাকার স্থানটিকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হিসাবে স্বীকার করেননি। বরং তিনি সমূলে কোন স্থানের বরকতময় হওয়াকেই অস্বীকার করে বসেছেন। আর আফসূস সালাফী ও গায়রে মুকাল্লিদগণও এই মতবাদ পোষণ করে চলেছেন।

সালাফীগণ যারা স্থানের বরকতময় হওয়াকে অস্বীকার করেন, তাদের দলীল ও তার জওয়াব সম্বন্ধে জানার জন্য আমার রচিত "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" কিতাবটি দেখা যেতে পারে। আলোচনা দীর্ঘ হওয়ার আশংকায় তার উল্লেখ থেকে বিরত থাকা গেল।

সর্বক্ষেত্রে বরকত অর্জনের ব্যাপক পন্থা

এতক্ষণ জীবনের বিভিন্ন দিকের বরকত অর্জনের পন্থা সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। আর কিছু এমন বিষয় রয়েছে যার দ্বারা জীবনের সবক্ষেত্রে বরকত অর্জন হবে। সে বিষয়গুলো হল ঈমান, তাকওয়া ও দুআ। কুরআনের কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ.﴾

অর্থাৎ, নগরবাসীরা যদি ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও জমিন থেকে বরকতের দুয়ার খুলে দিতাম। (সূরা আরাফ: ৯৬)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে ঈমান ও তাকওয়া-পরহেযগারির জীবন পদ্ধতি অবলম্বন করলে আল্লাহ তাআলা সবদিক থেকে বরকতের দুয়ার খুলে দিবেন।

দুআ দ্বারাও জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বরকত অর্জিত হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে বরকতের জন্য দুআ করতেন। এক হাদীছে এসেছে, তিনি এভাবে দুআ করতেন—

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ مَدِيْنَتِنَا، وَفِيْ ثِمَارِنَا، وَفِيْ مُدِّنَا، وَفِيْ صَاعِنَا بَرَكَةً مَعَ بَرَكَةٍ. وَفِيْ رِوَايَةٍ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْ شَامِنَا وَفِيْ يَمَنِنَا. (متفق عليه)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায় বরকত দাও, আমাদের ফল ফসলে বরকত দাও, আমাদের মাপের পাত্র মুদ্দ ও সা'-য়ে বরকত দাও। বরকতের উপর বরকত দাও। (অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে) হে আল্লাহ! আমাদের শাম দেশে বরকত দাও, আমাদের ইয়ামান দেশে বরকত দাও। (বোখারী ও মুসলিম)

পূর্বে বর্ণিত হয়েছে খাদ্য-খাবারে বরকত হওয়ার খানা সামনে আসলে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুআ করতেন–

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْمَا رَزَقْتَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. (كتاب الأذكار عن ابن السني باب ما يقول إذا قرب إليه طعامه)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি আমাদেরকে যে রিযিক দান করেছ তাতে আমাদেরকে বরকত দাও এবং জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (কিতাবুল আযকার)

অন্যের রিযিকে বরকত হওয়ার জন্যও নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দুআ করতেন। এক হাদীছে সেরূপ একটি দুআ এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِيْمَا رَزَقْتَهُمْ وَاغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ. (رواه الترمذي في سننه باب الدعاء في الضيف ٣٥٧٦)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তাদেরকে যে রিযিক দিয়েছ তাতে বরকত দাও, তাদেরকে ক্ষমা এবং তাদের প্রতি রহমত কর। (তিরমিযী)

পরিবার ও সন্তানাদিতে বরকত হওয়ার জন্য হাদীছ শরীফে এরূপ দুআ করার কথা বর্ণিত হয়েছে,

(اَللّٰهُمَّ) بَارِكْ لَنَا فِيْ أَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُلُوْبِنَا وأَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا، وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمِ. (رواه الحاكم في المستدرک برقم ١٠٠٥ وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ, আমাদের কান, চোখ, অন্তর এবং আমাদের বিবি ও সন্তানদের মধ্যে বরকত দান কর এবং আমাদের তওবা কবূল কর। তুমিই তো তওবা কবুলকারী, অতি দয়ালু। (মুস্তাদরকে হাকিম)

এ অধ্যায়ের আলোচনার সারকথা হল–

* নেক আমলের দ্বারা জীবনের সময়ে বরকত হয়।
* সম্পদের ব্যাপারে নির্লোভ থাকার দ্বারা সম্পদে বরকত হয়।
* দান–সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়।
* সততার দ্বারা ব্যবসা-বাণিজ্যে বরকত হয়।
* খাদ্য-শস্য স্টক থেকে নেয়ার সময় মেপে নেয়া, স্টকে কি পরিমাণ রইল তা মেপে না দেখা– এতে বরকত হয়।
* খাবার শুরু করার পূর্বে আল্লাহর নাম নিয়ে এবং বরকতের দুআ করে খেলে খাদ্য-খাবারে বরকত হয়।
* একত্রে খাওয়া দ্বারা খাদ্য-খাবারে বরকত হয়।
* আত্মীয়-স্বজনের সাথে সু-সম্পর্ক বজায় রাখা দ্বারা রিযিকে বরকত হয়।
* অতিরঞ্জিত ব্যয় বর্জন করা দ্বারা বিবাহ-শাদিতে বরকত হয়।
* আকাবির তথা হকপন্থী বড়দের দ্বীনী চিন্তাধারার মধ্যে থাকলে ইলম ও দ্বীনী চিন্তাধারায় বরকত হয়।
* নবী রসূল, বুযুর্গানে দ্বীন ও অলী-আউলিয়ার সংস্পর্শ দ্বারা জিনিসপত্রে বরকত হয়।
* নবী রসূল, বুযুর্গানে দ্বীন ও অলী-আউলিয়ার সংস্পর্শ দ্বারা স্থান ও ঘর-বাড়িতে বরকত হয়।
* ঈমান ও তাকওয়ার ওপর থাকলে জীবনের সবক্ষেত্রে বরকত হয়।
* দুআর দ্বারা জীবনের সবকিছুতে বরকত হয়। জীবনের সবকিছুতে বরকতের জন্য দুআ করা চাই।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলের জীবনের সবকিছুকে বরকতময় করে দিন। আমীন!

ষষ্ঠ অধ্যায়

যদি সমৃদ্ধ জীবন গড়তে চান

ষষ্ঠ অধ্যায়
যদি সমৃদ্ধ জীবন গড়তে চান

সমৃদ্ধ শব্দের অর্থ

সমৃদ্ধ শব্দটি 'সমৃদ্ধি'-র বিশেষণ। 'সমৃদ্ধি'-র অর্থ হল ঐশ্বর্যশালী হওয়া, উন্নত হওয়া, যথেষ্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়া। অতএব সহজে বলা যায় যিনি যথেষ্ট সম্পদ, জ্ঞান ইত্যাদির অধিকারী তিনি হলেন সমৃদ্ধ। সমৃদ্ধি সম্পদের ক্ষেত্রেও হতে পারে জ্ঞানের ক্ষেত্রেও হতে পারে। আবার জাগতিক উপায়-উপকরণে উন্নত হলেও সমৃদ্ধ আখ্যায়িত করা হয়। এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে সমৃদ্ধ শহর। এছাড়াও নৈতিক চরিত্রে সমৃদ্ধ হওয়া, বিভিন্ন গুণে সমৃদ্ধ হওয়া ইত্যাদি অনেক রকম সমৃদ্ধি রয়েছে। আমরা এখানে শুধু সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করব।

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতি হল ১০টি। তবে উল্লেখ্য যে, এখানে সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার যে উপায় ও পদ্ধতি বলা হবে তার অর্থ সম্পদের পরিমাণই

বৃদ্ধি নয়। কাজেই কোন পাঠকের এ কথা মনে করার অবকাশ নেই যে, এই ১০টি বিষয়ে আমল করতে পারলেই লক্ষ লক্ষ বা কোটি কোটি টাকার মালিক হওয়া যাবে নিঃসন্দেহে। বরং সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধিও হতে পারে, সম্পদের কার্যকারিতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাওয়াও হতে পারে। ইসলামের দৃষ্টিতে সম্পদের সমৃদ্ধি সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে আবার সম্পদের পরিমাণ নয় বরং সম্পদের কার্যকারিতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাওয়ার মাধ্যমেও হতে পারে। এই সম্পদের কার্যকারিতা ও গুণগত মান বৃদ্ধি পাওয়াকে ইসলামের পরিভাষায় সাধারণত ‘বরকত’ বলে আখ্যায়িত করা হয়ে থাকে। অতএব সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার অর্থ সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া বা সম্পদের বরকত বৃদ্ধি পাওয়া। বস্তুত সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়া সম্পদের মূল উদ্দেশ্য নয়। বরং সম্পদের মূল উদ্দেশ্য হল সম্পদ কাজে লাগা, সম্পদ দ্বারা কাংখিত উপকারিতা লাভ হওয়া। সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পেল কিন্তু সেই সম্পদ অকাজে অখাতে উড়ে গেল, তাহলে সেরূপ সম্পদ পেয়ে কোনো লাভ নেই, সেরূপ সম্পদ কামনা করা অনর্থক। এর বিপরীত সম্পদের পরিমাণ যা-ই হোক তা কাজে লাগল উপকারে এল, তাহলে সেই সম্পদ লাভজনক, সেরূপ সম্পদ কাম্য। তাই ইসলামের দৃষ্টিতে শুধু সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়াকে তেমন গুরুত্বের মনে করা হয় না বরং সম্পদের বরকতকেই গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়। পূর্বের অধ্যায়ে সম্পদে বরকত লাভের উপায় সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হয়েছে। এ অধ্যায়ে সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার আরও ১০টি উপায় ও পদ্ধতি বর্ণনা করা হল। সে ১০টি উপায় ও পদ্ধতি হল–

সমৃদ্ধি অর্জনের পন্থা

(১) তাকওয়া

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের একটি হল তাকওয়া। “যদি খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার রূপে জীবন গড়তে চান” নামক শিরোনামে তাকওয়ার অর্থ ও বিস্তারিত ব্যাখ্যা পেশ করা হয়েছে। সংক্ষেপে তাকওয়া হল আল্লাহর ভয় ও সেই ভয়ে সব রকম গোনাহ থেকে বিরত থাকা। তাকওয়ার অনেক ফায়দা। তার মধ্যে একটি ফায়দা হল তাকওয়া দ্বারা ধারণাতীত পন্থায় রিযিক লাভ হয়। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّيْ لَأَعْلَمُ اٰيَةً لَوْ اَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتْهُمْ – ﴿وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ

يَحْتَسِبُ.﴾ رواه الدارمي في كتاب الرقاق – باب في تقوى الله حديث رقم ٢٧٢٥. ورواه أحمد في مسنده حديث رقم ١٧٨/٥، ورواه ابن حبان في صحيحه برقم ٦٦٦٩.

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি এমন একটি আয়াত জানি, যদি লোকেরা সেটাকে ধারণ করত, তাহলে তা-ই তাদের জন্য যথেষ্ট হত। আয়াতটি হল–

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهٗ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.﴾

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে চলে, আল্লাহ তার মুক্তির পথ করে দেন এবং তাকে এমন জায়গা থেকে রিযিক দান প্রদান করেন যার সে ধারণাও করতে পারে না। (সুনানে দারিমী, মুসনাদে আহমদ ও সহীহ ইব্‌নে হিব্বান)

(২) তাওয়াক্কুল

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল তাওয়াক্কুল। তাওয়াক্কুল অর্থ আল্লাহর উপর ভরসা। আল্লাহ্‌র ইচ্ছা ব্যতীত কোনো কিছু হতে পারে না। তাই শরীয়তের নিয়মানুযায়ী যে কোনো চেষ্টা-তদবীর গ্রহণ করার পর কামিয়াবির জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখতে হবে। এরূপ ভরসা রাখাকে বলা হয় তাওয়াক্কুল। উল্লেখ্য যে, চেষ্টা-তদবীর না করে হাত পা গুটিয়ে অকর্মন্য হয়ে বসে থাকা বা চেষ্টা না করে ফলের আশা করা শরীয়তের বিধান নয় এবং এটাকে তাওয়াক্কুল বলাও হয় না। বরং নিয়মমত চেষ্টা-তদবীর করে, নিয়মমত আসবাব গ্রহণ করে তার ফলের জন্য এবং কামিয়াবির জন্য মনে মনে আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখাকেই বলা হয় তাওয়াক্কুল।

তাওয়াক্কুলের অনেক ফায়দা রয়েছে। তন্মধ্যে একটি ফায়দা বয়ান করে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ

تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذي في أبواب الزهد – باب في التوكل على الله برقم ٢٣٤٤، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথ তাওয়াক্কুল কর, তাহলে তিনি তোমাদেরকে অনুরূপ রিযিক দান করবেন, যেরূপ পাখীকে রিয্‌ক দিয়ে থাকেন– তারা ভোর বেলায় খালি পেটে বের হয়, দিনের শেষে ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে। (তিরমিযী)

(৩) সূরা ওয়াক্বেয়ার আমল

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল সূরা ওয়াক্বেয়া পাঠ করা। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে অনাহারে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তার রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন। হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ يُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا. وَكَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ يَقْرَأْنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ. رواه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم ٢٤٩٩. ورواه من المتقدمين ابن وهب في جامعه وأبو عبيد في فضائل القرآن، كما في بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن ابن القطان جـ/٤ صـ ٦٦٢، وإسناده مما يحتمل في الفضائل، واستنكار أحمد راجع إلى ضعف الإسناد على ما هو الظاهر.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে কখনও দারিদ্রে পতিত হবে না। (বর্ণনাকারী বলেন,) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) তাঁর কন্যাদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা পাঠ করতে বলতেন। (শুআবুল ঈমান)

(৪-৫) হজ্জ ও উমরা

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল হজ্জ আর একটি হল উমরা। হজ্জ ও উমরা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়। হজ্জ ও উমরা গোনাহকে যেমন মোচন করে, তেমনি অভাবকেও মোচন করে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ (ابْنِ مَسْعُوْدٍ) رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَابِعُوْا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ، كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ وَالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، وَلَيْسَ لِلْحَجِّ الْمَبْرُوْرِ ثَوَابٌ دُوْنَ الْجَنَّةَ. رواه النسائي في كتاب المناسک – فضل المتابعة بين الحج والعمرة ٢٦٣١.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, একাধারে হজ্জ ও উমরা করতে থাক। এটা পাপ ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন আগুন লোহা এবং সোনা রূপার ময়লা দূর করে দেয়। আর হজ্জে মাবরূর (অর্থাৎ, যে হজ্জ গোনাহ এবং খারাবী থেকে পবিত্র হয়।)–এর একমাত্র পুরস্কার হল জান্নাত। (নাসায়ী)

অনেকের এরকম ওয়াছওয়াছা হয় যে, হজ্জের জন্য এতগুলো টাকা খরচ করে ফেলব, এটা দিয়ে আরও কিছু দিন একটা ব্যবসা-বাণিজ্য করি, তাতে লাভ হবে, সেই লাভের টাকা দিয়ে হজ্জ করব। দেখা গেল টাকার মায়ায় তিনি হজ্জকে পিছিয়ে দিচ্ছেন। অনেকে তো টাকা কমে যাওয়ার আশংকায় কোনদিনই হজ্জ করতে যাচ্ছেন না। এসব লোকদের মনে রাখতে হবে হজ্জ ওমরাহ্ করলে টাকা-পয়সা কমে না বরং বাড়ে। এ হাদীছ থেকে পরিষ্কার বুঝা গেল হজ্জ ওমরা করলে অর্থ কমবে না বরং বাড়বে, অভাব আসবে না বরং অভাব মোচন হবে। দুনিয়াতে এরকম বহু আল্লাহর বান্দা আছেন যারা প্রতি বছর হজ্জ করেন, ওমরাহ্ করেন। আলহাম্‌দু লিল্লাহ্ প্রতি বছর তাদের অর্থের ব্যবস্থা হয়ে যায়। তাদের অভাব বাড়ে না বরং কমে, তাদের টাকা-পয়সা কমে না বরং বাড়ে। হাদীছের কথা তো মিথ্যা নয়। আমার আকীদা-বিশ্বাসে যদি দুর্বলতা থাকে তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কথায় বিশ্বাস করে আমল করা শুরু করলে ইন্‌শাআল্লাহ্ আল্লাহ পাক হজ্জ ওমরা আদায়কারী ব্যক্তির সম্পদে বরকত দান করবেন। সম্পদে বরকত হওয়ার কথা যদি নাও থাকত, তবুও হজ্জের যে ফায়দার কথা বলা হয়েছে, হজ্জের পুরস্কার হল জান্নাত, তদুপরি হজ্জের ছওয়াবের মধ্যে আরও বলা হয়েছে,

عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا: مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ.

(متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الحج– باب فضل الحج المبرور ١٥٢١، ورواه

مسلم في كتاب الحج حديث رقم ١٣٥٠، واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, যখন কেউ আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে গোনাহ মুক্ত হজ্জ করে সেই হজ্জ থেকে ফিরে আসে, সে যেন মায়ের পেট থেকে সদ্য ভুমিষ্ট সন্তানের মত নিস্পাপ ও নিঃকলুষ হয়ে ফিরে আসে। (বোখারী ও মুসলিম) এসব ছওয়াবের দিকে তাকালে হজ্জ ফরয হওয়ার পর হজ্জের জন্য লক্ষ কেন কোটি টাকা ব্যয় করতেও দ্বিধা আসার কথা নয়। (বোখারী ও মুসলিম)

(৬-৭) যাকাত ও দান-সদকা

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল যাকাত আর একটি হল সাধারণ দান-সদকা। যাকাত ও দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়। আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী সম্পদ ব্যয় করলে, আল্লাহর রাস্তায় সম্পদ ব্যয় করলে, দ্বীনের কাজে সম্পদ ব্যয় করলে সম্পদ কমে না বরং বাড়ে। এর বিপরীত অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করলে সে সম্পদে আল্লাহ পাক বরকত দেন না বরং তার বরকত মোচন করে দেন।

সুদী কারবারে বরকত মোচন হওয়া এবং দান-সদকা দ্বারা বরকত লাভ হওয়ার বিষয়ে কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ.﴾

অর্থাৎ, সুদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ مَآ اٰتَيْتُمْ مِّنْ زَكٰوةٍ تُرِيْدُوْنَ وَجْهَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, অর্থাৎ, তোমরা যাকাত (ইত্যাদি) যা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দিবে এসব লোকেরাই (তাদের ছওয়াব) বৃদ্ধি করতে থাকে। (সূরা রূম: ৩৯)

এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ، وَمَا زَادَ اللّٰهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلاَّ عِزًّا، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلّٰهِ إِلاَّ رَفَعَهُ اللّٰهُ. رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب – باب استحباب العفو والتواضع ٢٥٨٨، ورواه الترمذي في أبواب البر والصلة – باب ما جاء في التواضع ٢٠٢٩، وقال: هذا حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم..

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সদকা সম্পদকে হ্রাস করে না, ক্ষমা করা দ্বারা আল্লাহ বান্দার ইজ্জত বৃদ্ধি করেন; আর কেউ আল্লাহর উদ্দেশ্যে তাওয়াজু বা বিনয় অবলম্বন করলে আল্লাহ তার মর্যাদাকে উচুঁ করে দেন। (মুসলিম ও তিরমিযী)

উপরোক্ত আয়াতদ্বয় ও হাদীছ থেকে বুঝা যায়, আল্লাহর রাস্তায় দান- সদকা করা হলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করা হলে –ফরয ব্যয় হোক বা নফল ব্যয় হোক, যে পর্যায়ের ব্যয়ই হোক না কেন এই ব্যয় করলে– সম্পদ কমে না বরং আল্লাহ পাক সম্পদ বৃদ্ধি করে দেন। কখনও সম্পদের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেন, কখনও সম্পদের বরকত বৃদ্ধি করে দেন। যখন যেভাবে বৃদ্ধি করা আল্লাহ পাক মোনাছেব মনে করেন, সেভাবেই বৃদ্ধি করে দেন। এর বিপরীত যারা সুদ বা অবৈধ উপায়ে সম্পদ উপার্জন করে, তাদের সম্পদকে আল্লাহ বরকতহীন করে দেন, তাদের সম্পদে বরকত হয় না। সম্পদ দ্বারা যে উদ্দেশ্য –সুখ শান্তি অর্জন করা– তা তাদের ভাগ্যে জোটে না। দেখা যায় সব সময় তাদের পেরেশানী লেগে আছে, টেনশনের পর টেনশন লেগে আছে। তাদের সম্পদ ভাল ও কাংখিত কাজে লাগে না। অতএব দেখা গেল যাকাত দিলে, আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করলে আখেরাত ও দুনিয়া উভয় জগতের ফায়দা।

দান-সদকা দ্বারা সম্পদে বরকত হয়– এ সম্বন্ধে অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ: أَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. متفق عليه. رواه البخاري في كتاب النفقات

٥٣٥٢، ورواه مسلم في كتاب الزكاة – باب الحث على النفقة وتبشير المنفق الخلف ٩٩٣. واللفظ للبخاري.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি ব্যয় (দান) কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব (অর্থাৎ, তোমার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিব)। (বোখারী ও মুসলিম)

(৮) আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ رضـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. متفق عليه.

رواه البخاري في كتاب البيوع – باب من أحب البسط في الرزق ٢٠٦٨، ورواه مسلم في كتاب البر والصلة والأدب – باب صلة الرحم وتحريم قطيعتها ٢٥٥٧. واللفظ للبخاري.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি নিজ জীবিকার বৃদ্ধি ও দীর্ঘায়ু লাভ কামনা করে, সে যেন আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে উত্তম ব্যবহার করে। (বোখারী ও মুসলিম)

উল্লেখ্য– রিযিক দ্বারা শুধু খাদ্য-খাবার উদ্দেশ্য নয়। বরং রিযিক কথাটি অনেক ব্যাপক। মানুষ জীবনে খাদ্য-খাবার, ধন-দৌলত, পোশাক-পরিচ্ছদ, জ্ঞান-বুদ্ধি, শান্তি-নিরাপত্তা, সন্তান-সন্ততি যা কিছুই লাভ ও ভোগ করে সবই রিযিকের অন্তর্ভুক্ত। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা দ্বারা এই সব ধরনের রিযিকেই বরকত লাভ হয়। এখানে আরও উল্লেখ্য যে, আত্মীয়- স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা দ্বারা শুধু আসা-যাওয়া, খোশালাপ ও সৌজন্য রক্ষাই উদ্দেশ্য নয় বরং আত্মীয়-স্বজনের যাবতীয় হক বা অধিকার আদায় করাই হল আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। প্রয়োজনে আত্মীয়-স্বজনকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করাও এই সু-সম্পর্ক বজায় রাখার অন্তর্ভুক্ত।

(৯) ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে সততা রক্ষা করা

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে সততা রক্ষা করা। এক হাদীছ শরীফে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَام رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:... فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِيْ بَيْعِهِمَا، وإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا. متفق عليه. رواه البخاري في كتاب البيوع باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا ٢٠٧٩، ورواه مسلم في كتاب البيوع باب الصدق في البيع والبيان ١٥٣٢.

অর্থাৎ, হযরত হাকীম ইবনে হিযাম (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তারা (ক্রেতা ও বিক্রেতা) উভয়ে যদি সত্য বলে এবং দোষ-ত্রুটি পরিষ্কার করে ব্যক্ত করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ে বরকত হবে। আর যদি মিথ্যা বলে এবং গোপন করে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত মোচন হয়ে যাবে। (বোখারী ও মুসলিম)

যদিও বাহ্যিকভাবে মিথ্যা বলা দ্বারা মালের কাটতি বৃদ্ধি ও সাময়িক লাভ দেখা যায়, কিন্তু তাতে সম্পদের বরকত নষ্ট হয়ে যায়। এভাবে এক সময় না এক সময় ক্রেতাদের কাছে বিক্রেতার প্রতারণা ধরা পড়ে। তখন ক্রেতা তার থেকে নিজেও আর মাল ক্রয় করে না অন্য আরও অনেক ক্রেতাকে সে বিষয়টা জানিয়ে দেয়। ফলে ভবিষ্যতে ঐ বিক্রেতার ব্যবসায় মন্দা দেখা দেয়।

(১০) আয়-উপার্জনে হালাল পন্থার উপর থাকা

সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার উপায় ও পদ্ধতিসমূহের আর একটি হল আয়-উপার্জনে হালাল পন্থার উপর থাকা। পূর্বে কুরআনের আয়াত উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقٰتِ.﴾

অর্থাৎ, সুদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা বাকারাঃ ২৭৬)

এ আয়াতে সূদী কারবারে বরকত মোচন হয়ে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে। সুদের ন্যায় আয়-উপার্জনের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কেও একই কথা। আয়-উপার্জনের হালাল পন্থাতেই রয়েছে বরকত, হারাম পন্থায় রয়েছে বে-বরকতী।

সমৃদ্ধ জীবন গড়ার পদ্ধতি সম্পর্কিত আমাদের আলোচনার সার- সংক্ষেপে কথা হল– সমৃদ্ধ জীবন গড়তে চাইলে ১০টি পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। যথা:–

১. তাকওয়া।

২. তাওয়াক্কুল।

৩. সূরা ওয়াক্বেয়ার আমল।

৪. হজ্জ।

৫. উমরা।

৬. যাকাত।

৭. দান-সদকা।

৮. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা। তথা তাদের হকসমূহ আদায় করা।

৯. ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে সততা রক্ষা করা।

১০. আয়-উপার্জনে হালাল পন্থার উপর থাকা।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে সমৃদ্ধ জীবন গড়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

সপ্তম অধ্যায়

যদি টেনশনমুক্ত জীবন গড়তে চান

সপ্তম অধ্যায়
যদি টেনশনমুক্ত জীবন গড়তে চান

টেনশন-এর অর্থ

"টেনশন" (Tension) অর্থ মানসিক চাপ, মানসিক চাপা উত্তেজনা, মানসিক পীড়ন ইত্যাদি। দুশ্চিন্তা, উদ্বেগ, ভয়মিশ্রিত ভাবনা ইত্যাদি মানসিক অবস্থাগুলোও অনেকটা টেনশনের কাছাকাছি বা টেনশন-সংশ্লিষ্ট। যেমন– কেউ তার সন্তানকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাল। তারপর তার মধ্যে ভাবনা জাগল হায়রে ও যদি পথিমধ্যে কোথাও কোন গাড়ির তলে পড়ে! এখন বিশ্লেষণ করুন। তার সন্তানের ব্যাপারে তার মধ্যে একটা খারাপ চিন্তা জাগল, এতটুকু হল দুশ্চিন্তা। তার সন্তানের জীবনের ব্যাপারে তার মধ্যে ভয় জাগল, এতটুকু হল ভয়মিশ্রিত ভাবনা বা উদ্বেগ। এবং এরূপ দুশ্চিন্তা ও ভয়মিশ্রিত ভাবনার কারণে তার মধ্যে যে মানসিক চাপ সৃষ্টি হল এবং সে কারণে সে মনে মনে পীড়া পেতে থাকল এটা হল টেনশন।

টেনশনের প্রকার ও প্রতিকার

বহু কারণে টেনশন সৃষ্টি হতে পারে। টেনশন-এর রয়েছে বহু ধরন ও প্রকার। ধরন ও প্রকারভেদে টেনশনের প্রতিকার-ব্যবস্থাও ভিন্ন ভিন্ন। নিম্নে বিশদভাবে টেনশনের ১৫টা প্রকার ও তার প্রতিকার-ব্যবস্থা উল্লেখ করা হল। টেনশন-এর এসব প্রতিকার-ব্যবস্থা অবলম্বন করলেই আপনি টেনশন থেকে মুক্তি পাবেন, টেনশন-মুক্ত জীবন গড়তে পারবেন ইনশাআল্লাহ।

(এক) ভিত্তিহীন কারণে টেনশন

এক প্রকার টেনশন হল এমন কারণে টেনশন যে কারণের সত্যিকার কোনো ভিত্তি নেই। যেমন– কেউ এই টেনশন করল যে, আমার অফিসের বা আমার ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের অমুক কর্মকতা কর্মচারী বোধ হয় আমার টাকা-পয়সা মেরে খাচ্ছে। আমার অমুক অধীনস্থ হয়তো আমার কোন ক্ষতি করার চেষ্টা করছে। এসব ভেবে অহেতুক টেনশন ভোগ করতে থাকল। কিংবা যেমন– কোন স্বামী হয়তো দুশ্চিন্তা করল আমার স্ত্রী বোধ হয় অসৎ পথে চলছে, স্ত্রী দুশ্চিন্তা করল আমার স্বামী বোধ হয় বিপথে অগ্রসর হচ্ছে। এভাবে দুশ্চিন্তা টেনশনের কারণে তাদের মধ্যকার মন-খোলা আদর-সোহাগ চর্চা ক্ষতিগ্রস্ত হল, সুসম্পর্ক বিনষ্ট হল, জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠল। কিংবা যেমন– অনেকের মনে এরকম দুশ্চিন্তা এবং টেনশনও হয় যে, বাড়িতে স্ত্রী ছেলে-মেয়ে রয়েছে, আমি নেই, যদি ঘরে আগুন লাগে, কিংবা যদি ঘরে ডাকাত ঢোকে, অথবা কাউকে কারেন্টে ধরে, কিংবা আমার ছেলে-মেয়েকে যদি কেউ মারধর করে ইত্যাদি। এররকম অহেতুক ও ভিত্তিহীন দুশ্চিন্তা ও টেনশনের কোন শেষ নেই। বহু ক্ষেত্রে এবং বহু বিষয় নিয়ে এরূপ ভিত্তিহীন দুশ্চিন্তা টেনশন হতে পারে।

প্রতিকারঃ এ ধরনের টেনশনের প্রতিকার হল–

১. এসব দুশ্চিন্তার পেছনে প্রকৃতপক্ষেই যদি কোন দলীল বা সুস্পষ্ট লক্ষণ থাকে, তাহলে অবশ্যই উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় অনেকে কোনো দলীল বা সুস্পষ্ট লক্ষণ ছাড়াই অহেতুক দুশ্চিন্তা করে, অহেতুক টেনশনে ভোগে। শয়তানই মানুষকে পেরেশান করার জন্য এরূপ দুশ্চিন্তা ভিতরে জাগিয়ে দেয়। কারণ কোন মানুষ পেরেশান থাকলে তার ইবাদত-বন্দেগী সবকিছুই নষ্ট হবে। এজন্যই শয়তান মানুষকে পেরেশান করার উদ্যোগ নিয়ে থাকে আর এ জাতীয় ওয়াছওয়াছা দিয়ে মানুষকে পেরেশান করে তুলে থাকে। তাই এরূপ দুশ্চিন্তা জাগলে শয়তানের ওয়াছওয়াছা দূর করার জন্য اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ পড়ে নিতে হবে।

২. এরূপ দুশ্চিন্তা জাগলে একথাও স্মরণে আনতে হবে যে, দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারও প্রতি কোন কুধারণা করা পাপ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوْا.﴾

অর্থাৎ, নিশ্চয় কতক ধারণা (অর্থাৎ, দলীল-প্রমাণ ছাড়া কুধারণা) পাপ। তোমরা (কারও) গোপন দোষ সন্ধান কর না। (সূরা হুজুরাত: ১২)

অতএব কারও ব্যাপারে দলীল-প্রমাণ ছাড়া সন্দেহ তথা খারাপ ধারণা হলে হলে তখন এই আয়াতের বক্তব্যও স্মরণ করতে হবে যে, এরূপ ধারণা নাজায়েয। এই নাজায়েয কর্ম থেকে আমার বিরত থাকা উচিত।

৩. নিজের অনুপস্থিতিতে কোন বিপদ-আপদ ঘটার দুশ্চিন্তা জাগলে মনে করতে হবে আমি উপস্থিত থাকলেই কি বিপদ ঠেকাতে পারতাম? আসলে বিপদ ঠেকাতে পারেন একমাত্র আল্লাহ। আমি যে পর্যায়ের অভিভাবক আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম অভিভাবক। এ কথা চিন্তা করে এ জাতীয় কোন দুশ্চিন্তা জাগলেই মনে মনে অর্থ খেয়াল করে পড়ে নিন—

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি কত উত্তম অভিভাবক! (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

৪. তাকদীর সম্পর্কিত হাদীছের নিম্নোক্ত বক্তব্যও স্মরণ করুন— রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، وَ وَأَنَّ مَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ. (رواه أبو داود في باب في القدر ٤٦٨٧، ورواه ابن حبان برقم ٧٢٧)

অর্থাৎ, তোমার যা ঘটার তা এমন নয় যে, ঘটবে না, আর যা তোমার না ঘটার তা এমন নয় যে, ঘটবে। (আবূ দাঊদ, ইবনে মাজা ও ইবনে হিব্বান)

(দুই) ছোট্ট জিনিসকে বড় করে ভাববার কারণে সৃষ্ট টেনশন

আর এক প্রকার টেনশন হল যা কোন একটা ছোট্ট জিনিসকে বড় করে ভাববার কারণে কিংবা সহজকে জটিল করে ভাববার কারণে সৃষ্টি হয়। যেমন— একটু বুকে ব্যথা হল, ব্যস দুশ্চিন্তা শুরু করল যে, বোধ হয় হার্টে সমস্যা হয়ে গেছে। রীতিমত টেনশনে পড়ে গেল। অথচ দেখা যাবে সেটা হয়তো সামান্য গ্যাসের

কারণেই হয়েছে। কারও সঙ্গে সামান্য কিছু নিয়ে বিরোধ ঘটল, ব্যস দুশ্চিন্তা শুরু করে দিল যে, সে কি আমাকে হত্যার পরিকল্পনা করবে বা আমাকে কেসে ফাঁসাবে। এ নিয়ে রীতিমত টেনশন শুরু করে দিল। অথচ সে লোকটা হয়তো ইতিমধ্যে এমন ছোট্ট ব্যাপার রীতিমত ভুলেই গিয়েছে।

প্রতিকার: এ ধরনের টেনশনের প্রতিকার হল–

১. এরূপ টেনশন আসা শুরু করলেই প্রথমে চিন্তা করুন আসলেই আমি ছোট্ট জিনিসকে বড় বলে ভাববার মত ভুল করছি কি না, তিলকে তাল বানাচ্ছি কি না। পরে আবার এই ভাবনার জন্য নিজের কাছে নিজে হাস্যকর প্রতিপন্ন হই কি না।

২. কিছু সমস্যা হলেও মনে মনে হেসে উড়িয়ে দিন যে, এটা কোন সমস্যা হল! কিছু সমস্যা থাকলেও সমস্যা নেই বলে ভাবুন। যেমন– কিছু অসুস্থতা বোধ করলেও নিজেকে সুস্থ বলে ভাবুন, মনকে বোঝান যে, আমি তো রীতিমত সুস্থই আছি। মনে রাখবেন কোন কঠিন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিও যদি নিজের রোগকে হালকা মনে করে, তাতে তার অসুস্থতাবোধ হ্রাস পায়। পক্ষান্তরে ছোট্ট রোগকেও কঠিন মনে করতে থাকলে সে ভেঙ্গে পড়ে। তাই কখনও নিজের রোগ-ব্যধিকে জটিল করে চিন্তা করবেন না। শুধু রোগ-ব্যধি কেন কোনো কিছুকেই জটিল করে ভাববেন না। সবকিছুকে সহজ করে ভাবতে অভ্যস্ত হোন, সহজ লাগবে।

৩. অন্য কারও সম্বন্ধে খারাপ কিছু ভাববেন না যে, সে বুঝি এমন কঠিন কিছু পদক্ষেপ নিতে যাচ্ছে। এটাও কারও সম্বন্ধে দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কুধারণা, যা থেকে কুরআনে নিষেধ করা হয়েছে। (এ সম্পর্কিত আয়াতটি এক নম্বর টেনশনের প্রতিকারে উল্লেখ করা হয়েছে।) সেই সাথে একথাও স্মরণ করুন যে, আল্লাহই সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক। যদি একান্তই ভবিষ্যতে বড় ধরনের কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়ায় আল্লাহ পাক তা থেকে আমাকে উদ্ধার করবেন। মনে মনে অর্থ খেয়াল করে পড়ে নিন–

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কত উত্তম অভিভাবক! (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

(তিন) রোগ-ব্যধির কারণে টেনশন

আর এক প্রকার টেনশন হল রোগ-ব্যধির কারণে সৃষ্ট টেনশন। কেউ কোন রোগে আক্রান্ত হলে এরূপ দুশ্চিন্তাও আসতে পারে যে, এ রোগের কারণে ব্যথা, যন্ত্রণা, কষ্ট প্রভৃতি অনেক অসুবিধার সম্মুখীন তাকে হতে হবে, এ রোগে তার মৃত্যুও

হতে পারে; আর মৃত্যু হলে সব কিছু তাকে হারাতে হবে। এ রোগে সে দুর্বল হয়ে গেলে বা নিজের সাধ্যাতীত চিকিৎসা ব্যয়ের প্রয়োজন দেখা দিলে সে আপনজন ও আত্মীয় স্বজনের কাছে বোঝা হয়ে দাঁড়াবে বা তাদের অসুবিধার কারণ হয়ে দাঁড়াবে– এসব কথা ভেবেও সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে।

প্রতিকার: এ ধরনের টেনশনের প্রতিকার হল–

১. রোগ-ব্যধির ফায়দাসমূহ নিয়ে ভাবুন। রোগ-ব্যধি আল্লাহর নেয়ামত, কেননা আল্লাহ যাকে ভালবাসেন তাকেই কোন বিপদ দিয়ে থাকেন। রোগের মাধ্যমে তার গোনাহ মোচন হবে, দরজা বুলন্দ হবে। রোগকে যদি এ দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হয় তাহলে এর কারণে যে কষ্ট যন্ত্রণা ইত্যাদি সহ্য করতে হবে তার জন্য আর দুশ্চিন্তা আসবে না, মনোকষ্ট বোধ হবে না।

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا أَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ.

অর্থাৎ, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন সম্প্রদায়কে ভালবাসেন, তখন তাদেরকে (রোগ-শোক ইত্যাদি দিয়ে) পরীক্ষা করেন। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা)

রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهٗ أَذًى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سِوَاهُ، إِلاَّ حَطَّ اللّٰهُ تَعَالٰى بِهٖ سَيِّئَاتِهٖ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا. (مسلم ٢٥٧١ وابن حبان ٦٧٢٤)

অর্থাৎ, কোন মুসলমানের রোগ ইত্যাদি কোন কষ্ট হলে তার কারণে আল্লাহ তা'আলা তার পাপরাশি ঝরিয়ে দেন, যেমন বৃক্ষ তার পাতা ঝরিয়ে দেয়। (মুসলিম ও ইবনে হিব্বান)

এ হাদীছের মর্ম স্মরণ করলে রোগ-ব্যধির কারণে সৃষ্ট যন্ত্রণা সহ্য করা সহজ হবে, এ কারণে দুশ্চিন্তা দেখা দিবে না।

গোনাহ মোচন এবং দরজা বুলন্দ হওয়া ছাড়াও রোগ-ব্যধির আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। রোগ-ব্যধি হলে সুস্থতার কদর বুঝে আসে, রূপ-সৌন্দর্য বা শারীরিক তাকতের অহংকার হ্রাস পায়, আস্ফালনের মনোভাব স্তিমিত হয়, আখেরাতের দিকে মন ধাবিত হয়, গাফেলদের কাতার থেকে বেরিয়ে আসার মত চিন্তা জাগ্রত হয়।

২. ভবিষ্যতে পরিবার-পরিজনের ভরণ-পোষণের দুশ্চিন্তা হলে স্মরণ করবেন আমি যে পর্যায়ের অভিভাবক আল্লাহ তার চেয়ে উত্তম অভিভাবক। এ কথা চিন্তা করে এ জাতীয় কোন দুশ্চিন্তা জাগলেই মনে মনে অর্থ খেয়াল করে পড়ে নিবেন–

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহই আমাদের জন্য যথেষ্ট, তিনি কত উত্তম অভিভাবক! (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

৩. কোন রোগ-ব্যধির কারণে নিজেকে খুব অসহায় মনে হলে আপনার চেয়ে আরও বড় রোগে যারা আক্রান্ত তাদের কথা স্মরণ করুন, অসহায়ত্ববোধ হ্রাস পাবে। মাঝেমধ্যে হাসপাতালে যাবেন, তাহলে বহু রকম রোগ-ব্যধি থেকে আল্লাহ আপনাকে মুক্ত রেখেছেন তা বুঝে আসবে। তখন আপনার নিজের রোগকে হয়তো অনেক হালকাই মনে হবে। তাতে মনের কষ্টবোধ লাঘব হবে।

(চার) মৃত্যুর দুশ্চিন্তা থেকে সৃষ্ট টেনশন

আর এক প্রকার টেনশন হল মৃত্যুর দুশ্চিন্তা থেকে সৃষ্ট টেনশন। রোগীর মনে এরূপ দুশ্চিন্তা আসতে পারে যে, এ রোগে তার মৃত্যু হলে তার উপর নির্ভরশীল ছেলে-মেয়ে, স্ত্রী প্রমুখ পরিবার সদস্যদের জীবিকা ইত্যাদির কী অবস্থা হবে? রোগীর মনে সৃষ্ট এসব দুশ্চিন্তা রীতিমত টেনশনেও রূপ নিতে পারে।

প্রতিকার: মৃত্যুকে খারাপ মনে না করা বরং ভাল মনে করা। কেননা, মৃত্যু দ্বারা পাপ থেকে রক্ষা ও পৃথিবীর কারাগার থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় এবং মৃত ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র প্রেমিক হয়ে থাকে তাহলে এই মৃত্যুই তার প্রেমাষ্পদ-আল্লাহ্র নিকট তার দ্রুত পৌঁছে যাওয়ার এবং দ্রুত জান্নাতে পৌঁছে যাওয়ার মাধ্যম। এই দৃষ্টিভঙ্গিতে মৃত্যুকে মূল্যায়ন করলে রোগের অবস্থায় মৃত্যুর আশংকায় সে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হবে না। মৃত্যুকে অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গিতে মূল্যায়ন করে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (رواه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق ٢٩٥٦)

অর্থাৎ, দুনিয়া হল মুমিনের কারাগার ও কাফেরদের জান্নাত। (মুসলিম)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

اَلْعَبْدُ الْمُؤْمِنُ يَسْتَرِيْحُ مِنْ نَصَبِ الدُّنْيَا وَأَذَاهَا إِلٰى رَحْمَةِ اللّٰهِ. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الرقاق ٦٥١٢، ورواه مسلم في كتاب الجنائز ٩٥٠)

অর্থাৎ, মু'মিন বান্দা (মৃত্যুর দ্বারা) দুনিয়ার কষ্ট-ক্লেশ থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে আল্লাহ্‌র রহমতের কাছে উপনীত হয়। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

تُحْفَةُ الْمُؤْمِنِ اَلْمَوْتُ. (رواه الطبراني في الكبير. قال الهيثمي : ورجاله ثقات)

অর্থাৎ, মৃত্যু হল মু'মিনের জন্য এক তোহ্‌ফা। (তাবারানী)

বস্তুত মৃত্যু মু'মিনের নিকট সবকিছু হারানোর বিভীষিকা নয় বরং সবকিছু পাওয়ার উন্মুক্ত দুয়ার।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হল যে, মু'মিনের জন্য মৃত্যু খারাপ নয় বরং ভাল। তবে মৃত্যু ভাল বলে তা কামনা করা যাবে না। মৃত্যু কামনা করা নিষেধ এবং তা এ কারণে নিষেধ যে, সে নেককার হলে মৃত্যুর মাধ্যমে তার নেক কাজ-এর ধারা বন্ধ হয়ে যাবে, বরং বেঁচে থাকলে সে আরও নেক কাজের সুযোগ পাবে। আর পাপী হলে তার পাপ মোচনের ভবিষ্যত সুযোগও বন্ধ হয়ে যাবে। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا يَتَمَنّٰى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ، إِمَّا مُحْسِنًا فَلَعَلَّهٗ يَزْدَادُ، وَإِمَّا مُسِيْئًا فَلَعَلَّهٗ يَسْتَعْتِبُ. (رواه البخاري في باب ما يكره من التمني حديث رقم ٧٢٣٥)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে। কেননা, সে নেককার হলে আশা করা যায় সে আরও বেশি (ভাল কাজ) করতে পারবে। আর বদকার হলে আশা করা যায় সামনে তওবার মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তালাশ করতে পারবে। (বোখারী)

কেউ যদি পাপী হয়, তাহলে মৃত্যুর পর তার শাস্তি শুরু হয়ে যেতে পারে এবং আল্লাহ্‌র রহমত থেকে সে বঞ্চিত হয়ে যেতে পারে। এরূপ ব্যক্তি রোগাক্রান্ত হলে মৃত্যুকে ভাল মনে করার দ্বারা সে তার দুশ্চিন্তা দূর করতে পারবে না বরং সে শাস্তির ভয়ে আরও বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়বে। আর পাপ কম বেশি সকল

মানুষেরই থাকে। তাই সকল রোগীর জন্যই বিশেষভাবে গোনাহ থেকে তওবা করার বিধান রাখা হয়েছে এবং মুমূর্ষ ব্যক্তির জন্য নিয়ম রাখা হয়েছে সে তার জীবনের ভাল-মন্দ কার্যাবলী সম্পর্কে মনে মনে হিসাব-নিকাশ ও পর্যালোচনা করবে না। কেননা এতে মন্দের পরিমাণের আধিক্য দেখে আল্লাহ্‌র রহমত পাওয়ার আশা দুর্বল হয়ে পড়তে পারে এবং মানসিকভাবে সে আরও ভেঙ্গে পড়তে পারে। যারা মুমূর্ষ রোগীর নিকট উপস্থিত থাকবে তাদেরও কর্তব্য রোগীকে আল্লাহ্‌র রহমত লাভের সুসংবাদ প্রদান করা এবং তার জীবনের ভাল কাজগুলোর কথা তার সামনে উল্লেখ করা, যাতে তার মনে আল্লাহর রহমত লাভের আশা প্রবল হয়। বোখারী শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে- হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর প্রাক্কালে হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ওমর (রা.)-এর পেরেশানী লাঘব করার জন্য তার জীবনের সুকীর্তিগুলো তাঁর সামনে তুলে ধরেছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) তাঁর প্রশংসা করেছিলেন। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে- হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.) মুমূর্ষ অবস্থায় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলে তার পুত্র তাঁর প্রশংসাসূচক বাক্য দ্বারা তাঁকে দুশ্চিন্তা মুক্ত করেন।

এরপরও রোগীর মনে মৃত্যুর এবং রোগ থেকে মুক্তি লাভ না করার দুশ্চিন্তা এসে যাওয়ার যে সম্ভাবনা রয়েছে সে সম্ভাবনাকে হ্রাস করার নিমিত্তে রোগী শুশ্রূষাকারীদের জন্য সুন্নাত তরীকা রাখা হয়েছে তারা "রোগী অচিরেই রোগ মুক্ত হয়ে যাবে", "সে দীর্ঘজীবি হবে" ইত্যাদি আশাব্যঞ্জক কথা রোগীকে শোনাবে; কোন হতাশাব্যঞ্জক কথা তাকে শোনাবে না। এরূপ ক্ষেত্রের জন্য হাদীছে নিম্নোক্ত বাক্য বলে রোগীকে সান্ত্বনা দিতে শিক্ষা দেয়া হয়েছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নরূপ বলতেন–

لَا بَأْسَ طَهُوْرٌ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ. (رواه البخاري في كتاب المرضى ٥٦٥٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌ চাহে তো অচিরেই পবিত্রতা (সুস্থতা) লাভ হবে। (বোখারী)

রোগীর মনে আশার সঞ্চার করতে পারা এবং রোগীর মনে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি করতে পারা তার রোগ মুক্তির জন্য দৈহিক আনুকূল্য সৃষ্টিরও সহায়ক।

রোগ শুশ্রূষাকারীগণ হাসি মুখে থাকবে। আপনজন, আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব যারা রোগীর সেবায় থাকবে বা রোগী দেখতে যাবে তারা হাসি মুখে থাকবে, চেহারা মলিন করবে না, ছেড়া-ফাটা ও নোংরা পোশাক পরিধান করে শুশ্রূষা করতে যাবে না বরং স্বাভাবিক পরিষ্কার পোশাক পরিধান করে যাবে। এগুলো রোগী শুশ্রূষার সুন্নাত ও আদবের অন্তর্ভুক্ত। এগুলো রোগীর মানসিক ব্যধির প্রতিষেধক। কেননা

চেহারা মলিন দেখলে রোগী সন্দেহ করতে পারে যে, আমার কারণে তারা বিরক্ত হয়ে উঠেছে! আমি তাদের জন্য বোঝা হয়ে গিয়েছি! কিংবা আমার রোগ খারাপ পর্যায়ে গিয়েছে তা জানতে পেরেই কি ওরা এমন বিমর্ষ হয়ে পড়েছে? এভাবে রোগী আরও বেশি দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারে। আবার খুব বেশি জাঁক-জমকের পোশাক পরিচ্ছদ নিয়েও শুশ্রূষা করতে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা, তাতে রোগী তার প্রতি সমবেদনা বোধের অভাব রয়েছে বলে সন্দেহ করতে পারে।

(পাঁচ) নিজের মতের সাথে অন্যদের মিল না হওয়ার কারণে টেনশন

টেনশনের আর একটা প্রকার হল নিজের মতের সাথে অন্যরা একমত না হওয়ার কারণে যে টেনশন হয়। অনেকে এটা নিয়ে ভাবতে ভাবতে রীতিমত ভেঙ্গে পড়ে যে, কেন ওরা আমার মতের সঙ্গে একমত হচ্ছে না। ওরা কি বোকা, ওদের কি বুদ্ধি নেই, ওরা কেন সঠিকটা বোঝে না– এভাবে চিন্তা করতে করতে রীতিমত সেটা দুশ্চিন্তা এবং টেনশনে রূপ নেয়।

প্রতিকার: এরূপ টেনশন বোধকারী ব্যক্তিকে মনে রাখতে হবে প্রত্যেকটা মানুষ ভিন্ন ভিন্ন মানুষ। পৃথিবীর প্রথম মানুষ হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে পৃথিবীর শেষ মানুষটা পর্যন্ত কারও সঙ্গে কারও চেহারার মিল নেই, মিল হবেও না। কারও আকৃতি, কারও অবয়ব, কারও রঙ, কারও মেজায, কারও রুচি, কারও চরিত্র, কারও পছন্দ-অপছন্দ, কারও ভাল লাগা না লাগা অন্যের সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ নয়। তাহলে কেন মতের বেলায় অন্যের সঙ্গে পূর্ণ সাদৃশ্যপূর্ণ হবে? না হওয়াই স্বাভাবিক। এরূপ বিভিন্নতা আল্লাহর কুদরতের এক নিদর্শনও বটে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَمِنْ اٰيَاتِهٖ اِخْلَافُ اَلْسِنَتِكُمْ وَاَلْوَانِكُمْ.﴾

অর্থাৎ, আর তাঁর (কুদরতের) নিদর্শনাবলীর মধ্যে আর একটা হল তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। (সূরা রূম: ২২)

অতএব চেহারা, আকৃতি, অবয়ব, রঙ, রূপ, মেজায, রুচি ইত্যাদির বিভিন্নতার ন্যায় মতের বিভিন্নতাকেও স্বাভাবিক ভাবুন, দেখবেন আপনার দুশ্চিন্তা টেনশন হ্রাস পাবে। অন্যকে একমত করার পিছনে না পড়ে ভাল কাজে নিজেকে অগ্রসর করার চিন্তায় মগ্ন হোন। কুরআনে কারীম আমাদেরকে এমনই শিক্ষা দিয়েছে। যখন কেবলার হুকুম পরিবর্তন হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাস থেকে বায়তুল্লাহর দিকে কেবলা নির্ধারণ করা হয়, তখন এ নিয়ে ইয়াহুদী মুশরিকরা প্রচুর তুলকালামকাণ্ড শুরু করে দিয়েছিল। তখন নিম্নোক্ত আয়াত নাযেল হয়েছিল।

﴿وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ﴾

অর্থাৎ, সবার জন্য রয়েছে একেক কেবলা যে দিকে সে মুখ ফিরায়। অতএব (এ নিয়ে তারা যে চর্চায় লিপ্ত হয়েছে তার পিছনে না পড়ে) নেক কার্যাবলীতে প্রতিযোগিতামূলকভাবে এগিয়ে যাও। (সূরা বাকারা: ১৪৮)

(ছয়) অন্যদের থেকে কৃতজ্ঞতা না পাওয়ার কারণে টেনশন

টেনশনের আর একটা প্রকার হল কারও থেকে কাংখিত শোকর বা কৃতজ্ঞতা না পাওয়ার কারণে যে টেনশন হয়। অনেক সময় এমন হয় কেউ কারও কোন উপকার করল, কারও পক্ষে ভাল কিছু করল আর সে ঐ উপকারকারীর যথাযথ শোকর বা কৃতজ্ঞতা আদায় করল না বরং উল্টো হয়তো তার অপকারই করে বসল। কোন আত্মীয়ের সঙ্গে সে সম্পর্ক সুন্দর রাখার চেষ্টা করে চলল, অথচ সে আত্মীয় তার উল্টো করল। কারও প্রতি হয়তো সে ইনসাফ করল অথচ সে তার প্রতি উল্টো জুলুম করল। এরূপ ক্ষেত্রে অনেকেই মনে দুঃখ পায়, দুশ্চিন্তা করে, টেনশন বোধ করে। মনে মনে ভাবে কেন তার উপকার করতে গেলাম! কেন তার সঙ্গে ভাল করতে গেলাম! মনের ক্ষোভ প্রশমিত হয় না, মনকে বুঝ দিতে পারে না। অবশেষে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করে বসে আর কোনোদিন কারও উপকার করতে যাব না। আর কারও সঙ্গে ভাল কিছু করতে যাব না।

প্রতিকার: এরূপ ক্ষেত্রে মনকে বোঝাতে হবে আমি যা কিছুই উপকার করেছি, যা কিছুই ভাল করেছি তা আল্লাহর ওয়াস্তে করেছি, আল্লাহর কাছে পাওয়ার জন্য করেছি, তার থেকে প্রতিদান পাওয়ার নিয়তে নয়। মানুষের কাছে প্রতিদান পাওয়ার নিয়ত রাখা ঠিক নয়। আমি যদি তার থেকে কৃতজ্ঞতা না পাওয়ার কারণে কষ্ট বোধ করি তাহলে এটা এরই প্রমাণ বহন করে যে, আমি তার কাছ থেকে প্রতিদান পাওয়ার নিয়তে করেছিলাম। অতএব হে মন, তোমার নিয়ত দোরস্ত করে নাও। তোমার নিয়ত দোরস্ত করে নেয়ার ব্যাপারে তোমাকে সতর্ক করার জন্যই হয়তো আল্লাহ পাক তার দ্বারা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইয়েছেন। এটা তোমার ভালোর জন্যই করা হয়েছে। এরপর তুমি যদি আর কারও উপকার না কর, তাতে ঐ অকৃতজ্ঞ ব্যক্তির কোনো শিক্ষা হবে না, তাতে তার কোনো ক্ষতিও হবে না, বরং তুমিই নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হবে। শয়তানই সুযোগ বুঝে তোমাকে এভাবে নেক কাজ না করার ব্যাপারে প্ররোচিত করার প্রয়াস পাচ্ছে। তুমি পড়ে নাও– [illegible] (আমি বিতাড়িত শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাই।)

কুরআনের ঐ আয়াতটি স্মরণ করুন–

﴿وَمَا أُمِرُوْا اِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ.﴾

অর্থাৎ, তাদেরকে একনিষ্টভাবে আল্লাহর ইবাদত করার জন্যই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (সূরা বাইয়্যিনা: ৬)

আরও স্মরণ করুন–

﴿اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللّٰهِ لَا نُرِيْدُ مِنْكُمْ جَزَآءً وَّ لَا شُكُوْرًا.﴾

অর্থাৎ, (আল্লাহর খাঁটি বান্দারা বলে,) আমরা তোমাদেরকে আহার করাই আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আমরা তোমাদের থেকে কোনো প্রতিদান চাই না, কোনো কৃতজ্ঞতা কামনা করি না। (সূরা দাহ্র: ৯)

এমনও হতে পারে শয়তান ঐ লোককে অকৃতজ্ঞতার জন্য প্ররোচিত করেছেই এই লক্ষ্য সামনে নিয়ে যে, তাতে করে আপনি ভবিষ্যতে এরূপ নেক কাজ না করার জন্য প্ররোচিত হবেন। শয়তান তাকেও অকৃতজ্ঞ বানাল, আপনাকেও নেক কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য প্ররোচিত করল। এভাবে শয়তান এক ঢিলে দুই পাখি শিকার করার কৌশল অবলম্বন করেছে।

আর এটাও স্মরণে রাখুন কিছু লোকের স্বভাবই এমন যে, তাদের প্রতি ভাল করা হলে তারা মন্দ করার জন্য উদ্বুদ্ধ হয়। এ ধরনের লোকদের সম্বন্ধে এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿وَ مَا نَقَمُوْٓا اِلَّآ اَنْ اَغْنٰهُمُ اللّٰهُ وَ رَسُوْلُهٗ مِنْ فَضْلِهٖ.﴾

অর্থাৎ, (তাদের এসব মুনাফেকী ও কুফরী কর্মকাণ্ড) এরই পরিণতিতে ছিল যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে সম্পদশালী করে দিয়েছিলেন নিজের অনুগ্রহের মাধ্যমে। (সূরা তাওবা: ৭৪)

সারকথা হল– সব নেক কাজের প্রতিদান শুধু আল্লাহ থেকেই পাওয়া যাবে এই থাকবে নিয়ত। কোন নেক কাজ করে কারও থেকে প্রতিদান পাওয়ার আশা রাখবেন না। কারও থেকে কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অপেক্ষায় থাকবেন না। বরং কোন অসুস্থ মানসিকতার অধিকারী লোক থেকে ভাল কিছুর বদলায় মন্দ কিছুও পাওয়া যেতে পারে- তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত থাকবেন। নিম্নোক্ত হাদীছের বক্তব্যের উপর আমল করবেন, তাহলে মনে কষ্ট আসবে না, আনন্দ বোধ লাগবে। হযরত উকবা ইবনে আমের (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছিলেন,

صِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وَأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ، وَأَعْرِضْ عَمَّنْ ظَلَمَكَ. (رواه أحمد في مسنده برقم ٧٦٢٦١ وإسناده حسن)

অর্থাৎ, তোমার সঙ্গে যে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক জুড়ে রাখ। তোমাকে যে বঞ্চিত করে তুমি তাকে দাও। আর তোমার প্রতি যে জুলুম করে তুমি তার বিষয়টা এড়িয়ে যাও। (মুসনাদে আহমদ)

(সাত) কোন কিছু না পাওয়া নিয়ে টেনশন

টেনশনের আর একটা প্রকার হল কোন কিছু না পাওয়ার কারণে টেনশন। আমার একটা বাড়ি হল না, একটা গাড়ি হল না, একটা ফ্যাক্টরী হল না, ঐ পদটা চেয়েও পেলাম না, ঐ কাংঙ্খিত জিনিসটি অর্জন করতে পারলাম না। এভাবে কি কি হয়নি কি কি পাওয়া যায়নি তা নিয়ে টেনশন। এভাবে অনেককে দেখা যায় জীবনে কি কি পাওয়া যায়নি শুধু সেগুলো নিয়েই চিন্তা-চর্চা করে, কি কি পাওয়া গিয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-চর্চা করে না। ফলে একদিকে না পাওয়া জিনিসগুলোর জন্য দুশ্চিন্তা টেনশন হয়, অন্যদিকে পাওয়া জিনিসগুলোর শোকর আদায়ের মনোভাবও উজ্জীবিত হয় না।

প্রতিকার: এ জাতীয় টেনশনের প্রতিকারের জন্য আপনার করণীয় হল–

১. প্রথমেই বুঝতে হবে জীবনে কি কি পাওয়া যায়নি শুধু সেগুলো নিয়েই চিন্তা-চর্চা করা, কি কি পাওয়া গিয়েছে তা নিয়ে চিন্তা-চর্চা না করা একটা ভুল পদ্ধতি। অতীতের কোন কিছু অপ্রাপ্তির বিষয় নিয়ে বেশি চিন্তা-চর্চা করলে তাতে কোন লাভ তো হয়ই না, উপরন্তু যা পাওয়া গিয়েছে, তা নিয়ে শোকর আদায়ও বিঘ্নিত হয়। কারণ অপ্রাপ্তির কথা বেশি ভাবলে সেই ভাবনাই প্রবল হয়ে ওঠে, তাতে প্রাপ্তির ভাবনা হ্রাস পায় কিংবা সমূলেই তিরোহিত হয়ে যায়। এভাবে শোকর আদায়ের মনোভাব হয় বিঘ্নিত। তাই যা কিছু পাওয়া গেছে তা নিয়েই ভাবতে হবে, যা কিছু পাওয়া যায়নি তা নিয়ে চিন্তা-চর্চা পরিত্যাগ করতে হবে। তাতে না পাওয়ার টেনশন, কষ্ট দূর হওয়ার সাথে সাথে শোকর আদায়ও সহজ হবে।

২. আপনি যেসব নেয়ামত লাভ করেছেন সেগুলো স্মরণ করে নিজের মনকে তৃপ্ত করুন। একজন অন্ধের মনে জগতকে দেখার জন্য কী আকুতি! একজন বোবার মনে কথা বলার জন্য কী আকুলি-বিকুলি! একজন বধিরের মনে শব্দ শোনার জন্য কী ব্যাকুলতা অস্থিরতা! একজন পঙ্গুর মনে ইচ্ছেমত জগতে বিচরণ করার জন্য কী উদগ্র বাসনা! অথচ আপনি দিব্যি জগতের সবকিছু দেখতে পাচ্ছেন, সবকিছু বলতে

পারছেন, সবকিছু শুনতে পাচ্ছেন, সর্বত্র বিচরণ করতে পারছেন। এমনিভাবে আল্লাহর অসংখ্য নেয়ামত আপনি প্রতিনিয়ত ভোগ করে চলেছেন, সেগুলো স্মরণ করুন, অন্য অনেক কিছু না পাওয়ার কষ্টবোধ স্তিমিত হবে। আর যা কিছু পেয়েছেন তার জন্য শোকর আদায়ের চেতনা উজ্জীবিত হবে।

কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿فَخُذْ مَآ اٰتَيْتُكَ وَ كُنْ مِّنَ الشّٰكِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, সুতরাং যা কিছু আমি তোমাকে দান করলাম, গ্রহণ কর এবং কৃতজ্ঞ থাক। (সূরা আ'রাফ: ১৪৪)

আপনার দেখার মত দুটো চোখ আছে, শোনার মত দুটো কান আছে, ধরার মত দুটো হাত আছে, চলার মত দুটো পা আছে, বলার মত জবান আছে, বুঝার মত ব্রেণ আছে, ঈমান আছে, নিরাপত্তা আছে, তাহলে আপনার বড় ধরনের আর কী পেতে বাকি আছে?

﴿فَبِاَيِّ اٰلَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ.﴾

অর্থাৎ, অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (সূরা আর-রহমান)

৩. আপনি ভাবুন যা কিছু আপনি পেয়েছেন তা কি সত্যিকার অর্থেই আপনার জন্য পর্যাপ্ত নয়? প্রকৃত অর্থে আপনার যা প্রয়োজন তা কি পূরণ হয়নি? সত্যিকার অর্থে প্রয়োজন তো হল জীবনের নিরাপত্তা, শরীরের মোটামুটি সুস্থতা আর পেট পূর্তি করার মত একদিনের সামান্য নুন পান্থা। এর চেয়ে বেশি মূলত প্রয়োজন নয় তা হল খাহেশাত বা প্রবৃত্তির চাহিদা। প্রয়োজনের শেষ আছে খাহেশাতের শেষ নেই। খাহেশাতের যদি শেষ থাকত তাহলে কোটি টাকার মালিক শতকোটির চিন্তায় ব্যাকুল হয়ে ছোটাছুটি করত না, শতকোটির মালিক হাজার কোটির চিন্তায় বিভোর থাকত না। তাই মোটামুটি প্রয়োজন পূরণ হলেই ব্যস অনেক পেয়েছি– এমনটি মনে করতে অভ্যস্ত হোন। এ দ্বারাই আপনি এ জাতীয় দুশ্চিন্তা টেনশন থেকে মুক্তি পাবেন। এক হাদীছে তাই ইরশাদ হয়েছে,

مَنْ اَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِنًا فِيْ سِرْبِهٖ، مُعَافًى فِيْ جَسَدِهٖ، عِنْدَهٗ قُوْتُ يَوْمِهٖ، فَكَأَنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا. (رواه الترمذي ٢٣٤٦ وقال: حديث حسن غريب)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি সকাল করে এমন অবস্থায় যে, তার মনে আছে নিরাপত্তা বোধ করে, শরীরে আছে সুস্থতা, আর তার নিকট রয়েছে সেই দিনের খাদ্য, তাহলে যেন গোটা দুনিয়াই তার জন্য সংগ্রহ করে দেয়া হয়েছে। (তিরমিযী)

৪. মানুষের মধ্যে এটা পেলাম না, সেটা পেলাম না- এ রকম না পাওয়ার চিন্তা জাগ্রত হয় উপরের দিকে তাকালে। তাই দুনিয়ার ব্যাপারে নিচের দিকে তাকাতে বলা হয়েছে, তাহলে যা কিছু আল্লাহর নেয়ামত লাভ হয়েছে তাকে তুচ্ছ মনে হবে না। এক হাদীছে এসেছে,

اُنْظُرُوْا إِلٰى مَنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلاَ تَنْظُرُوْا إِلٰى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ، فَهُوَ اَئْجَدَرُ أَنْ تَزْدَرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ. (رواه مسلم في الزهد والرقائق والترمذي ٢٠١٣)

অর্থাৎ, তোমরা তোমাদের চেয়ে যারা নিচে আছে তাদের দিকে তাকাও। যারা উপরে আছে তাদের দিকে তাকিও না। এটাই আল্লাহর নেয়ামত তুচ্ছ জ্ঞান না হওয়ার উপযুক্ত পন্থা। (মুসলিম ও তিরমিযী)

অতএব উপরের দিকে নয় নিচের দিকে তাকান। আপনার চেয়ে সাস্থে, সুস্থতায়, চেহারায়, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে, ধন-সম্পদে, সুযোগ-সুবিধায় যারা নিচে আছে তাদের দিকে তাকান, দেখবেন লক্ষ-কোটি মানুষের চেয়ে আপনি উপরে আছেন। তখন এটা পেলাম না, সেটা পেলাম না– এ রকম না পাওয়ার কষ্ট থেকে মুক্তি পাবেন।

৫. মুমিন –যার নজর থাকবে আখেরাতের দিকে– দুনিয়াতে কিছু না পেলেও তাতে কষ্টবোধ করবে না, কারণ দুনিয়ার সবকিছুই সামান্য ও ক্ষণস্থায়ী। পক্ষান্তরে আখেরাতের সবকিছু অসামান্য ও চিরস্থায়ী। অতএব মুমিন আখেরাতকে প্রাধান্য দিবে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿بَلْ تُؤْثِرُوْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّ اَبْقٰى.﴾

অর্থাৎ, বস্তুত তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। অথচ পরকালের জীবন উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (সূরা আ'লা: ১৬–১৭)

(আট) অতীত নিয়ে টেনশন

টেনশনের আর একটা প্রকার হল অতীত নিয়ে টেনশন করা অর্থাৎ, অতীতের কোন ব্যর্থতা বা প্রতিকূল কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশন করা। অতীতে কোন কিছু না পাওয়াকে নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশন করা। অনেকেই এরূপ টেনশন করে থাকে।

কখনও ব্যবসায়ে লোকসান হয়ে গেল ,তাই নিয়ে দিনের পর দিন মাসের পর মাস দুশ্চিন্তায় ভুগতে থাকল। কোন সন্তান বা আপন কেউ পরীক্ষায় ফেল করল, তাই নিয়ে অব্যাহত দুশ্চিন্তা চলতে থাকল। কোন কাঙ্খিত কিছু পেল না বলে মনকে বিষণ্ন করে রাখল, টেনশন করতে থাকল। কোন কিছুর জন্য হাজার চেষ্টা করেও ফল পেল না- তাই নিয়ে দুশ্চিন্তা টেনশন করতে থাকল।

প্রতিকার: এরূপ টেনশনের প্রতিকার হল−

১. এরূপ লোকদের মনে রাখা চাই অতীত অতীত হয়ে গেছে। অতীত কখনই আর ফিরে আসবে না। দুনিয়ার জিন ইনসান সকলে মিলে চেষ্টা করলেও অতীতকে আর ফিরিয়ে আনতে পারবে না। মাতা-পিতা মরে গেছেন, তাদের জন্য দুঃখ দুশ্চিন্তা অনেক করা হলেও তারা আর দুনিয়ায় ফিরে আসেননি। প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু গাছপালা ঘরবাড়ি সব লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে গেছে, তা নিয়ে খোলা আকাশের নিচে বসে অনেক কান্নাকাটি হয়েছে, কিন্তু সেই গাছপাড়া ঘরবাড়ি আর পুনঃস্থাপিত হয়নি। অতীতে কোন এক সময় আপনার ব্যবসায় লোকসান হয়েছিল, তা নিয়ে আপনি অনেক দুশ্চিন্তা করেছেন, তাতে কি আপনার ব্যবসার সেই ক্ষতি লাভে পরিণত হয়েছে? আপনার সন্তান কখনও পরীক্ষায় ফেল করেছিল, তা নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তা করেছেন, তাতে কি সেই ফেল পাসে পরিবর্তিত হয়েছে? অতএব অতীতকে নিয়ে দুশ্চিন্তা বাদ দিন। হযরত সাহ্ল ইবনে আব্দুল্লাহ তাছতুরী (রহ.) বলেছেন,

أُمْسِ قَدْ مَاتَ، وَالْيَوْمُ فِى النَّزْعِ، وَغَدًا لَمْ يُوْلَدْ. (قيمة الزمن عند اللماء)

অর্থাৎ, গতকাল তো মরে গেছে, আজকের তো মরার উপক্রম হয়েছে আর আগামীকালের তো জন্মই হয়নি।

২. বস্তুত দুশ্চিন্তা টেনশন কখনই অতীতকে সংশোধন করতে পারবে না। দুশ্চিন্তা টেনশন দ্বারা অতীত ঠিক হয়ে যায় না। দুশ্চিন্তা টেনশন দ্বারা অতীত তো ঠিক হয়ই না বরং তাতে বর্তমান এবং ভবিষ্যতও নষ্ট হয়। এরূপ দুশ্চিন্তা-টেনশন বর্তমান ও ভবিষ্যতের সময় নষ্ট করে, বর্তমান ও ভবিষ্যতের চেষ্টা-সাধনার স্পৃহা নষ্ট করে। এভাবে আপনার ক্ষতি আরও বৃদ্ধি করে। তাই অতীতের ফাইল নিয়ে আর ঘাটাঘাটি করবেন না। সামনে এগিয়ে চলুন, সামনের কথা ভাবুন। অতীতের কোন পাপ থাকলে তার জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা চেয়ে নিন। আর অতীতের ভুল-ত্রুটি থেকে কোন শিক্ষা নেয়ার থাকলে সেই শিক্ষা নিয়ে সামনে এগিয়ে চলুন। সামনে এগিয়ে

চলাই জীবন জগতের সবকিছুর চিরাচরিত নীতি। সেটাই প্রকৃতিসম্মত নীতি। বাতাস পিছনের দিকে নয় সামনের দিকে ধেয়ে চলে। পানি পিছনের দিকে নয় সামনের দিকে বয়ে চলে। কাফেলা পিছনের দিকে নয় সামনের দিকে এগিয়ে চলে। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র সবকিছুই সামনের দিকে এগিয়ে চলে। এটাই সৃষ্টির স্বাভাবিক রীতি। এটাই প্রকৃতিসম্মত রীতি। ইসলামের নীতিমালাও প্রকৃতিসম্মত। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِیْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَیْهَا لَا تَبْدِیْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ؕ ذٰلِكَ الدِّیْنُ الْقَیِّمُ.

অর্থাৎ, এটাই আল্লাহর প্রকৃতি যার উপর তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। (সূরা রূম: ৩০)

অতীতের জন্য দুশ্চিন্তা দুঃখ না করে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলার দৃষ্টিভংগি বর্ণিত হয়েছে কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতে। ওহুদের যুদ্ধে বেশ কিছু সংখ্যক সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন। অনেকে আহত হন। এ অবস্থার মধ্যে আবার হামরাউল আসাদ নামক স্থানে যুদ্ধে যাওয়ার জন্য ডাক আসে। তখন নাযেল হয়,

﴿وَ لَا تَهِنُوْا وَ لَا تَحْزَنُوْا وَ اَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা হিনবল হয়ো না, (অতীতের ঘটনায়) দুঃখ করো না, (সামনে এগিয়ে চল) তোমরাই বিজয়ী হবে, যদি তোমরা খাঁটি মুমিন হও। (সূরা আলে ইমরান: ১৩৯)

৩. অতীতে কোন কিছু নিয়ে হাজার চেষ্টা করেও সফল হতে পারেননি? চেষ্টা ছাড়বেন না। হাল ছেড়ে দিবেন না। হতাশ হয়ে পড়বেন না। কুরআনে কারীমের বাণী স্মরণে রাখবেন- "তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে হতাশ হয়ো না।" ইসলামে হতাশার স্থান নেই। প্রকৃতির কোন কিছুর মাঝেও হতাশা নেই। একটা পিপড়া তার আহার সংগ্রহের জন্য একটা গাছে হয়তো শতবার ওঠার চেষ্টা করে, পড়ে যায় আবার ওঠার চেষ্টা করে, আবার পড়ে যায় আবার ওঠার চেষ্টা করে, সে হাল ছেড়ে দেয় না, চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হয় না। অবশেষে এক সময় সে তার চেষ্টায় সফল হয়। চেষ্টা করুন এক সময় আপনি সফল হবেন নিশ্চয়ই। যার জন্য আল্লাহ যে সময় নির্ধারণ করে রেখেছেন তখনই তা হবে। চেষ্টা করতে থাকুন নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর সফলতা আসবে। বন্ধ তালা খোলা হয় নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। বন্দী মুক্তি

পায় নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। দূরবর্তী নিকটে আসে নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। অনুপস্থিত এসে উপস্থিত হয় নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর। তাই চেষ্টা করতে থাকুন, নির্ধারিত সময় পার হওয়ার পর সফলতা আসবে। আর বহু চেষ্টার পরও যদি আপনার কাংখিত জিনিস না পান তাতেও ব্যর্থতা বোধ করবেন না। আপনার চেষ্টার পিছনে যদি কোন সদুদ্দেশ্য থাকে, তাহলে অন্তত ভাল কিছুর জন্য আপনার চেষ্টা নিবেদিত হয়েছে- এর পুরস্কার তো আপনি অবশ্যই পাবেন। অতএব সার্বিকভাবে আপনি ব্যর্থ– এমনটা ভাববার কোনো কারণ নেই।

(নয়) ভবিষ্যৎ নিয়ে টেনশন

টেনশনের আর একটা প্রকার হল ভবিষ্যৎ নিয়ে টেনশন করা। ভবিষ্যতে যদি অভাব দেখা দেয় তখন কী হবে! যদি কোন দিন চাকরিটা না থাকে তাহলে কী হবে! যদি কোন দিন অমুক রোগ হয় তখন কী হবে! যদি কোন দিন এমন দুর্ঘটনা ঘটে তাহলে কী হবে! স্ত্রী ভাবে যদি কোন দিন স্বামী মারা যায় তাহলে কী হবে! স্বামী ভাবে যদি কোন দিন স্ত্রী মারা যায় তাহলে এই সন্তানাদি নিয়ে কী হবে! এভাবে ভবিষ্যতের কোন বিষয় নিয়ে অনাকাংখিত চিন্তা থেকে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় টেনশন।

প্রতিকার: এরূপ টেনশনের প্রতিকার হল–

১. ভবিষ্যত নিয়ে এত বেশি ভাববেন না। ভবিষ্যতের সংক্ষিপ্ত প্লান-প্রোগ্রাম থাকতে পারে তা নিষেধ নয়। ভবিষ্যতের জন্য সাধ্যমত কিছু প্রস্তুতি রাখাও নিষেধ নয়। তবে ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা নিয়ে খুব বেশি চিন্তা করবেন না, দুশ্চিন্তা তো মোটেই না। মনে রাখবেন ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা করা এক রকম আল্লাহর প্রতি কুধারণা রাখা। আল্লাহর প্রতি সুধারণা রাখুন। বান্দা আল্লাহর প্রতি যেমন ধারণা রাখে আল্লাহ তার সঙ্গে তেমনই করেন। হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ. الحديث. (البخاري ٧٤٠٥ و مسلم ٢٦٧٥)

অর্থাৎ, (আল্লাহ বলেন,) বান্দা আমার প্রতি যেমন ধারণা রাখে আমি তার সঙ্গে তেমন-ই মুআমালা করি। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছের ভাষ্য অনুযায়ী আল্লাহর প্রতি ভাল ধারণা রাখলে আল্লাহ ভালই করবেন। অতএব আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল তথা ভরসা রাখুন। তিনি আপনার সঙ্গে থাকলে কার থেকে ভয়? আর তিনি আপনার সঙ্গে না থাকলে কার থেকে আশা?

২. মনে রাখবেন ভবিষ্যতের যতকিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করা হয় তার সিংহভাগই বাস্তবে ঘটে না। যত খারাপ কিছুর আশংকা করা হয়, তার বেশিরভাগই অমূলক প্রমাণিত

হয়। আল্লাহর উপর ভরসা রাখুন। আল্লাহই উত্তম অভিভাবক। এরূপ দুশ্চিন্তার মুহূর্তে পাঠ করুন-

﴿حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ.﴾

অর্থাৎ, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর কত উত্তম অভিভাবক তিনি! (সূরা আলে ইমরান: ১৭৩)

মুমিনের খোদা অত্যন্ত দয়ালু, অতি মেহেরবান। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। তিনি উত্তম অভিভাবক, উত্তম কর্মবিধায়ক। তাঁরই হাতে সবকিছুর চাবিকাঠি। তাহলে সেই খোদার প্রতি আস্থা ভরসা রাখতে মুমিন কেন উদ্বুদ্ধ হবে না?

৩. যখন ভবিষ্যত আসবে তখন ভবিষ্যত নিয়ে খুব ভাববেন, এখন নয়। ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে তা সময় হলেই দেখতে পাবেন। তখন যা করার করবেন। সময়ের আগেই গর্ভপাত করে তা দেখতে চাওয়া কেন? অনাগত ভবিষ্যতের বিপদ-আপদের কথা ভেবে দুশ্চিন্তা টেনশনকে আগাম দাওয়াত দিয়ে ঘরে আনা কোন্ বুদ্ধিমানের কাজ? মনে রাখতে হবে ভবিষ্যত একটা অনিশ্চিত বিষয়। আজকের সূর্য দেখতে পাচ্ছি আগামীকালের সূর্য দেখতে পাব কি না তা অনিশ্চিত। সকাল পেয়েছি, বিকাল পাব কি না তা অনিশ্চিত। আজকের দিন পেয়েছি আগামীকালের দিন পাব কি না তা অনিশ্চিত। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনায় নিশ্চিত বর্তমানকে নষ্ট করা বোকামী হবে বৈ কি। অনিশ্চিত বিষয়ের চিন্তা বাদ দিন, নিশ্চিত বিষয় নিয়ে ভাবুন। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَالَا يَرِيْبُكَ. (رواه الترمذى ٢٠١٨ وقال : حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, তোমরা সন্দেহপূর্ণ জিনিস বর্জন কর, যেটা সন্দেহমুক্ত সেটা গ্রহণ কর। (তিরমিযী)

৪. জীবনকে শুধু আজকের মধ্যে এবং শুধু এই মুহূর্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ ভাবতে শিখুন। তাতে এ জাতীয় টেনশন থেকে মুক্তি পাবেন। আমরা যদি আজকের দিনকেই জীবনের শেষ দিন ভাবতে শিখি, তাহলে জীবনের সবকিছুই সুন্দর হবে। তাহলে আজকের নামায হবে জীবনের শেষ নামাযের উপলব্ধিতে। তাতে কতইনা সুন্দর নামায হবে। আজকের তেলাওয়াত হবে জীবনের শেষ তেলাওয়াতের উপলব্ধিতে। তাতে কতইনা সুন্দর তেলাওয়াত হবে। এভাবে ইবাদত-বন্দেগী, চেষ্টা-সাধনা, আচার-ব্যবহার সবকিছুই হবে সুন্দর। কারণ মনের মধ্যে থাকবে এটাই হচ্ছে এ

ক্ষেত্রে আমার জীবনের শেষ করা। এর চেয়ে এটা সুন্দরভাবে করার সুযোগ আর হয়তো পাব না।

ভবিষ্যত নয় বর্তমানকে নিয়েই ভাবতে হবে এবং সেভাবেই চিন্তা-চেতনা পরিচালিত করতে হবে, সেভাবেই কাজ করে যেতে হবে– এ নীতি-র কথা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে একটি হাদীছে। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اِغْتَنِمْ خَمْسًا قَبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَکَ قَبْلَ هَرَمِکَ، وَصِحَّتَکَ قَبْلَ سَقَمِکَ، وَغِنَائَکَ قَبْلَ فَقْرِکَ، وَفَرَاغَکَ قَبْلَ شُغْلِکَ، وَحَيَاتَکَ قَبْلَ مَوْتِکَ. (رواه الحاكم في المستدرک في كتاب الرقاق برقم ٨٠١٠ وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين. وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থ: পাঁচটা জিনিস আসার পূর্বে পাঁচটা জিনিসকে কাজে লাগাও, তোমার যৌবনকে কাজে লাগাও বার্ধক্য আসার পূর্বে। সুস্থতাকে কাজে লাগাও অসুস্থতা আসার পূর্বে। সচ্ছলতাকে কাজে লাগাও অভাব আসার পূর্বে। অবসরকে কাজে লাগাও ব্যস্ততা আসার পূর্বে। আর জীবনকে কাজে লাগাও মৃত্যু আসার পূর্বে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, ভবিষ্যতে বৃদ্ধ বয়সে কাজ করব, ভবিষ্যতে সুস্থতা বাড়বে তখন কাজ করব, ভবিষ্যতে অভাব কমবে তখন দান-খয়রাত করব, ভবিষ্যতে ব্যস্ততা কমবে তখন কাজ করব– এভাবে ভবিষ্যতে করার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে এখনই কাজ শুরু করে দাও। ভবিষ্যত নয় বর্তমানকে সামনে রেখেই কাজ কর।

৫. পাখীর মত জীবন-পদ্ধতি অবলম্বন করুন। পাখী সকালে বাসা থেকে বেরিয়ে যায়, জীবিকা আহরণ করে, বিকালের চিন্তায় মগ্ন হয় না। আবার বিকালে বেরিয়ে যায়, জীবিকা আহরণ করে, পরবর্তী সকালের জীবিকা নিয়ে দুশ্চিন্তা করে না। কারও থেকে আশাও করে না, কারও উপর ভরসা করে বসেও থাকে না। সামান্য মাথা গোঁজার মত একটু ছায়া পেলেই তৃপ্ত, সামান্য জীবনস্পন্দন নিয়েই ক্ষান্ত। কত সুন্দর হাদীছের এই বর্ণনা–

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رض قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَوَكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرُزِقْتُمْ كَمَا تُرْزَقُ الطَّيْرُ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَتَرُوْحُ بِطَانًا. رواه الترمذي في أبواب الزهد – باب ما جاء في الزهادة في الدنيا، ٢٣٤٤ وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত ওমর (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যদি তোমরা আল্লাহ্‌র প্রতি যথাযথ তাওয়াক্কুল কর, তাহলে তোমাদেরকে রিযিক দান করা হবে, যেরূপ পাখীকে রিয্‌ক দেয়া হয়– তারা ভোর বেলায় খালি পেটে বের হয়, দিনের শেষে ভরা পেটে (বাসায়) ফিরে আসে। (তিরমিযী)

৬. প্রত্যেকটা ক্ষেত্রের যেসব দুআ রয়েছে সেগুলো আমল করুন। দুআ আপনাকে সুরক্ষা দিবে। শরীয়তে প্রত্যেকটা স্থানে এমন উপযোগী দুআ রাখা হয়েছে, যার দ্বারা আল্লাহর রহমত অনুকূলে আসে, ফলে সংশ্লিষ্ট স্থানের ক্ষতি ও প্রতিকুলতা থেকে রক্ষা পাওয়া যায়।

(দশ) কেউ আমাকে ভাল চোখে দেখে না– এই টেনশন

টেনশনের আর একটা প্রকার হল সর্বক্ষণ মনের মধ্যে এই টেনশন যে, সবাই বোধ হয় আমাকে খারাপ জানে, কেউ আমাকে ভাল চোখে দেখে না।

প্রতিকার: আপনার কাছে কি কোন দলীল আছে যে, সত্যিই সবাই আপনাকে খারাপ জানে? যদি না থাকে তাহলে আপনি বিনা দলীলে কারও প্রতি কুধারণার পাপে জড়িয়ে পড়ছেন। আর যদি দলীল থাকে তাহলে যে কারণে তারা খারাপ জানছে সেই কারণগুলো দূর করুন। আর যদি সে কারণগুলো শরীয়তের আলোকে দূর করার বিষয় না হয়, তাহলে তাদেরকে অবুঝ মনে করুন, তাদের জন্য সহীহ বুঝ হওয়ার দুআ করুন। যদি তাদের সহীহ বুঝ না হয় তাহলে এমন লোকদের কাছে ভাল প্রতিপন্ন হওয়ার খাহেশ কেন লালন করেন? এ খাহেশ বর্জন করুন। যদি আপনি নিজেকে পান এমন অবস্থায় যে, আপনার মধ্যে রয়েছে হেদায়াত যা আপনাকে সঠিক পথে পরিচালিত করছে, আপনার মধ্যে রয়েছে বিবেক যা আপনাকে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌঁছাচ্ছে, আপনার মধ্যে রয়েছে হায়া যা আপনাকে গর্হিত কর্ম থেকে বিরত রাখছে, আপনার মধ্যে রয়েছে ঈমান ও আমল যা আপনাকে পরকালের মহাসৌভাগ্যে

উপনীত করবে, তাহলে কেউ আপনাকে ভাল চোখে না দেখলেও তাতে আপনার কী আসে যায়?

এরপরও তাদের ভাল মনে না করার কারণে যদি আপনার মনে কষ্ট আসে তাহলে সেই কষ্টের জন্য সবর করুন আর আল্লাহর কাছে নিম্নোক্ত দুআ করতে থাকুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নেক্ত দুআ করতেন।

اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ شَكُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ صَبُوْرًا، وَاجْعَلْنِيْ فِيْ عَيْنِيْ صَغِيْرًا وَفِيْ أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيْرًا. (رواه البزار في مسنده برقم ٤٤٣٩)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমাকে বানাও শোকরগুজার, আমাকে বানাও সবরকারী, আমাকে বানাও আমার চোখে ছোট আর অন্যের চোখে বড়। (মুসনাদে বায্যার)

(এগার) পাছে লোকে কী বলে– এই টেনশন

টেনশনের আর একটা প্রকার হল সর্বক্ষণ মনের মধ্যে এই টেনশন যে, পাছে লোকে কী বলে। অর্থাৎ, কে পশ্চাতে আমার নিন্দা-মন্দ বলে, কে অগোচরে আমার দোষ-বদনাম করে, কে অজান্তে আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করে– এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করা, এ নিয়ে টেনশন করা। এ জাতীয় টেনশনকারী ব্যক্তি পাশে থাকা দুজন ব্যক্তিকে গোপনে কিছু বলতে দেখলেও মনে করে বুঝি আমার বিরুদ্ধেই কিছু বলছে। দূর দিয়ে দু চার জন লোক কথা বলতে বলতে যাচ্ছে, তাদের কেউ হয়তো ঘটনাচক্রেই তার দিকে ফিরে তাকাল, ব্যস দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল বুঝি ওরা আমার ব্যাপারেই কিছু বলতে বলতে যাচ্ছে। এ ধরনের লোকেরা অহেতুক অন্যের পিছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে রাখে যে, অমুকে আমার বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছে কি না।

প্রতিকার: এ ধরনের টেনশনের প্রতিকার হল–

১. মনে রাখবেন আপনি কারও মুখে তালা লাগিয়ে দিতে পারবেন না, কারও জিহ্বা রশি দিয়ে বেঁধে রাখতে পারবেন না। কোনোভাবেই কারও মুখ বন্ধ রাখতে পারবেন না। অতএব এভাবে টেনশন করে আপনার কোন লাভ হবে না। হাঁ যদি আপনার ব্যাপারে অন্যের মুখ বন্ধ রাখতে চান তার একটি মাত্র উপায় আছে। তা হল আপনি নিজেকে আরও সংশোধন করুন, নিজেকে আরও সাজিয়ে তুলুন, আরও গুণাবলী অর্জন করুন, আরও যোগ্যতা অর্জন করুন। নিজেকে এমনভাবে গড়ে তুলুন অন্যরা যেন আপনার দোষ ধরার সুযোগই না পায়। এটিই হল আপনার ব্যাপারে অন্যের মুখ

বন্ধ করানোর একমাত্র উপায়। আর নিজেকে দোষমুক্ত রূপে গড়ে তোলার পরও, নিজেকে প্রয়োজনীয় গুণাবলীতে সাজানোর পরও যদি কেউ পশ্চাতে আপনার দোষচর্চা করে বলে ধারণা করেন, তাহলে পশ্চাতে দোষ-বলা ঐ লোক বা লোকদের উদ্দেশে মনে মনে কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি আবৃত্তি করুন।

﴿قُلْ مُوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ.﴾

অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমরা তোমাদের আক্রোশ নিয়েই মরো। (সূরা আলে ইমরান: ১১৯)

২. আপনার ব্যাপারে মন্দ কিছু বলা হলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না। সেই মন্দ বলা দ্বারা আপনার ক্ষতি নাও হতে পারে, কিন্তু যে সেই মন্দ বলবে তার ক্ষতি হবে নিশ্চিত। কেউ আপনাকে নিয়ে চর্চা করল তাতে আপনার এক লাভ হল আপনি আলোচ্য ব্যক্তিতে পরিণত হলেন। আর এক লাভ হল গীবত করে সে আপনাকে হাদিয়া প্রদান করল, তার ছওয়াব আপনার আমলনামায় চলে এল আর আপনার গোনাহ তার আমলনামায় চলে গেল।

৩. দলীল ছাড়া কারও ব্যাপারে এমন ধারণা করবেন না যে, সে আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। এতে কুধারণার পাপ হবে। দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কোনো কুধারণা করা পাপ।

৪. অন্যায়ভাবে কেউ আপনার ব্যাপারে ষড়যন্ত্র করলে আল্লাহর উপরই সেটার ভার ন্যাস্ত করে রাখুন। তিনি শোনেন কে কি বলে, তিনি জানেন কে কি করে। কেউ ষড়যন্ত্র করলে তিনিই সেটা প্রতিহত করবেন। আপনাকে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশন করতে হবে না। কুরআনে কারীমে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

﴿فَسَيَكْفِيْكَ هُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ.﴾

অর্থাৎ, শীঘ্রই আল্লাহ তাদের (অনিষ্ট) থেকে তোমার জন্য যথেষ্ট হবেন। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (সূরা বাকারা: ১৩৭)

অন্য এক আয়াতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

﴿وَلَا تَكُ فِيْ ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, তাদের চক্রান্তের কারণে তুমি মন ছোট করবে না। (সূরা নাহ্‌ল: ১২৭)

(বার) সাধ্যের বাইরের জিনিস নিয়ে টেনশন

আর প্রকার টেনশন হল সাধ্যের বাইরের জিনিস নিয়ে টেনশন। অনেকেই সাধ্যের বাইরের বিষয় নিয়ে দুশ্চিন্তা টেনশন করে বালখিল্যতার পরিচয় দিয়ে থাকে। সারা বিশ্বের বায়ু দুষিত হয়ে যাচ্ছে, সারা বিশ্বের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে– এই নিয়ে দুশ্চিন্তায় তাদের ঘুম হারাম হয়ে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে নিত্য পণ্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে, সারা বিশ্বের শ্রমিকদের মজুরি হ্রাস পাচ্ছে– এই নিয়ে তাদের দুশ্চিন্তা টেনশনের অন্ত নেই। অনেক সাধারণ মানুষ –যারা দেশ ও রাষ্ট্রের কোনো পর্যায়ের কর্তা ব্যক্তি নয়– তাদেরকে দেখা যায় রাষ্ট্রের রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে এমনভাবে দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হয়ে পড়ে যে, নিজের জরুরি কাজকর্ম থেকেও সে বিচ্যুত হয়ে যায়। এসব কিছুই সাধ্যের বাইরের জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশনের অন্তর্ভুক্ত।

প্রতিকার: যদি আপনি সত্যিই সারা বিশ্বকে সংশোধনের মত ব্যক্তি হয়ে থাকেন, সারা বিশ্বের দায়িত্ব আপনার উপর অর্পিত হয়ে থাকে, তাহলে সারা বিশ্ব নিয়ে ভাবুন, প্রতিকারের চিন্তা করুন, তবে দুশ্চিন্তায় পড়বেন না, টেনশন করবেন না। টেনশনে সমাধান হয় না, সমাধান হতে পারে ধীরে-সুস্থে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করা দ্বারা। আর যদি আপনি সে পর্যায়ের ব্যক্তি না হয়ে থাকেন তাহলে গোটা বিশ্বকে নিজের ঘাড়ের উপর চাপিয়ে নিজের ঘাড় নিজে মটকাতে যাবেন না। দুনিয়ার ঘটনাবলীকে তার আপন স্থানে থাকতে দিন, নিজের মাথার উপর সেগুলো চাপাবেন না। আপনি যদি রাষ্ট্রের কর্তা পর্যায়ের কোন ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তাহলে রাষ্ট্র নিয়ে মাথা ঘামানো আপনাকে মানাবে, এবং সেটা আপনার দায়িত্বের অন্তর্ভুক্তও। নইলে এভাবে রাষ্ট্রের রাজনীতি অর্থনীতি নিয়ে এমনভাবে দুশ্চিন্তায় লিপ্ত হওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই। ইসলামে সাধ্যের বাইরে কাউকে কোনো দায়িত্ব বা চাপ দেয়া হয়নি। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোন কাজের ভার দেন না। (সূরা বাকারা: ২৮৬)

(তের) অন্যের ভাল কিছু দেখে টেনশন

অনেক সময় অন্যের ভাল কিছু হয়েছে বা হতে যাচ্ছে জেনে টেনশন হয়ে থাকে। মূলত এটা মনের পরশ্রীকাতরতা থেকে সৃষ্টি হয়ে থাকে।

প্রতিকার: মনের হাছাদ বা পরশ্রীকাতরতা দূর করার পদ্ধতি গ্রহণ করলেই এ ধরনের টেনশন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। হাছাদ বা পরশ্রীকাতরতা দূর করার জন্য নিম্নোক্ত পদ্ধতিসমূহ গ্রহণ করুন।

১. যার প্রতি হাছাদ বা হিংসা হয়, মনে না চাইলেও লোক সমাজে তার প্রশংসা করা।
২. যার যে নেয়ামতের কারণে হাছাদ হয়, সেটা তার জন্য আরও বৃদ্ধি পাক আল্লাহ্‌র কাছে এই দুআ করতে থাকা।
৩. মনে না চাইলেও দেখা হলে তাকে সালাম করা, তার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা দেখানো এবং নম্র ব্যবহার করা।
৪. মাঝে মধ্যে তাকে হাদিয়া প্রদান করা।

তবে উল্লেখ্য যে, কোন কাফের, মুরতাদ, ফাসেক ও বেদআতী লোকের কোন বিষয় সম্পদ ও নেয়ামত অর্জিত হলে এবং সে তা দ্বারা ফেতনা ফাসাদ ও দ্বীনের ক্ষতি করতে থাকলে তার সে সম্পদ ও নেয়ামত ধ্বংস হওয়ার কামনা করা নিন্দনীয় নয় বরং কোন কোন অবস্থায় তা উত্তম ইবাদত বলে গণ্য হবে।

(চৌদ্দ) নিজের কৃত অপরাধের কারণে টেনশন

কিছু কিছু টেনশন আছে যা নিজের কৃত কোন অপরাধের কারণে হয়ে থাকে। কেউ কাউকে খুন করলে বা অন্য কাউকে দিয়ে করালে অবশ্যই একটা দীর্ঘ মেয়াদী টেনশন তার মধ্যে আসবে, পাছে আবার জানাজানি হয়ে যাবে না তো? শেষ পর্যন্ত আমাকে ফাঁসিতে ঝুলতে হবে না তো? কারও বড় ধরনের কোন ক্ষতি করলেও এ জাতীয় টেনশন হয়ে থাকে। এমনকি কারও বিরুদ্ধে বড় ধরনের অমূলক কোন অপপ্রচার চালিয়ে থাকলে বা কারও পশ্চাতে কোন গীবত-সমালোচনা করে থাকলে এ জাতীয় টেনশন দেখা দিতে পারে।

প্রতিকার: এরূপ টেনশনের প্রতিকার হল নিজেকে এমন কর্মকাণ্ড থেকে বিরত রাখা। কোন পাপ বা অপরাধ করার সময় আখেরাতের ভয় তো রাখতেই হবে সেই সাথে এই চিন্তাও রাখতে হবে যে, পাছে এটা আমার টেনশনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে না তো?

(পনের) কোনো কারণ জানা নেই এমন টেনশন

কোন কোন সময় এমন টেনশনও দেখা যায় যার কোনো কারণ নেই, এমনিতেই অজানা কিছু একটা নিয়ে মনের মধ্যে চাপ বোধ হয়। মনটা বিষন্ন হয়ে পড়ে। চিন্তা করে এরূপ টেনশনের কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। চিহ্নিত করা যায় না, কি বিষয় নিয়ে টেনশন হচ্ছে কেন হচ্ছে। এটা মূলত টেনশন নয়, এ হল

মনের এক ধরনের সংকোচন ভাব, প্রফুল্লতার অভাব কিংবা মনের এক ধরনের জঞ্জাল।

প্রতিকার: এ ধরনের টেনশন তিন কারণে হতে পারে। নিম্নে প্রতিকার ব্যবস্থাসহ প্রত্যেক প্রকার উল্লেখ করা হল।

১. মনের সংকোচন বা প্রফুল্লতার অভাবের কারণে হতে পারে। এরূপ হলে মনকে বিকশিত করার বা উৎফুল্ল করার পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে। তাহলে এরূপ টেনশন দূর হবে। এরূপ মুহূর্তে এমন কিছু নিয়ে চিন্তা করতে হবে যাতে মনের প্রফুল্লতা আসে, মন বিকশিত হয়ে ওঠে। যেমন– নিজের অতীত জীবনের কোন সাফল্যের বিষয় নিয়ে চিন্তা করুন, কিংবা ভবিষ্যতের কোন উজ্জ্বল সম্ভাবনার বিষয় নিয়ে চিন্তায় মগ্ন হোন, তাহলে এরূপ টেনশন থেকে মুক্তি পাবেন। এভাবেও মনের অবস্থার পরিবর্তন না হলে এরূপ মুহূর্তে একাকী না থেকে নেককার বন্ধু-বান্ধবের কাছে যান, মন খুলে তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বলুন। বৈধ হাসি-ফূর্তি করুন, ভাল কবিতা বা গজল পাঠ করুন কিংবা শুনুন। ইনশাআল্লাহ মনের সংকোচন ভাব কেটে যাবে, মনের মধ্যে প্রফুল্লতা এসে পৌঁছবে।

২. অনেক সময় গোনাহের কারণে এরূপ মন খারাপ বোধ হয়। গোনাহের কারণে মনের পর্দার উপর এক ধরনের জং বা ময়লা-আবর্জনা পড়ে, তার কারণে মনের মধ্যে এরূপ জঞ্জাল বোধ হয়। এরূপ হলে সেই জং বা ময়লা-আবর্জনা দূর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। মনের জং বা ময়লা-আবর্জনা দূর করার উপায় হল যিকির। হাদীছে যিকিরকে বলা হয়েছে রেত। রেত দ্বারা যেমন লোহার জং বা মরিচা দূর হয়, তেমনি যিকির দ্বারা মনের জং তথা মনের ময়লা-অবর্জনা ও অপরিচ্ছন্ন ভাব দূর হয়। যিকির করা দ্বারা কলবের ময়লা পরিষ্কার হয়– এ মর্মে এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رض عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُوْلُ: لِكُلِّ شَيْءٍ صَقَالَةٌ وَصَقَالَةُ الْقُلُوْبِ ذِكْرُ اللّٰهِ. الحديث. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. كذا في المشكاة.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, সব জিনিসের রেত রয়েছে, কলবের রেত হল আল্লাহর যিকির। (আদ-দাওয়াতুল কাবীর)

হযরত ইবনে ওমর (রা.) থেকে বর্ণিত আর এক হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ هٰذِهِ الْقُلُوْبَ تَصْدَأُ كَمَا يَصْدَأُ الْحَدِيْدُ إِذَا أَصَابَهُ الْمَاءُ، قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا جِلَائُهَا؟ قَالَ:كَثْرَةُ ذِكْرِ الْمَوْتِ وَتِلَاوَةُ الْقُرْآنِ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان ٢٠١٤)

অর্থাৎ, এই অন্তরগুলোতেও জং ধরে যেমন লোহায় পানি লাগলে জং ধরে। জিজ্ঞাসা করা হল ইয়া রসূলাল্লাহ, অন্তরের এই জং থেকে অন্তরকে পরিষ্কার করার উপায় কী? তিনি বললেন, অধিক পরিমাণে মুত্যুর স্মরণ এবং কুরআনের তেলাওয়াত। (শুআবুল ঈমান)

যিকির দ্বারা মনে প্রশান্তি আসার বিষয়টি কুরআনে কারীমেও বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿**اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ.**﴾

অর্থাৎ, জেনে রাখ আল্লাহর যিকির দ্বারা মন প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রা'দ: ২৮)

কুরআনে কারীম তেলাওয়াত করাও যিকির। তাই কখনও মনে অশান্তি বোধ হলে বা মনটা বিষন্ন হয়ে পড়লে কিছুক্ষণ কুরআন তেলাওয়াত করুন বা অন্য কোন যিকির করুন ইনশাআল্লাহ মনের সংকোচন দূরীভূত হবে, মনের পর্দার উপর থেকে ময়লা আবর্জনা দূরীভূত হবে, মনে প্রশান্তি ফিরে আসবে। কুরআন তেলাওয়াত শুনুন বা নিজে তেলাওয়াত করুন, কুরআনের তর্জমা ও তাফসীর পড়ে বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করুন, মনের দুঃখ অস্বস্তি দূর করার এ এক অমোঘ ব্যবস্থা।

৩. যারা নিয়মিত যে পরিমাণ তেলাওয়াত কিংবা যিকির বা ইবাদত-বন্দেগী করে থাকেন তাতে কমতি হওয়ার কারণেও মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যারা যতটুকু দ্বীনী কথাবার্তা বা চর্চায় থাকতে অভ্যস্ত, তাদের সেই অভ্যাসের মধ্যে ব্যত্যয় ঘটলেও মনের এমন অবস্থা সৃষ্টি হতে পারে। যেমন: কেউ নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্য-পানীয় গ্রহণে অভ্যস্ত। এর পরে যদি কোন দিন সেই পরিমাণ খাদ্য-পানীয় গ্রহণে কমতি হয় তাহলে তার সাস্থ খারাপ বোধ হবে, তার মুখ শুকিয়ে আসবে, চামড়া চুপসে আসবে। তদ্রূপ তেলাওয়াত, যিকির, ইবাদাত-বন্দেগী, দ্বীনী চিন্তা-চর্চা– এগুলো হল কলব বা আত্মার খোরাক। তাই যিনি তার আত্মাকে যে পরিমাণ খোরাক

দিয়ে অভ্যস্ত তাতে ব্যত্যয় ঘটলে আত্মার মধ্যেও এক ধরনের সংকোচন ভাব দেখা দেয়। এ কারণে মন খারাপ লাগে। এটাকেই এক ধরনের টেনশন মনে হয়। আসলে এটা টেনশন নয়, এটা হল মন বা আত্মার চুপসে যাওয়া। এর প্রতিকার হল তেলাওয়াত, যিকির, ইবাদত-বন্দেগী ও দ্বীনী চিন্তা-চর্চার পূর্বের পরিমাণে ফিরে যাওয়া।

কয়েকটা দুশ্চিন্তা প্রসঙ্গ

টেনশন বলা হয় দুশ্চিন্তা যখন মনের মধ্যে চাপ সৃষ্টি করে। কিছু দুশ্চিন্তা এমন আছে যাকে ঠিক টেনশন বলা না গেলেও অনেকটা টেনশনের কাছাকাছি। টেনশনের মত এসব দুশ্চিন্তাও মনের মধ্যে এক ধরনের অবাঞ্ছিত চাপ সৃষ্টি করে রাখে। ফলে মানসিক পীড়া বোধ হয়। নিম্নে এরূপ কয়েকটা দুশ্চিন্তা ও তার প্রতিকার সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

অভাব-অনটন নিয়ে দুশ্চিন্তা

অভাব-অনটন থাকা নিয়েও অনেকের মনে সর্বক্ষণ একটা দুশ্চিন্তা লেগে থাকে।

প্রতিকার: অভাব-অনটন নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অভাব-অনটনকে শাস্তি হিসাবে এবং কষ্টের বিষয় হিসাবে না দেখে ফযীলতের বিষয় হিসাবে দেখতে হবে। অভাব-অনটনের ফযীলত স্মরণ করতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অভাবের যিন্দেগীর কথা স্মরণ করতে হবে। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবের যিন্দেগী পছন্দ করে নিয়েছিলেন। তিরমিযী শরীফের এক বর্ণনা মোতাবেক মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর জন্য মক্কার বাত্‌হা এলাকাকে (আর এক বর্ণনা মোতাবেক মদীনার উহুদ পাহাড়কে) স্বর্ণের বানিয়ে দেয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কিন্তু তিনি তা গ্রহণ করেননি বরং এক বেলা খেয়ে শোকর আদায় ও আর এক বেলা না খেয়ে সবর করার যিন্দেগীকে পছন্দ ও অবলম্বন করেছেন। কেননা অভাব-অনটনের যিন্দেগী ফযীলতের যিন্দেগী। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِطَّلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَآءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَآءَ. متفق عليه.رواه البخاري في كتاب الرقاق – باب فضل الفقر

٦٤٤٩، ورواه مسلم عن ابن عباس في كتاب الرقاق – باب أكثر أهل الجنة الفقراء إلخ ٢٧٣٧.

অর্থাৎ, হযরত ইমরান ইবনে হুসাইন (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমি জান্নাত পর্যবেক্ষণ করলাম তার অধিবাসীদের সিংহভাগ দরিদ্র শ্রেণীর লোক। আর জাহান্নাম পর্যবেক্ষণ করলাম তার অধিবাসীদের সিংহভাগই নারী সম্প্রদায়। (বোখারী ও মুসলিম)

অভাব-অনটনের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْفُقَرَآءُ الْجَنَّةَ قَبْلَ الْأَغْنِيَآءِ بِخَمْسِ مِأَةِ عَامٍ نِصْفِ يَوْمٍ. رواه الترمذي في أبواب الزهد – باب ما جاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ٢٣٥٣، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, গরীবেরা ধনীদের চেয়ে পাঁচশত বৎসর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর এই পাঁচশত বৎসর হল পরকালের অর্ধদিন। (তিরমিযী)

অভাব-অনটনের ফযীলত বয়ান করে আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَضِيَ مِنَ اللّٰهِ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الرِّزْقِ رَضِيَ اللّٰهُ مِنْهُ بِالْيَسِيْرِ مِنَ الْعَمَلِ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان في باب في تعديد نعم الله عز وجل وشكرها. حديث رقم ٤٥٨٥.

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি অল্প রিযিকে সন্তুষ্ট থাকে, আল্লাহ তার অল্প আমলে সন্তুষ্ট হন। (শুআবুল ঈমান)

উল্লেখ্য, অভাব-অনটনের এসব ফযীলতের কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবের যিন্দেগীকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন। সাহাবায়ে কেরামও অভাবের যিন্দেগীকে পছন্দ করতেন। সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে বিভিন্ন দেশ বিজয়ের ফলে যখন সাহাবায়ে কেরামের কাছে সম্পদ আসতে শুরু করেছিল, তখন সাহাবায়ে কেরাম পেরেশান হয়ে উঠেছিলেন এই ভেবে যে, আমাদের নেক আমলের বদলা কি দুনিয়াতেই দিয়ে দেয়া হচ্ছে!

অভাব-অনটনের যিন্দেগীতে আরও অনেক ফায়দা রয়েছে। অভাবী লোকেরা এমন সব গোনাহ থেকে সহজে বিরত থাকতে পারে, যেগুলোতে সম্পদশালীরা লিপ্ত হয়ে থাকে। সম্পদ থাকার কারণে সম্পদশালীরা বিভিন্ন রকম গোনাহের উপকরণ সহজে সংগ্রহ করতে পারে। ফলে তারা সেই সব উপকরণ সংগ্রহ করে গোনাহে লিপ্ত হয়। অভাবী লোকেরা সহজে সেসব গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে। এ কারণে এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا الْفَقْرَ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ وَلاَكِنِّيْ أَخْشٰى عَلَيْكُمْ اَئِنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلٰى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَتَنَافَسُوْهَا كَمَا تَنَافَسُوْهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا اَهْلَكَتْهُمْ. (رواه البخاري ٤٠١٥ ومسلم ٢٩٦١)

অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র কসম! আমি তোমাদের অভাবকে ভয় করি না। বরং আমি ভয় করি তোমাদের কাছে প্রচুর দুনিয়ার সম্পদ আসবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের কাছে এসেছিল। এমন হলে সেই সম্পদ তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছিল। (বোখারী ও মুসলিম)

অতএব মন থেকে অভাবে থাকার কষ্টবোধ লাঘব করার জন্য চারটি কাজ করুন।

১. তাকদীরে ফয়সালায় বিশ্বাস রাখুন। এই বিশ্বাস রাখুন, যে অবস্থায় থাকা আপনার জন্য মঙ্গলজনক সে অবস্থায়ই আল্লাহ আপনাকে রেখেছেন। আল্লাহ কারও অমঙ্গল করেন না।

২. চিন্তা করুন কার্ অভাব না আছে? কারও বাড়ি আছে গাড়ি নেই। কারও সুন্দরী বিবি আছে বিবির সঙ্গে মনের মিল নেই। কারও বিবির সঙ্গে খুব মিল আছে কিন্তু তার ভরণ-পোষণ দেয়ার মত টাকা-পয়সা নেই। কারও জ্ঞান-বুদ্ধি আছে কিন্তু টাকা-পয়সা নেই। কারও টাকা-পয়সা আছে কিন্তু জ্ঞান-বুদ্ধি নেই। কারও ঘরে প্রচুর খাদ্য-

খাবার আছে কিন্তু পেটে সেগুলো হজম করার মত শক্তি নেই। এমনিভাবে কারও এটা আছে তো সেটা নেই। বস্তুত এমন লোক পাওয়া দুষ্কর যার কোনোই অভাব নেই।

৩. অভাব-অনটনের ফযীলত স্মরণ করুন।

৪. সম্পদশালী হওয়ার খারাবী স্মরণ করুন। তাহলে মন থেকে অভাবে থাকার কষ্টবোধ লাঘব হবে।

আর অভাব দূর হওয়া এবং রিযিকে বরকতের জন্য তিনটি কাজ করুন।

১. আল্লাহর কাছে অভাব দূর হওয়ার এবং রিযিকে বরকত হওয়ার দুআ করতে থাকুন। তাঁর রহমতের দুয়ার সর্বক্ষণ উন্মুক্ত, তাঁর দানের হাত সর্বদা প্রসারিত। তাঁর দয়া সকলের জন্য অবারিত। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অভাবসহ কয়েকটি জিনিস থেকে মুক্তি চেয়ে এভাবে দুআ করতেন।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفَقْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ. (رواه النسائي والحاكم وابن حبان وأحمد)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে কুফর, অভাব ও কবরের আযাব থেকে মুক্তি চাই। (নাসায়ী, মুস্তাদরকে হাকিম, সহীহ ইবনে হিব্বান ও মুসনাদে আহমদ)

২. অভাবের মধ্যেও যতটুকু সাধ্য দান-খয়রাত করুন, তাতে রিযিকে বরকত হবে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَ يُرْبِى الصَّدَقٰتِ.﴾

অর্থাৎ, সুদকে আল্লাহ মোচন করে দেন আর দান-সদকাকে বৃদ্ধি করে দেন। (সূরা বাকারা: ২৭৬)

হাদীছে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رض أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ اللّٰهُ: أَنْفِقْ يَا اِبْنَ اٰدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْكَ. متفق عليه. رواه البخاري في كتاب النفقات ٥٣٥٢، ورواه مسلم في كتاب الزكاة – باب الحث على النفقة وتبشير المنفق الخلف ٣٩٩. واللفظ للبخاري.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, হে আদম সন্তান! তুমি ব্যয় (দান) কর, আমি তোমার জন্য ব্যয় করব (অর্থাৎ, তোমার সম্পদ বৃদ্ধি করে দিব)। (বোখারী ও মুসলিম)

৩. প্রতিদিন সন্ধ্যায় সূরা ওয়াকেয়া তেলাওয়াত করুন। যে ব্যক্তি প্রতি রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে অনাহারে থাকবে না। আল্লাহ তাআলা তার রিযিকের অভাব দূর করে দিবেন। হাদীছে এসেছে–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْوَاقِعَةِ فِيْ كُلِّ لَيْلَةٍ لَمْ يُصِبْهُ فَاقَةٌ أَبَدًا. وَكَانَ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ يَأْمُرُ بَنَاتِهِ يَقْرَأْنَ بِهَا كُلَّ لَيْلَةٍ. رواه البيهقي في شعب الإيمان حديث رقم ٢٤٩٩. ورواه من المتقدمين ابن وهب في جامعه وأبو عبيد في فضائل القرآن، كما في بيان الوهم والإيهام لأبي الحسن ابن القطان جـ/٤ صـ ٦٦٢، وإسناده مما يحتمل في الفضائل، واستنكارأحمد راجع إلى ضعف الإسناد على ما هو الظاهر.

অর্থাৎ, হযরত ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি প্রত্যেক রাতে সূরা ওয়াকেয়া পাঠ করবে, সে কখনও দারিদ্রে পতিত হবে না। (বর্ণনাকারী বলেন,) হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে মাসঊদ (রা.) তাঁর কন্যাদেরকে প্রত্যেক রাতে এ সূরা পাঠ করতে বলতেন। (শুআবুল ঈমান)

বিঃ দ্রঃ যিন্দেগীর সবক্ষেত্রে বরকত লাভ করার জন্য এ গ্রন্থের “যদি বরকতময় জীবন গড়তে চান” অধ্যায়ের আলোচনা পড়ুন। সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়ার আরও কিছু উপায় সম্বন্ধে জানতে পারবেন পূর্ববর্তী অধ্যায় (যদি সমৃদ্ধ জীবন গড়তে চান) পাঠ করলে।

বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা

অনেকে বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে থাকেন। অনেক সময় শুধু নিজের বিপদ-আপদ ও নিজের কষ্ট-ক্লেশ নয় গোটা মুসলমান জাতির উপর

বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ কেন তা নিয়েও ভাবেন, ভাবতে ভাবতে মন খারাপ করেন।

প্রতিকার: মুসলমানদের বিপদ-আপদ কেন হয়, তাদেরকে কষ্ট-ক্লেশে কেন রাখা হয়? এর পেছনে অনেক রহস্য থাকে। ইসলামে সুখ-দুঃখের রয়েছে অত্যন্ত স্পষ্ট তত্ত্ব। সেই রহস্য ও তত্ত্বগুলো বুঝতে পারলে দেখা যাবে বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ মূলত আল্লাহর রহমতই। তখন বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের কারণে মনের মধ্যে কষ্ট আসবে না। নিম্নে বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের রহস্য এবং সুখ-দুঃখের তত্ত্ব সম্বন্ধে বিশেষ ৬টি কথা পেশ করা হল। তারপর বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধারের উপায় সংক্ষেপে উল্লেখ করা হবে।

(এক) মুসলমানদের জন্য আল্লাহ পাক জান্নাত তৈরি করে রেখেছেন। এই জান্নাতের জন্য যা কিছু মেহনত-মোজাহাদা করা দরকার, সেই মেহনত-মোজাহাদার মধ্যে তাদের ত্রুটি থেকে যায়। আল্লাহ পাক সেই ত্রুটি পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে দুনিয়াতে কিছু কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে থাকেন। এভাবে স্বেচ্ছায় যতটুকু মেহনত-মোজাহাদা করার দরকার ছিল, তাতে ত্রুটি থাকায় বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে বাধ্যতামূলকভাবে আল্লাহ পাক সে মেহনত-মোজাহাদা করিয়ে নেন। যাতে জান্নাত অর্জন করার মত প্রয়োজনীয় মেহনত-মোজাহাদা পূর্ণ হয়ে যায়। তাই এরকম কষ্ট-ক্লেশ হওয়াটা মুসলমানদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়! এই কষ্ট-ক্লেশ, বিপদ-আপদে তারা ধৈর্য ধারণ করবে, তাদের ছওয়াব হতে থাকবে, তারা জান্নাতের দিকে এগুতে থাকবে। অতএব বুঝা গেল– এসব বিপদ-আপদ মু'মিনদের জন্য আল্লাহ্র রহমত স্বরূপ।

(দুই) কিছু বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ এসে থাকে গোনাহ মোচনের জন্য। এ হিসাবেও বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র রহমত স্বরূপ। কারণ এটা তাদের পাপ মোচনের কারণ হয়ে থাকে। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাই ইরশাদ করেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

(رواه مسلم في باب المؤمن أمره كله خير برقم ٢٩٩٩)

অর্থাৎ, মুমিনের ব্যাপারটা বড়ই অদ্ভুত! মুমিন ব্যতীত আর কারও ক্ষেত্রে এমনটা নয়। যদি তার সুখের কিছু হয় আর সে শোকর আদায় করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণকর; আবার যদি কোন কষ্টের কিছু হয় আর সে সবর করে, সেটাও তার জন্য কল্যাণ বয়ে আনে। (মুসলিম)

হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত অন্য এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَا مِنْ مُصِيْبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا. (رواه مسلم في كتاب البر والصلة ٢٥٧٢ والبخاري في كتاب المرضى ٥٦٤٠)

অর্থাৎ, মু'মিনের উপর যে কোনো বিপদ-আপদ হোক না কেন, এমনকি একটা কাঁটাও যদি তার পায়ে বিঁধে, এর জন্যও তার পাপ মোচন হয়। (মুসলিম ও বোখারী)

অতএব বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের কারণে মুসলমানদের কষ্ট বোধ করার কিছু নেই। তাদের জন্য তো অকল্যাণ বলেই কিছু নেই। সবই তাদের জন্য রহমত আর রহমত! সবই তাদের জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ!

(তিন) কিছু বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ আসে মুসলমানদের সতর্ক করার জন্য। যখন তারা পাপের পথে অগ্রসর হয়, যখন তারা ভুল পথে চলতে থাকে, তখন তাদের কিছু বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ দেয়া হয়; যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায় যে, আমরা ভুল পথে চলছি বলেই এই বিপদ দেখা দিয়েছে। আর সতর্ক হয়ে সেই পাপ থেকে তারা ফিরে আসে। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের কারণেই দুনিয়াতে বিপর্যয় ও বিপদ-আপদ দেখা দেয়, যাতে মানুষ তাদের কৃত কর্মের কিছু শাস্তি ভোগ করে এবং যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা রূম: ৪১)

এরকম বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেষ ব্যক্তিগতভাবে আসে ব্যক্তিগতভাবে সতর্কীকরণের জন্য, আর জাতিগত এবং সমষ্টিগতভাবে আসে জাতিগতভাবে ও সমষ্টিগতভাবে সতর্কীকরণের জন্য।

(চার) মুসলমানদের সামনে কিছু বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ আসে ভাল-মন্দ বাছাই করার জন্য। এরূপ বিপদের মুহূর্তে যারা খাঁটি মু'মিন, তারা দ্বীনের উপর অটল থাকে, আর যারা মুনাফেক গোছের মু'মিন, তারা ছাটাই হয়ে যায়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করেছে তারা বলবে, আমরা ঈমান এনেছি, (অর্থাৎ, মুসলমান বলে নিজেরদেরকে পরিচয় দিবে) আর (তারা খাঁটি মুসলমান কি খাঁটি মুসলমান না) তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? তাদের পূর্ববর্তী লোকদেরও আমি এরকম পরীক্ষা নিয়েছি, উদ্দেশ্য ছিল কারা খাঁটি মু'মিন আর কারা খাঁটি মু'মিন নয়- তা আল্লাহ জেনে নিবেন। (সূরা আনকাবূত: ২-৩)

(পাঁচ) কিছু বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ আসে পরীক্ষা স্বরূপ। বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করার জন্যই আল্লাহ পাক এরূপ পরীক্ষার ব্যবস্থা নিয়ে থাকেন। এ ক্ষেত্রে বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশে পড়ে যখন বান্দা ধৈর্য ধারণ করে, ধৈর্যের পরীক্ষায় যখন সে উত্তীর্ণ হয়, তখন তার মর্যাদা বুলন্দ হয়। দুনিয়াতেও পরীক্ষা দ্বারা মান উত্তীর্ণ হয়। আল্লাহ পাকও তদ্রূপ পরীক্ষার মাধ্যমে মর্যাদা বুলন্দ করেন। এ মর্মে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ؕ وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা নিব কিছু অভাব-অনটন দিয়ে, কিছু জান-মালের ক্ষতি দিয়ে, কিছু ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে। (তারপর আল্লাহ বলেছেন,) হে নবী! তুমি সবরকারীদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও। (সূরা বাকারা: ১৫৫)

এ জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ পাক যাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান, তাদেরই এরকম পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদেরকেই এরকম পরীক্ষার সম্মুখীন বেশি করা হয়। সবচেয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দা

হলেন নবীগণ। তাই নবীদের এরকম পরীক্ষা বেশি নেয়া হয়। এক হাদীছে এসেছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মানুষের মধ্যে কাদের পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন নেয়া হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জওয়াব দিয়েছিলেন,

اَلْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ. (رواه الترمذي برقم ٢٣٩٨)

অর্থাৎ, (সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয়) নবীদের, তারপর যে যত বেশি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের। (তিরমিযী)

হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আগুনে ফেলে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। হযরত ইউনুস (আ.)কে সাগরের মাছের পেটে নিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। হযরত যাকারিয়া (আ.)কে কাফেররা করাত দিয়ে চিরে দুই খণ্ড করে দিয়েছিল। এভাবে তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। হযরত আইয়ূব (আ.)কে কঠিন রোগে আক্রান্ত করে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। ১৮ বৎসর যাবত তিনি এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন যে, তার শরীরের মাংস খসে খসে পড়ত। তার শরীরে পোকা ধরে গিয়েছিল। লোকেরা তাঁকে লোকালয়ের বাইরে ফেলে রেখে এসেছিল। এসব নবীগণ অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় মানুষ ছিলেন। তারপরও কেন তাঁদের এসব বিপদ হল? আল্লাহ পাক এসব বিপদ দিয়ে তাঁদের মর্যাদা আরও বুলন্দ করেছেন। বুঝা গেল- মুসলমানদের কিছু কষ্ট-ক্লেশ ও কিছু বিপদ-আপদ তাদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ এসে থাকে।

এভাবে মুসলমানদের বিপদ-আপদের পিছনে রহস্য রয়েছে অনেক। সুখ-দুঃখ বিষয়ক তত্ত্ব রয়েছে অনেক ব্যাপক।

এবার বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ বিষয়ক দুশ্চিন্তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার মূল উপায় সম্বন্ধে সংক্ষেপে শুনুন।

১. বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশের রহস্য ও তত্ত্ব স্মরণ করুন।

২. তাকদীরের ফয়সালায় নিজেকে সন্তুষ্ট করুন। দৃঢ় বিশ্বাস রাখুন যে, আল্লাহ কোন বান্দার অমঙ্গল চান না। যে অবস্থার মধ্যে যার মঙ্গল সে অবস্থায়ই আল্লাহ তাকে রেখেছেন। পর্যালোচনা করলে দেখা যায় বান্দা যা কিছু চায় তার চেয়ে যা কিছু চায় না তার মধ্যেই তার মঙ্গল বেশি।

৩. আপনার চেয়ে যারা বেশি বিপদগ্রস্ত তাদের কথা স্মরণ করুন, আপনার কষ্টবোধ হ্রাস পাবে। আপনার পেটের পীড়া, ঐ যে একজনের রীতিমত আলসার হয়ে গেছে। আপনার মাথায় ব্যথা, ঐ যে একজনের রীতিমত ব্রেনে ক্যানসার হয়ে গেছে। আপনার কাশি হয়েছে, ঐ যে একজনের রীতিমত যক্ষ্মা হয়ে গেছে। আপনার ঠাণ্ডা

লেগে শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, ঐ যে একজনের রীতিমত হাঁপানি হয়ে গেছে। এভাবে আপনার চেয়ে যারা বেশি বিপদে আছে বেশি কষ্ট-ক্লেশে আছে তাদেরকে দেখুন, তাহলে আপনার কষ্টবোধ হ্রাস পাবে। মাঝে মধ্যে হাসপাতালে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের রোগে আক্রান্ত রোগীদের দেখুন, তাতে বহু রোগ থেকে আপনি মুক্ত আছেন ভেবে কষ্টবোধ হ্রাস পাবে। অসুস্থতা দেখা সুস্থতার আনন্দ এনে দিবে। জেলখানায় গিয়ে বন্দীদের দশা দেখুন, মুক্ত থাকার কদর বুঝে আসবে। পাগলদের হাসপাতালে গিয়ে পাগলদের অবস্থা দেখুন, জ্ঞান-বুদ্ধির কদর বুঝে আসবে।

৪. বিপদ-মুসীবতের ফায়দাগুলো স্মরণ করুন, মনে প্রশান্তি বোধ আসবে। বিপদ-আপদ দ্বারা গোনাহ মোচন হয়, মনের অহংকারবোধ হ্রাস পায়, বিপদ-আপদ দুআ স্মরণ করিয়ে দেয়। বিপদে সবর করতে পারলে আল্লাহর সাথে নৈকট্য পয়দা হয়। সবরের বদলায় জান্নাত লাভ হয়।

৫. যেসব বিপদ থেকে মুক্ত রয়েছেন সেগুলো স্মরণ করে শোকর আদায়ের জন্য নিজেকে উদ্বুদ্ধ করুন। ঐতো একজন লোকের একটা পা নেই কিংবা দুটো পা-ই নেই, আপনার তো সুস্থ দুটো পা রয়েছে। ঐ যে একজন অন্ধ লোক ভিক্ষা করে তার জীবিকা নির্বাহ করছে, আপনার যে সুন্দর দুটো চোখ রয়েছে যা দিয়ে জগতকে দেখে সম্মানের সাথে জীবিকা উপার্জন করতে পারছেন। ঐ যে একজন লোক মামলা-মোকদ্দমায় সর্বশান্ত হয়ে গেল, আপনি যে তা থেকে মুক্ত রয়েছেন। ঐ যে একজন লোক জীবনের ভয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে, আপনি যে দিব্যি নির্বিঘ্নে চলাফেরা করতে পারছেন, নিজের ঘরে আরামে ঘুমাতে পারছেন। এভাবে চিন্তা করুন আর নিজের ভিতর থেকে শোকরের আলহামদু লিল্লাহ বের করে আনুন।

৬. বেশি বেশি সালাতুল হাজাত পড়ে আল্লাহর কাছে বিপদ-মুসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য দুআ করতে থাকুন। বিপদ-মুসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার ক্ষেত্রে নামায ও দুআর রয়েছে বিশেষ আছর। আল্লাহ ছাড়া আর কে আছে যে আমাদের ডাকে সাড়া দিতে পারে, আমাদের কষ্ট দূর করতে পারে? কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াতটি স্মরণে রাখুন।

﴿اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَ يَكْشِفُ السُّوْٓءَ.﴾

অর্থাৎ, বলতো (আল্লাহ ছাড়া) কে নিঃসহায়ের ডাকে সাড়া দেন যখন সে ডাকে এবং কষ্ট দূরীভূত করেন? (সূরা নাম্‌ল: ৬২)

বিপদ-মুসীবত থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য হাদীছে শেখানো অনুযায়ী নিম্নোক্ত দুআ করতে থাকুন।

اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (رواه الترمذي ٣٥١٢ وقال : حديث حسن)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি। (তিরমিযী)

৭. অনেক সময় এমন হয় যে, দীর্ঘ দিন বা উপর্যুপরি বিপদ-আপদ ও বালা-মুসীবতে আক্রান্ত থাকার কারণে মনের মধ্যে হতাশা এসে যায় যে, আমার বিপদ বোধ হয় আর কাটবে না। এভাবে জীবনের প্রতিও হতাশা কিংবা বিতৃষ্ণা এসে পড়ে। এরকম অবস্থা হলে কুরআনের নিম্নোক্ত বাণীটি স্মরণ করুন–

﴿وَلَا تَيْئَسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। (সূরা ইউসুফ: ৮৭)

অতএব আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হবেন না, আল্লাহর সাহায্যের কথা ভুলে বসবেন না। আল্লাহর সাহায্য আসে নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পরিমাণে। আল্লাহর নিকট নির্ধারিত আছে সবকিছুর সময় ও পরিমাণ।

﴿كُلُّ شَيْئٍ عِنْدَهُ بِمِقْدَارٍ.﴾

অর্থাৎ, তাঁর কাছে প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমাণ রয়েছে। (সূরা রা'দ: ৮)

৮. আপনার অতীতের এমন কোন বিপদ-মুসীবতের কথা স্মরণ করুন যা থেকে আল্লাহ আপনাকে উদ্ধার করেছিলেন। আর ভাবুন অতীতে যিনি উদ্ধার করেছিলেন এখনও তিনি আছেন, তিনিই উদ্ধার করবেন যখন উদ্ধার করা তিনি ভাল মনে করেন।

ছেলে-মেয়ে নিয়ে দুশ্চিন্তা

অনেকে ছেলে-মেয়ে নিয়ে প্রচুর দুশ্চিন্তা করে থাকে। ছেলে-মেয়ে নিয়ে চিন্তা করা ভাল এবং তার প্রয়োজনও রয়েছে, কিন্তু দুশ্চিন্তা করা ভাল নয়, তার প্রয়োজনও নেই। সাধারণত ছেলে-মেয়ে নিয়ে চার ধরনের দুশ্চিন্তা হয়ে থাকে। তাদের লেখাপড়া নিয়ে, তাদের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে, তাদের ভবিষ্যত নিয়ে এবং পিতা-মাতার অবাধ্যতা নিয়ে। যে ধরনেরই দুশ্চিন্তা হোক না কেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আপনার দায়িত্ব পালন করার পর যদি সে বিষয়ে কাংখিত ফল না পেয়ে থাকেন তাহলে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা পরিহার করুন। তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আল্লাহর ফয়সালায় রাজি-খুশি থাকুন। মনে রাখতে হবে আমরা সব বিষয়ে চেষ্টা করতে পারি কিন্তু আমাদের

ইচ্ছেমত কোনো কিছুর কাংখিত ফল আমরা দাঁড় করাতে পারি না। ফলাফল দাঁড় করানো আমাদের হাতে নয়। সবকিছুর চূড়ান্ত ফলাফল আল্লাহর হাতে। তিনি আমাদের জন্য যে বিষয়ে যেমন সংগত মনে করেন তাতেই আমাদের রাজি থাকা চাই। আল্লাহর নবী হযরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁর পুত্রকে ভাল করার জন্য প্রয়োজনীয় দায়িত্ব পালনে নিশ্চয়ই ত্রুটি করেননি, কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর পুত্র কাফেরদের দলে গিয়ে ভিড়েছে এবং শেষ পর্যন্ত কাফেরদের সঙ্গে ডুবে মরেছে। এ সম্পর্কিত কুরআনে কারীমের বর্ণনা লক্ষ করুন।

وَ نَادٰی نُوۡحُ ۨابۡنَهٗ وَ کَانَ فِیۡ مَعۡزِلٍ یّٰبُنَیَّ ارۡکَبۡ مَّعَنَا وَ لَا تَکُنۡ مَّعَ الۡکٰفِرِیۡنَ ﴿۴۲﴾ قَالَ سَاٰوِیۡۤ اِلٰی جَبَلٍ یَّعۡصِمُنِیۡ مِنَ الۡمَآءِ ؕ قَالَ لَا عَاصِمَ الۡیَوۡمَ مِنۡ اَمۡرِ اللّٰهِ اِلَّا مَنۡ رَّحِمَ ۚ وَ حَالَ بَیۡنَهُمَا الۡمَوۡجُ فَکَانَ مِنَ الۡمُغۡرَقِیۡنَ ﴿۴۳﴾

অর্থাৎ, নূহ তাঁর পুত্র –যে তাদের থেকে পৃথক স্থানে ছিল– তাকে আহবান করে বলল, হে আমার প্রিয় পুত্র! আমাদের সাথে (নৌকায়) সওয়ার হয়ে যাও এবং কাফেরদের সাথে থেক না। সে বলল, আমি এখনই কোন পর্বতে আশ্রয় নিচ্ছি যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। সে (নূহ) বলল, আজ আল্লাহর বিধান থেকে কেউই রক্ষাকারী নেই, যাকে আল্লাহ রহম করেন সে ব্যতীত। আর একটা তরঙ্গ তাদের মধ্যে অন্তরায় হয়ে গেল। ব্যস, সে নিমজ্জিতদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। (সূরা হুদ : ৪২–৪৩)

আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীর অমঙ্গল কামনা করেননি। তা সত্ত্বেও তাঁর পুত্রের কাফের হওয়া এবং তাদের সঙ্গে ডুবে মরার মধ্যে কীভাবে মঙ্গল নিহীত ছিল তা আমাদের বোধ্যগম্য না হলেও আমরা বিশ্বাস রাখি যে, তার মধ্যেই নবীর জন্য মঙ্গল ছিল। এভাবেই শত চেষ্টা সত্ত্বেও আমাদের সন্তানকে ভাল করতে না পারলে আমাদের এ বিশ্বাসই রাখতে হবে যে, তার মধ্যেই আমাদের মঙ্গল।

সারকথা, সন্তান নিয়ে দুশ্চিন্তা বিষয়ের প্রতিকার হল–

১. সন্তানের লেখা-পড়া নিয়ে দুশ্চিন্তা হলে প্রথমে ভেবে দেখুন আপনি তার সুশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়েছেন কি না, এ ব্যাপারে আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন কি না। (সন্তানের সুশিক্ষার জন্য কি কি করণীয় এ সম্বন্ধে জানার জন্য আমার রচিত “আহকামে যিন্দেগী” কিতাবটি কিংবা এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি দেখা যেতে পারে।) যদি এ ব্যাপারে আপনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন, আপনার দায়িত্ব পালন করে থাকেন, তারপরও সন্তান শিক্ষা-দীক্ষায় অসফল হয়,

সুপথে না আসে, তাহলে তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আল্লাহর ফয়সালায় রাজি-খুশি থাকুন। মনে করুন এতেই আপনার জন্য মঙ্গল নিহীত রয়েছে। এভাবেই আপনি এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন।

২. সন্তানের স্বভাব-চরিত্র নিয়ে দুশ্চিন্তা হলে প্রথমে ভেবে দেখুন আপনার সন্তানের স্বভাব-চরিত্র গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন কি না। যদি প্রয়োজনীয় সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে থাকেন (এ সম্বন্ধে জানার জন্যও আমার রচিত "আহকামে যিন্দেগী" কিতাবটি কিংবা এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়টি দেখা যেতে পারে।) তারপরও সন্তানের স্বভাব-চরিত্র কাংখিতভাবে গড়ে না ওঠে, তাহলেও তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আল্লাহর ফয়সালায় রাজি-খুশি থাকুন। মনে করুন এতেই আপনার জন্য মঙ্গল নিহীত রয়েছে। এভাবেই আপনি এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন।

৩. সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তা এলে মনকে বোঝাবেন, আমি আমার সাধ্যমত সন্তানকে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছি, এতটুকুই আমার করণীয় ছিল, এখন তার ভবিষ্যত কী হবে তা তাকদীরের বিষয়, সে ব্যাপারে আমার কিছুই নিয়ন্ত্রণ নেই। ইসলাম সন্তানের ভবিষ্যত নিয়ে ভাবনার বিষয়ে এতটুকু বলেছে যে, তোমার পক্ষে হালাল পন্থায় সম্ভব হলে সন্তানের জন্য এতটুকু সম্পদ রেখে যাও যেন তাদেরকে অন্যের কাছে হাত পাততে না হয়। এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ.

الحديث. (متفق عليه. البخاري ١٢٩٥ ومسلم ١٦٢٨)

অর্থাৎ, তুমি তোমার উত্তরাধিকারীদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে এটা উত্তম এর চেয়ে যে, তাদেরকে এমন দরিদ্র অবস্থায় রেখে যাবে যে, তাদেরকে মানুষের কাছে হাত পাততে হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

অতএব হালাল পন্থায় সম্ভব হলে সন্তানের জন্য এতটুকু করে যাওয়ার চেষ্টা করুন। পারলে আল-হামদু লিল্লাহ, না পারলে আপনি দায়মুক্ত, তা নিয়ে আপনাকে দুশ্চিন্তা টেনশন করতে বলা হয়নি। হারাম পন্থায় হলেও সন্তানের জন্য ভবিষ্যতে চলার মত ব্যবস্থা করে যেতে হবে ইসলাম আমাদেরকে এমন দায়িত্ব দেয়নি।

৪. সন্তান পিতা-মাতার অবাধ্য– এ নিয়ে দুশ্চিন্তা হলে চিন্তা করে দেখুন যদি তাকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনার ত্রুটি না থাকে, তাহলে সন্তান থেকে যে অবাধ্যতা প্রকাশ পাচ্ছে সে ব্যাপারে তাকদীরের উপর সন্তুষ্ট থাকুন, আল্লাহর

ফয়সালায় রাজি-খুশি থাকুন। বিশ্বাস রাখুন এতেই আপনার জন্য মঙ্গল নিহীত রয়েছে। এভাবেই আপনি এ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন। আর যদি তাকে যথাযথভাবে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আপনার ত্রুটি থাকে, তাহলে আল্লাহর কাছে নিজের ত্রুটির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন এবং আল্লাহর কাছে বলুন, হে আল্লাহ! আমার ত্রুটি হয়েছে, আমার সন্তানকে এই ত্রুটির ক্ষতি থেকে রক্ষা করুন। সর্বোপরি সন্তান যেন আপনার জন্য সুখের হয় তার দুআ করুন। কুরআনে কারীমে এ বিষয়ে দুআ চাওয়ার ভাষাও শিক্ষা দেয়া হয়েছে।

﴿رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّ اجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের পরওয়ারদিগার, আমাদের স্ত্রীদের থেকে এবং আমাদের সন্তানাদি থেকে আমাদেরকে শান্তি দান কর। আর মুত্তাকীদের জন্য আমাদেরকে নেতা (আদর্শ স্বরূপ) বানিয়ে দাও। (সূরা ফুরকান: ৭৪)

৫. সর্বশেষ আর একটা কথা স্মরণে রাখা চাই। সন্তান মানুষের জন্য এক পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আপনাকে সবরের পরিচয় দিতে হবে। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে আল্লাহর কাছে মহা পুরস্কার লাভ করবেন। এই মহা পুরস্কার প্রদানের জন্যও সন্তান দ্বারা আপনাকে পরীক্ষা করা হতে পারে। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّمَآ اَمْوَالُكُمْ وَ اَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَ اللّٰهُ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ.﴾

অর্থাৎ, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান তো হল পরীক্ষা। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে মহা পুরস্কার। (সূরা তাগাবুন: ১৫)

রূপ সৌন্দর্য না থাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা

অনেকেরই রূপ সৌন্দর্য না থাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা হয়। এটাও মূলত সাধ্যের বাইরের জিনিস নিয়ে দুশ্চিন্তার পর্যায়ভুক্ত। নারীদের মধ্যেই সাধারণত এরূপ দুশ্চিন্তা দেখা যায়।

প্রতিকার: রূপ সৌন্দর্য না থাকার মধ্যেও আল্লাহর অনেক হেকমত ও রহস্য রয়েছে, অনেক ফায়দা ও উপকারিতা রয়েছে, সেগুলো চিন্তায় আনতে হবে, তাহলে রূপ সৌন্দর্য না থাকা জনিত দুশ্চিন্তা ও মনঃকষ্ট দূর হবে। সেমতে নিম্নে বর্ণিত ফায়দাগুলো লক্ষ করুন–

- যারা কালো বা রূপহীন তারা রঙ-রূপ দিয়ে স্বামীকে মুগ্ধ করতে পারবে না চিন্তা করে গুণ দিয়ে স্বামীকে মুগ্ধ করার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হয়। এভাবে সৎ ও কমনীয় গুণাবলী অর্জনের চিন্তায় তারা অগ্রসর হতে পারে। কালো ও রূপহীন নারীরা যদি চিন্তা করে যে, দুনিয়ার ক্ষণস্থায়ী যিন্দেগীতে তারা রূপ-লাবণ্য না পেলেও সৎ ও কমনীয় গুণাবলী অর্জনের চেতনা উদ্রেক করার মত যে অবলম্বন আল্লাহ তাদেরকে প্রদান করেছেন তা তাদের পরকালের চিরস্থায়ী যিন্দেগীর জন্য অনুকূল, তাহলে তারা রঙ রূপ না পাওয়ার কষ্টবোধ থেকে উত্তীর্ণ হতে পারবে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

[illegible]

অর্থাৎ, আখেরাতের যিন্দেগী উৎকৃষ্ট ও স্থায়ী। (সূরা আল-আ'লা: ১৭)

- যারা ফর্শা বা রূপবতী তাদের অনেকের মধ্যে রূপ-লাবণ্যজনিত এক ধরনের অহমিকা কাজ করে থাকে, ফলে স্বামীর সঙ্গে তাদের ব্যবহারে কমনীয়তা থাকে না, বরং বহু ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কথাবার্তা ও আচার- ব্যবহারে কর্কষ ভাব দেখা যায়। পক্ষান্তরে যারা কালো বা রূপহীন তারা এরূপ অহংকার থেকে মুক্ত থাকে, তারা কথাবার্তা ও আচার-ব্যবহারে কমনীয়তা এবং মাধুর্য অর্জনের ব্যাপারে যত্নবান হওয়ার চিন্তা করে থাকে, তারা চারিত্রিক গুণাবলীতে অলংকৃত হওয়ার চেষ্টায় যত্নবান হয়ে থাকে। অহংকার হল সবচেয়ে বড় আত্মিক রোগ। এই রোগ থেকে মুক্তির অবলম্বন লাভ করা এবং উত্তম চরিত্র অর্জনের অনুকূল মানসিক অবস্থা প্রাপ্ত হওয়াও আল্লাহর বড় নেয়ামত। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا. رواه البخاري في كتاب الأدب – باب لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا ٦٠٢٩.

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যার চরিত্র উত্তম। (বোখারী)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ جَابِرٍ رضـ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وأَقْرَبِكُمْ مِنِّيْ مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلَاقًا. رواه الترمذي في أبواب البر والصلة والأدب – باب ما جاء في معالي الأخلاق ٨١٠٢ والحديث صحيح.

অর্থাৎ, হযরত জাবের (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আমার কাছে অধিক প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সব থেকে নিকটতর, তোমাদের মধ্যে যার চরিত্র ভাল। (তিরমিযী)

- যারা ফর্শা ও রূপ-লাবণ্যময়ী তাদের অনেকে স্বামীর খেদমত থেকেও পিছিয়ে থাকে এই চিন্তায় যে, স্বামী তার প্রতি এমনিতেই দুর্বল, খেদমত না করলেও তার প্রতি খুশি। এই চিন্তা তাদেরকে স্বামীর খেদমতের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করে দেয়। পক্ষান্তরে কালো বা রূপ-লাবণ্যহীন নারী মনে করে তার পক্ষে রূপ-লাবণ্য দিয়ে স্বামীকে বাগানো সম্ভব নয়, স্বামীর সেবা ও খেদমতের মাধ্যমেই তাকে এ পথে এগিয়ে যেতে হবে। এভাবে তারা স্বামীর সেবা ও খেদমতে অগ্রসর হয়ে থাকে।
- যারা ফর্শা ও রূপবতী তাদের অনেকে স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে না, ফলে বহু ফর্শা নারী থাকে নোংড়া। পক্ষান্তরে কালো বা রূপহীন নারী স্বামীকে আকৃষ্ট করার জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, তারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে যত্নবান থাকে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার মানসিকতা লাভও আল্লাহর এক নেয়ামত। মুসলিম শরীফের প্রসিদ্ধ এক হাদীছের একাংশে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ. (رواه مسلم في أول كتاب الطهارة ٢٢٣)

অর্থাৎ, পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। (মুসলিম)

- যদি কোন কালো ও রূপহীন নারী শত যত্ন নেয়ার পরও স্বামী থেকে কাংখিত আদর-সোহাগ না পায়, তাহলে সে আল্লাহর কাছে বিনীত হয়, কাতর হয়ে প্রার্থনা করে, অন্তত পরকাল যেন সুন্দর হয়– এই চিন্তায় ব্রতী হয়ে ওঠে। এভাবে কালো ও রূপহীন নারী বেশি আল্লাহমুখী হয়, আখেরাতকে সুন্দর করার

চিন্তায় বেশি ব্রতী হয়। আর আল্লাহমুখী হওয়া এবং আখেরাতকে সুন্দর করার চিন্তা উদ্রেককারী উপাত্ত লাভ করার চেয়ে বড় নেয়ামত আর কী হতে পারে? এভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে কালো হওয়া বা রূপবতী না হওয়া এক হিসাবে অকল্যাণের মনে হলেও তার মধ্যে রয়েছে বিরাট কল্যাণের দিক। আল্লাহ তাআলা কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

عَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ... وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ.

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা জিনিস পছন্দসই নয় অথচ তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর। ... বস্তুত আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (সূরা বাকারা: ২১৬)

- যারা কালো বা রূপহীন তারা সহজে পর্দার অনুবর্তী হতে পারে। পক্ষান্তরে ফর্শা বা রূপ-লাবণ্যময়ী নারীদের অনেকে তাদের রূপ-লাবণ্য প্রদর্শনের চিন্তায় মেতে ওঠে, তাদের রূপ-লাবণ্য দর্শন করে কুমতলবী পুরুষরা তাদেরকে নানানভাবে বাহবা দেয়, পর্দাহীন চলার পক্ষে উসকানি দেয়, যা ঐই নারীদেরকে পর্দাহীন চলার পক্ষে আরও বেশি উৎসাহী করে তোলে। এভাবে পর্দাহীনতার গোনাহে জর্জরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অনেক সময় তারা কুমতলবী পুরুষদের খপ্পরে পড়ে চরিত্রহীনাও হয়ে যায়। অথচ যে নারীরা কালো বা রূপ-লাবণ্যহীন তারা সহজে এসব ফিতনা থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ তাআলা যে এভাবে তাদেরকে ফিতনা থেকে বাঁচার অনুকূল পয়দা করেছেন, এ-ও তাদের প্রতি আল্লাহর এক নেয়ামত। আল্লাহ তাআলা যে মানুষের প্রতি কতভাবে কত নেয়ামত দান করেছেন, তা গণনা করে শেষ করার নয়। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاِنْ تَعُدُّوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوْهَا.﴾

অর্থাৎ, যদি আল্লাহর নেয়ামত গণনা করতে যাও তবে গণনা করে শেষ করতে পারবে না। (সূরা ইব্রাহীম: ৩৪)

- যারা কালো ও রূপহীন হওয়ার কারণে মন-ভাঙ্গা থাকে, এই মন ভাঙ্গা থাকার কারণেও তারা আল্লাহর বিশেষ দয়া লাভ করতে পারেন। কারও কারও বর্ণনামতে ইমাম শাফিয়ী (রহ.) বলতেন, আল্লাহ মন-ভাঙ্গা লোকদের সঙ্গে থাকেন।

- ফর্শা ও রূপ-লাবণ্যময়ী না হওয়ার কারণে স্বামী কর্তৃক নিগৃহীত হলে নারী যখন সবর করবে, এই সবর করার কারণে আল্লাহর কাছে তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমের এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন,

﴿إِنَّمَا يُوَفَّى الصّٰبِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.﴾

অর্থাৎ, সবরকারীদেরকে তো অগণিত পুরস্কার দান করা হবে। (সূরা যুমার: ১০)

এভাবে দুনিয়াতে স্বামীর সামান্য আদর-সোহাগ থেকে বঞ্চনা আখেরাতে বিরাট প্রাপ্তির পথ তৈরি করবে। এ হিসাবে বিবেচনা করলেও রূপ-লাবণ্য না থাকাকে নেয়ামত বলে মনে হবে। বস্তুত আমরা অনেক কিছুই আখেরাতের বিবেচনায় দেখলে ভাল দেখাবে, অথচ সেগুলোকেই দুনিয়ার বিবেচনায় দেখলে খারাপ বোধ হবে। মুমিনের দৃষ্টি হওয়া চাই আখেরাত কেন্দ্রিক দৃষ্টি, দুনিয়া কেন্দ্রিক নয়।

টেনশনের ক্ষতিসমূহ

টেনশন থেকে বিরত থাকুন। টেনশনের কারণে বহু রকম ক্ষতি হয়– শারীরিক ক্ষতি হয়, মানসিক ক্ষতি হয় এবং দ্বীনী ক্ষতি হয়। শারীরিক ক্ষতি হল এতে শরীর বিষণ্ন হয়ে পড়ে, যার কারণে অনেক সময় কোন কোন রোগ-ব্যধি বেড়ে যায়, এমনকি স্ট্রোক-এর মত দুর্ঘটনাও ঘটে। মানসিক ক্ষতি হল দুশ্চিন্তা টেনশনের ফলে মন বিষণ্ন হয়ে পড়ে, মনের শান্তি নষ্ট হয়ে যায়, হতাশা বেড়ে যায়, কর্মস্পৃহা হ্রাস পায়। আর দ্বীনী ক্ষতি হল অনেক ধরনের টেনশনই তাকদীরে বিশ্বাসের পরিপন্থী, আল্লাহর ফয়সালায় রাজি-খুশি থাকার পরিপন্থী, আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা রাখার পরিপন্থী, আল্লাহর প্রতি তাওয়াক্কুল ভরসা থাকার পরিপন্থী। ফলে টেনশন ঈমানকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

টেনশন থেকে মুক্তির সারকথা

এ যুগ টেনশনের যুগ। নানান কারণে এ যুগে টেনশন বৃদ্ধি পেয়েছে। তাই টেনশন, টেনশনের প্রকার ও সেগুলো থেকে মুক্তির উপায় সম্বন্ধে সুদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হয়েছে। এই সুদীর্ঘ আলোচনার সারকথা হল টেনশন থেকে মুক্তি লাভের জন্য ২০টি কাজ করতে হবে। যথা:–

১. দলীল-প্রমাণ ছাড়া ভিত্তিহীন কোন কারণে টেনশন করবেন না।
২. ছোট্ট জিনিসকে বড় করে ভেবে টেনশন ডেকে আনবেন না।

৩. রোগ-ব্যধিকে আল্লাহর নেয়ামত ভাবুন। এ নিয়ে টেনশন করবেন না।

৪. মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবুন। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশন করবেন না।

৫. যত মানুষ তত মত। তাই একজনের মতে সঙ্গে অন্যজনের মতের অমিল হতেই পারে। অতএব নিজের মতের সাথে অন্যদের মিল না হওয়ার কারণে টেনশন করবেন না।

৬. ইখলাসের সঙ্গে সব কাজ করুন। অন্যদের থেকে কৃতজ্ঞতা না পেলে তা নিয়ে টেনশন করবেন না।

৭. জীবনে যা যা পাওয়া গেছে তা চিন্তা করে কৃতজ্ঞ থাকুন। কোন কিছু না পাওয়া নিয়ে টেনশন করবেন না।

৮. বর্তমান নিয়ে ভাবুন। অতীতের কোন ব্যর্থতা বা প্রতিকূল কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশন করবেন না।

৯. ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না। বর্তমানকে নিয়েই বেশি ব্যস্ত থাকার চেষ্টা করবেন।

১০. নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন। কেউ ভাল চোখে দেখল না– তা নিয়ে টেনশন করবেন না।

১১. পাছে লোকে কী বলে– এ নিয়ে টেনশন করবেন না।

১২. সাধ্যের বাইরের জিনিস নিয়ে টেনশন করবেন না।

১৩. মনে হাছাদ বা পরশ্রীকাতরতাকে স্থান দিবেন না। অন্যের ভাল কিছু দেখে টেনশন করবেন না।

১৪. অপরাধ থেকে বিরত থাকুন। তাহলে নিজের কৃত অপরাধের কারণে টেনশন করতে হবে না।

১৫. যিকির করুন, মনে প্রশান্তি থাকবে। কারণ-জানা-নেই এমন টেনশন আসবে না।

১৬. অভাব-অনটনকে শাস্তি হিসাবে এবং কষ্টের বিষয় হিসাবে দেখবেন না বরং ফযীলতের বিষয় হিসাবে দেখবেন, তাহলে অভাব-অনটনের কারণে টেনশন হবে না।

১৭. ইসলামের দৃষ্টিতে বিপদ-আপদের যে তাৎপর্য রয়েছে তা স্মরণে রাখুন, তাহলে বিপদ-আপদ নিয়ে টেনশন হবে না। বিপদ-আপদ সম্বন্ধে ইসলাম যে তাৎপর্য পেশ করেছে তার চেয়ে সুন্দর তাৎপর্য আর কারও পক্ষে পেশ করা সম্ভব নয়।

১৮. সাধ্য অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করুন, তারপর তাদের কী হল বা কী হবে তা নিয়ে বেশি ভাববার প্রয়োজন নেই। এই চিন্তা ছেলে-মেয়ে নিয়ে টেনশন থেকে মুক্তি দিবে।

১৯. রূপ না থাকার মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে তা নিয়ে ভাবুন, তাহলে রূপ না থাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন।

২০. টেনশনের ক্ষতিগুলো নিয়ে ভাববেন তাহলে টেনশন করার প্রবৃত্তি দমিত হবে।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সকলকে টেনশন থেকে মুক্তি দান করুন। আমীন!

অষ্টম অধ্যায়

যদি নিরাপদ জীবন গড়তে চান

অষ্টম অধ্যায়

যদি নিরাপদ জীবন গড়তে চান

“নিরাপদ” শব্দের অর্থ

“নিরাপদ” শব্দের মৌলিকভাবে দুটো অর্থ। ১. বিপদ-আপদমুক্ত অর্থাৎ দুর্দশামুক্ত, দুরবস্থামুক্ত, দুর্ঘটনামুক্ত ও দুঃখমুক্ত। ২. নিরুপদ্রব অর্থাৎ উৎপাতহীন। যার ওপর কেউ অত্যাচার, নির্যাতন ও উৎপীড়ন চালায় না, যার ওপর কেউ নিষ্ঠুরতা চালায় না সে হল উৎপাতহীন তথা নিরুপদ্রব। আবার যার ওপর কোন দৈব দুর্ঘটনা ঘটে না তাকেও বলা হয় নিরুপদ্রব।

নিরাপদ জীবন বলতে কী বোঝায়?

পূর্বে নিরাপদ শব্দের যে অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তিনটা বিষয় থেকে মুক্তি লাভ করার নাম হল নিরাপদ হওয়া। অতএব নিরাপদ জীবন বলতে বোঝায় যে জীবন সেই তিনটা বিষয় থেকে মুক্তি লাভ হয়। সেই তিনটা বিষয় হল–

১. দুর্দশা, দুরবস্থা, দুর্ঘটনা ও দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করা।
২. অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতা থেকে মুক্তি লাভ করা।
৩. দৈব দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি লাভ করা।

পুরোপুরি নিরাপদ জীবন লাভ সম্ভব কি?

পূর্বে নিরাপদ জীবন বলতে জীবনে যে তিনটা বিষয় থেকে মুক্তি লাভ করার কথা বলা হয়েছে, সে অনুসারে গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যায় কোনো মানুষের পক্ষে কোনো অর্থেই পুরোপুরি নিরাপদ হওয়া সম্ভব নয়। প্রথম ও তৃতীয় অর্থে পুরোপুরি নিরাপদ হওয়া সম্ভব নয় এ কারণে যে, কিছু দুরবস্থা, দুর্ঘটনা, দুঃখ ও দৈব দুর্ঘটনা আল্লাহর পক্ষ থেকেই দেয়া হয় মানুষের গোনাহ মোচনের জন্য বা মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য কিংবা কোন পাপ হয়েছে সে ব্যাপারে সতর্ক করার জন্য। আবার কিছু বিপদ-আপদ বা কষ্ট-ক্লেষ আসে ভাল-মন্দ বাছাই করার জন্য। (এ সম্বন্ধে এ অধ্যায়ের শেষভাগে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।) এসব ক্ষেত্রে মানুষের কোনো সাধ্য নেই তা প্রতিহত করার। তবে হাঁ যেসব পাপ করার কারণে বিপদ বা দুঃখ দুর্দশা আসে সেসব পাপ থেকে বিরত থাকলে সেই পাপের কারণে যে বিপদ বা

দুঃখ দুর্দশা আসার সম্ভাবনা ছিল তা থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আবার শরীয়তে এমন কিছু দুআ ও আমলও রয়েছে যার দ্বারা বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়। আর দ্বিতীয় অর্থে পুরোপুরি নিরাপদ হওয়া সম্ভব নয় এ কারণে যে, যারা অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয় তারা নিজের কৃতকর্মের কারণেই তা হয় সেটা নিশ্চিত নয়। অনেক সময় বিনা কারণেই বা ব্যক্তি হীন স্বার্থে কোন পাষণ্ড পক্ষ অন্যের উপর অত্যাচার নির্যাতন চালায়, নিষ্ঠুর ও বর্বর আচরণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে নিরীহ পক্ষ যে অত্যাচার, নির্যাতন, উৎপীড়ন ও নিষ্ঠুরতার শিকার হয় তার পেছনে আল্লাহর পক্ষ থেকে শুধু এই রহস্যই নিহীত থাকতে পারে যে, এর মাধ্যমে সেই নিরীহ পক্ষের অন্য কোন পাপ মোচনের বা তার মর্যাদা বুলন্দ করার ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অতএব এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে এরূপ নির্যাতন নিপীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়াও মানুষের সাধ্যের বাইরে। 'ব্যক্তিগতভাবে' কথাটা এজন্য বলা হল যে, এ ক্ষেত্রে সমাজের গুরুজনদের কর্তব্য রয়েছে এরূপ নির্যাতন নিপীড়নকারীদের বুঝিয়ে-শুনিয়ে, উপদেশ দিয়ে বিরত রাখা। রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনদেরও কর্তব্য রয়েছে এরূপ নির্যাতন নিপীড়নকারীদের আইন ও ক্ষমতা প্রয়োগ করে বিরত করা। তবে হাঁ মানুষ থেকে এমন কিছু কাজ, বা আচরণ কিংবা কথাও প্রকাশ পেয়ে যায় যার কারণে তাকে পরবর্তীতে নির্যাতন নিপীড়নের শিকার হতে হয়। যেমন– কেউ ক্ষমতা বা শক্তির অপব্যবহার করে অন্য কারও ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাল, এ ক্ষেত্রে পরবর্তীতে এমনও হতে পারে যে, নির্যাতিত ও নিপীড়িত পক্ষ সময়ের ব্যবধানে বেশি ক্ষমতাবান বা শক্তিমান হয়ে উঠল আর তাদের দ্বারা নির্যাতন নিপীড়িনকারী পক্ষ থেকে প্রতিশোধ গৃহীত হল। এরূপ নির্যাতন নিপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করা সম্ভব। আর তা এভাবে যে, নিরাপদ জীবনের প্রত্যাশী ব্যক্তি অন্য কারও ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালাবে না।

এতক্ষণের আলোচনার সারকথা হল নিরাপত্তা লাভের ক্ষেত্রে তথা নিরাপদ হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে মানুষের সাধ্যের মধ্যে তিন ধরনের কাজ এবং গুরুজন ও ক্ষমতাসীনদের দুই ধরনের কাজ করণীয় রয়েছে। সর্বমোট এই পাঁচ ধরনের কাজ করা হলেই সমাজসভ্যদের নিরাপদ জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। তবে পুরোপুরি নিরাপদ হওয়া সম্ভব নয় এ কারণে যে, কিছু বিপদ-আপদ এমনও রয়েছে যা প্রতিহত করা মানুষের সাধ্যের বাইরে, যার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে প্রদান করা হয়েছে। তবে হাঁ সেসব বিপদের মধ্যেও যেহেতু কোনো না কোনোভাবে মানুষের কল্যাণ রয়েছে (এ কথার ব্যাখ্যা পরবর্তীতে আসছে), তাই যদি সে হিসাবে সেগুলোকে বিপদ মনে

না করে নেয়ামত মনে করা হয়, তাহলে সেসব ক্ষেত্রেও মানুষের জীবনকে নিরাপদ বলা যায়।

সম্ভাব্য নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার পাঁচটি পদ্ধতি

পূর্বের আলোচনায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, পাঁচ ধরনের কাজ করলে সম্ভাব্য নিরাপদ জীবন গড়ে তোলা সম্ভব। যে পাঁচ ধরনের কাজ করলে সাধ্যানুপাতে নিরাপদ জীবন গড়ে তোলা সম্ভব সংক্ষেপে তা হল।

১. যেসব পাপ করার কারণে জাগতিক বিপদ-আপদ বা দুঃখ-দুর্দশা আসে সেসব পাপ থেকে বিরত থাকা।

২. এমন সব দুআ ও আমল করা যার দ্বারা বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

৩. যেসব কাজ বা আচরণ কিংবা কথা দ্বারা ভবিষ্যতে অন্যের নির্যাতন নিপীড়ন বা অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হওয়ার বা যে কোনো রকম প্রতিকূলতায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

৪. কেউ অন্যের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাবে না, তাহলে অন্যরাও তার উপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাবে না। সমাজের গুরুজনরা অন্যের উপর নির্যাতন-নিপীড়ন না চালানোর জন্য উপদেশ প্রদান করে, বুঝিয়ে শুনিয়ে মানুষকে বিরত রাখবে।

৫. রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনরা আইন ও শাস্তি প্রয়োগ করে মানুষকে অন্যের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালানো থেকে বিরত রাখবে।

নিম্নে উপরোক্ত পাঁচ ধরনের বিষয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত তিন ধরনের বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হল।

যেসব পাপের কারণে জাগতিক বিপদ-আপদ বা দুঃখ-দুর্দশা আসে

নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য যেসব পাপের কারণে জাগতিক বিপদ-আপদ ও দুঃখ-দুর্দশা আসে সকলে মিলে তা থেকে বেঁচে থাকার সযত্ন প্রয়াস গ্রহণ করতে হবে। বেশ কিছু পাপ রয়েছে যার কারণে জাগতিক বিভিন্ন রকম বিপদ-আপদ দেখা দেয়। নিম্নে তার কয়েকটার সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরা হল। যেমন–

মাপ ও ওজনে কম দেয়ার কারণে অনাবৃষ্টি দেখা দেয়

যখন মাপ ও ওজনে কম দেয়া বেড়ে যায় তখন অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। ফলে ফল-ফসল কমে যাওয়ায় জনজীবনে দুঃখ-দুর্দশা নেমে আসে, শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন বিঘ্নিত হয়। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

إِذَا بُخِسَ الْمِيْزَانُ حُبِسَ الْقَطْرُ. (رواه الحاكم في المستدرك ٨٥٣٦ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন, যখন মাপে কম দেয়া হয় বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায়। (মুস্তাদরকে হাকিম)

এখানে বৃষ্টিপাত বন্ধ হয়ে যায় বলে শস্য ফসল কমে যাওয়ার কথাই বোঝানো হয়েছে।

মাপ ও ওজনে কম দেয়ার কারণে দুর্ভিক্ষ আসে

মাপ ও ওজনে কম দেয়ার কারণে শুধু শস্য ফসল কমে যায় না, এতটা কমে যায় যে, দুর্ভিক্ষ পর্যন্ত দেখা দেয়। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَصَ قَوْمٌ اَلْعَهْدَ إِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ،... وَلَا طَفَّفُوا الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُوْا النَّبَاتَ وَاُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ. (التفسير الكبير تحت سورة المطففين)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের উপর তাদের শত্রুদের নিযুক্ত করে দেন। ... তারা মাপে কম দিলে শস্য-উদ্ভিদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ আরোপিত হয়। (তাফসীরে কাবীর)

যাকাত না দেয়ার কারণেও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়

যাকাত না দেয়ার কারণেও অনাবৃষ্টি দেখা দেয়। হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত–

مَا نَقَصَ قَوْمٌ اَلْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلاَ ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلاَّ سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلاَّ حَبَسَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ.

(كنز العمال ٤٣٩٤٣)

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়, কোন সম্প্রদায়ে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ হতে থাকলে আল্লাহ তাদের ওপর (অপ)মৃত্যু চাপিয়ে দেন। আর কোন সম্প্রদায় যাকাত দেয়া বন্ধ করলে তাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হয়। (কানযুল উম্মাল)

অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে শত্রুদের দৌরাত্ম বেড়ে যায়

পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَصَ قَوْمٌ اَلْعَهْدَ إِلَّا سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ عَدُوَّهُمْ،... وَلَا طَفَّفُوا الْكَيْلَ إِلَّا مُنِعُوْا النَّبَاتَ وَأُخِذُوْا بِالسِّنِيْنَ. (التفسير الكبير تحت سورة المطففين)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কোন সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে আল্লাহ তাদের ওপর তাদের শত্রুদের নিযুক্ত করে দেন। (অর্থাৎ, শত্রুরা তাদের ওপর দৌরাত্ম চালাতে থাকে।) ... তারা মাপে কম দিলে শস্য-উদ্ভিদ থেকে তাদেরকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাদের ওপর দুর্ভিক্ষ আরোপিত হয়। (তাফসীরে কাবীর)

অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে সমাজে খুনাখুনি দেখা দেয়

অঙ্গীকার ভঙ্গ করার কারণে সমাজে খুনাখুনি দেখা দেয়। হযরত বুরাইদা থেকে বর্ণিত–

مَا نَقَصَ قَوْمٌ اَلْعَهْدَ قَطُّ إِلاَّ كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلاَ ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِيْ قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا سَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلَا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللّٰهُ عَنْهُمُ الْمَطَرَ. (كنز العمال ٤٣٩٤٣)

অর্থাৎ, কোন সম্প্রদায় ওয়াদা-অঙ্গীকার ভঙ্গ করলে তাদের মধ্যে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়, কোন সম্প্রদায়ে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ হতে থাকলে আল্লাহ তাদের ওপর (অপ)মৃত্যু চাপিয়ে দেন। আর কোন সম্প্রদায় যাকাত দেয়া বন্ধ করলে তাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ করে দেয়া হয়। (কানযুল উম্মাল)

প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ হতে থাকলে অপমৃত্যু দেখা দেয়

পূর্বে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, সমাজে প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ হতে থাকলে আল্লাহ তাদের ওপর অপমৃত্যু চাপিয়ে দেন। ফলে মানুষের নিরাপদ জীবন চরমভাবে বিঘ্নিত হয়।

যেনা বেড়ে যাওয়ার কারণে হত্যাকাণ্ড এবং মহামারী বেড়ে যায়

যখন যেনা বেড়ে যায় তখন হত্যাকাণ্ড এবং মহামারী বেড়ে যায়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রা.) বলেছেন,

إِذَا كَثُرَ الزِّنَا كَثُرَ الْقَتْلُ وَوَقَعَ الطَّاعُوْنُ، وَإِذَا كَثُرَ الْكِذْبُ كَثُرَ الْهَرْجُ.

(رواه الحاكم في المستدرک ٨٥٣٦ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, যখন যেনা বেড়ে যায় (সমাজে) হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায় এবং মহামারী দেখা দেয়। আর যখন মিথ্যা বেড়ে যায় হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়। (মুস্তাদরকে হাকিম)

মিথ্যা বেড়ে যাওয়ার কারণেও হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়

পূর্বে বর্ণিত রেওয়ায়েত দ্বারা একথাও প্রমাণিত হয় যে, সমাজে মিথ্যাচার বেড়ে গেলে সমাজে হত্যাকাণ্ড বেড়ে যায়। ফলে মানুষের নিরাপদ জীবন চরমভাবে বিঘ্নিত হয়।

বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তির দুআ ও আমলসমূহ

মানুষের জীবনে যেসব স্থানে কোনো দুর্ঘটনা, বিপদ-আপদ বা প্রতিকূল কিছু ঘটার আশংকা থাকে সেরূপ অনেক স্থানেই শরীয়তে বিভিন্ন রকম দুআ রাখা হয়েছে সম্ভাব্য সেসব দুর্ঘটনা, বিপদ-আপদ বা প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য। নিরাপদ জীবন গড়ে তুলতে চাইলে সযত্নে এসব দুআ আমল করা চাই। নিম্নে এরূপ বিশেষ বিশেষ স্থানের দুআসমূহ উল্লেখ করছি যাতে সেগুলো পাঠ আমাদের জীবনের বহু দুর্ঘটনা, বিপদ-আপদ ও প্রতিকূল অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়ার উপায় হয়ে দাঁড়ায় এবং আমরা নিরাপদ জীবন লাভ করতে পারি।

দুশ্চিন্তা পেরেশানী দূর করার দুআ

কোনো বিষয়ে মনে দুশ্চিন্তা বা পেরেশানী থাকলে কিংবা অশান্তির মধ্যে পড়লে পাঠ করবে–

حَسْبِـيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ. (رواه أبو داود في كتاب الأقضية – باب الرجل يحلف على حقه ٣٦٢٤)

অর্থ: আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম তত্ত্বাবধায়ক। (আবূ দাঊদ)

অথবা পড়বে–

يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ. (رواه الحاكم في المستدرك - كتاب الدعاء حديث رقم ١٩١١، وقال: صحيح الإسناد.)

অর্থ: হে চিরঞ্জীব, হে সবকিছু ধারণকারী, আমি তোমার রহমতের ওছীলা দিয়ে তোমার কাছে ফরিয়াদ করছি। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অথবা পড়বে–

لَآ اِلٰهَ اِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ أِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ. (رواه الترمذي في أبواب الدعوات ٣٥٠٥، والحاكم حديث رقم ١٨٩٩، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص: صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ, তুমি ছাড়া কোনো মা'বূদ নেই, তুমি অতি পবিত্র। আর আমি অবশ্যই গোনাহগারদের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে একসাথে খানা খেলে পাঠ করার দুআ

অসুস্থ ব্যক্তির সঙ্গে যেমন– কুষ্ঠ রোগীর সঙ্গে বা খোস-পাঁচড়া আছে এমন ব্যক্তির সঙ্গে বা যাদের অন্য কোন সংক্রামক ব্যধি আছে এমন লোকদের সঙ্গে এক সাথে খানা খেলে এরূপ আশংকা হতে পারে যে, আমার মধ্যে উক্ত রোগ সংক্রমিত হয় কি না। এরূপ সম্ভাব্য অসুবিধা থেকে মুক্তি লাভের জন্য এরূপ স্থানে নিম্নোক্ত দুআ পড়া সুন্নাত।

بِسْمِ اللّٰهِ ثِقَةً بِاللّٰهِ وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ. (رواه الحاكم في كتاب الأطعمة حديث رقم ٧٣٥٣، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص: صحيح.)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ্‌র প্রতি ভরসা রেখে এবং আল্লাহ্‌র উপর তাওয়াক্কুল করে আরম্ভ করলাম। (মুস্তাদরকে হাকিম)

শত্রু বা দুষ্ট লোকের ক্ষতি থেকে বাঁচার দুআ

শত্রু বা যে কোনো দুষ্ট লোকের দ্বারা ক্ষতির আশংকা হলে এই দুআ পড়বে–

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ. (رواه أبو داود في كتاب الصلاة - باب ما يقول إذا خاف قوما ١٥٣٤)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমাকে তাদের মোকাবিলায় দাঁড় করাচ্ছি এবং তাদের অনিষ্ঠ থেকে তোমার কাছে পানাহ চাচ্ছি। (আবূ দাঊদ)

ঋণ থেকে মুক্তির দুআ

ঋণ মানুষের জীবনে অনেক পেরেশানির কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যথাসময়ে ঋণ পরিশোধ করতে না পারলে পাওনাদারের পক্ষ থেকে শক্ত কথা শোনা, লাঞ্ছনা-গঞ্জনা পাওয়া, ভবিষ্যতে ঋণ আদায় করার সামর্থ না হলে ঋণের বোঝা নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে যাওয়া এবং ওয়ারিশদের ওপর তার অবাঞ্ছিত বোঝা রেখে যাওয়া ইত্যাদি আশংকা ও পেরেশানি দেখা দিতে পারে। এরূপ আশংকা ও পেরেশানি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শরীয়তে ঋণ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত দুআ রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْنِنِيْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ.

(رواه الترمذي في أحاديث شتى من أبواب الدعوات ٣٥٦٣، وقال: هذا حديث حسن غريب. ورواه الحاكم حديث رقم ٢٠٠٩ وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص: صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ, হারাম হতে দূরে রেখে হালাল রিযিক দ্বারা তুমি আমার জন্য যথেষ্ট কর। আর তোমার অনুগ্রহে তুমি ব্যতীত অন্য সকল থেকে আমাকে মুখাপেক্ষীহীন বানাও। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

সফরকালে বিদায় নেয়ার দুআ

সফরে যাওয়ার সময় পরিবারের ব্যাপারে নানান আশংকা মনে জাগতে পারে। আমার অনুপস্থিতিতে ওদের বিপদাপদ হলে কে ওদের দেখবে? সফর থেকে ফিরে এসে ওদের কোন খারাপ অবস্থা দেখতে হবে না তো? সফরে আমার মৃত্যু হলে ওদের কী উপায় হবে? ইত্যাকার নানান আশংকা মনে জাগতে পারে। সম্ভাব্য এসব বিপদাপদ যেন না ঘটে এ জন্য আপনজন থেকে বিদায় নেয়ার সময় শরীয়ত নিম্নোক্ত দুআ বলে বিদায় নেয়ার নিয়ম রেখেছে।

أَسْتَوْدِعُكُمُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا يَضِيْعُ وَدَآئِعُهٗ. (كتاب الأذكار عن ابن السني باب أذكاره إذا خرج)

অর্থ: আমি তোমাদেরকে এমন সত্তার কাছে আমানত রেখে যাচ্ছি, যার আমানত কখনও নষ্ট হয় না। (কিতাবুল আযকার)

সফরে রওনা দেওয়ার সময় (যানবাহনে আরোহণ করে যানবাহনের দুআ পড়ার পর) নিম্নোক্ত দুআও পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْاَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هٰذَا اَلْبِرَّ وَالتَّقْوٰى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضٰى، اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هٰذَا وَاطْوِعَنَّا بُعْدَهٗ، اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِيْ السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ، اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ مِنْ وَعْثَآءِ السَّفَرِ وَكَابَةِ

الْمَنْظَرِ وَسُوْٓءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ. (رواه مسلم في كتاب الحج – باب استحباب الذكر إذا ركب دابة متوجها لسفر حج وغيره إلخ ١٣٤٢.)

অর্থ: হে আল্লাহ! এই সফরে আমরা তোমার নিকট নেকী ও তাকওয়া কামনা করি। এই সফরকে আমার জন্য সহজ করে দাও এবং দুরত্বকে গুটিয়ে দাও। হে আল্লাহ! এ সফরে তুমিই আমার সঙ্গী এবং তুমিই আমার স্থলাভিষিক্ত আমার পরিবারের জন্য। হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট সফরের দুঃখ-কষ্ট এবং ভয়ানক দৃশ্যের সম্মুখীন হওয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। আরও আশ্রয় প্রার্থনা করছি প্রত্যাবর্তনের পর স্বীয় মাল-আসবাব এবং পরিবার পরিজনের মধ্যে অশুভ অবস্থা অবলোকন করা থেকে। (মুসলিম)

সফরকালে বিদায় দেয়ার দুআ

কারও সফরে যাওয়ার সময় যারা তাকে বিদায় দেয়, তাদের মনেও বিভিন্ন আশংকা জাগে। যদি সফরে তার কোন দুর্ঘটনা ঘটে, যদি সে অবাঞ্ছিত কোন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়, যদি তার মুত্যু ঘটে এবং আমাদের মধ্যে আর ফিরে না আসে। ইত্যাকার বিভিন্ন আশংকা মনে জাগে। সম্ভাব্য এসব বিপদ যেন না ঘটে তার জন্য বিদায় জানানোর সময় তার সমুদয় বিষয়কে আল্লাহর ওপর হাওয়ালা করে নিম্ন দুআ পড়ার নিয়ম রাখা হয়েছে−

أَسْتَوْدِعُ اللّٰهَ دِيْنَكَ وأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيْمَ عَمَلِكَ. (رواه الترمذي في أبواب الدعوات – باب ما جاء ما يقول إذا ودع إنسانا ٢٤٤٣. وقال:حديث حسن صحيح غريب.)

অর্থ: আমি তোমার দ্বীন, তোমার আমানত এবং তোমার আমলের শেষ পরিণাম আল্লাহর নিকট সোপর্দ করছি। (তিরমিযী)

ঘর থেকে বের হওয়ার দুআ

ঘর থেকে বের হওয়ার সময়ও বিভিন্ন রকম অসুবিধা বা বিপদাপদের আশংকা মনে জাগতে পারে। বাইরে গিয়ে যদি কোথাও এক্সিডেন্ট ঘটে, বা অন্য কোনো রকম দুর্ঘটনার সম্মুখীন হই? বাইরে কোন প্রতারকের খপ্পরে পড়ব না তো? ইত্যাকার আশংকা জাগে। সম্ভাব্য এসব বিপদাপদ থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে বের

হওয়ার সময় আল্লাহর ওপর তাওয়াক্কুল করে নিম্নোক্ত দুআ পড়ে বের হবে। একমাত্র তিনিই পারেন সব বিপদ থেকে রক্ষা করতে।

بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لَا حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. (رواه أبو داؤد في كتاب الأدب – باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته ٥٩٨٦)

অর্থ: আমি আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে বের হলাম। আল্লাহ্‌রই উপর ভরসা করলাম। শক্তি সামর্থ কেবল আল্লাহ্‌র কাছ থেকেই আসে। (আবূ দাঊদ)

আর এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ يَعْنِيْ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهٖ: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهٗ: كُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ. رواه الترمذي في أبواب الدعوات – باب ما يقول إذا خرج من بيته ٣٤٢٦. وقال: حديث حسن صحيح غريب.

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় পড়ে "বিসমিল্লাহি তাওয়াক্কাল্‌তু আলাল্লাহি লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ", তার উদ্দেশে বলা হয়, তোমার জন্য যথেষ্ট হবে, তোমাকে রক্ষা করা হবে। আর শয়তান তার থেকে দূর হয়ে যাবে। (তিরমিযী)

ঘর থেকে বের হওয়ার সময় এমন আশংকাও হয় যে, যদি কোন ভুল-ভ্রান্তি হয়, যদি কারও দ্বারা নির্যাতিত হই, কেউ আমার ওপর বাড়াবাড়ি অতিরঞ্জন করে, ইত্যাদি। তাই ঘর থেকে বের হওয়ার সময় সব রকম ভুলভ্রান্তি ও পদস্খলন ইত্যাদি থেকে মুক্তি এবং অপর কর্তৃক জুলুম নির্যাতনের শিকার হওয়া থেকে মুক্তি চাওয়া বিষয়ক নিম্নোক্ত দুআও পড়বে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ. (رواه أبو داؤد في كتاب الأدب– باب ما يقول الرجل إذا خرج من بيته حديث رقم ٥٠٨٥)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি নিজে বা অন্য কর্তৃক বিভ্রান্ত হওয়া, নিজে বা অন্য কর্তৃক বিচ্যুত হওয়া, জালেম হওয়া বা মাজলূম হওয়া, নাদানী করা বা নাদানীর স্বীকার হওয়া (এই সবকিছু) থেকে তোমার কাছে পানাহ চাই। (আবূ দাউদ)

যানবাহনের দুআ

যানবাহনে চড়ার সময় দুর্ঘটনার আশংকা কার মনে জাগ্রত না হয়। গাড়ির চালক যত দক্ষই হোক না কেন, তবুও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। অন্য গাড়ি চালকের নাদানী বা অদক্ষতার কারণেও তো এক্সিডেন্ট ঘটে থাকে। তাই যানবাহনে আরোহণের সময় আল্লাহর ওপরই ভরসা প্রধান সম্বল। আল্লাহই পারেন গাড়ি বা অন্যসব রকম বাহনকে নিয়ন্ত্রণ করতে। এজন্য যানবাহনে আরোহণের সময় নিয়ম রাখা হয়েছে বিসমিল্লাহ বলে যানবাহনে আরোহণ করবে। তারপর নিম্নোক্ত দুআ পড়বে। এ দুআ পড়া সুন্নাত।

﴿سُبْحَانَ الَّذِيْ سَخَّرَلَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهٗ مُقْرِنِيْنَ وَاِنَّا اِلٰى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ.﴾

অর্থ: পবিত্র ঐ আল্লাহ, যিনি এই বাহনকে আমাদের অধীন করে দিয়েছেন, অথচ একে আমরা নিজেদের অধীন করতে পারতাম না। আর নিশ্চয় আমরা আপন প্রভুর কাছে ফিরে যাব।

নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে আরোহণের দুআ

নৌকা, জাহাজ, পুল ইত্যাদিতে আরোহণের সময়ও দুর্ঘটনা ও বিপদের আশংকা মনে জেগে থাকে। তাই এসবের সম্ভাব্য দুর্ঘটনা ও বিপদ থেকে মুক্তির জন্য এগুলোতে আরোহণের সময় নিম্নোক্ত দুআ রাখা হয়েছে।

﴿بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرٖىهَا وَ مُرْسٰىهَا اِنَّ رَبِّىْ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ وَ مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَ الْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ السَّمٰوٰتُ مَطْوِيّٰتٌۢ بِيَمِيْنِهٖ

سُبْحٰنَهٗ وَ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ۝ (كتاب الأذكار عن ابن السني–باب ما يقول اذا ركب سفينة)

অর্থ: আল্লাহ্‌র নামেই এর চলা ও থামা। নিশ্চয়ই আমার প্রতিপালক অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (কিতাবুল আযকার)

উদ্দিষ্ট স্থান দেখার পর পড়ার দুআ

সফরের পথ পাড়ি দিয়ে যে নগরী বা গ্রামে যাওয়া উদ্দেশ্য, সেখানকার ব্যাপারেও বিভিন্ন আশংকা মনে জাগতে পারে। সেখানে যাওয়াটা তার জন্য অকল্যাণকর হবে না তো? সেখানকার আলো বাতাস আবহাওয়া তার সাস্থ্যের জন্য প্রতিকূল হবে না তো? সেখানকার অধিবাসীদের দ্বারা তার কোন অমঙ্গল হবে না তো? ইত্যাদি আশংকা মনে জাগতে পারে। তাই উদ্দিষ্ট নগরী বা গ্রাম নজরে আসার পর এসব সম্ভাব্য প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য নিম্নোক্ত দুআ পড়ার নিয়ম রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلْنَ، وَرَبَّ الْأَرْضِيْنَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِيْنِ وَمَا أَضْلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسأَلُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ أَهْلِهَا، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ أَهْلِهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا.

(رواه الحاكم في المستدرک حديث رقم ٢٥٣٥، وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي في التلخيص: صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ– আকাশমণ্ডলী এবং সেগুলো যাকে ছায়া দেয় তার প্রভু, সপ্তভূমি ও সেগুলো যা ধারণ করে তার প্রভু, শয়তান ও তারা যাদেরকে বিভ্রান্ত করে তাদের প্রভু, বাতাস ও তা যা কিছু উড়িয়ে নেয় তার প্রভু, আমরা তোমার কাছে চাই এই নগরীর কল্যাণ ও এই নগরবাসীর কল্যাণ। আর তোমার কাছে পানাহ চাই এই নগরীর অকল্যাণ থেকে, এই নগরীর অধিবাসীদের অকল্যাণ থেকে এবং এই নগরীতে যা কিছু রয়েছে সবকিছুর অকল্যাণ থেকে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

প্রচণ্ড বাতাস প্রবাহিত হওয়ার সময় দুআ

প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করলে মনের মধ্যে পেরেশানির শেষ থাকে না। ঘরটা ভেঙ্গে পড়বে না তো? বিল্ডিংয়ের জানালা, কাচ ইত্যাদি গুড়িয়ে যাবে না তো? গাছপালা ইত্যাদি লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে না তো? ইত্যাদি নানান আশংকা। এরূপ সম্ভাব্য বিপদ ও আশংকা থেকে মুক্তির জন্য প্রচণ্ড বাতাস বইতে শুরু করলে নিম্নোক্ত দুআ পড়ার নিয়ম রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُکَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيْهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ، وأَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ. (رواه مسلم في كتاب صلاة الاستسقاء حديث رقم ٨٩٩)

অর্থ: হে আল্লাহ, আমি তোমার কাছে চাই এই বাতাসের কল্যাণ, তার মধ্যে যা আছে তার কল্যাণ ও যাসহ তা প্রেরিত হয়েছে তার কল্যাণ। আর তোমার কাছে পানাহ চাই এর অনিষ্ট থেকে, এর মধ্যে যা রয়েছে তার অনিষ্ট থেকে এবং যাসহ তা প্রেরিত হয়েছে তার অনিষ্ট থেকে। (মুসলিম)

প্রচণ্ড মেঘ দেখলে দুআ

আকাশে প্রচণ্ড মেঘ দেখলে মনের মধ্যেও নানান দুশ্চিন্তার মেঘ জমতে শুরু করে। সম্ভাব্য অনেক বিপদের আশংকায় মন বিচলিত হয়ে পড়ে। এই মেঘ কোন ভয়ঙ্কর ঝড়ে রূপ নেবে না তো? প্রচণ্ড বৃষ্টিপাতে পথঘাট, ফসলের ক্ষেত সব তলিয়ে যাবে না তো? মাছের ঘের পুকুর সবকিছু পানিতে একাকার হয়ে মাছগুলো ভেসে যাবে না তো? ইত্যাদি নানান অনিষ্টের চিন্তা মনে জাগতে পারে। সম্ভাব্য এসব অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রচণ্ড মেঘ দেখলে নিম্নোক্ত দুআ পড়ার নিয়ম রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِکَ مِنْ شَرِّهَا. (رواه أبو داود في كتاب الأدب- باب ما يقول إذا هاجت الريح ٥٠٩٠)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই মেঘের সঙ্গে যে অনিষ্ঠ রয়েছে তা থেকে আমরা তোমার কাছে পানাহ চাই। (আবূ দাঊদ)

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের সময় দুআ

অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকলে তার কারণে ফসলের ক্ষতি, কর্মস্থলে যেতে না পারার ক্ষতি, বানভাসির ক্ষতি ইত্যাদি আশংকা মনে জাগা তো অতি স্বাভাবিক। তাই অতিরিক্ত বৃষ্টিপাত হতে থাকলে ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার আবেদনপূর্ণ নিম্নোক্ত দুআ রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا، اَللّٰهُمَّ عَلَى الْأُكَامِ وَالظِّرَابِ وَبُطُوْنِ الْأَوْدِيَةِ وَمَنَابِتِ الشَّجَرِ. (متفق عليه. رواه البخاري في أبواب الاستسقاء – باب الاستسقاء في خطبة الجمعة ١٠١٤)

অর্থ: হে আল্লাহ, এই বৃষ্টি আমাদের আশেপাশে বর্ষণ কর, আমাদের ওপর বর্ষণ করো না। হে আল্লাহ! উচ্চস্থান, বনজঙ্গল, পাহাড় প্রণালী ও বৃক্ষ উৎপাদনের স্থানসমূহের উপর বর্ষণ কর। (বোখারী)

বিদুৎ চমকানো ও বজ্রপাতের সময় দুআ

বিদুৎ চমকাতে দেখলে বা বজ্রপাতের শব্দ শুনলে তো মৃত্যুর আশংকা জেগেই থাকে। তাই বিদ্যুৎ চমকানো ও বজ্রপাতের সময় জীবন রক্ষার আবেদনপূর্ণ নিম্নোক্ত দুআ রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ لاَ تَقْتُلْنَا بِغَضَبِكَ، وَلاَ تُهْلِكْنَا بِعَذَابِكَ، وَعَافِنَا قَبْلَ ذَالِكَ.

(المستدرک للحاکم حديث رقم ٧٩٣٥. وقال: صحيح الإسناد، ووافقه الذهبيي في التلخيص: صحيح.)

অর্থ: হে আল্লাহ! তোমার গযব দিয়ে আমাদেরকে মেরে ফেল না, তোমার আযাব দিয়ে আমাদেরকে ধ্বংস করে দিও না। তার আগে আমাদেরকে শান্তি দাও। (মুস্তাদরকে হাকিম)

অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে দুআ

অগ্নিকাণ্ড যে ক্ষতির তা তো আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তাই কোন জায়গায় অগ্নিকাণ্ড হতে দেখলে "আল্লাহু আকবার" বলার সাথে সাথে নিম্নোক্ত দুআও রাখা হয়েছে।

﴿يٰنَارُ كُوْنِيْ بَرْدًا وَّ سَلٰمًا عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ.﴾ (الأنبياء : ٦٩)

অর্থ: হে আগুন, তুমি ইবরাহীমের জন্য ঠাণ্ডা এবং শান্তিদায়ক হয়ে যাও। (অর্থাৎ, এ আগুন যেন কোনোভাবে ক্ষতির না হয়।) (كتاب الأذكار عن ابن السني باب يقول اذا رأي الحريق.)

কাউকে মুসীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে দুআ

কাউকে কোন মুসীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে নিজের মনেও আশংকা জাগে আমিও যদি এমন পেরেশানীতে পড়ি! আমিও যদি এমন খারাপ অবস্থায় পড়ি! যেমন– কাউকে কোন কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত দেখলে মনে জাগে আমিও যদি এমন রোগে আক্রান্ত হই! মনটা আশংকায় জড়োসড়ো হয়ে পড়ে। তাই কাউকে কোন মুসীবত, পেরেশানী বা খারাপ অবস্থায় দেখলে তা থেকে বর্তমানে রক্ষা পাওয়া গেছে তার জন্য শোকর আদায় করণার্থে নিম্নোক্ত দুআ পাঠ করার নিয়ম রাখা হয়েছে। আর কোন নেয়ামতের জন্য শোকর আদায় করলে যেহেতু সেই নেয়ামত বেড়ে যায়, তাই আশা করা যায় এই দুআ পাঠ করলে সেসব মুসীবত ও পেরেশানী থেকে মুক্ত থাকার নেয়ামত নষ্ট হবে না অর্থাৎ, ভবিষ্যতে সেসব মুসীবত ও পেরেশানীতে সে আক্রান্ত হবে না। দুআটি এই–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلاكَ بِهٖ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً.

(رواه الترمذي في أبواب الدعوات- باب ما جاء ما يقول إذا رأى مبتلى ٣٤٣٢، وقال: هذا حديث حسن غريب.)

অর্থ: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি আমাকে ঐ অবস্থা থেকে রক্ষা করেছেন, যে অবস্থায় তোমাকে ফেলেছেন। (তিরমিযী)

তবে দুআটি এমনভাবে পড়বে না যে, উক্ত মুসীবতগ্রস্ত ব্যক্তি বুঝতে পারে। তাহলে সে মনে কষ্ট অনুভব করবে। কোনো মানুষকে কোনোভাবে কষ্ট দেয়া অনুচিত।

পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় দুআ

পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময়ও মনের মধ্যে একধরনের ক্ষতির আশংকা দেখা দিতে পারে। কারণ মলমূত্র ত্যাগের ঘর হল খবীছ জিনদের বসবাসের স্থান। অতএব সেখানে কেউ গেলে সেই খবীছ জিনদের দ্বারা কোন ক্ষতিতে পড়তে পারে। বর্ণিত আছে– মদীনার খাযরাজ গোত্রের সর্দার হযরত সা'দ ইবনে উবাদাহ (রা.)কে পায়খানাতেই খবীছ জিনরা হত্যা করেছিল। অনেক সময় খবীছ জিনরা পায়খানায় গমনকারীর যৌনাঙ্গ নিয়ে খেলাও করে থাকে। (কীরূপে খেলা করে তা আমাদের জানা নেই।) এরূপ ক্ষতি ও খেলার হাত থেকে নিরাপদ হওয়ার জন্য পেশাব-পায়খানায় যাওয়ার সময় বিসমিল্লাহসহ নিম্নোক্ত দুআ রাখা হয়েছে।

بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُ بِکَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَآئِثِ. (رواه البخاري في كتاب الوضوء – باب ما يقول عند الخلاء. ولم يذكر البخاري لفظ "بسم الله" وذكر ابن أبي شيبة مع" بسم الله" وابن ماجة لم يذكر إلا "بسم الله".)

অর্থ: আল্লাহর নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! নর-নারী উভয় প্রকার দুষ্ট জিন (-এর ক্ষতি ও খেলা) থেকে আমি তোমার আশ্রয় কামনা করছি। (বোখারী ও মুসান্নাফে ইব্‌নে আবী শায়বা)

আপনজনের মৃত্যু বা যে কোনো মুসীবত ও বিপদ-আপদে দুআ

আপনজনের মৃত্যু হলে বা যে কোনো মুসীবত ও বিপদ-আপদে পড়লে মনের মধ্যে এরূপ আশংকা জাগে যে, তার অবর্তমানে যেসব উপকার তিনি আমাদের করতেন তা কার দ্বারা আঞ্জাম পাবে! তার উত্তম বিকল্প আমাদের ভাগ্যে জুটবে কি? এসব আশংকা থেকে মনের মুক্তি ও নিরাপত্তা বোধ সৃষ্টি করার জন্য এরূপ মুহূর্তে নিম্নোক্ত দুআ রাখা হয়েছে। এরূপ মুহূর্তে এই দুআ পাঠ করলে আল্লাহ সেই মুসীবতে পুরস্কার দান করেন এবং সেই মৃত ব্যক্তির উত্তম বিকল্প দান করেন। দুআটি এই–

إِنَّا لِلّٰهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ. اَللّٰهُمَّ أُجُرْنِيْ فِيْ مُصِيْبَتِيْ وأَخْلِفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا. (رواه مسلم في كتاب الجنائز – فصل في الاسترجاع عند المصائب كلها ٩١٨. ورواه أحمد في مسنده حديث رقم ٣٠٩/٦)

অর্থ: নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই জন্য এবং অবশ্যই আমরা তাঁরই নিকট ফিরে যাব। হে আল্লাহ, আমার এই মুসীবতে তুমি আমাকে প্রতিদান নসীব কর এবং তার স্থলে তার চেয়ে উত্তম বিকল্প আমাকে দান কর। (মুসলিম ও মুসনাদে আহমদ)

শোয়ার সময় পাঠ করার দুআ

শোয়ার সময় মানুষের মনে নানান রকম দুশ্চিন্তা আসতে পারে। এরূপ দুশ্চিন্তার মধ্যে একটা হল ঘুমের মধ্যে কোন দুর্ঘটনা ঘটবে না তো? ঘুমের মধ্যে আমার জীবনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হবে না তো? এরূপ দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির জন্য এবং জীবন-মরণ বিষয়ে নিরাপত্তা লাভের জন্য আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত অন্য কোনো পন্থা নেই। কারণ ঘুমের মধ্যে নিজের কোনো ক্ষমতা চেতনা কিছুই থাকে না। তাই আল্লাহর উপরই আশ্রয় গ্রহণ করা শ্রেয়। এজন্য ঘুমের সময় এই দুআ পড়ে নিতে হয়।

اَللّٰهُمَّ بِاِسْمِکَ أَمُوْتُ وأَحْيٰى. (رواه الترمذي في كتاب الدعوات ٣٤١٧ وقال: حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তোমার নামেই আমি মৃত্যু বরণ করি এবং জীবন লাভ করি। (তিরমিযী)

ঘুমের মধ্যে একটা দুশ্চিন্তা এরূপও হয় যে, ঘুমের মধ্যে কোন দুঃসপ্ন দেখব না তো? ঘুমের মধ্যে শয়তান আশ্রয় করবে না তো? তাই শোয়ার সময় আয়াতুল কুরছী পাঠ করার সুন্নাত রাখা হয়েছে। রেওয়ায়েতে এসেছে–

إِذَا اَوَيْتَ إِلٰى فِرَاشِکَ فَاقْرَأْ اٰيَةَ الْكُرْسِيِّ اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ حَتّٰى تَخْتِمَ الْاٰيَةَ فَإِنَّکَ لَنْ يَّزَالَ عَلَيْکَ مِنَ اللّٰهِ حَافِظٌ وَلاَ يَقْرُبَنَّکَ شَيْطَانٌ حَتّٰى تُصْبِحَ. رواه البخاري في كتاب الكفالة – باب إذا وكل رجلا فترک الوكيل شيئا إلخ ٢٣١١.

অর্থাৎ, যখন তুমি বিছানায় যাবে, তখন আয়াতুল কুরছী **اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ** থেকে আয়াত শেষ পর্যন্ত পাঠ করবে। তাহলে সকাল পর্যন্ত আল্লাহ্র

পক্ষ থেকে তোমার নিকট হেফাজতকারী থাকবে এবং শয়তান তোমার কাছে আসতে সক্ষম হবে না। (বোখারী)

আয়াতুল কুরছী এই–

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَیُّ الْقَیُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّ لَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ مَا فِی الْاَرْضِ ؕ مَنْ ذَا الَّذِیْ یَشْفَعُ عِنْدَهٗۤ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ اَیْدِیْهِمْ وَ مَا خَلْفَهُمْ ۚ وَ لَا یُحِیْطُوْنَ بِشَیْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖۤ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِیُّهُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضَ ۚ وَ لَا یَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَ هُوَ الْعَلِیُّ الْعَظِیْمُ ﴿۲۵۵﴾

মৃত্যুর পূর্বে পাঠ করার দুআ

মৃত্যুর সময় আসন্ন হলে মৃত্যুকে এক বড় বিপদ ও কষ্টের বিষয় হিসাবে দেখা হয়। সম্ভাব্য সেই কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়ার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর সময় আসন্ন হলে নিম্নোক্ত দুআ পড়ার নিয়ম রাখা হয়েছে।

اَللّٰهُمَّ أَعِنِّيْ عَلٰى غَمَرَاتِ الْمَوْتِ أَوْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ. (رواه الترمذي في أبواب الجنائز - باب ما جاء في التشديد عند الموت ٩٧٨ وقال: حديث غريب.)

অর্থ: হে আল্লাহ, মৃত্যুর বিভীষিকা/মৃত্যু যন্ত্রণার এই পর্যায়ে তুমি আমাকে সাহায্য কর। (তিরমিযী)

যেসব কাজ, আচরণ কিংবা কথার কারণে ভবিষ্যতে প্রতিকূলতায় পড়ার আশংকা থাকে

নিরাপদ জীবন গড়ে তোলার জন্য যেসব কথা, কাজ বা আচরণের কারণে ভবিষ্যতে নির্যাতিত হওয়ার কিংবা যে কোনো রকম প্রতিকূলতায় পড়ার আশংকা রয়েছে তা থেকে বেঁচে থাকতে হবে। এরূপ কথা, কাজ ও আচরণ রয়েছে বহু। নিম্নে উদাহরণ স্বরূপ তার কয়েকটা তুলে ধরা হল।

বেশি কথা বললে ঝামেলায় পড়ার আশংকা

বেশি কথা বললে যে ঝামেলায় পড়তে হয় তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই, পদে পদে আমরা তা দেখে থাকি। বেশি কথা বললে মিথ্যা বলা থেকেও নিরাপদ থাকা যায় না। কথার ফাঁকে মিথ্যাও এসে পড়ে। এজন্যই বলা হয়,

مَنْ سَكَتَ سَلَمَ.

অর্থাৎ, যে চুপ থাকে সে নিরাপদ থাকে।

এ কথাটি এক হাদীছেও এসেছে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস (রা.) বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَنْ صَمَتَ نَجَا. (رواه الترمذي ٢٥٠١)

অর্থাৎ, যে চুপ থাকে মুক্তি পায়। (তিরমিযী)

অতএব নিজের জীবনকে নিরাপদ রাখতে চাইলে বেশি কথা বলা থেকে বিরত থাকা চাই। তবে কুরআন-হাদীছের কথা হলে, দ্বীনী কথা হলে তা গর্হিত নয়।

অন্যের জন্য কুয়া খুড়লে নিজে সেই কুয়ায় পড়ার আশংকা

অন্যকে বিপদে ফেলার চেষ্টা করলে নিজেও অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়। এজন্যই বলা হয়, অন্যের জন্য কুয়া খুড়লে নিজে সেই কুয়ায় পড়তে হয়। আরবীতে প্রবাদ আছে–

مَنْ حَفَرَ بِئْرًا لِغَيْرِهِ سَقَطَ فِيْهَا. (التمثيل والمحاضرة للثعالبي)

অর্থাৎ, যে অন্যের জন্য কুয়া খনন করে সে নিজে তাতে পড়ে।

অতএব নিজের জীবনকে নিরাপদ রাখতে চাইলে অন্য কারও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার, অন্য কাউকে বিপদে ফেলার চেষ্টা থেকে বিরত থাকা চাই।

কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করলে নিজে ফেঁসে যাওয়ার আশংকা

কেউ কাউকে বিপদে ফেলার জন্য বা ক্ষতিগ্রস্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র করলে সে নিজে ফেঁসে যাওয়ার আশংকামুক্ত থাকতে পারে না। কারণ কোনো ষড়যন্ত্রই চিরকাল গোপন থাকে না। যখন ষড়যন্ত্র ফাঁস হয় ষড়যন্ত্রকারী ফেঁসে যায়। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَلَا يَحِيْقُ الْمَكْرُ السَّيِّئَ اِلَّا بِاَهْلِهِ.﴾

অর্থাৎ, কুচক্র কুচক্রীদেরকেই ঘিরে ধরে। (সূরা ফাতির: ৪৩)

অতএব নিজের জীবনকে নিরাপদ রাখতে চাইলে কারও বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা থেকে বিরত থাকা চাই।

সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত লোকের কাছে গেলে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা

বোখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছে এসেছে,

لَا يُوْرِدُ مُمْرِضٌ عَلٰى مُصِحٍّ. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب الطب – باب لا هامة ٥٧٧١، ورواه مسلم في كتاب السلام – باب لا عدوى ولا طيرة إلخ واللفظ لمسلم ٢٢٢١)

অর্থাৎ, যার অসুস্থ উট আছে, সে যেন তার উট সুস্থ ব্যক্তির উটের সাথে পানি পান করতে না পাঠায়। (বোখারী ও মুসলিম)

এমনিভাবে বোখারী শরীফে আরও এসেছে,

... وَفِرَّ مِنَ الْمَجْذُوْمِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ. (رواه البخاري في كتاب الطب– باب الجذام ٥٧٠٧)

অর্থাৎ, আর সিংহ থেকে যেমন পলায়ন কর, কুষ্ঠ রোগী থেকেও তদ্রূপ পলায়ন কর। (বোখারী)

সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীর কাছে যাওয়া না যাওয়া সম্পর্কে হাদীছে দু' ধরনের বক্তব্য এসেছে। এক হাদীছে এসেছে "রোগ সংক্রমণ হয় না"। এ হাদীছে "রোগ সংক্রমণ হয় না" বলে রোগের মধ্যে নিজস্ব সংক্রমণ ক্ষমতা না থাকার কথা বোঝানো হয়েছে। বরং আল্লাহ্‌র ফয়সালাতেই সংক্রমিত হওয়ার থাকলে আক্রান্ত হয় নতুবা আক্রান্ত হয় না। আর যে হাদীছে রোগাক্রান্ত প্রাণীকে সুস্থ প্রাণীর কাছে নিতে নিষেধ করা হয়েছে বা কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে তা এ কারণে যে, এরূপ প্রাণী বা রোগীর সংস্পর্শ অন্যদের আক্রান্ত হওয়ার কারণ। তাই কারণ থেকে নিষেধ করা হয়েছে, যেমন পতনোন্মুখ দেয়ালের কাছে যেতে নিষেধ করা হয় এ কারণে যে, তার কাছে গেলে এই যাওয়াটা তার ক্ষতির কারণ হতে পারে। এছাড়াও এ দু' ধরনের হাদীছের মধ্যে সমন্বয় সাধনের (تطبيق দেয়ার) আরও বিভিন্ন সূরত হতে পারে। যাহোক সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত রোগীর কাছে যেতে

নিষেধ করা হয়েছে। তাদের কাছে যাওয়াতে আক্রান্ত হওয়ার আশংকা রয়েছে। ফলে তাদের কাছে যাওয়া স্বাস্থের নিরাপত্তার পক্ষে আশংকাজনক।

যেসব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে জীবনকে নিরাপদ করা সম্ভব নয়

পূর্বে বলা হয়েছিল, জীবনে এমন বেশ কিছু বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে যা থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। অতএব কারও পক্ষেই জীবনকে পুরোপুরি বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ করা সম্ভব নয়। তবে উল্লেখ করা সঙ্গত যে, যেসব বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকা সম্ভব নয় সেগুলো আসলে বিপদ বা কষ্টই নয়। কেননা সেগুলো দ্বারা হয় মানুষের গোনাহ মোচন হয়, কিংবা মর্যাদা বুলন্দ হয়, কিংবা তাদেরকে সতর্ক করা হয় যেন তারা ভবিষ্যতে এ ধরনের পাপ না করে। আর বলা বাহুল্য, গোনাহ মোচন হওয়াও এক ধরনের নেয়ামত, মর্যাদা বুলন্দ হওয়াও নেয়ামত, সতর্কীকরণের ফলে যদি ভবিষ্যতে পাপ থেকে মুক্ত থাকতে পারে সেটিও তার কল্যাণের সূচনা করবে এ হিসাবে সেটাও নেয়ামত। তাই বলা চলে, মুমিন মুসলমানের যিন্দেগীতে কোন বিপদই প্রকৃতপক্ষে বিপদ নয়। বিপদ-আপদের মধ্যেও মুমিন মুসলমান নিরাপদ। বিপদ-আপদ, দুঃখ-কষ্টও তাদের জন্য কল্যাণ। এক হাদীছে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَالِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِمُؤْمِنٍ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ.

(رواه مسلم في باب المؤمن أمره كله خير برقم ٢٩٩٩)

অর্থাৎ, মু'মিনের বিষয় বড়ই অদ্ভুত! –মুমিন ছাড়া এ বিষয়টা কারও জন্য এমন নয়– যদি তার সুখের কিছু হয় সে শোকর আদায় করে, ফলে সেটা তার জন্য কল্যাণকর হয়; আবার যদি কোন কষ্টের কিছু হয় সে সবর করে, ধৈর্য ধারণ করে, ফলে সেটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। (অর্থাৎ, সব কিছুর মধ্যে তার কল্যাণই কল্যাণ, মুসলমানদের অকল্যাণ বলে কিছু নেই। (মুসলিম)

যাহোক যে চার ধরনের বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব নয়, সেগুলো হল–

১. গোনাহ মোচনের জন্য যে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে

কিছু বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশ এসে থাকে গোনাহ মোচনের জন্য। এক হাদীছে বলা হয়েছে,

مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كُفِّرَ بِهَا عَنْهُ حَتَّى الشَّوْكَةَ يُشَاكُهَا. (رواه مسلم في كتاب البر والصلة ٢٥٧٢ والبخاري في كتاب المرضى ٥٦٤٠)

অর্থাৎ, মু'মিনের উপর যেকোনো বিপদ-আপদ হোক না কেন, এমনকি একটা কাঁটাও যদি তার পায়ে বিঁধে, এর জন্যও তার পাপ মোচন হবে। অতএব বিপদ-আপদ, কষ্ট-ক্লেশের কারণে মুসলমানদের হতাশ হওয়ার কিছু নেই, এসবের কারণে মুসলমানদের কষ্ট বোধ করার কিছু নেই। তাদের জন্য তো অকল্যাণ বলেই কিছু নেই। সবই তাদের জন্য রহমত আর রহমত! সবই তাদের জন্য কল্যাণ আর কল্যাণ!

একবার হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজেরে মক্কী (রহ.) এই ওয়াজ করেছিলেন যে, মুসলমানদের সব কষ্ট-ক্লেশই তাদের জন্য আল্লাহর রহমত। ইতিমধ্যে সেখানে একজন লোক এল, সে ফোড়ার যন্ত্রনণায় কাঁতরাচ্ছিল। সে এসে বলল, হুজুর! একটু দুআ করুন আল্লাহ যেন আমার এই কষ্টটা দূর করে দেন। উপস্থিত কেউ কেউ মনে মনে ভাবল এই কষ্ট তো আল্লাহ্র রহমত। তাহলে হুজুর এই রহমত দূর হওয়ার দুআ কীভাবে করবেন? হযরত হাজী সাহেব দুআ করলেন– হে আল্লাহ! রোগ-ব্যধিও তোমার রহ্মত, রোগ থেকে মুক্তিও তোমার রহ্মত। আমরা দুর্বল বান্দা, রোগ-ব্যধির রহমতকে আমরা বরদাশ্ত করতে পারি না। তাই আমাদের জন্য রোগ থেকে মুক্তির আসান রহমতের ফয়সালা কর। সোবহানাল্লাহ! বুযুর্গদের জবান থেকে কত সুন্দরভাবে দ্বীনের সহীহ ব্যাখ্যা বের হয়।

২. মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য যে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে

অনেক সময় কিছু কষ্ট-ক্লেশ ও বিপদ-আপদ আসে পরীক্ষা স্বরূপ। বান্দার মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য। এই কষ্ট-ক্লেষ ও বিপদ-আপদে পড়ে যখন বান্দা ধৈর্য ধারণ করবে, ধৈর্যের পরীক্ষায় যখন সে উত্তীর্ণ হবে, তখন তার মর্যাদা বুলন্দ হয়ে যাবে। দুনিয়াতেও পরীক্ষা দ্বারা মান উত্তীর্ণ হয়। আল্লাহ পাকও তদ্রূপ পরীক্ষার মাধ্যমে মর্যাদা বুলন্দ করেন। এ মর্মে আল্লাহ পাক কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেছেন,

﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرٰتِ وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাদের পরীক্ষা নিব কিছু অভাব-অনটন দিয়ে, কিছু জান-মালের ক্ষতি দিয়ে, কিছু ফল-ফসলের ক্ষতি দিয়ে। (তারপর আল্লাহ বলেছেন, হে নবী!) তুমি সবরকারীদের সুসংবাদ জানিয়ে দাও! (সূরা বাকারাঃ ১৫৫) অর্থাৎ, এ যারা এই পরীক্ষায় সবর করে উত্তীর্ণ হয়, তাদের জন্য রয়েছে সুসংবাদ, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর রহমত ও দয়া। এ জাতীয় পরীক্ষার মাধ্যমে মানুষের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। আল্লাহ পাক যাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করতে চান, তাদেরই এরকম পরীক্ষা নেন। তাই আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের থেকেই এরকম পরীক্ষা বেশি নেয়া হয়। সবচেয়ে আল্লাহর প্রিয় বান্দা হলেন নবীগণ। তাই নবীদের থেকে এরকম পরীক্ষা বেশি নেয়া হয়। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল مَنْ أَشَدَّ النَّاسِ بَلَاءً অর্থাৎ, কার পরীক্ষা সবচেয়ে কঠিন হয়? তিনি জওয়াবে বলেছিলেন,

اَلْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْأَمْثَلُ فَالْأَمْثَلُ. (رواه ابن حبان في صحيحه ٢٩٢١)

অর্থাৎ, সবচেয়ে কঠিন পরীক্ষা হয় নবীদের, তারপর যে যত বেশি আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত তাদের। (তিরমিযী)

হযরত ইব্রাহীম (আ.)কে আগুনে ফেলে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। হযরত ইউনুস (আ.)কে সাগরের মাছের পেটে নিয়ে পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। হযরত যাকারিয়া (আ.)কে কাফেররা করাত দিয়ে চিরে দুই খণ্ড করে দিয়েছিল। এভাবে তাঁর পরীক্ষা নেয়া হয়েছিল। হযরত আইয়ূব (আ.)কে কঠিন রোগ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়েছিল। ১৮ বৎসর যাবত তিনি এমন কঠিন রোগে আক্রান্ত ছিলেন যে, তাঁর শরীরের মাংস খসে খসে পড়ত। তার শরীরে পোকা ধরে গিয়েছিল। লোকেরা তাঁকে লোকালয়ের বাইরে ফেলে রেখে এসেছিল। এনবীগণ অবশ্যই আল্লাহর প্রিয় মানুষ ছিলেন। তারপরও কেন তাঁদের এসব বিপদ হল? আল্লাহ পাক এসব বিপদ দিয়ে তাঁদের মর্যাদা আরও বুলন্দ করেছেন। বুঝা গেল- মুসলমানদের কিছু কষ্ট-ক্লেশ, কিছু বিপদ-আপদ তাঁদের মর্যাদা বুলন্দ করার জন্য পরীক্ষা স্বরূপ এসে থাকে।

৩. সতর্ক করার জন্য যে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে

কিছু বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ আসে মানুষকে সতর্ক করার জন্য। যখন মানুষ পাপের পথে অগ্রসর হয়, যখন তারা ভুল পথে চলতে থাকে, তখন তাদেরকে কিছু বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ দেয়া হয়; যাতে তারা সতর্ক হয়ে যায় যে, আমরা ভুল পথে চলছি বলেই এই বিপদ দেখা দিয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে,

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِىْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের কারণেই স্থল ও পানি ভাগে বিপর্যয় দেখা দেয়, যাতে মানুষ তাদের কৃতকর্মের কিছু শাস্তি ভোগ করে এবং যাতে তারা ফিরে আসে। (সূরা রূম: ৪১)

আল্লাহ পাক মানুষকে এরকম বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ দিয়ে সতর্ক করতে চান যে, তোমরা সতর্ক হও, তোমাদের কি ত্রুটি হচ্ছে সে ব্যাপারে তোমরা সতর্ক হও। এরকম বিপদ-আপদ ব্যক্তিগতভাবে আসে ব্যক্তিগতভাবে সতর্কীকরণের জন্য, আর জাতিগত এবং সমষ্টিগতভাবে আসে জাতিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে সতর্কীকরণের জন্য।

৪. ভাল-মন্দ বাছাই করার জন্য যে বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট আসে

কিছু বিপদ-আপদ বা কষ্ট-ক্লেষ আসে ভাল-মন্দ বাছাই করার জন্য। এরূপ বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেষের মুহূর্তে যারা খাঁটি মু'মিন, তারা দ্বীনের উপর অটল থাকে, আর যারা মুনাফেক গোছের মু'মিন, তারা ছাটাই হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَحَسِبَ النَّاسُ اَنْ يُّتْرَكُوْٓا اَنْ يَّقُوْلُوْٓا اٰمَنَّا وَ هُمْ لَا يُفْتَنُوْنَ وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, মানুষ কি মনে করেছে তারা বলবে, "আমরা ঈমান এনেছি", আর তাদের পরীক্ষা নেয়া হবে না? তাদের পূর্ববর্তীদের আমি পরীক্ষা নিয়েছি, উদ্দেশ্য ছিল কারা খাঁটি মু'মিন আর কারা খাঁটি মু'মিন নয় আল্লাহ তা জেনে নিবেন। (সূরা আনকাবূত: ২-৩)

সত্যিকার মু'মিন আর কপট মু'মিনদের মধ্যে পার্থক্য করার জন্যই আল্লাহ এরকম পরীক্ষা নিয়ে থাকেন। যখন এরকম পরিস্থিতি আসে, তখন কে খাঁটি আর কে

অখাঁটি- তার পার্থক্য ফুটে ওঠে। কার ভিতরে খাঁটি ঈমানী চেতনা আছে আর কার ভিতরে খাঁটি ঈমানের চেতনা নেই তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে নিরাপদ জীবন দান করুন। আমীন!

নবম অধ্যায়

যদি সুখ-শান্তিময় জীবন গড়তে চান

নবম অধ্যায়
যদি সুখ-শান্তিময় জীবন গড়তে চান

সুখ-শান্তির অর্থ

সুখ অর্থ আরাম, আয়েশ, আনন্দ, প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি ও স্বাচ্ছন্দ। আর শান্তি অর্থ হল চিত্তের উৎকণ্ঠাশূন্যতা, চিত্তের স্থৈর্য। সহজ কথায় মনের প্রশান্তি হল শান্তি। অতএব বুঝা গেল সুখ-শান্তি কোন একক জিনিসের নাম নয়। সুখ-শান্তি হচ্ছে অনেকগুলো বিষয়ের সমষ্টি। তার মধ্যে কিছুর সম্পর্ক মনের সঙ্গে, কিছুর সম্পর্ক সম্পদের সঙ্গে এবং কিছুর সম্পর্ক অন্য বিষয়ের সঙ্গে। আরাম, আয়েশ, আনন্দ, চিত্তের উৎকণ্ঠাশূন্যতা, চিত্তের স্থৈর্য– এগুলো মনের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। প্রাচুর্য ও সমৃদ্ধি সম্পদের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়। আর স্বাচ্ছন্দের সম্পর্ক সুস্থতা ও কষ্টহীন অবস্থার সঙ্গে। এখন সারকথা এই বের করা যায় যে, **প্রাচুর্য, সমৃদ্ধি, সুস্থতা ও কষ্টহীন অবস্থার ফলে মনের মধ্যে যে আরাম, আনন্দ বোধ হয়, মনের মধ্যে যে প্রশান্তি লাভ হয়, তা-ই হল সুখ-শান্তি।**

সুখ-শান্তির সম্পর্ক কিসের সঙ্গে?

তাহলে পূর্বের বিশ্লেষণে সাব্যস্ত হল যে, সুখ-শান্তির উপাত্ত তথা সুখ-শান্তির অবলম্বন হচ্ছে তিনটা জিনিস। ১. সম্পদের প্রাচুর্য। ২. সুস্থতা। ৩. কোনোভাবে কোনো কষ্ট না থাকা। এই তিনটা জিনিস অর্জিত হলেই সুখ-শান্তি অর্জিত হওয়ার কথা, অর্থাৎ এই তিনটা জিনিস থাকলেই মনে আনন্দ বোধ ও প্রশান্তি অর্জিত হওয়ার কথা। কিন্তু অনেকের ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্রচুর ধন-সম্পদ থাকা সত্ত্বেও, সুস্থ থাকা সত্ত্বেও, বিশেষ কোন কষ্ট না থাকা সত্ত্বেও তারা মনের বিষণ্নতা কাটিয়ে উঠতে পারে না, চিত্তে প্রশান্তি অনুভব করে না, তাদের চিত্তের উৎকণ্ঠা দূর হয় না, অর্থাৎ, তারা

সুখ-শান্তি অনুভব করে না। এজন্যই অনেকে বলে থাকেন, আসলে সুখ হল মনের বিষয়, ধন-সম্পদ, সুস্থতা, কষ্ট না থাকা– এগুলোর সাথে সুখের কোনো সম্পর্ক নেই। তবে আমরা ভারসাম্য রক্ষা করে বলতে চাই, ধন-সম্পদ, সুস্থতা ইত্যাদির সঙ্গে সুখের কোনোই সম্পর্ক নেই তা নয়। কারও যদি ধন-সম্পদ মোটেই না থাকে, কোনো প্রকারেই সে সুস্থ না থাকে, কোনোভাবেই সে দুঃখ-কষ্ট থেকে নিস্কৃতি না পায় তাহলে সে মনে মনে নিজেকে সুখী ভাবতে পারে না, এভাবে সে মনের মধ্যে প্রশান্তি টেনে আনতে পারে না, স্বাভাবিক দুশ্চিন্তা ও উৎকণ্ঠা তার থেকেই যায়। এটা মানুষের স্বভাবগত বিষয়, তাই স্বাভাবিকভাবেই এটা ঘটে থাকে। অতএব ধন-সম্পদ, সুস্থতা ইত্যাদির সঙ্গে সুখের কোনোই সম্পর্ক নেই তা নয়, স্বাভাবিক কিছু সম্পর্ক রয়েছে বৈ কি। ধন-সম্পদ ও সুস্থতা থাকা এবং কষ্ট-অসুবিধা না থাকার সঙ্গেও সুখ-শান্তির সম্পর্ক আছে, তবে সেই ধন-সম্পদ বলতে অগাধ ধন-সম্পদ নয়, সেই সুস্থতা বলতে একশ পার্সেন্ট সুস্থতা নয়, সেই কষ্ট-অসুবিধা না থাকা বলতে একশ পার্সেন্ট কষ্ট-অসুবিধা দূর হওয়া নয়। বরং **যতটুকু ধন-সম্পদ আছে, যতটুকু সুস্থতা আছে, যতটুকু কষ্ট-অসুবিধা থেকে মুক্তি পাওয়া গেছে ততটুকুকেই অনেক পাওয়া মনে করে সন্তুষ্ট হতে পারলে এবং ততটুকুতেই মনকে প্রশান্ত করতে পারলে তা-ই হল সুখ-শান্তি।**

সুখ-শান্তি অর্জনের উপায়

মূলত জীবন সমৃদ্ধ, টেনশনমুক্ত ও নিরাপদ হলে সেটিই সুখ-শান্তিময় জীবন। পূর্বের তিনটি অধ্যায় যথা:– "যদি সমৃদ্ধ জীবন গড়তে চান", "যদি টেনশনমুক্ত জীবন গড়তে চান" ও "যদি নিরাপদ জীবন গড়তে চান"– এ তিনটি অধ্যায়ে এ সম্বন্ধে আলোচনা অতিবাহিত হয়েছে। এ তিনটি অধ্যায়ের আলোচনাতেই সুখ-শান্তিময় জীবন গড়ার উপায় সম্বন্ধে পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে। এরপরও "যদি সুখ-শান্তিময় জীবন গড়তে চান" নামক এ অধ্যায়ে সুখ-শান্তিময় জীবন গড়া সম্বন্ধে আরও কিছু তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করা হল। সর্বমোট এই চারটি অধ্যায়ে বর্ণিত সবকিছুই সুখ-শান্তি অর্জনের উপায় ও পদ্ধতির সাথে সংশ্লিষ্ট। সবগুলো অধ্যায়ের আলোচনাই মনোযোগ সহকারে পড়ুন, আমল করুন, ইনশাআল্লাহ জীবনের কাংখিত সুখ-শান্তি অর্জিত হবে।

নিম্নে সুখ-শান্তি অর্জনের বিশেষ ৫টি পন্থা বর্ণিত হল। এই ৫টি অবলম্বন করুন। এর সঙ্গে পূর্বের তিনটি অধ্যায়ে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণ করে চলুন। ইনশাআল্লাহ জীবনে সুখ উপলব্ধি করবেন, শান্তি অনুভব করবেন, সুখ-শান্তিময় জীবন গড়ে উঠবে।

সুখ-শান্তি অর্জনের বিশেষ পাঁচটি পন্থা

এক. কানাআত তথা যা পাওয়া গেছে তাতেই তুষ্ট থাকা

সুখ-শান্তি অর্জনের জন্য প্রথম কাজটি করুন যতটুকু ধন-সম্পদ পাওয়া গেছে তার ওপরই সন্তুষ্ট থাকুন। যা পাওয়া গেছে তাতেই তুষ্ট থাকাকে আরবীতে বলা হল "কানাআত"। হালাল পন্থায় আরও বেশি উপার্জনের চেষ্টা নিষেধ নয়, তবে আরও বেশি পাওয়ার ওপর নিজের মনের সন্তুষ্টিকে ঝুলিয়ে রাখবেন না। বরং যতটুক পাওয়া গেছে তার ওপরই মনকে সন্তুষ্ট ও তৃপ্ত রাখুন। তাহলেই আপনি জীবনকে সুখ-শান্তিময় করার ব্যাপারে সাফল্য লাভ করবেন। কানাআত তথা যা পেয়েছেন তাতেই পরিতৃপ্তি অনুভব করা এটিই হল সুখের অন্যতম কথা। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে।

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللّٰهُ بِمَا آتَاهُ. (رواه الحاكم في المستدرک ۹۴۸۱ وقال: صحيح على شرط الشيخين وأقره عليه الذهبى فى التلخيص.)

অর্থাৎ, হযরত আম্‌র ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সেই ব্যক্তি সফল যে মুসলমান, তাকে চলনসই রিযিক দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ যা তাকে দিয়েছেন তাতেই তাকে পরিতৃপ্ত রেখেছেন। (মুস্তাদরকে হাকিম)

দুই. জীবনে যা যা পাওয়া গেছে তা বেশি বেশি স্মরণ করা

সুখ-শান্তি অর্জনের জন্য আর একটি কাজ করুন জীবনে যা যা পাওয়া গেছে তা বেশি বেশি স্মরণ করুন। কি কি পাওয়া যায়নি তা নিয়ে চিন্তা-চর্চা কম করুন, পারলে তা সম্পূর্ণই বর্জন করুন। নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো পেয়েছেন তাতেই মনে করুন রাজার হালে আছি, তাতেই সুখ, তাতেই শান্তি। মনে রাখবেন নিজের অভাববোধ যত কমানো যাবে ততই শান্তিবোধ বাড়তে থাকবে। এ সম্বন্ধে এ গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে "(সাত) কোন কিছু না পাওয়া নিয়ে টেনশন" শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

তিন. তাকদীরে বিশ্বাস রাখা

সুখ-শান্তি অর্জনের জন্য আর একটি কাজ করুন তাকদীরে বিশ্বাস রাখুন, তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন। জীবনে যা কিছু ঘটছে তা আল্লাহর ফয়সালায় ঘটছে, তাতেই বান্দার কল্যাণ নিহীত- এই বিশ্বাস রাখুন। এই বিশ্বাস আপনার মানসিক শান্তি এনে দিবে, আপনি মানসিকভাবে সুখ উপলব্ধি করতে পারবেন। আপনি স্বামী থেকে কাংখিত আদর-সোহাগ পাচ্ছেন না, ভাল ব্যবহার পাচ্ছেন না, কিংবা আপনি স্ত্রীকে মনেরমত পাননি, মনে সুখ উপলব্ধি করছেন না, সন্তান সুপথে নেই মনে অশান্তি বোধ করছেন, ছেলে বিয়ে দিয়ে ভাল বউ পাননি, মেয়ে বিয়ে দিয়েছেন তার দজ্জাল শাশুড়ি তাকে জ্বালায়, মনের মধ্যে সর্বক্ষণ তা নিয়ে আগুন জ্বলছে– এরকম যতকিছুর কারণে আপনি ভাবছেন আপনি সুখী নন, আপনার জীবনে সুখ-শান্তি নেই, এসবকিছুর ক্ষেত্রেই আপনি তাকদীরের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন, বিশ্বাস রাখুন এই কষ্টের মধ্যে কোনো না কোনোভাবে আপনার কল্যাণ রয়েছে। এরকম বিশ্বাসই আপনার মানসিক শান্তি এনে দিবে, আপনি মানসিকভাবে সুখ উপলব্ধি করতে পারবেন। বিপদ-মুসীবত এবং দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও কীভাবে মানুষের কল্যাণ নিহীত থাকে এ সম্বন্ধে এই গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে "বিপদ-আপদ ও কষ্ট-ক্লেশ নিয়ে দুশ্চিন্তা" শিরোনামের অধীনে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

চার. সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করা

সুখ-শান্তি অর্জনের জন্য আর একটি কাজ করুন– জীবনের নিত্য ঝামেলা অসুবিধেগুলো স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করুন। স্বাভাবিক বিষয়গুলোকে অস্বাভাবিকভাবে নিলে আপনি সুখ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত হবেন। আপনাকে সংসারের জন্য বাজার করতে হয়। এটাকে যদি আপনি অস্বাভাবিকভাবে নেন যে, এভাবে নিত্য বাজার করে থলে টুকরি ভরে আমাকে বাসায় বয়ে নিয়ে যেতে হয়, আর বাসার বৌ বাচ্চারা ঘরে বসে রাজারহালে সেগুলো ভোগ করে, আমি হলাম সংসারের এক চাকর! এভাবে বিষয়টাকে অস্বাভাবিকভাবে নিলে আপনি অযথাই নিজেকে সুখ উপলব্ধি থেকে বঞ্চিত করবেন। আপনার গাড়ি নেই, রিকসায় বাসে করে সব জায়গায় যেতে হয়। এ বিষয়টা খুবই স্বাভাবিক। ক'জনেরই বা গাড়ি থাকে। এখন আপনি যদি এটাকে অস্বাভাবিকভাবে নেন যে, আমি তো সমাজের নিম্ন শ্রেণীর মানুষ, গাড়ি-ঘোড়া কি আর আমার ভাগ্যে আছে! আমার কপালে কি আর এই সুখ জুটবে! তাহলে অযথাই আপনি নিজেকে অসুখী ভাবলেন। আপনি নিজেকে গাড়ি-না-থাকা লাখো জনতার একজন স্বাভাবিক সদস্য ভাবুন, তাহলে আপনার মনের সুখ নষ্ট হবে না। আপনি নিজস্ব বাড়ি করতে পারেননি, সারাজীবন

ভাড়াবাড়িতে বসবাস করে চলছেন, এ কারণে নিজেকে অসুখী ভাববেন না। শহরে বসবাসকারীদের শতকরা ৮০/৯০ জনেরই নিজস্ব বাড়ি নেই। এভাবে আপনার জীবনে এটা নেই ওটা নেই, সংসারে এটা নেই ওটা নেই, এই অসুবিধে সেই অসুবিধে– এসব কারণে নিজেকে অযথা অসুখী ভাববেন না। সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করুন, আপনি সুখী থাকবেন। দুনিয়াতে কিছু অসুবিধে থাকবেই, এটাই স্বাভাবিক। কুরআনে কারীমের একটা আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

[illegible]

অর্থাৎ, মানুষকে আমি কষ্ট-ক্লেষের মধ্যেই সৃষ্টি করেছি। (সূরা বালাদ: ৪)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে দুনিয়ার জীবনে কষ্ট-ক্লেষ থাকা স্বাভাবিক। অতএব ছোটখাট বিষয়কে অস্বাভাবিক ভেবে নিজের জীবনকে অসুখী করে তুলবেন না।

এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ وَجَنَّةُ الْكَافِرِ. (رواه مسلم في كتاب الزهد والرقائق ٢٩٥٦)

অর্থাৎ, দুনিয়া হল মু'মিনের জন্য কারাগার স্বরূপ, আর কাফেরদের জন্য জান্নাত স্বরূপ। (মুসলিম)

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে, কারাগার যেমন আরাম-আয়েশের স্থান নয় সেখানে কষ্ট-ক্লেষ থাকাই স্বাভাবিক। তদ্রূপ দুনিয়ার জীবনে মুসলমানদের কষ্ট-ক্লেষ থাকাই স্বাভাবিক। পক্ষান্তরে কাফেরদের জন্য যেহেতু পরকালে জান্নাত নেই, পরকালে তারা সুখের মুখ দেখতে পাবে না, তাই দুনিয়াতে তাদের কিছু সুখ-শান্তি দিয়ে দেয়া হয়। মুসলমানরা যেমন দুনিয়াতে ভাল কাজ করে, কাফেররাও তো অনেক ভাল কাজ করে, অনেক রকম সমাজ সেবা তারা করে, মানুষের অনেক রকম উপকার তারা করে। তারা অনেকে সত্য কথা বলে, ন্যায়-নীতির উপর চলে। এই সমস্ত ভাল কাজের বদলা যেহেতু পরকালে তারা পাবে না, তাই দুনিয়াতে তাদের কিছু সুখ-শান্তি দিয়ে দেয়া হয়।

পাঁচ. সুখ-শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করা

সুখ-শান্তি অর্জনের জন্য আর একটি কাজ করুন– আল্লাহর কাছে সুখ-শান্তির জন্য দুআ করুন। নিম্নে সুখ-শান্তির উদ্দেশ্যে কুরআনে বর্ণিত একটি দুআ এবং হাদীছে বর্ণিত একটি দুআ পেশ করা হল।

﴿ رَبَّنَاۤ اٰتِنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِى الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾

অর্থাৎ, হে আমাদের রব! তুমি আমাদেরকে কল্যাণ দান কর দুনিয়াতেও এবং আখেরাতেও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর। (সূরা বাকারা: ২০১)

হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত এক হাদীছে এসেছে– এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞাসা করল কোন্ দুআ সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা কর। যদি তোমাকে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা প্রদান করা হয়, তাহলে তো তুমি সফলকাম হলে। (رواه الترمذي ٣٥١٢ واسناده حسن) সেমতে আমরা দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করে এভাবে দুআ করতে পারি–

আরবীতে: اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ أَسْئَلُكَ الْعَافِيَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِى الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ.

বাংলায়: হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানেই বিপদ-আপদ থেকে মুক্তি ও নিরাপত্তা কামনা করছি।

সারকথা, সুখ-শান্তির জন্য বিশেষভাবে নিম্নোক্ত ৫টি কাজ করুন।

১. কানাআত তথা যা পাওয়া গেছে তাতেই তুষ্ট থাকুন।
২. জীবনে যা যা পাওয়া গেছে তা বেশি বেশি স্মরণ করুন।
৩. তাকদীরে বিশ্বাস রাখুন।
৪. সবকিছুকে স্বাভাবিকভাবে নেয়ার চেষ্টা করুন।
৫. সুখ-শান্তির জন্য আল্লাহর কাছে দুআ করুন

এর সঙ্গে সমৃদ্ধ জীবন গড়ার জন্য যে ১০টি কাজ করার তাও করুন। সে ১০টি হল–

১. তাকওয়া।
২. তাওয়াক্কুল।
৩. সূরা ওয়াক্বেয়ার আমল।
৪. হজ্জ।
৫. উমরা।
৬. যাকাত।
৭. দান-সদকা।

৮. আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

৯. ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনে সততা রক্ষা করা।

১০. আয়-উপার্জনে হালাল পন্থার উপর থাকা।

এর সঙ্গে টেনশন-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য যে ২০টি কাজ করতে হয় তাও করুন। সে ২০টি কাজ হল–

টেনশন-দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাওয়ার ২০টি কাজ

১. দলীল-প্রমাণ ছাড়া বিনা কারণে টেনশন করবেন না। এতে অহেতুক নিজের শান্তিকে নষ্ট করা হবে।

২. ছোট্ট জিনিসকে বড় করে ভেবে টেনশন ডেকে আনবেন না। ছোট জিনিস ছোটই, তাকে বড় করে ভাববেন কেন?

৩. রোগ-ব্যধিকে আল্লাহর নেয়ামত ভাবুন। এ নিয়ে টেনশন করবেন না। বরং আল্লাহর নেয়ামত ভেবে তাতে সুখ অনুভব করার চেষ্টা করুন।

৪. মৃত্যুকে স্বাভাবিক ভাবুন। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশন করবেন না। এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করে কেউ কোনো দিন এ থেকে মুক্তি পায়নি, কোনো দিন মুক্তি পাবেও না।

৫. যত মানুষ তত মত। অতএব নিজের মতের সাথে অন্যদের মিল না হওয়ার কারণে টেনশন করবেন না।

৬. ইখলাসের সঙ্গে সবকাজ করুন। অন্যদের থেকে কৃতজ্ঞতা না পেলে তা নিয়ে টেনশন করবেন না।

৭. জীবনে যা যা পাওয়া গেছে তা চিন্তা করে কৃতজ্ঞ থাকুন। কোন কিছু না পাওয়া নিয়ে টেনশন করবেন না।

৮. বর্তমান নিয়ে ভাবুন। অতীতের কোন ব্যর্থতা বা প্রতিকূল কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা-টেনশন করবেন না।

৯. ভবিষ্যতের বিপদ-আপদ ও প্রতিকূলতা নিয়ে খুব বেশি ভাববেন না। ভবিষ্যতের বিষয় আল্লাহর ওপর ন্যস্ত রাখুন, সে ব্যাপারে আপনার তেমন কিছু করণীয় নেই। শরীয়তের আলোকে ভবিষ্যতের ব্যাপারে কিছু করার থাকলে তা করুন।

১০. নিজেকে উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন। কেউ ভাল চোখে দেখল না– তা নিয়ে টেনশন করবেন না।

১১. পাছে লোকে কী বলে– এ নিয়ে টেনশন করবেন না। পাছের লোকদের মুখ কোনো দিন বন্ধ করা যায় না।

১২. সাধ্যের বাইরের জিনিস নিয়ে টেনশন করবেন না। সাধ্যের বাইরে কোনো বিষয়ে আল্লাহ আপনাকে কোন দায়িত্ব দেননি, আপনি সেই দায়িত্ব নিজের ঘাড়ে চাপাতে চান কেন?

১৩. মনে হাছাদ বা পরশ্রীকাতরতাকে স্থান দিবেন না। অন্যের ভাল কিছু দেখে টেনশন করবেন না।

১৪. অপরাধ থেকে বিরত থাকুন। তাহলে নিজের কৃত অপরাধের কারণে টেনশন করতে হবে না।

১৫. যিকির করুন, মনে প্রশান্তি থাকবে। কারণ-জানা-নেই এমন টেনশন আসবে না। তা ছাড়া যিকিরের অন্যান্য ফায়দা তো রয়েছেই।

১৬. অভাব-অনটনকে শাস্তি হিসাবে এবং কষ্টের বিষয় হিসাবে দেখবেন না বরং ফযীলতের বিষয় হিসাবে দেখবেন, তাহলে অভাব-অনটনের কারণে টেনশন হবে না।

১৭. ইসলামের দৃষ্টিতে বিপদ-আপদের যে তাৎপর্য রয়েছে তা স্মরণে রাখুন, তাহলে বিপদ-আপদ নিয়ে টেনশন হবে না।

১৮. সাধ্য অনুযায়ী ছেলে-মেয়ের ব্যাপারে দায়িত্ব পালন করুন, তারপর তাদের কী হল বা কী হবে তা নিয়ে বেশি ভাববার প্রয়োজন নেই। এরূপ চিন্তা ছেলে-মেয়ে নিয়ে টেনশন থেকে মুক্তি দিবে।

১৯. রূপ না থাকার মধ্যে যে কল্যাণ রয়েছে তা নিয়ে ভাবুন, তাহলে রূপ না থাকা নিয়ে দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পাবেন।

২০. টেনশনের ক্ষতিগুলো নিয়ে ভাববেন তাহলে টেনশন করার প্রবৃত্তি দমিত হবে। টেনশনের বহুবিধ ক্ষতি থাকা সত্ত্বেও কেন আপনি টেনশন করে নিজের ক্ষতি ডেকে আনবেন?

এর সঙ্গে সঙ্গে জীবনকে নিরাপদ রাখার জন্য যে ৫টি কাজ করতে হয় তাও করুন। সে ৫টি কাজ হল–

জীবনকে নিরাপদ রাখার ৫টি কাজ

১. যেসব পাপ করার কারণে জাগতিক বিপদ-আপদ বা দুঃখ-দুর্দশা আসে সেসব পাপ থেকে বিরত থাকা।

২. এমন সব দুআ ও আমল করা যার দ্বারা বিভিন্ন রকম দুর্ঘটনা ও বিপদাপদ থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

৩. যেসব কাজ বা আচরণ কিংবা কথা দ্বারা ভবিষ্যতে অন্যের নির্যাতন নিপীড়ন বা অন্যায় ও নিষ্ঠুর আচরণের শিকার হওয়ার বা যে কোনো রকম প্রতিকূলতায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে তা থেকে বিরত থাকা।

৪. কেউ অন্যের ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাবে না, তাহলে অন্যরাও তার ওপর নির্যাতন-নিপীড়ন চালাবে না। সমাজের গুরুজনরা অন্যের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন না চালানোর জন্য উপদেশ প্রদান করে, বুঝিয়ে শুনিয়ে মানুষকে বিরত রাখবে।
৫. রাষ্ট্রের ক্ষমতাসীনরা আইন ও শাস্তি প্রয়োগ করে মানুষকে অন্যের ওপর নির্যাতন নিপীড়ন চালানো থেকে বিরত রাখবে।

এই সর্বমোট ৪০টি বিষয়ের মধ্যেই নিহীত আছে সুখ-শান্তির রহস্য। আল্লাহ আমাদেরকে সুখ-শান্তিময় জীবন গড়ে তোলার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দশম অধ্যায়

যদি সুখী দাম্পত্য জীবন গড়তে চান

দশম অধ্যায়
যদি সুখী দাম্পত্য জীবন গড়তে চান

পূর্বের অধ্যায়ে সুখ-শান্তিময় জীবন গড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হয়েছে। দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার জন্য মূলত সেসব পদ্ধতির অনেকগুলোই প্রযোজ্য। এরপরও এ অধ্যায়ে সুখী দাম্পত্য জীবন সম্বন্ধে কিছু অতিরিক্ত তথ্য ও তত্ত্ব পেশ করা হল।

দাম্পত্য জীবনকে সুখী করার জন্য প্রথমে চিহ্নিত করতে হবে কি কি কারণে দাম্পত্য জীবনের সুখ নষ্ট হয়। সে কারণগুলো দূর করতে পারলে এবং পূর্বের অধ্যায়ে বর্ণিত সুখ-শান্তিময় জীবন গড়ার পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করতে পারলেই ইনশাআল্লাহ দাম্পত্য জীবনে সুখ আসবে, সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে উঠবে। নিম্নে যেসব কারণে দাম্পত্য জীবনের সুখ নষ্ট হয় সেগুলো প্রতিকার ব্যবস্থাসহ উল্লেখ করা হল যাতে তা দাম্পত্য জীবনে সুখ প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখতে পারে।

যেসব কারণে দাম্পত্য জীবনের সুখ নষ্ট হয়

১. স্বামী স্ত্রী একে অপরের অধিকার আদায় না করা

দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার প্রধান একটা কারণ হল স্বামী স্ত্রী কর্তৃক একে অপরের অধিকার আদায় না করা। স্বামী স্ত্রী একে অপরের অধিকার আদায় না করলে পরস্পরে মন কষাকষি হয়, ঝগড়া-বিবাদ হয়। এ থেকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সুখ-শান্তি নষ্ট হয়। এজন্য স্বামী স্ত্রী উভয়কে একে অপরের অধিকার সম্বন্ধে জানতে হবে, উভয়ে উভয়ের অধিকার আদায় করতে হবে। স্বামী ও স্ত্রীর অধিকার সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা আমার রচিত “আহকামে যিন্দেগী” ও “ফিকহুন নিছা” গ্রন্থে রয়েছে। সেসব অধিকারের মধ্যে যেগুলো আদায় করা না হলে পরস্পরে মন কষাকষি

হয়, ঝগড়া-বিবাদ হয় এবং তা থেকে তাদের দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয় নিম্নে শুধু সেগুলোরই বিশদ বিবরণ প্রদান করা হল।

স্ত্রীর যেসব অধিকার আদায় না করলে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়

১. স্বামীর স্বচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দেয়া কর্তব্য। স্ত্রীর হাত খরচার জন্যও পৃথকভাবে কিছু দেয়া উচিত, যাতে সে তার ছোটখাট এমন সব প্রয়োজন পূরণ করতে পারে যেগুলো সব সময় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়। সাধ্য থাকা সত্ত্বেও স্ত্রীর ভরণ-পোষণে বখীলী করলে, তার প্রয়োজনের দিকে খেয়াল না দিলে এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মনকষাকষি হতে পারে, ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে এবং এভাবে তাদের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। আবার স্ত্রীরও মনে রাখা উচিত জীবনের শুরুতেই স্বামীর কাছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও আব্দার শুরু করে দেয়া বুদ্ধিমত্তার পরিপন্থী কাজ। এতে করে স্বামী স্ত্রীকে লোভী মনে করে বসতে পারে। এরূপ মনে করার সুযোগ করে দেয়া ভুল হবে। এরূপ মনে করলে সেটা হবে স্ত্রীর প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা, যা দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্পর্কে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। স্ত্রী যদি স্বামীর কাছে দাবী-দাওয়া পেশ না করে বরং স্বামীই স্ত্রীর মনের চাহিদা বুঝে কাজ করে, সেটিই হল মধুর জীবন। স্ত্রী স্বামীর কাছে দাবী-দাওয়া পেশ না করলেই স্বামী স্ত্রীর প্রতি বেশি মুগ্ধ হতে পারে এই ভেবে যে, আমার স্ত্রী আমার প্রতি এতই সহানুভূতিশীল যে, আমার প্রতি কোনোই চাপ সৃষ্টি করতে চায় না। কিংবা মনে করবে আমার স্ত্রীর মন বেশ উর্ধ্বের, তার মনে লোভ-লালসা কম। স্বামী যদি কখনও স্ত্রীর কাছে তার মনের চাহিদা সম্পর্কে জানতে চায় এবং স্ত্রী বুঝতে পারে যে, এখন কোনো কিছু আব্দার করলে স্বামী অসন্তুষ্ট নয় বরং সন্তুষ্ট হবে, তাহলে স্বামীর সাধ্যের প্রতি খেয়াল রেখে কোনো আব্দার জানাতে পারে। বস্তুত দাম্পত্য জীবনে স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতার বিষয়ে দু পক্ষকেই খেয়াল রাখতে হবে। এ ব্যাপারে স্বামী স্ত্রীর কেউ অন্যকে কষ্ট দিবে না। কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে দিকনির্দেশনা দিয়ে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَآرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَ لَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ. ﴾

অর্থাৎ, কাউকে সাধ্যের বাইরে চাপ দেয়া যাবে না। না জননীকে তার সন্তানের জন্য কষ্ট দেয়া যাবে না জনককে তার সন্তানের জন্য। (সূরা বাকারা: ২৩৩)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَ مَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّآ اٰتٰىهُ اللّٰهُ.﴾

অর্থাৎ, যার স্বচ্ছলতা আছে সে তার স্বচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয় করবে, আর যার অভাব আছে সে তার সামর্থ অনুসারে ব্যয় করবে। (সূরা তালাক: ৭)

২. স্বামীর স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকর-নওকরের ব্যবস্থা করা স্বামীর দায়িত্ব। অবশ্য স্বচ্ছলতা না থাকলে তখন স্ত্রীকেই রান্না-বান্না (নিজের জন্য এবং স্বামীর সন্তানাদির জন্যও) ইত্যাদি কাজ করতে হবে, এটা তখন তার দায়িত্ব হয়ে দাঁড়ায়। স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও স্বামী এরূপ ব্যবস্থা না করলে এ নিয়ে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মনকষাকষি হতে পারে, ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে এবং এভাবে তাদের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। আবার স্বচ্ছলতা না থাকলে স্বামীর ওপর চাপ দেয়াতে স্বামীর মন বিগড়ে যেতে পারে এই ভেবে যে, ও শুধু নিজেরটাই বোঝে আমার দিকটা বুঝার চেষ্টা করে না। দাম্পত্য জীবনে স্বচ্ছলতা অস্বচ্ছলতার বিষয়ে দু পক্ষকেই খেয়াল রাখতে হবে– এ কথা সামান্য পূর্বে দলীলসহ আলোচনা করা হয়েছে।

৩. স্ত্রীর বসবাসের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী পৃথক ঘর বা অন্তত পৃথক রূম পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। স্ত্রী যদি পৃথক থাকার কথা বলে এবং স্বামীর মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে একই ঘরে থাকতে খুশি খুশি রাজী না থাকে, তাহলে তার ব্যবস্থা করা স্বামীর উপর ওয়াজিব। অন্তত একটা পৃথক কামরা তাকে দিতে হবে, যেখানে সে তার মাল-আসবাব তালাবদ্ধ রেখে হেফাজত করতে পারে এবং স্বাধীনভাবে একান্তে স্বামীর সঙ্গে মনোরঞ্জন করতে পারে। এরূপ না করলে এ নিয়েও স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মনকষাকষি হতে পারে, ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে এবং এভাবে তাদের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। (اصلاح انقلاب امت–এর আলোকে)

৪. স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা। ব্যবহার খারাপ করলে এ নিয়েও ধীরে ধীরে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর মনকষাকষি হতে পারে, ঝগড়া-বিবাদ হতে পারে এবং এভাবে তাদের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। নারীদের সঙ্গে সদ্ভাবে জীবন যাপন করার ও ভাল ব্যবহার করার নির্দেশ নিয়ে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْ مَعْرُفِ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা তাদের সঙ্গে (স্ত্রীদের সঙ্গে) ভাল ব্যবহার করবে। (সূরা নিছা: ১৯)

৫. স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা না রাখা। (আবার একেবারে অসতর্কও না থাকা উচিত।) এ সম্বন্ধে পরে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হবে।

৬. পারিবারিক শান্তি শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে যে ক্ষেত্রে স্ত্রীকে সংশোধনমূলক কিছুটা প্রহার করার অনুমতি স্বামীকে দেয়া হয়েছে, সে ক্ষেত্রেও স্বামী সীমালংঘন করতে পারবে না। অর্থাৎ, প্রকাশ্য স্থানে দাগ পড়ে যাবে এমনভাবে স্ত্রীকে মারতে পারবে না বা প্রচণ্ডভাবেও মারপিট করতে পারবে না। পুরুষ তার কর্তৃত্ব সুলভ ক্ষমতার অপব্যবহার করে কোনোভাবেই স্ত্রীর প্রতি জুলুম অবিচার করতে পারবে না। শাসনের ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি কিংবা যেকোনোভাবে স্ত্রীর প্রতি জুলুম হলে স্ত্রী স্বামীর প্রতি বিরূপ হবে, স্বামীকে আর মন থেকে ভালবাসতে পারবে না। এভাবে তাদের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হবে। এরূপ বাড়াবাড়ি যেন হতে না পারে এজন্য হাদীছে বহু দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এক হাদীছে এসেছে–

وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرَّحٍ. (رواه الترمذي ١١٦٣ وقال: حسن صحيح)

অর্থাৎ, (শাসনের প্রয়োজনে) মারতে হলেও এমনভাবে মারবে না যে তার আছর প্রকাশ পাবে। (তিরমিযী ও ইবনে মাজা) অর্থাৎ, এমনভাবে মারবে না যে, গায়ে দাগ পড়ে যাবে, চেহারায় ছাপ পড়ে যাবে।

অন্য এক হাদীছে বলা হয়েছে,

لاَ يَجْلِدُ أَحَدُكُمْ اِمْرَأَتَهٗ جَلْدَ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِيْ آخِرِ الْيَوْمِ. (رواه البخاري في كتاب النكاح باب ما يكره من ضرب النساء ٥٢٠٤)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেন স্ত্রীকে গোলামের মত মারপিট না করে। পরে আবার দিনশেষে রাতের বেলায় তার সাথে মেলামেশা হবে! (বোখারী)

এখানে একটা জরুরি কথা মনে রাখা চাই। তাহল স্ত্রী থেকে কোন বিশেষ ত্রুটি বা অন্যায় দেখা দিলে তাকে সংশোধনের জন্য প্রথমেই মারধর করার নীতি ইসলামে নেই। ইসলাম এ ব্যাপারে খুব সুন্দর পন্থা বলে দিয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَالّٰتِیْ تَخَافُوْنَ نُشُوْزَهُنَّ فَعِظُوْهُنَّ وَاهْجُرُوْهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা যে নারীদের অবাধ্যতার আশংকা কর, তাদেরকে উপদেশ দাও, তাদেরকে বিছানায় পরিত্যাগ কর এবং তাদেরকে (হালকা) মারধর কর। (সূরা নিসা : ৩৪)

এ আয়াতে স্ত্রীদের সংশোধনের তিনটা পন্থা বলা হয়েছে। **একটা পন্থা হল** উপদেশ। অর্থাৎ, তাদেরকে উপদেশ দিয়ে বোঝাও, তাদেরকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সুপথে আনার চেষ্টা কর। যদি এভাবেও সংশোধন না হয়, তাহলে **দ্বিতীয় পন্থা হল** তাদেরকে ব্যবহার করা ছেড়ে দাও, বিছানায় অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাক। এতে তার আত্মমর্যাদা ও অভিমানে কিছুটা আঘাত লাগবে। যদি এতটুকু আঘাত পেয়ে সংশোধন হয়ে যায়, তাহলে আলহাম্‌দু লিল্লাহ্‌। এভাবে অনেক নারীর সংশোধন হয়েও যায়। এতেও যদি সংশোধন না হয়, তাহলে **তৃতীয় পন্থা হল** তাদেরকে হালকা কিছু মারধর করতে পার। এটা কিন্তু তৃতীয় পর্যায়ের বিষয়। মুফাসসিরীনে কেরাম বলেছেন, আল্লাহ পাক যে ধারাবাহিকতায় পন্থাগুলো বলেছেন, সেই ধারাবাহিকতা অনুসারেই অগ্রসর হতে হবে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষা করা ওয়াজিব। একটু কিছু মতের বিপরীত দেখা গেলে সাথে সাথেই মারধর শুরু করে দেয়া যাবে না। তাহলে ওয়াজিব ধারাবাহিকতা ভঙ্গ করার গোনাহ হবে। তবে শেষ পর্যায়ে কিছু মারধর করতে হলেও সেই মারধর যেন কোনোভাবেই জুলুম নির্যাতনের পর্যায়ে না হয়।

৭. স্ত্রীর মনোরঞ্জনের জন্য অন্তত কিছুক্ষণ নির্জনে তাকে সময় দেয়া, তার সঙ্গে হাসিফুর্তি করা স্বামীর কর্তব্য। যাতে সেও মনোরঞ্জন করতে পারে, মনের কথা বলতে পারে, সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাতে পারে এবং একাকিত্বের কষ্ট লাঘব করতে পারে। এরূপ সময় দিতে না পারলে তার সমমনা কোনো নারীকে তার নিকট আসা-যাওয়া বা রাখার ব্যবস্থা করবে। কোনোভাবেই স্ত্রীর মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করলে স্বামী- স্ত্রীর মধ্যে ঘনিষ্টতা গড়ে উঠবে না, বরং ধীরে ধীরে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে এক পর্যায়ে তা পারস্পরিক সুখ বিনষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

স্ত্রীর মনোরঞ্জনের বিষয়ে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাম্পত্য জীবনের একটি ঘটনা দেখুন। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জলীলুল কদর নবী ছিলেন, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ছিলেন, সবচেয়ে পদমর্যদার ব্যক্তি ছিলেন। তা সত্ত্বেও বিবিদের সাথে তিনি কেমন আচার ব্যবহার করেছেন? হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। জীবনে দুইবার তিনি হযরত আয়েশা (রা.)-এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করেছেন। প্রথমবার হযরত আয়েশা (রা.) আগে বেড়ে গেছেন। আর একবার জীবনের শেষ

দিকে যখন আয়েশা (রা.)-এর সাস্থ্য কিছুটা মোটা হয়ে গিয়েছিল, তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিতে গেছেন এবং বলেছেন, এটা হল ঐদিনের প্রতিশোধ। এভাবে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিবিদের সাথে মনোরঞ্জন করেছেন।

৮. স্ত্রীর ভুল-ক্রটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা, যতক্ষণ সীমালংঘনের পর্যায়ে না যায় এবং তার পক্ষ থেকে কষ্ট পেলে ছবর করা এবং নীরব থাকা। তবে এক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে অর্থাৎ, প্রয়োজন বোধে স্ত্রীকে মোনাছেব মত তম্বীহও করতে হবে। সব ভুল-ক্রটির জন্য কঠিন ও রুক্ষ হলে যেমন পারস্পরিক দূরত্ব বাড়বে তেমনি কোনো অবস্থায়ই স্ত্রীকে তম্বীহও করবে না- এমন নীতি গ্রহণ করলে স্ত্রী লাগামহীন হয়ে যেতে পারে যা ভবিষ্যতে অবশ্যই অশান্তির কারণ হবে। স্ত্রীদের অন্যায় অপরাধ হলে তার প্রতিকারের জন্য কি কি করণীয় তার বিস্তারিত বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে।

৯. একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ-পোষণ, রাতযাপন প্রভৃতি বিষয়ে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা করা ওয়াজিব। এরূপ সমতা রক্ষা করা না হলে যে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে অশান্তি হয়ে থাকে তা আর ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। তবুও এ ব্যাপারে পরবর্তীতে কিছু বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

স্বামীর যেসব অধিকার আদায় না করলে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি বিনষ্ট হয়

১. স্বামী অপছন্দ করে– এরূপ কোনো পুরুষকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে আসতে দিবে না। এরূপ কোনো পুরুষের সঙ্গে একাকী দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশা করবে না। এ থেকে স্বামীর মনে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে এবং এক পর্যায়ে তা তাদের মধ্যকার সুখ-শান্তিকে বিলীন করে দিতে পারে। মনে রাখতে হবে স্ত্রীর সতীত্ব স্বামীর সম্পদ, (অতএব সতীত্ব রক্ষা না করলে সতীত্বহীনতার অপরাধ তো রয়েছেই, সেই সাথে রয়েছে স্বামীর অধিকার নষ্ট করার অপরাধ।) তাই এ সম্পদ রক্ষায় কোনো ক্রটি করলে স্বামী কোনোভাবেই সুখ অনুভব করতে পারে না। এটা সংসারের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার সবচেয়ে বড় কারণ। এ জন্যই স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রী বাড়ি বা ঘর থেকে বের হবে না। এ থেকে স্বামীর মনে স্ত্রীর চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ জাগতে পারে এবং এক পর্যায়ে তা তাদের মধ্যকার সুখ-শান্তিকে বিলীন করে দিতে পারে।

২. স্বামীর নিকট তাঁর সাধ্যের বাইরে কোনো খাদ্য-খাবার বা পোশাক-পরিচ্ছদের আবদার করবে না। কোনো দাবি নিয়ে বা কোনো একটা বিষয় নিয়ে ঘ্যানর-ঘ্যানর করবে না। এতে স্বামীর মন বিষিয়ে উঠতে পারে, যা তাদের সুখ-শান্তি বিনষ্টের

কারণ হয়ে দাঁড়াবে। জীবনের শুরুতেই স্বামীর কাছে বিভিন্ন দাবী-দাওয়া ও আব্দার শুরু করে দিলে স্বামী স্ত্রীকে লোভী মনে করে বসতে পারে। এরূপ মনে করার সুযোগ করে দেয়া ভুল হবে। এরূপ মনে করলে সেটা হবে স্ত্রীর প্রতি এক ধরনের নেতিবাচক ধারণা, যা দাম্পত্য জীবনের মধুর সম্পর্কে বিঘ্ন ঘটাতে পারে। বরং স্বামীর সাধ্য থাকলেও নিজের থেকে কোনো কিছুর ফরমায়েশ না করাই উত্তম। স্বামী নিজের থেকেই তার খাহেশ জিজ্ঞাসা করে সে মোতাবেক ব্যবস্থা করবে– এটাই সুন্দর পন্থা।

স্বামী তার সাধ্য অনুসারে যতটুকু যা দিতে পেরেছে তার জন্য শোকর আদায় করবে, না-শুকরি করবে না। যেমন– কোনো এক সময় তাঁর আনীত কোনো দ্রব্য অপছন্দ হলে এরূপ বলবে না যে, কোনো দিন তুমি একটি পছন্দসই জিনিস দিলে না ... ইত্যাদি। এরূপ বললে স্বামী এই জিদে এসে যেতে পারে যে, ঠিক আছে আমার আনা জিনিস যখন তোমার পছন্দ হয় না তাহলে এখন থেকে তুমিই কিনে এনো, কিংবা ভাবতে পারে আমার আনা ভাল জিনিসও তার পছন্দ হয় না, ঠিক আছে এখন থেকে বাজে জিনিসই আনব। চিন্তা করে দেখুন তো এমন হলে কি কোন পক্ষেরই মনের সুখ-শান্তি থাকবে?

৩. স্বামী যৌনচাহিদা পূরণ করার জন্য আহবান করলে স্ত্রীর পক্ষে তাতে সাড়া দেয়া কর্তব্য, ফরয। (অবশ্য শরীয়তসম্মত ওজর থাকলে ভিন্ন কথা; যেমন– হায়য নিফাসের অবস্থা থাকলে।) বোখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا دَعَا الرَّجُلُ اِمْرَأَتَهٗ إِلٰى فِرَاشِهٖ فَأَبَتْ أَنْ تَجِيْءَ لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ. (متفق عليه. رواه البخاري في كتاب النكاح باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها برقم ٥١٩٣، ورواه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم ١٤٣٦، واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় আহবান করে আর সে আসতে অস্বীকার করে, সকাল পর্যন্ত ফেরেশতারা তার উপর অভিশাপ দিতে থাকে।

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهٖ مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَاَتَهٗ اِلٰى فِرَاشِهَا فَتَأْبٰى عَلَيْهِ إِلاَّ كَانَ الَّذِيْ فِي السَّمَآءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا. (رواه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم ١٤٣٦)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, সেই সত্তার কসম, যার হাতে আমার জীবন, যদি কোনো ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, তাহলে স্বামী তার প্রতি খুশি না হওয়া পর্যন্ত আসমানে যিনি আছেন তিনি (অর্থাৎ, খোদা) তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন। (মুসলিম)

এ হাদীছ থেকে স্পষ্টত বুঝা গেল স্বামীর বিছানায় যাওয়ার আহ্বানকে অস্বীকার করলে স্বামীর অসন্তুষ্টিতে আল্লাহ তাআলাও অসন্তুষ্ট হন।

স্বামীর যৌনচাহিদা যথাযথ পূরণ না করলে অন্য নারীর প্রতি স্বামীর মন ঝুকে যেতে পারে, যা ভবিষ্যতে স্বামী-স্ত্রীর সংসারে অশান্তি ডেকে আনতে পারে।

৪. স্বামী অস্বচ্ছল, দরিদ্র বা কুৎসিত হলে তাঁকে তুচ্ছ না জানা। কোন স্ত্রী তার স্বামীকে তুচ্ছ জানলে সেই স্ত্রীর প্রতি স্বামীর মন অবশ্যই এক সময় বেঁকে বসবে, যা তাদের মধ্যকার সুখ-শান্তি নষ্টের কারণ হবে।

৫. কারও সম্মুখে স্বামীর সমালোচনা না করা। স্বামী এটা জানলে অবশ্যই সেই স্ত্রীর প্রতি সে ভাববে ও আমাকে ভালবাসে না। এরূপ ভাবনা তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করবে এবং এক পর্যায়ে তা পারস্পরিক সুখ-শান্তি বিনষ্ট করবে।

৬. স্বামীর আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদ ও কথা কাটাকাটি না করা, তাদের সঙ্গে অমিল রেখে না চলা। বরং সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার চেষ্টা করা। অন্যথায় স্বামী স্ত্রীকে খুলে বলতে না পারলেও এ নিয়ে ঐ স্ত্রীর প্রতি তার মনোকষ্ট থেকে যাবে, যা ভবিষ্যতে কোন একসময় বিস্ফোরিত হয়ে সংসারকে তছনছ করে দিতে পারে।

৭. স্বামীর উদ্দেশে সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে এবং হাসি খুশি থাকা কর্তব্য। এটা স্বামীর অধিকার। এতে স্ত্রীর প্রতি স্বামীর আকর্ষণ বহাল থাকে। যা তার মনের সুখকে

ধরে রাখে। প্রত্যেক স্বামীই চায় তার স্ত্রী তার জন্য সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে থাকুক। স্ত্রীকে স্বামীর এই মানসিক অবস্থা বুঝতে হবে। স্বামীর মেজায ও মানসিক অবস্থা বুঝে চলা জরুরী। স্বামী-স্ত্রী একে অপরের মন-মেজায বুঝে না চললে মনের সুখ গড়ে ওঠে না। যতটুকু সুখ বিদ্যমান তা-ও বিনষ্ট হয়ে যায়।

৮. স্বামীর শারীরিক খেদমত করা। স্বামী সফর থেকে এলে বা বাইরে থেকে কর্মক্লান্ত হয়ে এলে তার তাৎক্ষণিক যত্ন নেয়া, সুবিধা-অসুবিধা দেখা ও খোঁজ-খবর নেওয়া জরুরি। শুধু সফর থেকে ফিরলেই নয় সর্বদাই স্বামীর স্বাস্থ্য শরীরের প্রতি খেয়াল রাখা ও যত্ন নেয়া স্ত্রীর দায়িত্ব। এ দায়িত্বে অবহেলা করলে স্বামীর মন আপ্লুত হয় না, সে মনে সুখ অনুভব করে না। স্বামীর খেদমতের জন্যই ঘরের রান্না-বান্না করা, কাপড় ধোয়া ইত্যাদি আইনগতভাবে স্ত্রীর দায়িত্ব না হলেও নৈতিক কর্তব্য হিসাবে করতে হয়।

৯. স্বামীর আদব এহ্তেরাম ও সম্মান রক্ষা করে চলা। চড়া গলায় ঝাঁঝালো স্বরে স্বামীর সঙ্গে কথা না বলা, তাকে শক্ত কথা না বলা। মোটকথা, কথা-বার্তায়, উঠা-বসায়, আচার-আচরণে সর্বদা স্বামীর আদব রক্ষা করে চলা কর্তব্য। এর অন্যথা হলে স্বামীর কর্তৃত্বসুলভ মানসিকতায় আঘাত লেগে স্বামী বেঁকে বসতে পারে। তাহলে তা পারস্পরিক সুখ-শান্তি বিনষ্ট করবে।

(بہشتی زیور ও تحفۂ زوجین، مفاتيح الجنان) –এর আলোকে।

অধিকারের ব্যাপারে সচেতন নয় দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান হোন

এতক্ষণ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের অধিকার সম্বন্ধে আলোচনা করা হল। উদ্দেশ্য– যেন স্বামী স্ত্রী উভয়ে এসব অধিকারের বিষয়ে অবগত হয়ে একে অপরের অধিকার আদায়ে সচেষ্ট হয়। যাতে তাদের দাম্পত্য সুখ-শান্তিময় হয়ে ওঠে। এখানে প্রসঙ্গত আলোচনা করা সংগত মনে হচ্ছে যে, আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজের অধিকারের ব্যাপারে খুব সচেতন কিন্তু দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান নয়। সেমতে স্বামী যদি তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান না হয় অর্থাৎ. স্ত্রীর অধিকার আদায় তার দায়িত্ব এ দায়িত্ব পালনে যদি সে যত্নবান না হয়, তাহলে সুখ-শান্তি আসবে না। তদ্রূপ স্ত্রী যদি তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে দায়িত্বের ব্যাপারে যত্নবান না হয় অর্থাৎ. স্বামীর অধিকার আদায় তার দায়িত্ব– এ দায়িত্ব পালনে যদি সে যত্নবান না হয়, তাহলেও শান্তি আসবে না। স্বামী যদি শুধু নিজের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকে এবং পদে পদে শুধু এটাই দেখে যে, স্ত্রী তার অধিকার আদায় করছে কি না– স্ত্রী তার খেদমত ঠিকমত করছে কি না, স্ত্রী তার

আনুগত্য পুরোপুরি করছে কি না ইত্যাদি, অথচ স্ত্রীর জন্য তার দায়িত্ব-কর্তব্য কি সে ব্যাপারে সচেতন না থাকে– স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ঠিকমত না দেয়, স্ত্রীর মনের দিকে খেয়াল না রাখে, তার সুবিধা-অসুবিধার প্রতি খেয়াল না দেয়, তাহলে স্ত্রী তার প্রতি সন্তুষ্ট হতে পারবে না, তাহলে সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না। এভাবে চলতে থাকলে স্ত্রীও এক সময় বিগড়ে গিয়ে স্বামীর জন্য করণীয় কাজে গাফিলতি করবে। সংসারে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবে। পক্ষান্তরে স্ত্রীও যদি শুধু এটাই দেখে যে, স্বামী তার অধিকার ঠিকমত আদায় করছে কি না– তার ভরণ-পোষণে কোন ত্রুটি হচ্ছে কি না, তার মনোরঞ্জনে কোন ত্রুটি হচ্ছে কি না, তার হাতখরচ ঠিকমত দিচ্ছে কি না ইত্যাদি, অথচ সে স্বামীর খেদমতের প্রতি ঠিকমত লক্ষ না রাখে, স্বামীর আনুগত্য করে না চলে, তাহলেও সংসারে শান্তি আসবে না, তাহলে স্বামীও তার প্রতি আরও বিগড়ে যাবে। সংসারে বিশৃঙ্খলা বেড়ে যাবে। ইসলাম স্বামী স্ত্রী উভয়ের অধিকার যেমন রেখেছে, তেমনি উভয়ের দায়িত্ব-কর্তব্যও রেখেছে। বস্তুত স্বামী স্ত্রী উভয়েই যখন নিজ নিজ দায়িত্ব আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হবে এবং অপর পক্ষের দায়িত্ব পালনে ত্রুটি হলে কুরবানী ও সহনশীলতার পরিচয় দিবে তখনই তাদের দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে।

অধিকার আদায়ের ব্যাপারে সোচ্চার না হয়ে সহনশীলতার পরিচয় দেয়ার এবং নিজ দায়িত্ব পালনে যত্নবান থাকার শিক্ষা অতি সুন্দরভাবে নিম্নোক্ত হাদীছে বিবৃত হয়েছে–

سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ! أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُوْنَ حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُوْنَ حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَه فِي الثَّانِيَةِ أَوِ الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ صلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِسْمَعُوْا وأَطِيْعُوْا، فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوْا وَعلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ.

(رواه مسلم في كتاب الإمارة باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق برقم ١٨٤٦، ورواه الترمذي في كتاب الفتن باب ما جاء ستكون فتن كقطع الليل المظلم حديث رقم ٢١٩٩، وقال: حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, সালমা ইবনে ইয়াযীদ জু'ফী (রা.) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নিকট জানতে চাইলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! যদি এমন আমীর উমরা ও কর্তৃপক্ষ আমাদের উপর দাঁড় হয়, যারা আমাদের থেকে তাদের অধিকার আদায় করতে চায় অথচ আমাদের অধিকার আমাদেরকে প্রদান করা থেকে বিরত থাকে, সে মুহূর্তে আমাদেরকে কী করার নির্দেশ দেন? রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকলেন। সে আবার প্রশ্ন করলে তিনি এবারও উত্তর প্রদান থেকে বিরত থাকলেন। আবার সে প্রশ্ন করলে (দ্বিতীয়বার বা তৃতীয়বার, তখন আশআছ ইবনে ক্বায়ছ তাকে ধরে টান দেন) তখন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা তাদের কথা শুনবে, তাদের আনুগত্য বহাল রাখবে। তাদের দায়িত্ব তাদের পালন করা কর্তব্য এবং তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের পালন করা কর্তব্য। (মুসলিম ও তিরমিযী)

এ হাদীছে যদিও আমীর উমরা ও তাদের অধীনস্থদের ব্যাপারে বলা হয়েছে, তবে "তাদের দায়িত্ব তাদের পালন করা কর্তব্য এবং তোমাদের দায়িত্ব তোমাদের পালন করা কর্তব্য।"– এ বক্তব্যের মর্ম ব্যাপক, অন্য লোকদের এবং জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রের বেলায়ও তা প্রযোজ্য।

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ أُثْرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ. (رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار حديث رقم ٣٧٩٢ ورواه مسلم في كتاب الزكاة باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبُّر من قوِيَ إيمانه ١٠٦١)

অর্থাৎ, আমার দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর তোমাদের অধিকারের চেয়ে অন্যদের অধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়া হবে– এমন এক পরিস্থিতির সম্মুখীন তোমরা হবে, তখন তোমরা ধৈর্যের পরিচয় দিও। এভাবে হাউযে কাওছারের নিকট আমার সঙ্গে তোমাদের মিলন হবে। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিজেদের অধিকার বিবেচিত হতে না দেখলে ধৈর্য ও সহনশীলতা প্রদর্শন এবং কর্তৃপক্ষের আনুগত্য অব্যাহত রাখার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

২. শুধু আইন দেখা নৈতিক গুণের ভিত্তিতে না চলা

এতক্ষণ যেসব কারণে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হয় তার একটা কারণ (স্বামী-স্ত্রীর একে অপরের অধিকার আদায় না করা) সম্বন্ধে আলোচনা শেষ হল। অনেক সময় দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার একটা কারণ হয়ে দাঁড়ায় শুধু এই অধিকার দেখা অর্থাৎ, আইন দেখা। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এরূপ মনোভাব থাকলে তাদের সংসারে শান্তি আসবে না। শুধু নিজের অধিকার দেখলে হবে না, অপরের অধিকার তথা নিজের দায়িত্ব-কর্তব্যও দেখতে হবে। শুধু আইন দেখলে হবে না, আইনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতাও দেখতে হবে। একটা উদাহরণ দিয়ে বিষয়টা খোলাসা করা যেতে পারে। যেমন– স্বামীর কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, স্বামীর জন্য রান্না-বান্না করা স্ত্রীর আইনত দায়িত্ব নয় তবে স্বামীর অপারগতায় এটা স্ত্রীর নৈতিক দায়িত্ব। এমনিভাবে স্ত্রীর অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা করানো স্বামীর আইনত দায়িত্ব নয়, স্বামী এটা নৈতিক দায়িত্ব হিসাবে করবে। এখন মনে করুন স্ত্রী যদি শুধু আইন দেখে এবং স্বামীকে বলে যে, তোমার কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করা, তোমার জন্য রান্না-বান্না করা আমার আইনত দায়িত্ব নয়, আমি এগুলো করতে পারব না, আর স্বামী যদি বলে ঠিক আছে তোমার অসুখ-বিসুখের চিকিৎসার করানো আমার আইনত দায়িত্ব নয়, আমি এটা করতে পারব না, তোমার চিকিৎসার ব্যবস্থা তুমি নিজেই কর, তাহলে বলুন তো স্বামী স্ত্রী এভাবে নৈতিক দিক উপেক্ষা করে শুধু আইন দেখলে কি তাদের সংসারে শান্তি আসবে? আদৌ আসবে না। শান্তির জন্য আইনের সঙ্গে সঙ্গে নৈতিক দিকটিও দেখতে হবে। শান্তির জন্য আইনের পাশাপাশি নৈতিক অনুশীলনও প্রয়োজনীয়।

৩. স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একে অপরের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া

দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার আর একটা প্রধান কারণ হল স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একে অপরের চরিত্র নিয়ে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়া। স্বামী স্ত্রী একে অপরের চরিত্রের ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়লে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে চরম অশান্তি দেখা দিতে পারে। সুখী দাম্পত্য জীবনের স্বপ্ন ধুলায় মিলে যেতে পারে। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের জন্য প্রথমত উভয়কেই মনে রাখতে হবে যে, দলীল-প্রমাণ ছাড়া কারও ব্যাপারে কু-ধারণা করা অন্যায় এবং পাপ। দলীল-প্রমাণ ব্যতীত সন্দেহ ইসলামে নিষিদ্ধ। কুরআনে কারীমে ইরশাদ করা হয়েছে,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ.

অর্থাৎ, হে মুমিনরা! তোমরা অনেক ধারণা থেকে বেঁচে থাক। নিশ্চয় কোন কোন ধারণা পাপ। (সূরা হুজুরাত: ১২)

এখানে বোঝানো হয়েছে যে, দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কারও ব্যাপারে কোনো খারাপ ধারণা করা পাপ।

অতএব দলীল-প্রমাণ ছাড়া নিছক সন্দেহ হয়ে থাকলে মন থেকে সে সন্দেহ ঝেড়ে ফেলতে হবে। যদি মন থেকে সন্দেহ না যায়, তাহলে যে কারণে সন্দেহ সৃষ্টি হয় সে কারণ উল্লেখ করে তাকে স্পষ্ট বলতে হবে যে, এ কারণে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হচ্ছে, তুমি এ থেকে বিরত হও, আর বিরত হতে না পারলে আমার জন্য দুআ কর যেন আমার মন থেকে এ সন্দেহ দূর হয়ে যায় এবং নিজেও মন থেকে কু-ধারণা দূর হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দুআ করতে থাকবে। এভাবে ইনশাআল্লাহ মন পরিষ্কার হয়ে যাবে। অন্যথায় মনে মনে সন্দেহ, ক্ষোভ চাপা রাখলে সেটা খারাপ পরিণতি ডেকে আনতে থাকবে।

আর বাস্তবিকই যদি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, স্বামীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, তাহলে স্ত্রী যেহেতু জোরপূর্বক স্বামীকে কোনো কিছু মানাতে বাধ্য করতে পারবে না এবং এজন্য বকাঝকা করলে স্বামীর জিদ বেড়ে গিয়ে আরও হিতে বিপরীত হতে পারে, তাই স্ত্রীর তখন করণীয় হল−

(এক) স্বামীর মতি ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দুআ করবে।

(দুই) যখন স্বামী নির্জনে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে থাকবে এবং ঠাণ্ডা মাথায় থাকবে তখন খুব নরম ভাষায় তাকে বোঝাতে থাকবে।

(তিন) স্বামীর মনোরঞ্জনের জন্য আগের চেয়ে বেশি নিজেকে নিবেদিত করবে। এভাবে হয়ত স্বামীর সংশোধন হয়ে যেতে পারে। এ না করে স্ত্রী যদি এরূপ মুহূর্তে স্বামীকে জব্দ করতে চায়, প্রকাশ্যে হেয় করতে চায় এবং স্বামীর মনোরঞ্জনে পূর্বের চেয়ে পিছিয়ে থাকে, তাহলে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি।

আর বাস্তবিকই যদি দলীল-প্রমাণের ভিত্তিতে জানা যায় যে, স্ত্রীর চরিত্র নষ্ট হচ্ছে, তাহলে তাকে জরুরি ভিত্তিতে শক্তভাবে পর্দা ব্যবস্থার অনুবর্তী করতে হবে। পর্দা মেনে না চললে, পর পুরুষদের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হাসি-তামাশা ও অবাধ মেলামেশা করলে পর পুরুষের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ, হাসি-তামাশা ও অবাধ মেলামেশার ফলে অবৈধ মেলামেশা পর্যন্ত হয়ে যায়। পর্দায় থাকলে এ সমস্ত অঘটন হতে পারে না। পর্দা-ব্যবস্থাই হল নারীর সতীত্ব রক্ষার সবচেয়ে বড় উপায়।

পর্দা বিধান লংঘন করা থেকেই স্বামী-স্ত্রীর একের প্রতি আরেকজনের সন্দেহ সৃষ্টি হয়ে থাকে। পর্দা পারিবারিক জীবনে সন্দেহ সৃষ্টির পথকে বন্ধ করে দেয়। পর্দা রক্ষা করলে স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সন্দেহ আসতে পারে না, স্ত্রীর মন অন্য কোনো পুরুষের দিকে যেতে পারে না, স্বামীর দিকেই তার সব দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে, স্বামীও

শরীয়তসম্মত পর্দার বিধান মেনে চললে এবং পরনারীর প্রতি দৃষ্টি না দিলে তার মনও অন্য নারীর দিকে ঝুকতে পারে না বরং স্ত্রীর দিকেই তার দৃষ্টি সম্পূর্ণ নিবদ্ধ থাকে। এভাবে পর্দার বিধান রক্ষা করলে স্বামী-স্ত্রী উভয়ের দৃষ্টি নিজেদের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে এবং তাদের ভালবাসা অটুট থাকে, তাদের পারিবারিক জীবন শান্তিময় থাকে। পর্দার বিধান তাই ইহকাল পরকাল উভয় জগতের বিচারে একটি সুন্দর বিধান।

বহু লোকের জীবনের এমন ঘটনাও শোনা যায় যে, বয়স বেশি হওয়ার কারণে স্বামীর যৌন ক্ষমতা হ্রাস পায়। ফলে সে পূর্বের মত স্ত্রীকে যৌন সঙ্গ দিতে বাস্তবেই অপারগ হয়ে পড়ে। অথচ স্ত্রী সন্দেহ করে যে, তার অন্যত্র যাতায়াত রয়েছে। যৌন বিজ্ঞান সম্বন্ধে একেবারেই ধারণা না থাকার ফলে এমনটি হয়ে থাকে। এরূপ হলে স্বামীর করণীয় হল স্ত্রীকে বিষয়টা ভাল করে বোঝানো আর স্ত্রী এটা করতে পারে যে, সে স্বামীকে বুঝিয়ে তাকে সম্ভাব্য চিকিৎসা গ্রহণের জন্য উদ্বুদ্ধ করবে।

৪. একাধিক বিয়ে করা

দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার আর একটা কারণ হল একাধিক বিয়ে। ইসলাম বিভিন্ন প্রয়োজনের ভিত্তিতে একাধিক বিয়ে (এক সঙ্গে সর্বোচ্চ চারজন) পুরুষের জন্য জায়েয রেখেছে। পৃথিবীর বহু মুসলিম রাষ্ট্রে পুরুষ একাধিক বিয়ে করলে স্ত্রীরা এটাকে সহজেই মেনে নেয়। কিন্তু হিন্দুদের সংস্পর্শে –যাদের ধর্মে একাধিক বিয়ে নেই– আমাদের দেশের নারীরা সহজে সতীনকে মেনে নেয় না। ফলে পুরুষ একাধিক বিয়ে করলেই এ নিয়ে পূর্বের স্ত্রী/স্ত্রীরা স্বামীর সঙ্গে নানান রকম অসহযোগিতা করে, ঝগড়াঝাটি বাঁধিয়ে, মনোমালিন্য করে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তিকে হাওয়ায় মিলিয়ে দেয়। তাই আমাদের দেশের পুরুষদেরকে দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি ধরে রাখতে চাইলে প্রয়োজনে একাধিক বিয়ে করতে হলে আগের স্ত্রীকে পূর্বে রাজি করিয়ে তারপর সে পদক্ষেপ নিতে হবে। এটাই নিরাপদ পন্থা। একান্তই একাধিক বিয়ে করা হলে যদি সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার উপক্রম হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তার প্রতিকারের জন্য স্বামী ও স্ত্রী উভয়েরই কিছু করণীয় রয়েছে। স্বামীর করণীয় হল আগের স্ত্রী পরবর্তী স্ত্রীকে কেন মেনে নিতে পারে না তা বুঝতে হবে। আগের স্ত্রী পরবর্তী স্ত্রীকে এ কারণে মেনে নিতে পারে না যে, তার আশংকা থাকে পরবর্তী স্ত্রীকেই বেশি আদর-সোহাগ করা হবে এবং তার আদর-সোহাগ কমে যাবে, তার সন্তানাদি অবহেলিত হবে ইত্যাদি। তাই স্বামীর কর্তব্য হবে কার্যতভাবে এ আশংকাকে দূর করা অর্থাৎ, সে সকল স্ত্রীর মধ্যে পূর্ণভাবে সমতা রক্ষা করবে, সকলকেই এক দৃষ্টিতে দেখবে, সকলের সঙ্গে এক রকম আদর-সোহাগের আচরণ

করবে, তাহলে আস্তে আস্তে পূর্বের স্ত্রী স্বাভাবিক হয়ে আসবে। আর স্ত্রীর কর্তব্য হল প্রথমত সে মনকে বোঝাবে যে, পুরুষের জন্য একাধিক বিয়ে করা যখন জায়েয, তখন আমার সেটা মেনে নিতে বাধা কোথায়। দ্বিতীয়ত সে জিদ ধরে স্বামীর খেদমত ও মনোরঞ্জনে ত্রুটি করবে না; তাহলে এই অবসরে পরবর্তী স্ত্রীর দিকে স্বামী বেশি ঝুঁকে পড়বে। বরং তার জন্য উচিত হবে স্বামীকে আরও বেশি আকৃষ্ট করার চেষ্টা করা, যাতে স্বামীকে ভারসাম্যের পর্যায়ে রাখা যায়। তৃতীয়ত সতীনকে প্রকাশ্যে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়া। যদি সতীনের সঙ্গে প্রকাশ্যে শত্রুতার আচরণ করা হয়, তাহলে সেও তাকে শত্রু ভাববে। এভাবে শুরু থেকেই অমিল লেগে গেলে ভবিষ্যতে তাকে আপন করে নেয়া কঠিন হবে। মনে রাখতে হবে– নতুন সতীনকে আপন করে নিতে না পারলে সংসারে যে অশান্তি আসবে, সে অশান্তি শুধু নতুন সতীনই ভোগ করবে না, তাকেও ভোগ করতে হবে। তাই জিদ ধরা নয় বরং বুদ্ধিমত্তা হল শুরু থেকেই সতীনকে আপন করে নিয়ে মিলেমিশে থাকার চেষ্টা করা। আর নতুন স্ত্রীকেও মনে রাখতে হবে যে, তার স্বামীর পুরাতন স্ত্রীরও অধিকার রয়েছে, যেমন তার অধিকার রয়েছে। অতএব পুরাতন স্ত্রী থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে নিজের কুক্ষিগত রাখার প্রচেষ্টা ঠিক হবে না। নতুন স্ত্রী যদি স্বামীকে সব স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে, তাহলে এক দিকে স্বামী অন্যায় থেকে রক্ষা পাবে, অপর দিকে আগের স্ত্রীও তাহলে নতুনের প্রতি মুগ্ধ হবে এবং সর্বোপরি দাম্পত্য জীবন ও সংসারের শান্তি রক্ষা হবে।

৫. স্বামীর মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের সাথে স্ত্রীর সুসম্পর্ক না থাকা

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার আর একটা কারণ হল স্বামীর মাতা-পিতা ও ভাই-বোনদের সাথে স্ত্রীর সুসম্পর্ক না থাকা। সাধারণত স্বামীর পিতা-মাতা অর্থাৎ, ঐ স্ত্রীর শ্বশুর-শাশুড়ী পুত্রের উপর অধিকার থাকার সুবাদে পুত্রবধূর উপরও কর্তৃত্ব করতে চায় এবং পুত্রের ন্যায়-পুত্রবধূকেও বাধ্যগত পেতে এবং রাখতে চায়। তারা পুত্র থেকে যে রকম আনুগত্য ও খেদমত পাওয়ার, পুত্রবধূ থেকেও সে রকম পেতে চায়। এর ফলে পুত্র-বধূর সঙ্গে কর্তৃত্ব সুলভ আচরণ ও ক্ষেত্র বিশেষে বাদীসুলভ ব্যবহারও করে থাকে। অনেক সময় পুত্রবধূ প্রফুল্ল চিত্তে না চাইলেও জবরদস্তী তার থেকে শ্বশুর-শাশুড়ী কাজ ও খেদমত নিয়ে থাকেন এবং জবরদস্তী পুত্রবধূকে একান্নভুক্ত রাখা হয়। এসব কারণে পুত্রবধূর স্বাধীন চেতনা আঘাতপ্রাপ্ত হয়, কখনও কখনও সে আত্মমর্যাদায় আঘাতবোধ করে এবং এ সংসারকে সে আপন বলে মেনে নিতে পারে না, ফলে শ্বশুর-শাশুড়ীর সঙ্গে শুরু হয় তার সম্পর্কের টানাপোড়েন। আর তার চূড়ান্ত পরিণতি এই হয় যে, তাদের থেকে সে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যেতে চায়। আর স্বামী এর প্রতিকার করে না বলে স্বামীর প্রতিও তার সন্দেহ হয় যে, সে আমাকে খুব একটা আপন করে নিতে পারেনি। এভাবে স্বামীর প্রতি তার সন্দেহ ক্ষোভ পূঞ্জিভূত হতে থাকে। পরিণামে তাদের দাম্পত্য জীবনে দেখা দেয় অশান্তি।

এর প্রতিকারের জন্য শ্বশুর-শাশুড়ীর মনে রাখা দরকার যে, শ্বশুর-শাশুড়ীর খেদমত করা মৌলিকভাবে পুত্রবধূর দায়িত্ব নয়, করলে সেটা তার অনুগ্রহ। বরং এ খেদমতের দায়িত্ব তাদের পুত্রের উপর বর্তায়। পুত্রের পক্ষ থেকে তার বধূ যদি সে খেদমতের দায়িত্ব আঞ্জাম দেয়, তাহলে সেটা তার অনুগ্রহ। শ্বশুর-শাশুড়ী যদি পুত্র-বধূর খেদমতকে এ দৃষ্টিভঙ্গীতে মূল্যায়ন করে, তাহলে পুত্র-বধূর প্রতি তারা প্রীত হবে এবং তার প্রতি তাদের বাদী সুলভ মনোভাব সৃষ্টি হবে না। এরূপ করলে পুত্রবধূ তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে না, তাদের ছেলের দাম্পত্য জীবনে অশান্তি আসবে না। আবার স্বামীর বোঝার রয়েছে কেন তার স্ত্রী তার মাতা-পিতা ও তার ভাই-বোনদের সঙ্গে একান্নভুক্ত থাকতে চায় না। সে সকলকে সম্প্রীতির সঙ্গে থাকার জন্য বোঝাবে, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবে, প্রয়োজনে তার স্ত্রীর জন্য স্বাধীনভাবে থাকার ব্যবস্থা করবে।

অনেক পিতা-মাতাই মনে করে থাকেন তাদের পুত্রের ভিন্ন সংসার গড়ে উঠলে তারা অবহেলিত হবেন, তারা বঞ্চিত হবেন। কিন্তু পুত্রকে যদি তারা যথাযথভাবে গড়ে তুলতে পারেন, তাহলে পুত্রের সংসার ভিন্ন হলেও পুত্র তাদের অধিকার ও খেদমতে ত্রুটি করবে না– এটাও বাস্তব সত্য। তদুপরি জোর-জবরদস্তী কিছুদিন একান্নভুক্ত রাখা হলেও চরম অবনিবনা সৃষ্টি হওয়ার পর এক সময় তো পৃথক হতেই হবে, সেই পৃথক হওয়াটা আগে ভাগে করে ফেললেই তো ভাল। মনে রাখা দরকার– যৌথ পরিবার সাময়িক বিচারে ভাল হলেও স্থায়ী সুসম্পর্কটা বড় কথা। তদুপরি স্ত্রীর অধিকার আছে পৃথক হয়ে যেতে চাওয়ার, অন্তত একটা থাকার ভিন্ন ঘর পাওয়া স্ত্রীর অধিকার। এ সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। হযরত থানবী (রহ.) বলতেন, দু চুলার আগুন থেকেই (অর্থাৎ, ভিন্ন সংসার থেকেই) সংসারের শান্তিতে আগুন লাগে। অতএব এই যুগে শুরু থেকেই চুলা পৃথক করে দেওয়া সমীচীন। (تحفۂ زوجین) তবে স্ত্রীরও মনে রাখা দরকার বিনা প্রয়োজনে স্বামীকে তার মাতা-পিতা ও ভাই-বোন থেকে পৃথক করে নিয়ে তাদের মনে কষ্ট দেয়া উচিত নয়। বেঁচে থাকলে তাকেও হয়তো একদিন শাশুড়ী হতে হবে, আজ সে যেমন আচরণ করবে ভবিষ্যতেও সে তেমনই ফল পাবে।

আর স্ত্রী সকলের সঙ্গে মিলে মিশে থাকার জন্য জা ননদ প্রমুখের সাথে নিম্নোক্ত নীতিমালা মেনে চলবে। তাহলে ইনশাআল্লাহ সকলেই অশান্তি থেকে রক্ষা পাবে।

* জা ননদদের থেকে স্বামীকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়ার চেষ্টা করবে না।

* শ্বশুর বাড়ীর জা ননদ প্রমুখদের কোনো দোষ-ত্রুটি মাতা-পিতার কাছে বলবে না বা শ্বশুরালয়ের কারও সম্পর্কে কোনো গীবত-শেকায়েত বাপের বাড়ীতে করবে না। এ থেকেই ক্রমান্বয়ে উভয় পক্ষের মন খারাপ হয়ে নানান জটিলতার সৃষ্টি হয়ে থাকে।

* জা ননদ প্রমুখদের মধ্যে যারা বড় তাদেরকে আদব-সম্মান করবে এবং যারা ছোট তাদেরকে স্নেহ করবে।

* জা ননদ প্রমুখরা যে কাজ করবে তা করতে লজ্জাবোধ করবে না। তাদের কাজে সহযোগিতা করবে বরং তারা করার পূর্বেই সম্ভব হলে তাদের কাজ করে দিবে, তাহলে তাদের ভালবাসা লাভ করা যাবে।

* নিজের কাজ ফেলে রাখবে না এই ভেবে যে, সংসারে জা ননদ অমুক অমুক রয়েছে তারা করবে। বরং নিজের করণীয় সবকিছু নিজেই করে সারবে, নিজের সবকিছু নিজেই সাজিয়ে-গুছিয়ে ও পরিপাটি করে রাখবে।

৬. স্ত্রীর চেহারা বা কোন কিছু অপছন্দ লাগা

কিছু লোকের ক্ষেত্রে দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি না আসার কারণ হয়ে দাঁড়ায় তাদের স্ত্রীদের সুন্দরী না হওয়া। স্ত্রী সুন্দরী নয় বলে তারা মনে সুখ উপলব্ধি করে না। অনেক স্বামী আছে স্ত্রীর মধ্যে কোন গুণের অভাব আছে বা তার চাল-চলন কিংবা স্বভাব আচরণ কিংবা খুটিনাটি কোন কিছু অপছন্দ লাগে বলেই নিজেকে অসুখী ভাবে, মন খারাপ করে। এ ক্ষেত্রে ঐ স্বামীদের মনে রাখতে হবে যে, এর মধ্যেই আল্লাহ কোন কল্যাণ রেখেছেন। এরূপ চিন্তা করলে মন খারাপ হওয়াটা কমে যাবে। এই মন খারাপ হওয়া ভাব দূর করার আর একটা উপায় হল তার গুণগুলো দেখা। তার মধ্যে বহু দোষ-ত্রুটি থাকলেও কিছু না কিছু গুণও অবশ্যই আছে। সেই গুণগুলো দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। আমাদের স্বভাব হল আমরা একজনের শুধু দোষগুলো দেখি, তার গুণগুলো দেখি না। যার কারণে তার সম্পর্কে আমাদের মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ তার গুণগুলো দেখলে তার ভিত্তিতে মন শান্ত্বনা পেত। একজন মানুষ যত খারাপই হোক না কেন, তার মধ্যে কোনো না কোন গুণও অবশ্যই থাকে। কথায় বলে ঘড়ি যদি একেবারে অচলও হয়, তবুও অন্তত দিনে রাতে দুইবার টাইম ঠিক দেয়। যেমন– একটা ঘড়ির কাটা ১২টার উপরে এসে বন্ধ

হয়ে আছে, তাহলে এ ঘড়ি দুপুর ১২টায় এবং রাত ১২টায়– এই দুইবার ঠিক টাইম দিবে। বুঝা গেল অচল জিনিসের মধ্যেও কিছু না কিছু ফায়দা অবশ্যই আছে। তাই কোন নারীর যত দোষ-ত্রুটি থাকুক, তার অনেক গুণও থাকবে। সেই গুণগুলো দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করতে হবে। বিবিকে ভাল না লাগার প্রতিকারে এ-ই হল মনস্তাত্ত্বিক চিকিৎসা। আপনার স্ত্রীকে আপনার ভাল লাগে না, মন খারাপ, তার এই দোষ, সেই দোষ, তাকে আপনি সহ্য করতে পারছেন না, দুর্ব্যবহার করতে মনে চাচ্ছে, তাহলে তার কি কি গুণ আছে চিন্তা করে বের করুন এবং সেগুলোর ভিত্তিতে তার প্রতি মুগ্ধ থাকার চেষ্টা করুন। দেখবেন আপনার মন ঠিক হয়ে যাবে। কুরআনে কারীমে এ ব্যাপারে সুন্দর দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَ عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ فَاِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّ يَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا.﴾

অর্থাৎ, তোমরা তাদের সঙ্গে (স্ত্রীদের সঙ্গে) ভাল ব্যবহার করবে। যদি তাদেরকে তোমাদের ভাল না লাগে, তাহলে (মনে রাখবে) হতে পারে তোমরা কোন কিছু অপছন্দ কর অথচ আল্লাহ তাতে প্রচুর কল্যাণ রেখেছেন। (সূরা নিছা: ১৯)

এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لاَ يَفْرُكُ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خلقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ –أَوْ قَالَ: غَيْرَهُ–. (رواه مسلم في كتاب الرضاع ١٤٦٩)

অর্থাৎ, কোন স্বামী যেন তার স্ত্রীর প্রতি রুষ্ঠ হয়ে না থাকে। স্ত্রীর কোন চরিত্র অপছন্দনীয় লাগলে অন্য কোন একটা ভাল লাগবে। (মুসলিম)

হিন্দুস্থানের একজন প্রসিদ্ধ বুযুর্গ ছিলেন হযরত মির্জা মাজহার জানেজানা (রহ.)। তিনি খুব নাজুক মেজাযের লোক ছিলেন। এমন নাজুক মেজাযের যে, বিছানার চাদরে একটা ভাঁজ পড়ে থাকলেও বলতেন, আমার মাথায় ব্যথা শুরু হয়েছে, এই ভাঁজটা সোজা কর। এরকম নাজুক মেজায লোকের ইসলাহের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাকে (মাজহার জানেজানাকে) দিয়েছিলেন পূর্ণাঙ্গ বক্র মেজাযের এক স্ত্রী। মুরীদরা বারবার বলেছেন, হুজুর! আপনার পারিবারিক জীবন তো সারাক্ষণই অশান্তির মধ্যে কাটছে। বিবির সাথে লাগালাগি চলতেই থাকে। এই আপদ কি দূর করে দেয়া যায় না? মির্জা মাজহার জানেজানা (রহ.) জওয়াবে বলেছেন, আল্লাহ পাক হয়তো এর মধ্যেই আমার কল্যাণ রেখেছেন। এর দ্বারাই

আমার ইসলাহের ব্যবস্থা করেছেন। আমার মেজায তো বেশি নাজুক, তাই ওর মত বক্র মেজায বিবিকে দিয়ে আল্লাহ পাক আমার চিকিৎসা করাচ্ছেন। আরেকটা বিষয় হল আমার বিবির মধ্যে একটি বিশেষ গুণ আমি খুঁজে পেয়েছি। সে আমাকে ছাড়া আর কারও কথা ভাবে না। আমার বিশ্বাস যদি আমি কোন দিন কোন কারণে জেলে যাই, আর এর মধ্যেই দশ বিশ বছর আঁটকে থাকি, তবুও সে আমার ঘর থেকে বের হয়ে যেতে পারবে না, এই গুণ তো আমার ভেতর নেই। যখন আমি তার এই গুণের কথা চিন্তা করি, তার প্রতি মুগ্ধ হয়ে যাই যে, সে আমার সামান্য চারটে ডাল-ভাত খায়, আর আমার জন্য তার এত ভাবনা, এত চিন্তা-ফিকির।

হযরত থানভী (রহ.) বলেছেন, এই বিবিরা সামান্য একটা কথার ভিত্তিতে সবকিছু ছেড়ে দিয়ে স্বামীর সাথে চলে আসে। সেই কথাটা হল- তাকে বলা হয় অমুকের ছেলের সাথে তোমাকে বিয়ে দিলাম, আর সে বলে, কবুল করলাম। ব্যস, এতটুকু কথার পরই সে তার মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন সব ছেড়ে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসে। তোমার কথায় উঠা-বসা করে, তোমার মনোরঞ্জনের চেষ্টা করে, তোমাকে ছাড়া আর কারও চিন্তা করে না। শুধু এ বিষয়টা চিন্তা করাই বিবির প্রতি মুগ্ধ হওয়ার জন্য যথেষ্ট, তার মধ্যে আর কোনো গুণ থাকার দরকার হয় না। অন্য কোন গুণ থাকলে তো সোনায় সোহাগা। যদি গুণের চেয়ে দোষের পরিমাণ বেশি থাকে, তাহলে মনে করতে হবে যে, আল্লাহ পাক এর মধ্যে কোনো না কোনোভাবে আমার ফায়দা রেখেছেন। অন্তত এতটুকু ফায়দা তো অবশ্যই হবে যে, তাকে দেখে, তার দোষ-ক্রটি দেখে রাগ আসবে, মন খারাপ হবে, তখন সবর করার সুযোগ সৃষ্টি হবে। প্রতিদিন এরকম সবর করতে করতে সবরের গুণ স্বভাবে পরিণত হবে। আর যদি সত্যিকারভাবে কারও মধ্যে সবরের গুণ এসে যায়, তাহলে সে জান্নাত লাভ করবে। সবরের পুরষ্কার হল জান্নাত। সবরকারীদের সঙ্গে আল্লাহর রহমত ও নুসরত থাকে। কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা সবরকারীদের জন্য সু-সংবাদের কথা জানিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَبَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা সবরকারীদেরকে সু-সংবাদের কথা জানিয়ে দাও। (সূরা বাকারা: ১৫৫)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ সবরকারীদের সঙ্গে রয়েছেন। (সূরা বাকারা: ১৫৩)

৭. ঘ্যান-ঘ্যান ক্যাট-ক্যাট করা

দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার আর একটা বিশেষ কারণ হল পরস্পরে ঘ্যান-ঘ্যান ও ক্যাট-ক্যাট করতে থাকা। পরস্পরে ঘ্যান-ঘ্যান করতে থাকা অর্থ একে অপরের প্রতি একঘেয়ে অনুযোগ করতে থাকা, কোন কিছু নিয়ে অব্যাহতভাবে বক বক করতে থাকা। আর পরস্পরে ক্যাটক্যাট করা অর্থ একে অপরকে কটুকথা ও বিরক্তিকর কথা অব্যাহতভাবে বলতে থাকা। যেমন– স্বামী পছন্দ করে স্ত্রীর জন্য একটা শাড়ি এনে দিল। স্ত্রীর হয়তো সেটা তেমন পছন্দ হল না। এই নিয়ে স্ত্রী দিনের পর দিন অনুযোগ করেই যেতে থাকল– একদিন বলল, কী একটা সেকেলে শাড়ি নিয়ে এসেছে, আধুনিক যুগে এমন ডিজাইনের শাড়ি মেয়েরা পরে নাকি? আরেকদিন বলল, কী যে তোমার রুচি এই রঙটা তুমি কী করে পছন্দ করতে পারলে? আরেকদিন বলল, শাড়ির সুতো যে এমন পঁচা তা কি একটুও খেয়াল করে দেখলে না? এভাবে একটা জিনিস নিয়ে অব্যাহতভাবে অনুযোগ করতে থাকলে অব্যাহতভাবে বক বক করতে থাকলে স্বামীর মন নষ্ট হবে। তাহলে এক পর্যায়ে স্বামী চিন্তা করে বসতে পারে যে, ঠিক আছে সামনে কাপড়- চোপড় কেনার দায়িত্ব তাকেই দিয়ে দেব। কিংবা চিন্তা করে বসতে পারে যখন আমার আনা জিনিস তার পছন্দই হয় না, ঠিক আছে সামনে আর ভাল কিছু দিবই না। তাহলে ভেবে দেখুন তো এমন হলে কি তা সুখের হবে? আবার কোনদিন হয়তো রান্নায় স্বাদ একটু কম হল আর তা নিয়ে স্বামী স্ত্রীকে কটু কথা বলতেই থাকল। কিংবা স্ত্রীর রান্নার ধরন স্বামীর পছন্দ নয় বলে একেকদিন একেক ভংগিতে তাকে বিরক্তকর সব মন্তব্য শোনাতে থাকল। এরূপ করলে স্ত্রীর মন নষ্ট হবে। স্ত্রী হয়তো তাহলে ভবিষ্যতে আর স্বাদ করে রান্নার প্রতি মনোযোগই দিবে না এই চিন্তা করে যে, আমি যতই চেষ্টা করি ওনার তো পছন্দ হয়ই না, তাহলে আর চেষ্টা করে লাভ কী? ভেবে দেখুন তো এমন হলে সেটা কি কারও পক্ষেই সুখকর হবে?

বস্তুত দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বহাল রাখতে হলে পরস্পরে একে অপরের প্রতি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি রাখতে হবে। একে অপরের ভুল-বিচ্যুতি মার্জনা করে যেতে হবে। কারও ভুল-ত্রুটি হলে প্রয়োজনে তা সংশোধনের জন্য মোলায়েমভাবে বলুন, কঠিনভাবে বলবেন না, কিংবা তা নিয়ে ঘ্যান-ঘ্যান ক্যাটক্যাট করবেন না।

৮. একে অপরের স্বভাব বুঝার চেষ্টা না করা

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি বহাল রাখার জন্য একে অপরের স্বভাব ও রুচি বুঝে চলতে হবে। কারও স্ত্রী যদি রসিক মেজাযের না হয় তাহলে তার সঙ্গে রসিকতা করতে গেলে সে উল্টো বুঝে আরও তেড়ে যেতে পারে। গল্প গুজব পছন্দ না করলে তার সঙ্গে তেমন গল্পগুজবে লিপ্ত না হওয়াই সংগত হবে। সাদাসিদে মেজাযের হলে তার সঙ্গে পাঁচপোচের কথা না বলা চাই। স্ত্রীকেও এভাবে স্বামীর মেজায ও রুচি বুঝে চলার চেষ্টা করতে হবে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের মেজায ও রুচি বুঝে চললে কখনও কারও মনে বিরক্তি বা তীক্ততা দেখা দিবে না। অন্যথায় বিরক্তি ও তীক্ততাবোধ দেখা দিবে, যা মনের শান্তি নষ্ট করবে।

৯. একে অপরের মানসিক অবস্থা বুঝার চেষ্টা না করা

দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নষ্ট হওয়ার আর একটা কারণ হল একে অপরের মানসিক অবস্থা বুঝার চেষ্টা না করা। স্ত্রীর মন কিসে আনন্দ পায় তা যদি স্বামী বুঝার চেষ্টা না করে, স্বামীর মন কিসে আনন্দ পায় তা যদি স্ত্রী বুঝার চেষ্টা না করে, একে অপরের আনন্দ-খুশি যদি বুঝার চেষ্টা না করে, তাহলে এমন বেরসিকদের মধ্যে মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে কীভাবে? তাদের মধ্যে মানসিক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে না।

১০. খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক-বিতণ্ডার ক্ষেত্রে কোনপক্ষেরই ছাড় না দেয়া

দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক-বিতণ্ডা হয়েই থাকে। এটা খুভই স্বাভাবিক। এরূপ ক্ষেত্রে কেউই যদি ছাড় দিতে না চায়, কেউই যদি নতি স্বীকার করতে না চায়, তাহলে বিষয়টা অনেক দূর গড়াতে পারে। তাদের শান্তি নষ্ট হতে পারে, এমনকি তাদের সংসার ভাঙ্গাভাঙ্গি পর্যন্ত হতে পারে। মনে করুন এমনই স্বাভাবিক খুঁটিনাটি কিছু একটা নিয়ে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। এরপর স্বামী ভাবল ও নত না হলে আমি ওর সঙ্গে আর কথাই বলব না, কিংবা স্ত্রী ভাবল সামান্য এই একটু জিনিসের জন্য উনি আমাকে এত কড়া কথা বললেন, ঠিক আছে আমি এজন্য তার কাছে নতি স্বীকার করব না, অভিমানে গাল ফুলিয়ে থাকল। এভাবে দুজনই জিততে চাইল, কেউ হার মানতে রাজি হল না। দুজনেরই গোঁ ধরার কারণে তাদের মধ্যে দিনের পর দিন কথা বন্ধ থাকল, পারস্পরিক মাধুর্য বিনিময় বন্ধ থাকল, সংসারের শান্তি উবে গেল। এরূপ বিষয়ের পরিণতিতে স্বামী বা স্ত্রীকে বিপথগামী পর্যন্ত হয়ে যেতে দেখা যায়, কিংবা তুচ্ছ এমন বিষয়কে কেন্দ্র করে ঘর ছাড়াছাড়ি পর্যন্ত হয়ে যায়, যা দুজনের কারোরই কাম্য ছিল না। পরিণামে দুজনই অনুতপ্ত হয়। তাহলে দেখা গেল দুজনই হেরে গেল, জিততে

চেয়েও কেউই জিততে পারল না। এখানে শুরুতেই যে কোন একজন হার মেনে নিলে অবস্থা এতদূর গড়ায় না।

দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তির সারকথা

সারকথা দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যা যা করণীয় তা হল–

স্বামীর করণীয়

১. স্বচ্ছলতা অনুসারে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ দিবে। এতে বখীলী করবে না।
২. স্বচ্ছলতা থাকলে স্ত্রীর জন্য চাকর-নওকরের ব্যবস্থা করবে।
৩. স্ত্রীর সঙ্গে সদ্ব্যবহার করবে।
৪. স্ত্রীর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা রাখবে না।
৫. পারিবারিক শান্তি শৃংখলা রক্ষার স্বার্থে স্ত্রীকে সংশোধনমূলক শাসন বহাল রাখবে।
৬. স্ত্রীর মনোরঞ্জনের ব্যাপারে যত্নবান থাকবে।
৭. স্ত্রীর ভুল-ত্রুটি হলে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবে, যতক্ষণ সীমালংঘনের পর্যায়ে না যায়।
৮. স্ত্রীর কোন কিছু অপছন্দ লাগলে তার ভালগুণগুলো দেখে তার প্রতি মুগ্ধ হওয়ার চেষ্টা করবে।
৯. একাধিক স্ত্রী থাকলে ভরণ-পোষণ, রাতযাপন প্রভৃতি বিষয়ে সমতা রক্ষা করে চলবে।
১০. প্রয়োজনে সম্ভব হলে সাংসারিক কাজে স্ত্রীকে সহযোগিতা করবে।স্ত্রীর করণীয়
১. স্বামী অপছন্দ করে– এরূপ কোনো পুরুষকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত ঘরে আসতে দিবে না। তাদের সঙ্গে একাকী দেখা-সাক্ষাত ও মেলামেশা করবে না।
২. স্বামীর নিকট তাঁর সাধ্যের বাইরে কোনো খাদ্য-খাবার বা পোশাক-পরিচ্ছদের আবদার করবে না।
৩. স্বামী যৌনচাহিদা পূরণ করার জন্য আহবান করলে তাতে সাড়া দিতে অবহেলা করবে না।
৪. স্বামী অস্বচ্ছল, দরিদ্র বা কুৎসিত হলে তাঁকে তুচ্ছ জানবে না।
৫. কারও সম্মুখে স্বামীর সমালোচনা করবে না।
৬. স্বামীলর চরিত্রের ব্যাপারে অহেতুক সন্দেহ বা কুধারণা রাখবে না।
৭. স্বামীর মাতা-পিতা, ভাই-বোন, আপনজন ও আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকবে।

৮. স্বামীর উদ্দেশে সেজে-গুজে পরিপাটি হয়ে থাকবে, হাসি খুশি থাকবে। এটা স্বামীকে খুশি করার নিয়তে এবং ছওয়াবের নিয়তে করবে।

৯. স্বামীর শারীরিক খেদমতে ত্রুটি করবে না।

১০. স্বামীর আদব-এহ্তেরাম ও সম্মান রক্ষা করে চলবে। স্বামীর সঙ্গে প্রেম ভালবাসার সম্পর্কও থাকবে, আদব-এহ্তেরামের সম্পর্কও থাকবে।

স্বামী স্ত্রী উভয়ের যা করণীয়

১. পূর্বের অধ্যায়ে সুখ-শান্তিময় জীবন গড়ার পদ্ধতি সম্বন্ধে যা আলোচনা করা হয়েছে, তা মেনে চলবে।

২. একাধিক বিয়ের ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী সকলেই বুদ্ধিমত্তা ও সহনশীলতার পরিচয় দিতে হবে।

৩. সংসারের কোনোকিছু নিয়ে কেউ ঘ্যান-ঘ্যান ক্যাট-ক্যাট করবে না।

৪. একে অপরের স্বভাব বুঝার চেষ্টা করবে।

৫. একে অপরের মানসিক অবস্থা বুঝার চেষ্টা করবে।

৬. শুধু আইন নয় নৈতিক গুণের ভিত্তিতে চলবে।

আল্লাহ তাআলা সকলের দাম্পত্য জীবনে সুখ-শান্তি দান করুন। আমরা যেন সুখী দাম্পত্য জীবন গড়ে তুলতে পারি সে তাওফীক দান করুন। আমীন!

একাদশ অধ্যায়
যদি খাঁটি মু'মিন-মুসলমান রূপে জীবন গড়তে চান

একাদশ অধ্যায়

যদি খাঁটি মুমিন-মুসলমান রূপে জীবন গড়তে চান

প্রথমে মুমিন হওয়ার প্রশ্ন, তারপর খাঁটি মুমিন হওয়ার প্রশ্ন। তাই প্রথমে আমরা মুমিন হওয়ার জন্য কি কি জরুরি তা বর্ণনা করব, তারপর খাঁটি মুমিন হতে চাইলে কি কি করণীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

(উল্লেখ্য, শিরোনামে উল্লেখিত মুমিন ও মুসলমান শব্দদুটোকে সমার্থবোধক ধরে নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যদিও ক্ষেত্র বিশেষে মুমিন ও মুসলমান শব্দদ্বয়ের অর্থে পার্থক্যও ধরা হয়ে থাকে।)

মুমিন হওয়ার জন্য করণীয়

মুমিন হওয়ার জন্য যে কয়টি বিষয়ে ঈমান রাখতে হয় সেগুলোতে ঈমান-বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে এবং সেগুলোর ক্ষেত্রে কোন ভিন্ন ধ্যান-ধারণা থাকলে তা বর্জন করতে হবে। নিম্নে আমরা প্রথমে কয়টি বিষয়ে কি কি ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হয় সে সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করব, তারপর উদাহরণ স্বরূপ ঈমান-বিরোধী কিছু ধ্যান-ধারণার কথা উল্লেখ করব। যাতে ঈমান-বিরোধী উক্ত ধ্যান-ধারণাসহ অনুরূপ ঈমান-বিরোধী অন্য কোন ধ্যান-ধারণা থাকলে সবগুলো থেকে বেঁচে থাকা সম্ভব হয়।

যেসব বিষয়ে যা যা ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে

(এখানে সংক্ষেপে যে যে বিষয়ে যা যা বিশ্বাস রাখতে হয় তা উল্লেখ করা হল। এগুলো সম্বন্ধে বিস্তারিত জানতে হলে আমার রচিত "আহকামে যিন্দেগী" বা "ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ" কিতাব দেখে নেয়া যেতে পারে।)

*** "আল্লাহ"-এর উপর নিম্নোক্ত ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।**

১. আল্লাহ্র সত্তা ও তাঁর অস্তিত্বে বিশ্বাস করা।

২. আল্লাহ্র ছিফাত অর্থাৎ, তাঁর গুণাবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

৩. তাওহীদ বা আল্লাহ্র একত্ববাদে বিশ্বাস রাখতে হবে। তাঁর সত্তায় কেউ শরীক নেই, তাঁর গুণাবলীতেও কেউ শরীক নেই এবং ইবাদতে তাঁর সঙ্গে কাউকে শরীক করা যাবে না।

*** ফেরেশ্তা সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।**

ফেরেশতা সম্বন্ধে এই বিশ্বাস রাখতে হবে যে, আল্লাহ এক প্রকার নূরের মাখলূক সৃষ্টি করেছেন, যারা পুরুষও নয় নারীও নয়। যারা কাম, ক্রোধ, লোভ ইত্যাদি রিপু থেকে মুক্ত। যারা নিষ্পাপ। আল্লাহর আদেশের বিন্দুমাত্র ব্যতিক্রম তারা করে না। তারা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে পারে। আল্লাহ তাদেরকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত রেখেছেন।

*** নবী ও রসূল সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।**

১. নবীগণ নিষ্পাপ-তাঁদের দ্বারা কোনো পাপ সংঘটিত হয় না।
২. নবীগণ মানুষ, তাঁরা খোদা নন বা খোদার পুত্র নন বা খোদার রূপান্তর (অবতার) নন বরং তাঁরা খোদার প্রতিনিধি ও নায়েব।
৩. নবীগণ আল্লাহ্র বাণী হুবহু পৌঁছে দিয়েছেন।
৪. নবীদের ছিলছিলা হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর শেষ হয়েছে।
৫. আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বশ্রেষ্ঠ নবী এবং তিনি খাতামুন্নাবী অর্থাৎ, তাঁর পর আর কোন নবী আসবে না।
৬. নবীগণ কবরে জীবিত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও কবরে জীবিত আছেন।
৭. হযরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যত পয়গম্বর এসেছেন, তাঁদের সকলেই হক ও সত্য পয়গম্বর ছিলেন, সকলের প্রতিই ঈমান রাখতে হবে। তবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর আগমনের পর অন্য নবীর শরীয়ত রহিত হয়ে গিয়েছে, এখন শুধু হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর শরীয়ত ও তাঁর আনুগত্যই চলবে।
৮. নবীদের মু'জিযায় বিশ্বাস করাও ঈমানের অঙ্গীভূত। নবীদের দ্বারা তাঁদের সত্যতা প্রমাণিত করার জন্য অনেক সময় অনেক অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে। এসব অলৌকিক ঘটনাকে 'মু'জিযা' বলে।

*** আসমানী কিতাব সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।**

১. এ সমস্ত কিতাব আল্লাহ্‌র বাণী, মানব রচিত নয়।

২. আল্লাহ যেমন অবিনশ্বর ও চিরন্তন, তাঁর বাণীও তদ্রূপ অবিনশ্বর ও চিরন্তন। কুরআন নশ্বর বা সৃষ্ট নয়।

৩. আসমানী কিতাবসমূহের মধ্যে কুরআন শরীফ সর্বশ্রেষ্ঠ।

৪. কুরআন শরীফ সর্বশেষ কিতাব, এর পর আর কোনো কিতাব নাযিল হবে না। কেয়ামত পর্যন্ত কুরআন শরীফের বিধানই চলবে।

৫. কুরআন শরীফের হেফাজতের জন্য আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন, সেমতে কেউ একে কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটাতে পারবে না। কুরআনকে অবিকৃত বিশ্বাস করতে হবে।

এক বর্ণনামতে সর্বমোট ১০৪টি কিতাব প্রেরণ করা হয়। তন্মধ্যে চারটি হল বড় কিতাব। যথা:–

১. তাওরাত বা তৌরীতঃ যা হযরত মূসা (আ.)-এর উপর নাযেল হয়।

২. যবূরঃ যা হযরত দাঊদ (আ.)-এর উপর নাযেল হয়।

৩. ইঞ্জীলঃ যা হযরত ঈসা (আ.)-এর উপর নাযেল হয়।

৪. কুরআনঃ যা আমাদের নবী হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর উপর নাযিল হয়।

*** আখেরাত সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।**

আখেরাত বা পরকাল সম্বন্ধে বিশ্বাস করার অর্থ হল মৃত্যুর পর থেকে শুরু করে কবর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়, হাশর-নাশর ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় এবং জান্নাত জাহান্নাম ও তার সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয় –যেগুলো সম্পর্কে ঈমান আনার শিক্ষা দেয়া হয়েছে তার সবকিছুতেই বিশ্বাস করা। অতএব এ পর্যায়ে মোটামুটিভাবে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীতে বিশ্বাস রাখতে হবে।

১. কবরে মুনকার-নাকীরের সওয়াল জওয়াব সত্য।

২. কবরের আযাব সত্য।

৩. পুনরুত্থান ও হাশর ময়দানের অনুষ্ঠান সত্য।

৪. আল্লাহ্‌র বিচার ও হিসাব নিকাশ সত্য।

৫. নেকী ও বদীর ওজন সত্য।

৬. আমলনামার প্রাপ্তি সত্য।

৭. হাউযে কাউছার সত্য। এই উম্মতের মধ্যে যারা পূর্ণভাবে সুন্নাতের পায়রবী করবে, কেয়ামতের ময়দানে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে একটি

হাউজ থেকে পানি পান করাবেন, যার ফলে আর তাদেরকে পিপাসায় কষ্ট দিবে না। এই হাউজকে বলা হয় "হাউজে কাউছার"।
৮. পুলসিরাত সত্য। জাহান্নামের উপর একটা পুল স্থাপন করা হবে, যা চুলের চেয়ে সরু এবং তলোয়ারের চেয়ে ধারালো হবে। এটাকে বলা হয় পুলসিরাত। সকলকেই এই পুল পার হতে হবে।
৯. শাফাআত সত্য। পরকালে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, হাফেজ, মুজাহিদ প্রমুখ শ্রেণীল লোকদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সুপারিশ করার ক্ষমতা দেয়া হবে। রসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অনেক প্রকারের শাফাআত বা সুপারিশ করবেন।
১০. জান্নাত বা বেহেশ্‌ত সত্য।
১১. জাহান্নাম বা দোযখ সত্য।

*** তাকদীর সম্বন্ধে নিম্নোক্ত ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।**
১. সবকিছু সৃষ্টি করার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা সবকিছু লিখে রেখেছেন।
২. সবকিছু ঘটার পূর্বেই আল্লাহ তাআলা সব কিছু সম্বন্ধে অবহিত এবং তাঁর জানা ও ইচ্ছা অনুসারেই সবকিছু সংঘটিত হয়।
৩. তিনি ভাল ও মন্দ সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।
৪. আল্লাহ তাআলা কলম দ্বারা লওহে মাহ্‌ফূজে (সংরক্ষিত ফলকে) তাকদীরের সবকিছু লিখে রেখেছেন।
৫. মানুষ একদিকে নিজেকে অক্ষম ভেবে নিজেকে দায়িত্বহীন মনে করবে না এই বলে যে, আমার কিছুই করার নেই; তাকদীরে যা আছে তা-ই তো হবে। আবার তাকদীরকে এড়িয়ে মানুষ খোদার পরিকল্পনার বাইরেও কিছু করে ফেলতে সক্ষম- এমনও মনে করবে না।
৬. মানুষের প্রতি আল্লাহ্‌র যত হুকুম ও আদেশ-নিষেধ রয়েছে, তার কোনোটি মানুষের সাধ্যের বাইরে নয়। কোনো অসাধ্য বিষয়ে আল্লাহ কোনো হুকুম ও বিধান দেননি।
৭. আল্লাহ তাআলার উপর কোনো কিছু ওয়াজিব নয়, তিনি কাউকে কিছু দিতে বাধ্য নন, যা কিছু তিনি দান করেন সব তাঁর রহমত ও মেহেরবানী মাত্র।
* আরও যেসব বিষয়ে ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।
১. মে'রাজ সম্বন্ধে ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।
২. আরশ কুরছী সম্বন্ধে ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।
৩. আল্লাহর দীদার সম্বন্ধে ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।

৪. কেয়ামতের আলামত সম্বন্ধে ঈমান-বিশ্বাস রাখতে হবে।

৫. শেষ যুগে হযরত মাহ্দীর আবির্ভাব হবে- এ বিশ্বাস রাখতে হবে। হযরত মাহদী মুসলমানদের খলীফা হবেন এবং আধিপত্য বিস্তারকারী নাসারাদের বিরুদ্ধে জিহাদ পরিচালনা করবেন এবং তাদের দখল থেকে শাম, কনষ্ট্যান্টিনোপল (বর্তমান ইস্তাম্বুল) প্রভৃতি অঞ্চল জয় করবেন। তাঁর আমলে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে এবং তাঁর আমলেই হযরত ঈসা (আ.) অবতরণ করবেন। হযরত ঈসা (আ.)-এর আগমনের কিছুকাল পর তিনি ইন্তেকাল করবেন।

৬. শেষ যুগে দাজ্জালের আবির্ভাব হবে– এ বিশ্বাস রাখতে হবে। আল্লাহ তাআলা শেষ জমানায় লোকদের ঈমান পরীক্ষা করার জন্য একজন লোককে প্রচুর ক্ষমতা প্রদান করবেন। তার এক চোখ কানা আর এক চোখ টেরা থাকবে। চুল কোঁকড়া ও লাল বর্ণের হবে, সে খাটো দেহের অধিকারী হবে। তার কপালে লেখা থাকবে ك ف ر অর্থাৎ, কাফের। সকল মু'মিনই সে লেখা পড়তে পারবে। এ হচ্ছে দাজ্জাল।

৭. শেষ যুগে হযরত ঈসা (আ.)-এর পৃথিবীতে অবতরণ হওয়া সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখতে হবে।

৮. শেষ যুগে ইয়া'জূজ মা'জুজের আবির্ভাব হবে এ বিশ্বাস রাখতে হবে। দাজ্জালের ফেতনা ও তার মৃত্যুর পর আসবে ইয়া'জূজ ও মা'জূজের ফেৎনা। ইয়া'জূজ মা'জূজ অত্যন্ত অত্যাচারী সম্প্রদায়ের মানুষ। তাদের সংখ্যা অনেক বেশি হবে। তারা দ্রুত সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং ভীষণ উৎপাত শুরু করবে, হত্যা ও লুটতরাজ চালাতে থাকবে।

৯. কেয়ামতের পূর্বে আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া আসা সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখতে হবে। যে ধোঁয়ায় মু'মিন মুসলমানের সর্দির মত ভাব হবে এবং কাফেররা বেহুশ হয়ে যাবে। ৪০ দিন পর ধোঁয়া পরিষ্কার হয়ে যাবে।

১০. কেয়ামতের পূর্বে পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদিত হবে– এ বিশ্বাস রাখতে হবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের পর আর কারও ঈমান কবূল হবে না।

১১. দাব্বাতুল আর্দ সম্বন্ধে বিশ্বাস রাখতে হবে। পশ্চিম দিক থেকে সূর্য উদয়ের দিন বা তার পরের দিন মক্কা শরীফের সাফা পাহাড় ফেটে অদ্ভুত আকৃতির এক জন্তু বের হবে। একে বলা হয় "দাব্বাতুল আর্দ" (ভূমির জন্তু)। এ জন্তুটা মানুষের সঙ্গে কথা বলবে। সে অতিদ্রুত বেগে সারা পৃথিবী ঘুরে আসবে। সে মুমিনদের কপালে একটি নূরানী রেখা টেনে দিবে, ফলে তাদের চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যাবে এবং বেঈমানদের নাকের অথবা গর্দানের উপর সীল মেরে দিবে, ফলে তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে।

কিছু ঈমান বিরোধী ধ্যান-ধারণা

নিম্নে কিছু ঈমান-বিরোধী ধ্যান-ধারণা সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করা হল, এর মধ্যে কিছু রয়েছে, কিছু রয়েছে কুফরী এবং কিছু রয়েছে শিরক। ঈমান শুদ্ধ করার এসব ধ্যান-ধারণা বর্জন করা চাই। (আহকামে যিন্দেগী থেকে গৃহীত)

* জনগণকে সকল ক্ষমতার উৎস মানা, জনগণকে আইনের উৎস মানা ঈমান পরিপন্থী। কেননা ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসে আল্লাহ্‌কেই সর্বময় ক্ষমতার উৎস স্বীকার করা হয় এবং বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র আল্লাহ্‌র।

* প্রচলিত গণতন্ত্রে জনগণকেই সকল ক্ষমতার উৎস এবং জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরকে আইন বা বিধানের অথরিটি বলে স্বীকার করা হয়, তাই প্রচলিত গণতন্ত্রের ধারণা ঈমান আকীদার পরিপন্থী।

* সমাজতন্ত্রে নিখিল বিশ্বের কোন সৃষ্টিকর্তা বা খোদা আছে বলে স্বীকার করা হয় না, তাই নাস্তিকতা নির্ভর এই সমাজতন্ত্রের মতবাদে বিশ্বাস করা ঈমান আকীদা পরিপন্থী।

* গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ইত্যাদি তন্ত্রমন্ত্রকে মুক্তির পথ মনে করা এবং একথা বলা যে, ইসলাম সেকেলে মতবাদ, এর দ্বারা বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের এই যুগে উন্নতি অগ্রগতি সম্ভব নয়- এটা কুফ্‌রী।

* "ধর্ম নিরপেক্ষতা"-এর অর্থ যদি হয় কোন ধর্মে না থাকা, কোন ধর্মের পক্ষ অবলম্বন না করা, কোন ধর্মকে সমর্থন দিতে না পারা, তাহলে এটা কুফ্‌রী মতবাদ। কেননা ইসলাম ধর্মে থাকতেই হবে, ইসলামের পক্ষ অবলম্বন করতেই হবে, ইসলামী কার্যক্রমকে সমর্থন দিতেই হবে। আর যদি ধর্মনরিপেক্ষতার অর্থ হয় রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত না করা, তাহলে সে ধারণাও ইসলামী আকীদা-বিশ্বাসের পরিপন্থী। কেননা, ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে ক্ষমতা ও সামর্থ্য থাকলে ইসলামী খেলাফত প্রতিষ্ঠা করা ফরয। আর কোন ফরযকে আস্বীকার করা কুফ্‌রী। যদি ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ শুধু এতটুকু হয় যে, সকল ধর্মাবলম্বীরা নিজ নিজ ধর্ম-কর্ম পালন করতে পারবে, জোর জবরদস্তী কাউকে অন্য ধর্মে প্রবেশ করানো যাবে না, তাহলে এতটুকু ধারণা ইসলাম পরিপন্থী হবে না।

* ডারউইন-এর বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করা কুফ্‌রী অর্থাৎ, একথা বিশ্বাস করা যে, বিবর্তন অনুযায়ী ক্রমান্বয়ে পরিবর্তন হতে হতে এক পর্যায়ে বানর থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস ইসলাম ও ঈমান পরিপন্থী। ইসলামী আকীদা বিশ্বাসে আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে সর্ব প্রথম হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর থেকেই মনুষ্য জাতির বিস্তৃতি ঘটেছে।

* ইসলাম মসজিদের ভিতর সীমাবদ্ধ থাকবে, ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত জীবনে এটাকে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে, সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে এটাকে টেনে আনা যাবে না– এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। কেননা, এভাবে ইসলামের ব্যাপকতাকে অস্বীকার করা হয়। ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস অনুযায়ী কুরআন-হাদীছে তথা ইসলামে মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক, রাষ্টীয় যাবতীয় ক্ষেত্রের সকল বিষয়ে শাশ্বত সুন্দর দিক নির্দেশনা রয়েছে।

* নামায রোযা, হজ্জ, যাকাত, পর্দা করা ইত্যাদি ফরয সমূহকে ফরয তথা অত্যাবশ্যকীয় জরুরি মনে না করা এবং গান, বাদ্য, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি হারাম সমূহকে হারাম মনে না করা এবং এগুলোকে মৌলভীদের বাড়াবাড়ি বলে আখ্যায়িত করা কুফ্‌রী। কেননা কোন ফরযকে ফরয বলে অস্বীকার করা বা কোন হারামকে জায়েয মনে করা কুফ্‌রী।

* টুপি, দাড়ি, পাগড়ী, মসজিদ, মাদ্রাসা, আলেম মৌলভী ইত্যাদিকে তুচ্ছ জ্ঞান করা, এগুলোকে হেয় দৃষ্টিতে দেখা, এগুলো নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা মারাত্মক গোমরাহী। ইসলামের কোন বিষয় –তা যত সামান্যই হোক– তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

* আধুনিক কালের নব্য শিক্ষিতদের কেউ কেউ এবং কোন কোন বাতিল ভণ্ড মনে করেন যে, কেবল মাত্র ইসলমই নয় হিন্দু, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, বৌদ্ধ নির্বিশেষে যেকোনো ধর্মে থেকে মানবতা, মানব সেবা পরোপকার প্রভৃতি ভাল কাজ করলে পরকালে মুক্তি হবে। এরূপ বিশ্বাস করা কুফ্‌রী। একমাত্র ইসলাম ধর্ম অনুসরণের মধ্যেই পরকালীন মুক্তি নিহিত– একথায় বিশ্বাস রাখা ঈমানের জন্য জরুরি।

বিঃ দ্রঃ এ গন্থে যেসব বিষয়কে কুফ্‌রী বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, কারও মধ্যে তা পরিলক্ষিত হলেই তাকে কাফের বলে ফতওয়া দিয়ে দেয়া যাবে না। কেননা কুফ্‌রের মধ্যে বিভিন্ন স্তর রয়েছে। যদিও সব স্তরের কুফ্‌রী গোমরাহী এবং যার মধ্যে তা পাওয়া যাবে সে পথভ্রষ্ট, গোমরাহ এবং আহ্‌লে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত বহির্ভূত, তবে কুফ্‌রের কোন্ স্তর পাওয়া গেলে কাউকে কাফের বলে ফতওয়া দেয়া যায় তা বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্‌তীগণই নির্ণয় করতে পারেন। এ ব্যাপারে সাধারণ মানুষের পক্ষে বিজ্ঞ উলামা ও মুফ্‌তীগণের স্মরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত নিজেদের থেকে কোন ফতওয়া বা সিদ্ধান্ত প্রকাশ করা সমীচীন হবে না। কাউকে কাফের আখ্যায়িত করার জরুরি কয়েকটি মূলনীতি ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ গ্রন্থের ২য় খণ্ডের প্রথম অধ্যায়-এর শেষে বর্ণনা করা হয়েছে।

* কোন বুযুর্গ বা পীর মুরশিদ সম্বন্ধে এই আকীদা রাখা যে, তিনি সব সময় আমাদের অবস্থা জানেন। তিনি সর্বত্র হাযির নাযির। এটা শির্‌ক।

* কোন পীর বুযুর্গকে দূর দেশ থেকে ডাকা এবং মনে করা যে, তিনি জানতে পেরেছেন। এটা শির্‌ক।

* কোন পীর বুযুর্গের কবরের নিকট সন্তান বা অন্য কোন উদ্দেশ্য চাওয়া।এটা শির্‌ক। সন্তান দেয়ার মালিক আল্লাহ, পীর বুযুর্গ নয়।

* পীর বা কবরকে সাজদা করা। এটা শির্‌ক।

* কোন বুযুর্গের নাম অজীফার মত জপ করা। এটা শির্‌ক।

* কোন পীর বুযুর্গের নামে শিরনী, ছদকা বা মানত করা। এটা শির্‌ক।

* কোন পীর বুযুর্গের নামে জানোয়ার জবেহ করা। এটা শির্‌ক।

* কারও দোহাই দেয়া। এটা শির্‌ক।

* কারও নামের কছম খাওয়া বা কিরা করা। এটা শির্‌ক।

* আলীবখ্‌শ, হোছাইন বখ্‌শ ইত্যাদি নাম রাখা। এটা শির্‌ক।

* নক্ষত্রের তা'ছীর (প্রভাব) মানা বা তিথি পালন করা শিরক।

* জ্যোতির্বিদ, গণক, ঠাকুর বা যার ঘাড়ে জিন এসেছে তার নিকট হাত দেখিয়ে অদৃষ্ট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা। তাদের ভবিষ্যদ্বাণী ও গায়েবী খবরে বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলো শিরক।

* কোন জিনিস দেখে কু-লক্ষণ ধরা বা কু-যাত্রা মনে করা, যেমন অনেকে যাত্রা মুখে কেউ হাঁচি দিলে বা যাত্রা মুখে কোন মেয়ে মানুষ বা কাল কলসি দেখলে বা যাত্রা মুখে হোচট খেলে কু-যাত্রা মনে করে থাকে। এগুলো শিরক।

* কোন দিন বা মাসকে অশুভ মনে করা। এটা শির্‌ক।

* মহররমের তা'জিয়া বানানো। এটা শির্‌ক।

* এরকম বলা যে, খোদা রসূলের মর্জি থাকলে এই কাজ হবে বা খোদা রসূল যদি চায় তাহলে এই কাজ হবে। (বরং এভাবে বলা সহীহ যে, খোদা চাইলে হবে বা খোদার মর্জি থাকলে হবে।)

* এরকম বলা যে, উপরে খোদা নিচে আপনি (বা অমুক)। এটা শির্‌ক।

* কাউকে "পরম পূজনীয়" লেখা। এটা শির্‌ক।

* "কষ্ট না করলে কেষ্ট (শ্রীকৃষ্ণ) পাওয়া যায় না" বলা বা "জয়কালী নেগাহবান " ইত্যাদি বলা। এটা শির্‌ক।

* কোন পীর-বুযুর্গ, দেও, পরী, ভূত, ব্রাহ্মণকে লাভ লোকসানের মালিক মনে করা। এটা শির্‌ক।

* কোন পীর বুযুর্গের দরগাহ্ বা কবরের চতুর্দিক দিয়ে তওয়াফ করা। এটা শির্ক।

* কোন পীর বুযুর্গের দরগাহ বা বাড়ীকে কাবা শরীফের ন্যায় আদব-তা'যীম করা। এটা শির্ক।

এতক্ষণ মুমিন হওয়ার জন্য যা যা করণীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল। এবার খাঁটি ও কামেল মুমিন হওয়ার জন্য যা যা করণীয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হচ্ছে।

খাঁটি ও কামেল মুমিন হওয়ার জন্য করণীয়

খাঁটি মুমিন হওয়ার দুটো কাজ করতে হবে:- খাঁটি মু'মিনের গুণাগুণ অর্জন করতে হবে এবং অখাঁটি মুমিনদের চরিত্র বর্জন করতে হবে। নিম্নে এ দুটো বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হল।

এক. খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য খাঁটি মু'মিনের গুণাগুণ অর্জন করতে হবে। আর খাঁটি মুমিনের মধ্যে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকে, ঈমানের দাবি অনুযায়ী তাদের চরিত্র গড়ে ওঠে। ঈমানের দাবি অনুসারে আমল আর ঈমানের দাবি অনুযায়ী চরিত্র- এই দুটো হল খাঁটি মুমিনের প্রধান গুণ। অতএব খঁটি মুমিন হতে চাইলে ঈমানের দাবি অনুযায়ী আমল থাকতে হবে, ঈমানের দাবি অনুযায়ী চরিত্র গড়ে তুলতে হবে। যদি শুধু ঈমানের দাবি থাকে, ঈমান অনুযায়ী আমল না থাকে, ঈমানের দাবি অনুযায়ী চরিত্র গড়ে না ওঠে, তাহলে সেটা খাঁটি ও কামেল ঈমান নয়। এরূপ ঈমানের দাবিদার খাঁটি ও কামেল মুমিন নয়।

দুই. খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য অখাঁটি মুমিনদের চরিত্র বর্জন করতে হবে। ইসলামের পরিভাষায় অখাঁটি মুমিন বলতে বোঝায় মুনাফেকদের। অতএব খাঁটি মুমিন হতে চাইলে মুনাফেকদের চরিত্র বর্জন করতে হবে। কাফেরদের চরিত্র তো অতি অবশ্যই বর্জন করতে হবে। কাফের মুনাফেকদের চরিত্র সম্বন্ধে কুরআন-হাদীছে বিশদ বিবরণ রয়েছে, খাঁটি মুমিন হতে চাইলে সেগুলো থেকে বিরত থাকা জরুরি। নিম্নে খাঁটি মুমিনের চরিত্র ও মুনাফেকদের চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল। উদ্দেশ্য- খাঁটি মুমিনদের গুণাবলী অর্জন করতে হবে এবং মুনাফেকদের চরিত্র বর্জন করতে হবে।

খাঁটি মুমিনদের গুণাবলী

আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য অনেক গুণ অর্জন করা চাই। তার মধ্যে কুরআনে কারীমের সূরা ফুরকানে ৬৩ নং আয়াত থেকে ৭৪ নং আয়াত পর্যন্ত ১৩টি

আয়াতের মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁর খাঁটি বান্দাদের ১০টি বিশেষ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হওয়ার জন্য এ ছাড়াও আরও গুণাবলীর প্রয়োজন রয়েছে। তবে বিশেষভাবে উক্ত ১০টি গুণ অর্জন করা চাই। নিম্নে উক্ত ১০টি গুণের বর্ণনা পেশ করা হল।

১ নং গুণ হল– কথাবার্তা ও আচার–আচরণে নম্রতা থাকা। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.﴾

অর্থাৎ, দয়াময় আল্লাহর খাঁটি বান্দা হল তারা যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলে। তারা কখনও উগ্রতার পরিচয় দেয় না।

নম্রতা গুণ আল্লাহর কাছে বিশেষ পছন্দনীয় গুণ। এই গুণের অধিকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক খুব পছন্দ করেন। এর বিপরীত যাদের মধ্যে নম্রতার বিপরীত অহংকার ও ঔদ্ধত্য থাকে, আল্লাহ পাক তাদেরকে খুব বেশি অপছন্দ করেন। তাই আল্লাহর খাঁটি ও প্রিয় বান্দা হতে হলে নম্রতা গুণ অর্জন করা চাই।

২ নং গুণ হল– তাহাজ্জুদের নামায আদায় করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا.﴾

অর্থাৎ, যারা তাদের প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে দাঁড়ানো অবস্থায় এবং সাজদা অবস্থায় রাত কাটায়।

এ আয়াতে আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের যে বিশেষ গুণটির কথা বলা হয়েছে, তা হল– আল্লাহর খাঁটি বান্দারা তাহাজ্জুদের নামায তরক করেন না। তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার খাস সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে বান্দার নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সব নফল নামায দ্বারাই আল্লাহর সঙ্গে বান্দার নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তবে তার মধ্যে বিশেষভাবে তাহাজ্জুদের নামায দ্বারা খাস নৈকট্যের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এক হাদীছে এসেছে–

أَفْضَلُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْمَفْرُوْضَةِ صَلَاةٌ فِيْ جَوْفِ اللَّيْلِ. الحديث. (رواه أحمد و مسلم)

অর্থাৎ, ফরয নামাযের পর সমস্ত নফল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদার নামায হল তাহাজ্জুদের নামায।

আর এক হাদীছে এসেছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ دَأْبُ الصَّالِحِيْنَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلٰى رَبِّكُمْ، وَمُكَفِّرَةٌ لِلسَّيِّئَاتِ، وَمَنْهَاةٌ عَنِ الْإِثْمِ. (رواه الحاكم في المستدرك حديث رقم ١١٨٤ وقال: صحيح على شرط البخاري، ووافقه الذهبي في التلخيص)

অর্থাৎ, তোমরা তাহাজ্জুদের নামায পড়। কেননা তাহাজ্জুদের নামায হল তোমাদের পূর্ববর্তী নেককার লোকদের তরীকা এবং তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের নৈকট্য লাভের উপায় আর তোমাদের গোনাহ মোচনকারী ও পাপ থেকে বাধা দানকারী।

উল্লেখ্য, তাহাজ্জুদের নামায ফরয বা ওয়াজিব নয় বরং সুন্নাত। তা সত্ত্বেও খাঁটি মুমিনদের গুণ হিসাবে যখন তাহাজ্জুদের নামাযের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তখন খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য ফরয নামায যে অবশ্যই থাকতে হবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এক রেওয়ায়েতে স্পষ্টত উল্লেখও করা হয়েছে যে, (ফরয) নামায না পড়ে (খাঁটি) মুমিন হওয়া যাবে না। হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেছেন,

لاَ إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ صَلَاةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا وُضُوْءَ لَهُ. (الإبانة الكبرى برقم ٨٨٧ وكنز العمال برقم ٢١٦٤٧)

অর্থাৎ, যার নামায নেই তার ঈমান নেই। আর যার উযূ নেই তার নামায নেই। (আল-ইবানাতুল কুবরা ও কানযুল উম্মাল)

কুরআনে কারীমেও এসেছে, হাদীছেও এসেছে যে, কাফেরদের সঙ্গে জেহাদ চলতে থাকবে যতক্ষণ তারা কুফর শিরক বর্জন না করে এবং নাযায না পড়ে ও যাকাত না দেয়। এখানেও বোঝানো হয়েছে যে, (ফরয) নামায না পড়লে তাকে মুমিনই গণ্য করা হবে না।

৩ নং গুণ হল– জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য দুআ করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ.﴾

অর্থাৎ, যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে জাহান্নামের শাস্তিকে হটান।

এ আয়াত দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের মধ্যে জাহান্নামের ভয় বিদ্যমান থাকে, জাহান্নামের ভয়ে তাদের অন্তর কম্পমান থাকে, তাদের অন্তরে সর্বদা জাহান্নাম থেকে বাঁচার চিন্তা বিদ্যমান থাকে। তারা জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য যেমন গোনাহ থেকে বিরত থাকেন, প্রয়োজনীয় আমল করতে থাকেন, তেমনি জাহান্নাম থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি এবং রোনাযারীও করতে থাকেন।

৪ নং গুণ হল– আল্লাহর দেওয়া সম্পদ ব্যয় করার ক্ষেত্রে মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ.﴾

অর্থাৎ, ঐ সব লোক যারা সম্পদ ব্যয় করার সময় বেশিও করে না কমও করে না। (বরং মধ্যপন্থা অবলম্বন করে।)

যেসব ক্ষেত্রে শরীয়ত সম্পদ ব্যয় করতে অনুমতি দিয়েছে সেখানে ব্যয় করতে কমও করা যাবে না বেশিও করা যাবে না। প্রয়োজনের তুলনায় কম ব্যয় করলে সেটা হবে বখীলী। বখীলী করা গোনাহ। আবার প্রয়োজনের তুলনায় বেশি ব্যয় করলে সেটা হবে অমিতব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয়। আর অমিতব্যয় বা অতিরিক্ত ব্যয় করাও গোনাহ। অতএব ব্যয়ের ক্ষেত্রে গোনাহ থেকে বাঁচতে হলে প্রয়োজনের তুলনায় কমও করা যাবে না, বেশিও করা যাবে না। বরং মধ্যম পন্থা গ্রহণ করতে হবে। এটাই শরীয়তের নিয়ম, এটাই আল্লাহর খাঁটি বান্দাদের তরীকা।

৫ নং গুণ হল– আল্লাহর সঙ্গে শরীক না করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ.﴾

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কাউকে উপাস্য সাব্যস্ত করে না। অর্থাৎ, তারা শির্‌ক করে না, আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরীক করে না।

৬ নং গুণ হল– অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা না করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ لَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ.﴾

অর্থাৎ, যারা অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না।

এ আয়াতে মানুষের হক নষ্ট না করার দিকে ইংগিত রয়েছে। মানুষের সবচেয়ে বড় হক হল তার জীবনের হক। তাই কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা মানুষের সবচেয়ে বড় হক নষ্ট করা। এ জন্য অন্যায়ভাবে মানুষকে হত্যা করা মারাত্মক ধরনের কবীরা গোনাহ। যারা আল্লাহর খাস বান্দা তারা মানুষের এই বড় হক নষ্ট করে না, মানুষের অন্য কোন হকও নষ্ট করে না।

৭ নং গুণ হল– যেনা না করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ لَا يَزْنُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, যারা যেনা করে না।

যেনা করা মারাত্মক ধরনের পাপ। এই মারাত্মক পাপে জড়িত থেকে কেউ আল্লাহ খাস বান্দা হতে পারবে না। কোন নারীর সঙ্গে অবৈধ মেলামেশা করা হল আসল যেনা। এ ছাড়া কোন গায়র মাহরাম মহিলাকে দেখা হল চোখের যেনা, কোন গায়র মাহরাম মহিলাকে হাত দিয়ে স্পর্শ করা হল হাতের যেনা, পা দিয়ে যেনার উদ্দেশ্যে অগ্রসর হওয়া পায়ের যেনা। এমনকি কোন মহিলাকে নিয়ে কু-কল্পনা হল মনের যেনা। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে হলে এই সব ধরনের যেনা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৮ নং গুণ হল– মিথ্যা স্বাক্ষ্য না দেওয়া। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ وَ اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا.﴾

আয়াতের এই অংশটুকুর একটা তর্জমা হল তারা অনর্থক ও অসার কার্যকলাপে যোগ দেয় না। যদি কখনও ঘটনাচক্রে এরূপ অসার কার্যকলাপের কোন মজলিস সামনে পড়ে যায় তাহলে স্ব-সম্মানে সেখান থেকে সরে পড়ে।

এ আয়াতে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলা হয়েছে। তাহল অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপে জড়িত না হওয়া। আমাদের জীবনের অনেক সময় অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপের মধ্যে নষ্ট হয়ে যায়। যার মধ্যে দ্বীন বা দুনিয়ার কোন ফায়দা নেই, যেটা শরীয়ত সমর্থন করে না এরূপ কথা ও কাজ হল অনর্থক। আল্লাহর খাস বান্দা হতে হলে জীবনের সময়কে এরূপ অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপের মধ্যে নষ্ট করার অবকাশ নেই। জীবনকে সুন্দর বানাতে হলে জীবনের যতটুকু সময় পাওয়া যায় তাকে অর্থবহ কাজে লাগাতে হবে, অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপ থেকে

বিরত থাকতে হবে। এক হাদীছে নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ. (سنن الترمذي ٢٣١٧)

অর্থাৎ, ইসলামী জীবনের সৌন্দর্য হল অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপ বর্জন করা। (তিরমিযী)

এখানে বোঝানো হয়েছে মুসলমান হিসাবে তুমি তোমার জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলতে চাও, তাহলে অনর্থক কথা ও অনর্থক কার্যকলাপ থেকে বিরত থাক।

৯ নং গুণ হল– আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা মেনে নেয়। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ **وَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّ عُمْيَانًا.** ﴾

অর্থাৎ, "যাদেরকে প্রতিপালকের আয়াত স্মরণ করিয়ে দিলে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে না" বরং মেনে নেয়।

অন্ধের মত আচরণ করার অর্থ হল দেখেও না দেখার মত থাকা অর্থাৎ, আমলে না আনা। আর বধিরের মত আচরণ করার অর্থ হল শুনেও না শোনার মত থাকা অর্থাৎ, আমলে না আনা। যারা কুরআন-হাদীছের কথা শুনে অন্ধ ও বধিরের মত আচরণ করে অর্থাৎ, যারা কুরআন-হাদীছের কথা শুনে আমলে আনে না, তারা কোনদিন আল্লাহর খাস বান্দা হতে পারবে না। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাইলে কুরআন-হাদীছের কথা শুনে কালবিলম্ব না করে যথাসম্ভব আমলে আনতে হবে। কুরআন-হাদীছের কোন বিষয়ের প্রতি অমনোযোগিতা প্রদর্শন করা যাবে না।

১০ নং গুণ হল– পরিবার এবং সন্তানাদিকে ভাল বানানোর ফিকির করা। আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿ **وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَ ذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا.** ﴾

অর্থাৎ, যারা প্রার্থনা করে যে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও এমন সন্তান-সন্ততি দান কর যারা আমাদের জন্য শান্তির হবে। আর আমাদেরকে মুত্তাকীদের আদর্শ বানাও।

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে, আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে হলে শুধু নিজেকে ভাল বানানোর ফিকির করলে চলবে না, বরং নিজের পরিবার এবং সন্তানাদিকেও ভাল বানানোর ফিকির করতে হবে, তাদের ভাল হওয়ার জন্য আল্লাহর কাছে দুআও করতে হবে।

এই হল সূরা ফুরকানে বর্ণিত আল্লাহ তাআলার খাঁটি বান্দাদের ১০টি গুণ। এছাড়াও কুরআন সুন্নায় খাঁটি মুমিনদের আরও অনেক গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন–

১১ নং গুণ হল– চরিত্র ভাল করা। আল্লাহর খাঁটি বান্দা হতে চাইলে চরিত্র ভাল করতে হবে। বোখারী শরীফের এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ مِنْ أَخْيَرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ خُلُقًا. (رواه البخاري ٦٠٢٩)

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সর্বাপেক্ষা উত্তম, যার চরিত্র উত্তম।

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِأَكْمَلِكُمْ إِيْمَانًا أَحَاسِنُكُمْ أَخْلاَقًا. الحديث. (رواه البيهقي في شعب الإيمان ٨١١٨)

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে জানাব তোমাদের মধ্যে কামেল (পূর্ণ ও খাঁটি) মুমিন কে? তারা হল তোমাদের মধ্যে যাদের আখলাক-চরিত্র ভাল। (শুআবুল ঈমান)

আখলাক-চরিত্রের অনেক বিষয় রয়েছে। সবর, সহনশীলতা, তাওয়াজু, আমানতদারী, সদ্ব্যবহার, আত্মীয়তা রক্ষা করা, অতিথি পরায়ণতা, ভ্রাতৃত্ব, স্নেহ-মমতা, ত্যাগ ও বদান্যতা, উদারতা, হায়া বা লজ্জাশীলতা, বড়কে ভক্তি ও শ্রদ্ধা করা, ছোটদের স্নেহ করা, ক্ষমা ও দয়া প্রদর্শন ইত্যাদি– এসব কিছুই আখলাক-চরিত্রের বিষয়। খঁটি মুমিন হতে চাইলে এ বিষয়গুলো অর্জন করতে হবে। এবং সেই সঙ্গে যেসব বদ চরিত্র রয়েছে তা বর্জন করতে হবে। বদ-চরিত্রের মধ্যে রয়েছে গীবত, চোগলখোরী, তোষামোদ বা চাটুকারিতা, গালি-গালাজ করা, অশ্লীল কথা বলা, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা, রুক্ষ কথা বলা, মিথ্যা বলা, বেশি কথা বলা ইত্যাদি। খাঁটি মুমিন হতে চাইলে এসব বদ-চরিত্র বর্জন করতে হবে। চরিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এসব বিষয়ে

"আহকামে যিন্দেগী" কিতাবে বিস্তারিত বিবরণ ও ব্যাখ্যা রয়েছে, কেউ এসব বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চাইলে কিতাবখানি পাঠ করতে পারেন।

আখলাক-চরিত্রের বিষয়াদি ঈমানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কেউ আখলাক-চরিত্র ঠিক না করে খাঁটি মুমিন হতে পারবে না। যেমন উদাহরণ স্বরূপ আখলাক-চরিত্রের একটি বিষয় হল সবর। সবর গুণ অর্জন না করে কেউ খাঁটি ও কামেল মুমিন হতে পারবে না। হযরত আলী (রা.) বলেছেন,

اَلصَّبْرُ مِنَ الْإِيْمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ، مَنْ لاَ صَبْرَ لَهُ لَا إِيْمَانَ لَهُ. (كنز العمال برقم ٨٦٣٢)

অর্থাৎ, ঈমানের জন্য সবর তেমন, দেহের জন্য মাথা যেমন। যার সবর নেই তার ঈমান নেই। (কানযুল উম্মাল)

১২ নং গুণ হল– দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ। আত্মমর্যাবোধের বিপরীত হল হীনম্মন্যতাবোধ। যদি কেউ এরূপ ধারণা রাখে যে, ইসলামী আদর্শের উপর থাকলে সম্মান পাওয়া যাবে না, এটাই হল ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা। এরূপ হীনম্মন্যতা বোধ থেকেই মুমিন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজের আদর্শের উপর অটল না থেকে এক এক পরিবেশে গিয়ে এক এক রূপ ধারণ করা হয়ে থাকে। এই হীনম্মন্যতা পরিহার করে এরূপ মানসিকতা রাখতে হবে যে, দ্বীন পালন করার মধ্যেই আমার মর্যাদা, দ্বীনী রীতিনীতির মধ্যেই প্রকৃত সম্মান। এরূপ মানসিকতা হল দ্বীনী আত্মমর্যাবোধ। এই দ্বীনী আত্মমর্যাদাবোধ খাঁটি মুমিনদের এক বিশেষ মানসিকতা। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ رضـ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْغَيْرَةُ مِنْ الْإِيْمَانِ، وَإِنَّ الْمِذَاءَ مِنَ النِّفَاقِ، وَالْمِذَاءُ اَلدَّيُّوْثُ. (رواه البيهقي في السنن الكبرى حديث رقم ٢١٥٥٣)

অর্থাৎ, হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আত্মমর্যাদাবোধ ঈমানের অংশ আর নিজের স্ত্রীকে অন্য পুরুষের বিছানায় যেতে দেয়া এবং তাতে সন্তুষ্ট থাকা হল মুনাফেকী। (শুআবুল ঈমান)

১৩ নং গুণ হল– রসূলের মহব্বত অন্তরে অন্য সকলের চেয়ে বেশি রাখা। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَتّٰى أَكُوْنَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهٖ وَوَالِدِهٖ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ. (رواه البخاري ١٥ ومسلم ٤٤)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত- তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ কামেল মুমিন হবে না, যতক্ষণ আমি তার কাছে তার সন্তানাদি, পিতা-মাতা ও সমস্ত মানুষ থেকে বেশি প্রিয় না হব। (বোখারী ও মুসলিম)

১৪ নং গুণ হল– মুসলমানদের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালবাসা। হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا، وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا، أَوَلاَ أَدُلُّكُمْ عَلٰى شَيْئٍ إِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ أَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ. (رواه مسلم ٥٤، ورواه الترمذي ٢٦٨٨ وقال: حديث حسن صحيح. واللفظ لمسلم)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা মুমিন না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। আর তোমরা খাঁটি মুমিন হবে না, যতক্ষণ না তোমরা একে অপরকে ভালবাস। আমি কি বলে দিব কী করলে তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালবাসা সৃষ্টি হবে? তোমরা নিজেদের মধ্যে সালামের ব্যাপক রেওয়াজ ঘটাও। (মুসলিম ও তিরমিযী)

অন্য এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ. وفي رواية لمسلم: حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ أَوْ قَالَ لِجَارِهٖ وفي رواية النسائي: مِنَ الْخَيْرِ. (رواه البخاري ١٣ ومسلم ٤٥ والنسائي ٥٠١٧)

অর্থাৎ, হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) নবী রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ কামেল মুমিন হবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য ভাল না বাসবে যা (কিছু মঙ্গলের বিষয়) সে তার নিজের জন্য ভালবাসে। মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে এসেছে যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য কিংবা প্রতিবেশীর জন্য ভাল না বাসবে যা সে তার নিজের জন্য ভালবাসে। (বোখারী, মুসলিম ও নাসায়ী)

অন্য এক রেওয়ায়েতে কামেল মুমিন হওয়ার জন্য শুধু মুসলমান নয় সমস্ত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও ভালবাসা রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهٖ. (مسند أحمد ١٣٨٠٩)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ কামেল মুমিন হবে না, যতক্ষণ সে সমস্ত মানুষের জন্য ভাল না বাসবে যা সে তার নিজের জন্য ভালবাসে। (মুসনাদে আহমদ)

১৫ নং গুণ হল– মনের চাহিদাকে রসূলের আনীত আদর্শের অনুগত করে দেয়া। এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبْعًا لِمَا جِئْتُ بِهٖ. (رواه النووي في آخر الأربعين وقال: حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমাদের কেউ

কামেল মুমিন হবে না, যতক্ষণ তাদের মনের চাহিদা আমার আনীত আদর্শের অনুগত না হবে। (আল-আরবাঈন)

১৬-১৭ নং গুণদ্বয় হল- অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়া এবং দ্বীনের কথায় ঈমান বৃদ্ধি পাওয়া। খাঁটি মু'মিনের চরিত্র হল- যখন কুরআন-হাদীছের কথা তার সামনে বলা হবে, যখন আল্লাহ আল্লাহ্‌র রসূলের কথা তার সামনে আসবে, তখন তার ভিতরে ভয় সৃষ্টি হবে, তার ঈমানে প্রবৃদ্ধি ঘটবে। এ মর্মে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا.﴾

অর্থাৎ, খাঁটি মু'মিন তারা, যাদের কাছে আল্লাহর কথা বলা হলে তাদের মনে আল্লহর ভয় বাড়তে থাকে, তাদের ঈমান বাড়তে থাকে। (আনফাল: ২)

আরেক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর কথায় তাদের দেহে কম্পন এসে যায়, তাদের অন্তর জুড়ে একটা প্রশান্তি এসে যায়। (সূরা যুমার: ২৩) বুঝা গেল- কুরআন হাদীছের কথা শুনে অর্থাৎ, আল্লাহ্ আল্লাহ্‌র রসূলের কথা শুনে জিদ নয় বরং ভয় আসা উচিৎ। নিজের ভুল ধরা পড়লে রাগ নয় বরং আনন্দ বোধ করা উচিৎ। এটাই হল খাঁটি মু'মিনের চরিত্র।

আরেক এক আয়াতে এসেছে-

﴿وَهُمْ يَسْتَبْشِرُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, তারা আনন্দিত হয়। (সূরা তাওবা: ১২৪) কারণ তারা বুঝতে পারে যে, আমরা ভুলের ভিতরে ছিলাম, আমাদের সেই ভুল সংশোধন করার পথ আমাদের সামনে এসে গেল। আমরা যেটা জানতাম না সেটা এখন জানতে পারলাম- এই কথা চিন্তা করে তারা আনন্দ বোধ করতে থাকে যে, এখন আমাদের নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারব, আমাদের নাজাতের পথ হয়ে যাবে।

১৮ নং গুণ হল– দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দেয়া। আল্লাহ পাক বয়ান করেছেন,

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّشْرِىْ نَفْسَهُ ابْتِغَآءَ مَرْضَاتِ اللّٰهِ وَاللّٰهُ رَؤُوْفٌ بِالْعِبَادِ.﴾

অর্থাৎ, কতক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজের (সবকিছু) বিক্রি করে দেয়। আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অতি দয়াদ্র। (সূরা বাকারাঃ ২০৭)

হযরত সোহায়েব রূমী (রা.) সম্পর্কে এই আয়াতটি নাযিল হয়েছিল। তিনি মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় রওনা দিয়েছিলেন। তার হিজরতের কথা শুনে কাফেররা তাঁর পিছু ধাওয়া করেছিল। যখন তারা কাছে চলে এল, তখন হযরত সোহায়েব (রা.) সওয়ারী থেকে নেমে বললেন, তোমরা জান আমার তীর লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না। আমার তীরের খাপে অনেক তীর আছে, এর একটা থাকতেও তোমরা কেউ আমার কাছে ভিড়তে পারবে না। তীর যখন শেষ হয়ে যাবে তলোয়ার চালাব, আমার প্রাণ থাকতে কেউ কাছে ভিড়তে পারবেনা। কাজেই চলে যাও। আর যদি তোমরা দুনিয়ার স্বার্থ চাও, তাহলে আমি মক্কায় রক্ষিত আমার ধন-সম্পদের সন্ধান তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি। তা তোমরা নিয়ে নাও এবং আমার রাস্তা ছেড়ে দাও। তারা বলল, আমরা তাতে রাজি আছি, তোমার কোথায় কি ধন-সম্পদ আছে আমাদেরকে বলে দাও। তখন তিনি তাদেরকে সব বলে দিলেন। তারা তার পথ ছেড়ে দিল। নিরাপদে তিনি মদীনায় পৌঁছে গেলেন। মদীনায় যেয়ে রসূল (সা.) কে ঘটনা শোনালেন। রসূল (সা.) ঘটনা শুনে বললেন, তোমার ব্যবসা লাভজনক হয়েছে। অর্থাৎ, কত সুন্দর ব্যবসা করেছ তুমি। দুনিয়ার বিনিময়ে দ্বীন কিনে নিয়েছ। তিনি দ্বীনের জন্য, দ্বীনের খাতিরে, আল্লাহর ও আল্লাহর রসূলের খাতিরে দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে দিয়েছিলেন। এই তো খাঁটি মু'মিনের গুণ, এই তো খাঁটি মু'মিনের বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ পাক তাই এই আয়াত নাযেল করলেন। যার ভাবার্থ হল- কতক মানুষ এমন আছে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার সবকিছুকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। আল্লাহ পাক এ ধরনের লোকদের ব্যাপারে অত্যন্ত মেহেরবান।

বুঝা গেল- খাঁটি মু'মিন হল সে, যে তার আখেরাতের জন্য, যে তার দ্বীনের জন্য দুনিয়াকে বিসর্জন দিতে রাজি। এর বিপরীত দুনিয়ার স্বার্থে দ্বীন ধর্মকে বিসর্জন দেয়া হল কাফের মুনাফেকদের চরিত্র। এটা খাঁটি মু'মিনদের চরিত্র নয়।

১৯ নং গুণ হল– কোনরূপ দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়া কুরআন সুন্নাহর কথা মেনে নেয়া। একবার মদীনায় বিশ্‌র নামক এক মুনাফেক এবং এক ইয়াহুদীর মধ্যে একটা বিষয়ে ঝগড়া সৃষ্টি হল। এক পর্যায়ে তারা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর

কাছে বিচার নিয়ে আসল। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়াহুদীর পক্ষে ফয়সালা দিয়ে দিলেন। মুনাফেক ভেবেছিল তার পক্ষে রায় হবে, কিন্তু রায় তার বিপক্ষে চলে গেল। সে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর রায়কে মনে প্রাণে মেনে নিতে পারল না। সে ইয়াহুদীকে বলল, চল আমরা ওমরের কাছে যাই। ইয়াহুদী দেখল ঝগড়ার কোন নিষ্পত্তি হল না, অগত্যা কী করা যায় ঠিক আছে চল। তারা হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে গেল। ইয়াহুদী হযরত ওমর (রা.)-এর কাছে বলল, আমরা মুহাম্মাদের কাছে গিয়েছিলাম, তিনি আমার পক্ষে রায় দিয়েছেন, কিন্তু ইনি সে রায় মানছেন না, আপনার কাছে আমাকে নিয়ে এসেছেন। হযরত ওমর (রা.) ঘটনা শুনে বিশ্‌রকে জিজ্ঞাসা করলেন ঘটনা এরকম কি না? সে স্বীকার করল হাঁ। হযরত ওমর (রা.) বললেন, আচ্ছা তোমরা এখানে থাক আমি আসছি। তিনি ঘরে গেলেন। তলোয়ার নিয়ে আসলেন। তারপর বললেন, আল্লাহ্‌র রসূলের বিচারে যে সন্তুষ্ট হয় না, আমি তার বিচার এভাবেই করি। এই বলে মুনাফেকের গর্দান উড়িয়ে দিলেন। আর এক ঘটনায় এক ব্যক্তি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর রায়ে সন্তুষ্ট হতে পারল না। এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়–

﴿فَلَا وَ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا.﴾

অর্থাৎ, না, এভাবে তারা মু'মিন হতে পারবে না। তোমার রবের কসম! তারা খাঁটি মু'মিন হতে পারবে না, যতক্ষণ তারা তাদের যাবতীয় বিরোধের বিষয়ে ফয়সালার জন্য তোমার কাছে না আসবে; তারপর তুমি যে রায় দিবে দ্বিধাহীন চিত্তে সে রায় পুরোপুরি মেনে না নিবে। (সূরা নিসা: ৬৫)

বুঝা গেল খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য কুরআন-হাদীছের কথাকে পুরোপুরি মেনে নিতে হবে, মনে কোন রকম দ্বিধা সংকোচ থাকতে পারবে না। বিনা সংশয়ে, বিনা দ্বিধায় মেনে নিতে হবে, সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে। কুরআনের এই আয়াতের বক্তব্য অনুযায়ী এরকম না হলে খাঁটি মু'মিন হওয়া যাবে না।

২০ নং গুণ হল– কাউকে কোনভাবে কষ্ট না দেওয়া। খাঁটি মুমিন হল সেই যারা দ্বারা কোন মুসলমান কোনভাবে কষ্ট না পায়। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

اَلْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِهٖ وَيَدِهٖ. (صحيح البخاري ٩ ومسلم ٤١)

অর্থাৎ, খাঁটি মুমিন-মুসলমান হল সেই যারা হাত ও জবান থেকে সব মুসলমান নিরাপদ থাকে। (বোখারী ও মুসলিম)

অন্য এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

اَلْمُؤْمِنُ مَنْ اَمِنَهُ النَّاسُ عَلٰى دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ. (رواه الترمذي ٢٦٢٧ وقال: حديث حسن صحيح)

অর্থাৎ, খাঁটি মুমিন হল সেই যার ওপর মানুষ তাদের জান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা বোধ করে। (তিরমিযী)

২১ নং গুণ হল– আমানতদারী থাকা। খাঁটি মুমিন হল সেই যে কোনোভাবে কারও খেয়ানত করে না। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لاَ أَمَانَةَ لَهُ، وَلاَ دِيْنَ لِمَنْ لاَ عَهْدَ لَهُ. (رواه أحمد ١٢٥٠٥ والبزار ٧١٩٦)

অর্থাৎ, যার মধ্যে আমানতদারী নেই তার খাঁটি ঈমান নেই। আর যার মধ্যে অঙ্গীকার পূরণ করা নেই তার মধ্যে খাঁটি দ্বীন নেই। (মুসনাদে আহমদ ও মুসনাদে বায্যার)

মুনাফেকদের চরিত্র

(১) মুনাফেকদের একটা চরিত্র হল বহুরূপিতা। এক আয়াতে বর্ণিত হয়েছে–

﴿وَ اِذَا لَقُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْٓا اٰمَنَّا وَ اِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيٰطِيْنِهِمْ قَالُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, তারা যখন মুমিনদের কাছে যায় তখন বলে আমরাও তোমাদের মত মুমিন, আবার যখন তাদের শয়তানদের কাছে অর্থাৎ, তাদের কাফের নেতাদের কাছে যায় তখন বলে, আমরা তো আপনাদের সঙ্গে আছি। আমরা তো (মুসলমানদের সঙ্গে) উপহাস করি মাত্র। (সূরা বাকারা: ১৪)

এখানে দেখানো হয়েছে মোনাফেকরা হয় বহুরূপী। মুনাফেকরা যখন যেখানে যেমন, তখন সেখানে তেমন রূপ ধরে। তাই মুমিনদের কাছে আসলে বলে যে, আমরা মুমিন এবং এমন হাবভাব দেখায়, এমন গতিবিধি দেখায় যেন তারা মুমিন। আবার যখন কাফেরদের কাছে যায়, কাফেরদের সঙ্গে ওঠা-বসা করে, তখন

তাদের মত হয়ে যায়, তাদের রূপ ধারণ করে। এরা খাঁটি মু'মিন নয়, এরা হল মোনাফেক। খাঁটি মুমিন বহুরূপী হতে পারবে না। সে হবে এক রূপী। খাঁটি মুমিন সব স্থানে, সব পরিবেশে, সব মহলে এক আদর্শের ওপর থাকবে। চোরের মজলিসে গেলে চোর সাজবে, আবার সাধুর মজলিসে গিয়ে সাধুর রূপ ধারণ করবে– এরকম বহুরূপিতা খাঁটি মুমিনের চরিত্র নয়। খাঁটি মু'মিন সব জায়গায় তার নিজের আদর্শের ওপর অটল থাকবে, সে সব পরিবেশে তার ঈমান আমলের পরিচয়ে থাকবে। আল্লাহ পাক হুকুম দিয়েছেনও এমন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿صِبْغَةَ اللّٰهِ وَ مَنْ اَحْسَنُ مِنَ اللّٰهِ صِبْغَةً.﴾

অর্থাৎ, তোমরা দ্বীনের রং গ্রহণ কর। আল্লাহর চেয়ে ভাল রং লাগানোর কে আছে? (সূরা বাকারা: ১৩৮)

এখানে রং লাগানো কথাটা এজন্য বলা হয়েছে যে, শরীরে রং লাগালে যেমন দেখা যায়, মুমিনের উপরও যেন দ্বীনের রং তেমনি ফুটে ওঠে। সে যে ধর্ম গ্রহণ করেছ, তার উপরে সেই ধর্মের, সেই আদর্শের রং যেন পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে। মুমিনকে এমন হতে হবে যেন দেখলেই বুঝা যায় সে ইসলাম ধর্মের অনুসারী। মুমিনের কথা-বার্তা, ওঠা-বসা, পোশাক-পরিচ্ছদ, আচার-ব্যবহার, অবয়ব অর্থাৎ, চুল, দাড়ি, ইত্যাদি সবকিছু থেকে যেন তার দ্বীনের ছাপ ফুটে ওঠে।

সব পরিবেশে, সব মহলে সব স্থানে নিজের আদর্শের ওপর অটল থাকতে হবে। স্থান-কাল-পাত্রের দোহাই দিয়ে ইসলামী আদর্শ বর্জন করার অবকাশ নেই। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে চলার কথা ইসলামে আছে, তবে সেটা ইসলামকে বর্জন করে নয়। স্থান-কাল-পাত্র বুঝে চলতে হবে, তবে ইসলামের সীমারেখার ভিতরে থেকে। ইসলামের সামান্যতম কোন আদর্শ বর্জন করে সমাজের সঙ্গে, কালের সঙ্গে, পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলালোর নীতি ইসলামে নেই।

(২) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা। যদি কেউ এরূপ ধারণা রাখে যে, ইসলামী আদর্শের উপর থাকলে সম্মান পাওয়া যাবে না, এটাই হল ইসলামী আদর্শের ব্যাপারে হীনম্মন্যতা। এরূপ হীনম্মন্যতা বোধ থেকেই মুমিন মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নিজের আদর্শের উপর অটল না থেকে এক এক পরিবেশে গিয়ে এক এক রূপ ধারণ করা হতে থাকে। কারণ তারা মনে করে ইসলামী আদর্শের ওপর থাকলে সম্মান পাওয়া যাবে না। তারা ইসলামের আদর্শে থাকাতে সম্মান বোধ করেনা। এটাও একটা মুনাফেকী মানসিকতা। মুনাফেকদের সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে, তারা মু'মিনদের আদর্শকে

সম্মানের মনে করত না। বরং কুফ্‌রী আদর্শে তারা মুগ্ধ ছিল। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿يَقُوْلُوْنَ لَئِنْ رَّجَعْنَآ اِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ.﴾

অর্থাৎ, তারা নিজেরা বলাবলি করত যে, অবশ্যই সম্মানী লোকেরা অসম্মানী লোকদেরকে মদীনা থেকে বের করে দিবে। (সূরা মুনাফিকূনঃ ৮)

অর্থাৎ, মদীনার মুনাফেকরা মনে করত, মু'মিনরা যে আদর্শে আছে, সেটা সম্মানের আদর্শ নয়। এদেরকে মদীনায় থাকতে দিলে আমাদের অসম্মান ঘটবে, তাই এই লোকদেরকে মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিতে হবে, আমাদের সমাজ থেকে ওদেরকে বের করে দিতে হবে। এ রকম কথা বর্তমান যুগেও আমাদের কিছু লোকে বলে, একটু ভাষা বদলিয়ে ভিন্ন শব্দ দিয়ে বলে। যেমন বলে, মোল্লা মৌলবিদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দেয়া হোক, অমুক দেশে পাঠিয়ে দেয়া হোক। একজন বলেছিল, ইসলাম এই চৌদ্দশত বৎসর যাবত ইতর শ্রেণীর লোকদের মধ্যে টিকে আছে। এভাবে ইসলামের ভেতরে থাকাকে সম্মানের মনে না করা, ইসলাম পন্থীদেরকে ইতর মনে করা, তাদেরকে অসম্মানের দৃষ্টিতে দেখা– এগুলো ধর্মীয় হীনম্মন্যতা, এগুলো মুনাফেকদের মানসিকতা, মুনাফেকী চরিত্র। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿ وَ لِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُوْلِهٖ وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ. ﴾

অর্থাৎ, সম্মান আল্লাহর, আল্লাহর রসূলের এবং মু'মিনদের। (সূরা মুনাফিকূনঃ ৮)

অতএব যারা খাঁটি মুমিন, খাঁটি ঈমানী চেতনার অধিকারী, তারা ইসলামের ওপর থাকাকে ইজ্জত-সম্মানের মনে করবে। তাই তারা যেখানেই যাক না কেন, যে পরিবেশেই যাক না কেন, যে সমাজেই যাক না কেন, নিজেদের আদর্শের উপর টিকে থাকতে পারবে। কারণ তারা মনে করে আসল সম্মান তো এই আদর্শের মধ্যেই, আসল সম্মান তো আল্লাহ আল্লাহ্‌র রসূলের আদর্শে থাকার মধ্যে।

(৩) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল ধর্মীয় সুবিধাবাদিতা। অর্থাৎ, সুবিধা বুঝলে ধর্মকর্ম করা আর অসুবিধা বুঝলে ধর্মকর্ম বর্জন করা। এরূপ চরিত্র থাকার ফলে মুনাফেকরা সর্বাবস্থায় দ্বীনের ওপর অটল থাকতে পারে না। যারা এরূপ সর্বাবস্থায় দ্বীনের ওপর অটল থাকে না, তাদের সমালোচনা করে আল্লাহ পাক বলেছেন,

﴿وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللّٰهَ عَلٰى حَرْفٍ فَاِنْ اَصَابَهٗ خَيْرُنِ اطْمَاَنَّ بِهٖ وَ اِنْ اَصَابَتْهُ فِتْنَةُنِ انْقَلَبَ عَلٰى وَجْهِهٖ خَسِرَ الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةَ ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِيْنُ.﴾

অর্থাৎ, কতক মানুষ এমন আছে যারা প্রান্তিকভাবে আল্লাহর ইবাদত করে। তারা ভাল অবস্থায় থাকলে নিশ্চিন্তে ইবাদত চালিয়ে যায়, কিন্তু কোন বিপর্যয় আসলে পিছন দিকে ফিরে যায়। তাদের দুনিয়া আখেরাত সবই বরবাদ। এটা তো সুস্পষ্ট ক্ষতি। (সূরা হজ্জ: **১১**)

এ আয়াতে বোঝানো হয়েছে যে, কতক মানুষ এমন আছে যারা একটু প্রতিকূল অবস্থা দেখলে ধর্মকর্ম ছেড়ে দেয়। অর্থাৎ, যখন দেখে ইসলামের কথা বলতে গেলে, ইসলামী আদর্শের ওপর থাকতে গেলে একটু অসুবিধা, তখন তারা পিছন দিকে সরে পড়ে। তখন তারা ইবাদত-বন্দেগী, ইসলামী আদর্শ ছেড়ে দেয়। আল্লাহ পাক এ ধরনের লোকদের সম্পর্কে বলেছেন, এদের দুনিয়াও বরবাদ-আখেরাতও বরবাদ। এরা খাঁটি মু'মিন নয়।

পূর্বের আয়াতে ঐসব লোকদের সমালোচনা করা হয়েছে যারা অনুকূল অবস্থায় আল্লাহকে ডাকে, প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহকে ভুলে যায়। এরা হল সুসময়ের বন্ধু বা বসন্তের কোকিল। এর বিপরীত কিছু লোক এমন আছে, যারা প্রতিকূল অবস্থায় আল্লাহকে ডাকে অর্থাৎ, বিপদাপদে পড়লে আল্লাহকে ডাকে, তারপর বিপদাপদ কেটে গেলে আল্লাহকে ভুলে যায়। আল্লাহ পাক এই শ্রেণীর লোকদেরও নিন্দা করেছেন, এদের সম্পর্কে নিন্দা করে বলেছেন,

﴿فَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ فَلَمَّا نَجّٰهُمْ اِلَى الْبَرِّ اِذَا هُمْ يُشْرِكُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে (এবং সমুদ্রের প্রকাণ্ড ঢেউ তাদেকে ঘিরে ধরে), তখন তারা একান্তভাবে নিবিষ্ট মনে আল্লাহকে ডাকতে থাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে নিরাপদে কূলে ফিরিয়ে আনেন (অর্থাৎ, বিপদ দূর করে দেন, তখন আল্লাহর কথা ভুলে যায়), তখন তারা শরীক করা শুরু করে। (সূরা আনকাবূত: ৬৫)

উপরোক্ত আয়াত দুটো থেকে বুঝা গেল খাঁটি মু'মিন সেই, যে সর্বাবস্থায় দ্বীনের ওপর টিকে থাকে। কোন বিপদ, কোন প্রতিকূল অবস্থাও তাকে দ্বীন থেকে সরাতে পারে না। আবার সুখ-শান্তি বা অনুকূল অবস্থাও তাকে দ্বীন থেকে গাফেল করতে পারে না। সুখের অবস্থায় হোক, দুঃখের অবস্থায় হোক, বিপদের অবস্থায়

হোক, শান্তির অবস্থায় হোক, অনুকূল অবস্থায় হোক, প্রতিকূল অবস্থায় হোক সর্বাবস্থায় সে তার আদর্শের ওপর টিকে থাকবে। এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَ لَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, যারা ঈমান আনে, এরপর ঈমানের উপরে অটল থাকে, কোন অবস্থায় তাদের ঈমানী আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয় না, তাদের কোনো ভয় নেই, তারা দুঃখীত হবে না। (সূরা আহ্‌কাফঃ ১৩)

এই আয়াত থেকে বুঝা গেল- যারা এর বিপরীত, অর্থাৎ, যারা নিজেদের আদর্শের ওপর অটল থাকবে না তাদের ভয় আছে, তাদের দুঃখ পেতে হবে।

(৪) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল আখেরাতের জন্য দুনিয়ার স্বার্থকে বিসর্জন দিতে না পারা। কাফের মোনাফেকরা আখেরাতকে সামনে রেখে আখেরাতের জন্য দুনিয়ার স্বার্থকে বিসর্জন দিতে পারে না বরং তারা দুনিয়ার স্বার্থের জন্য আখেরাতকে বিসর্জন দিয়ে দেয়। তথা পরকালকে বিসর্জন দিয়ে, দ্বীন ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে দুনিয়া অর্জন করতে চায়। তাদের সামনে মুখ্য হল দুনিয়া। তাদের মানসিকতা হল অর্থকড়ি চাই, গাড়ী-বাড়ী চাই, দুনিয়ার মান-ইজ্জত চাই, দুনিয়ায় বড় হয়ে টিকে থাকা চাই। এর জন্য প্রয়োজনে তার দ্বীনকে, আখেরাতকে, আল্লাহ্ রসূলকে বিসর্জন দিতে রাজি। এরা খাঁটি মু'মিন নয়। খাঁটি মু'মিনের মানসিকতা পূর্বে বর্ণনা করা হয়েছে যে, তারা দ্বীনের জন্য প্রয়োজনে দুনিয়াকে বিসর্জন দিয়ে দেয়।

(৫) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল ইবাদত করতে, দ্বীনের কাজ করতে মনে খারাপ লাগা, দ্বীনের কাজ করতে মনে কষ্ট বোধ হওয়া। আর আল্লাহ্ আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কাজ করতে আনন্দ বোধ করা, তাতে মজা বোধ করা। আল্লাহ পাক বেশ কিছু সংখ্যক আয়াতে মুনাফেকদের সম্পর্কে বলেছেন যে, কোন দ্বীনের কাজ সামনে আসলে তাদের খারাপ লাগে, ভাল লাগে না, ফলে তারা অগ্রসর হতে পারে না। এর বিপরীত আল্লাহ্ আল্লাহর রসূলের বিরুদ্ধে কাজ করতে তারা আনন্দ বোধ করে, এতে তারা মজা পায়। পক্ষান্তরে যারা খাঁটি মু'মিন, তাদের মনে শান্তি আসে ইবাদত করাতে। দ্বীনের কাজ করাতে তাদের শান্তি বোধ হয়, তৃপ্তি লাগে। আল্লাহ পাক বলেন,

﴿ ثُمَّ تَلِيْنُ جُلُوْدُهُمْ وَ قُلُوْبُهُمْ اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহর স্মরণে তাদের দেহ মনে প্রশান্তি আসে। (সূরা যুমার: ২৩)

অর্থাৎ, আল্লাহর কথা বলতে, আল্লাহর কথা মানতে, ইবাদত করতে তাদের দেহমনে প্রশান্তি এসে যায়। তারা এর মধ্যে এক অপূর্ব আনন্দ, এক অপূর্ব তৃপ্তি বোধ করতে থাকে। একটা মজা বোধ, একটা স্বাদ বোধ তাদের মধ্যে আসে। এই অবস্থা চলে আসলে দ্বীনের কাজ ছাড়তে তাদের খারাপ লাগে। তাই তখন দ্বীনের খেলাফ করার দিকে তারা যায় না, অর্থকড়ির লোভ দেখালেও যায় না, ভয় ভীতি দেখালেও যায় না, তখন তারা সর্বাবস্থায় ঈমান আমলের ওপর অটল থাকতে পারে, কেউ কোনোভাবেই তাদেরকে বিচ্যুত করতে পারে না।

খাঁটি মুমিন হতে গেলে মেহনত মোজাহাদা করতে হবে। অর্থাৎ, দ্বীনের ওপরে, দ্বীনের লাইনে মেহনত-মোজাহাদা করতে হবে, সহজিয়া পন্থা তালাশ করলে চলবে না। সাধারণভাবে আমরা অনেকেই সহজিয়া পন্থা তালাশ করে থাকি। ফলে একটু কষ্টের আমল সামনে এলেই পিছে সরে যাই। আমরা সর্বদা তালাশ করি কত সহজে ইসলাম পালন করা যায়। নিজে ব্যক্তিগতভাবে ইসলাম মানা সহজ, আমরা এটা করি। কিন্তু পরিবারকে ইসলাম অনুযায়ী চালানো একটু কষ্টকর, তাই এ ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকি। ব্যক্তিগতভাবে ঈমান-আমলের উপরে থাকা, ব্যক্তিগতভাবে আমল করা সহজ, কিন্তু নিজের দ্বাপরা সমাজে তার অভিব্যক্তি ঘটানো, সব মহলে, সব পরিবেশে, সব পরিস্থিতিতে নিজেকে মুমিন বলে জাহির করা একটু কঠিন, তাই আমরা সেটা ছেড়ে দেই। এটা খাঁটি মু'মিনের মানসিকতা নয়। খাঁটি মু'মিন হল সেই, যে আল্লাহকে পাওয়ার জন্য সব রকম মেহনত মোজাহাদা করতে নিজেকে সব সময় প্রস্তুত রাখে, যে মেহনত মোজাহাদা করে, সে-ই আল্লাহকে পায়। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেছেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.﴾

অর্থাৎ, আমাকে পাওয়ার জন্য যারা মোজাহাদা করবে, অবশ্যই আমাকে পাওয়ার পথ আমি তাদেরকে দেখাব। (সূরা আনকাবূত: ৬৯)

(৬) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল আমল থেকে দূরে থাকার জন্য বাহানা তালাশ করা। এরূপ বাহানা তালাশ করা মুনাফেকী চরিত্র। খাঁটি ঈমানের চেতনা হল- আমল না করার জন্য, আমল থেকে গা বাঁচানোর জন্য বাহানা তালাশ না করা, অজুহাত না খোঁজা। এর বিপরীত আমল না করার জন্য, আমল থেকে গা বাঁচানোর জন্য বাহানা তালাশ করা মুনাফেকী চরিত্র। তাবুকের যুদ্ধে মুনাফেকদের থেকে এরূপ চরিত্র প্রকাশ পেয়েছিল। তাবুকের যুদ্ধ ছিল ইসলামের সবচেয়ে কঠিন

যুদ্ধ। এটা ছিল রোমান শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ। অত্যন্ত গরমের মৌসুস ছিল। সময়টা ছিল ফল পাকার সময় অর্থাৎ, খেজুর আহরণ করার সময়। সারা বছরে তাদের এই একটা ফসলই হত। এই খেজুর এখন পাকছে, এখন এগুলো সংগ্রহ করে রাখতে হবে, এর উপর নির্ভর করছে সারা বছরের জীবিকা। এরূপ কঠিন মুহূর্তে তাবুকের যুদ্ধের আহ্বান আসে। এ যুদ্ধে যাওয়া ছিল কঠিন মোজাহাদার বিষয়। মুনাফেকরা তাই যুদ্ধে না যাওয়ার জন্য নানান রকম বাহানা বের করেছিল। দ্বীনের কাজ থেকে নিজের গা বাঁচানোর জন্য যত রকম বাহানা বের করা সম্ভব মুনাফেকরা সবটা করেছিল। কারও বিবি অসুস্থ, কারও সাস্থ্য খারাপ, কারও পেটে ব্যথা, কারও মাথায় ব্যথা- এরকম নানান বাহানা তারা বের করেছিল। একজন এসে এমনও বাহানা পেশ করেছিল, বাহ্যিকভাবে যা শুনলে মনে হবে সত্যিই লোকটার ভিতর খুব ভাল, কিন্তু আসলে তার ভিতর ছিল খারাপ। বাহ্যিকভাবে তার কথাটা ছিল ভাল, কিন্তু তার মতলব ছিল খারাপ। সে ছিল একজন মুনাফেক, নাম ছিল জাদ্দ ইব্‌নে কায়স। সে এসে বলেছিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি রোমানদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে যাব, সকলেরই জানা আছে আমি নারীদের প্রতি খুব বেশি দুর্বল, তাই যুদ্ধে গেলে আমি নিজের ঈমান-আমল রক্ষা করতে পারব কি না ভয় পাচ্ছি। ঐ রোমান সুন্দরীদেরকে দেখে যদি আমি ফিত্‌নায় পড়ে যাই! তাই আমাকে যুদ্ধে না যাওয়ার অনুমতি দিলেই কি ভাল হয় না? কী সুন্দর যুক্তি! আল্লাহ তাআলা তার প্রসঙ্গে বলেছেন,

﴾اَلَا فِى الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا.﴿

অর্থাৎ, ওরা তো (বলছে ফিতনায় পড়ে যাব, ওরা তো) ফিত্‌নায় পড়েই আছে। (সূরা তাওবা: ৪৯) অর্থাৎ, ওরা তো মুনাফেকীর ফেত্‌নায় পড়ে আছে। ওরা ভাল কথার আড়ালে খারাপ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার মত মুনাফেকী চরিত্রের ফিতনায় পড়ে আছে। ওরা নেক কাজ থেকে গা বাঁচানোর জন্য বাহানা বের করার মত মুনাফেকী চরিত্রের ফিতনায় পড়ে আছে।

এক শ্রেণীর মানুষ আছেন যারা ইসলামের আমল থেকে দূরে থাকার জন্য যুক্তি বের করেন। এটাও আমল থেকে গা বাঁচানোর জন্য এক ধরনের বাহানা বের করা। ইসলামের কথা হল আল্লাহ ও আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, মেনে নিতে হবে। আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের যা সিদ্ধান্ত, আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের যা ফয়সালা তা মেনে নিতে হবে। কোন রকম দ্বিধা-দন্দ্ব ছাড়াই মেনে নিতে হবে, বিনা যুক্তিতে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিতে হবে। এটাই হল খাঁটি মু'মিনের চরিত্র। কুরআন-হাদীছের কথার সামনে কোনো রকম নিজস্ব যুক্তি থাকতে

পারবে না। নিজস্ব যুক্তি থাকার অর্থ হল আমি আমার যুক্তি দিয়ে বিচার করব কুরআন-হাদীছের কথাটা ভাল না মন্দ। কুরআন-হাদীছ বিনা যুক্তিতে ভাল। কুরআন-হাদীছের উৎকর্ষ আমাদের বিচারের উর্দ্ধে, আমাদের যুক্তির উর্দ্ধে।

যুক্তি দিয়ে কি ভাল-মন্দ সাব্যস্ত করা যায়? দুনিয়ার এমন কোন খারাপ বিষয় নেই যা যুক্তি দিয়ে ভাল সাব্যস্ত করা না যায়। এমন কোন অবৈধ কাজ নেই যা যুক্তি দিয়ে বৈধ সাব্যস্ত করা না যায়। কলকাতায় একজন লোক হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.)কে বলেছিল, হুজুর! ইসলাম তো প্রাকৃতিক ধর্ম, মানুষের প্রাকৃতিক যে সব চাহিদা আছে, ইসলাম সেগুলোকে অস্বীকার করে না। যেমন খাওয়ার চাহিদা, পান করার চাহিদা, যৌন চাহিদা ইত্যাদি। এসব চাহিদা পূরণ করার পদ্ধতি ইসলামে রাখা হয়েছে। ইসলাম তো প্রাকৃতিক ধর্ম। অতএব যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে অর্থাৎ, জন্মগতভাবে মানুষ দাড়ী ছাড়াই জন্মগ্রহণ করে, তাই দাড়ী না রাখাই ইসলামের বিধান থাকা উচিৎ, এটাই তো যুক্তিতে বলে। হযরত ইসমাঈল শহীদ (রহ.) সাথে সাথেই বলেছিলেন, তাহলে ভাই জন্মগতভাবে আপনার মুখে দাঁত ছিল না, অতএব আপনার দাঁত ভেঙ্গে ফেলে দিন। একজন মন্তব্য করেছিলেন, মাওলানা তো দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়ে দিয়েছেন। কেউ যদি যুক্তি বের করে যে, প্রাকৃতিক নিয়ম হল -বড়রা ছোটদের মেরে খায়; যেমনঃ বনের বড় বড় পশু ছোট পশুদের মেরে খায়, পানির বড় বড় মাছগু ছোট ছোট মাছ মেরে খায়। দেখা গেল-বড়দের ছোটদের মেরে খাওয়া হল প্রাকৃতিক নিয়ম। কাজেই সমাজের বড়রা অর্থাৎ, ধনীরা যদি গরীবদের শোষণ করে খায়, তাহলে সেটা প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে বৈধ হওয়া উচিত। এটাও তো একটা যুক্তি হয়ে গেল। এভাবে যুক্তি দিয়ে গায়রে মাহ্‌রাম মহিলাদেরকে দেখা, যেনা করা সবকিছুকে বৈধ করা যাবে। কেউ যদি বলে, আল্লাহ তো মহিলাদেরকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন, তাহলে আমরা আল্লাহর সৃষ্টি করা সৌন্দর্য কেন উপভোগ করতে পারব না? আল্লাহর সৃষ্টি করা সৌন্দর্য কেন দেখতে পারব না? এতে তো নাউযু বিল্লাহ আল্লাহর কুদরত দেখার ছওয়াব হওয়ার কথা! কেউ যদি বলে, আমার গাছের ফসল আমি কেন খেতে পারব না? আমার গাছের ফল ভোগ করার অধিকার আমারই সবচেয়ে বেশি। এভাবে যুক্তি দিয়ে নিজের মেয়েকেও ভোগ করা সঠিক সাব্যস্ত করা যায়। নাউযু বিল্লাহ! এভাবে যুক্তি দিয়ে দুনিয়ার সব অবৈধকে বৈধ করা যায়। একবার পশ্চিমা দেশের কিছু লোক উলঙ্গবাদী আন্দোলন শুরু করেছিল যে, সবাইকে উলঙ্গ থাকতে হবে। তারা কতগুলো যুক্তি পেশ করেছিল। তার মধ্যে একটা হল উলঙ্গবাদী আন্দোলন সফল হলে পোশাকের পেছনে যত টাকা ব্যয় হয়, সেই টাকা বেঁচে যাবে। আর একটা যুক্তি ছিল কবি সাহিত্যিকরা যখন এগুলো দেখবে, তখন

তাদের কাব্য-সহিত্যে রস আসতে থাকবে, যা দ্বারা মানুষের উপকার হবে। আর একটা যুক্তি ছিল- স্বভাবত গোপন জিনিসের প্রতি মানুষের কৌতুহল বেশি থাকে, এই কৌতুহল বেশি থাকার কারণেই নারীদেরকে নিয়ে এত টানা-হ্যাঁচড়া হয়। যখন সব নারী উলঙ্গ হয়ে যাবে, তখন তাদের প্রতি আর কৌতুহল থাকবে না, ফলে অপকর্ম কমে যাবে। কৌতুহল আছে বলেই তো অপকর্ম হয়। দেখুন কত সুন্দর (?) যুক্তি! এভাবে যুক্তি দিয়ে তো দুনিয়ার সবকিছুকে বৈধ করা যায়। কিন্তু কোন্ যুক্তিটা সুস্থ মস্তিষ্ক থেকে আসে, আর কোনটা অসুস্থ্ মস্তিষ্ক থেকে আসে, তার মধ্যে তো পার্থক্য করতে হবে। অসুস্থ্ মস্তিষ্কের যুক্তি কি আদৌ জীবন চালানোর কিংবা ভাল-মন্দ নির্ণয়ের মাপকাঠি হতে পারে?

এখন প্রশ্ন হল কোন্টা সুস্থ্ যুক্তি আর কোন্টা অসুস্থ্ যুক্তি তা কী করে নির্ণয় করা যাবে? তা নির্ণয়ের উপায় হল- যে যুক্তি কুরআন-হাদীছের সঙ্গে সাজুয্যপূর্ণ, সেটিই সুস্থ্য যুক্তি। আর যে যুক্তি কুরআন-হাদীছ বিরোধী সে যুক্তি হল অসুস্থ্য যুক্তি। সুতরাং মানুষের যুক্তি দিয়ে কোন ভাল-মন্দ চুড়ান্ত ভাবে বিচার করা যাবে না, সে ক্ষেত্রে আল্লাহ ও আল্লাহ্‌র রসূলের কথা কি তা দেখতে হবে। কাজেই যুক্তি নয় বরং কুরআন-হাদীছই হল চুড়ান্ত মাপকাঠি। এ-ই হল খাঁটি মু'মিনের চেতনা। খাঁটি মুমিন কুরআন-হাদীছের সব কথা মানবে, বিনা যুক্তিতে মানবে। না মানার জন্য বাহানা বা অজুহাত খোঁজ করবে না। না মানার জন্য কোন যুক্তি দাঁড় করাবে না। না মানার জন্য ওজুহাত বা যুক্তি বের করাও এক ধরনের প্রতারণা।

(৭) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল প্রতারণা করা। প্রতারণা একটা মুনাফেকী চরিত্র। খাঁটি মু'মিনের মধ্যে কোন রকম প্রতারণা থাকবে না। হাদীছে অনেক মুনাফেকী চরিত্রের কথা বয়ান করা হয়েছে। তার মধ্যে এক হাদীছে তিনটা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে,

آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ.

(رواه البخاري ٣٣ ومسلم ٥٩ وفي رواية بزيادة: وإذا خاصم فجر)

অর্থাৎ, মুনাফেকের আলামত তিনটা:- যখন কথা বলে মিথ্যা বলে, যখন ওয়াদা করে মনে মনে সেটা ভঙ্গ করার নিয়ত থাকে, আর তার কাছে আমানত রাখা হলে সে আমানতে খেয়ানত করে। (বোখারী ও মুসলিম)

বোখারী ও মুসলিমের এক রেওয়ায়েতে চারটা বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। উপরোক্ত ৩টা এবং অতিরিক্ত আর একটা হল যখন ঝাগড়া বিবাদে লিপ্ত হয় সীমালংঘন করে।

এ হাদীছে বোঝানো হয়েছে মুনাফেক যখন ওয়াদা করে, তখন মুখে তো ওয়াদা করে কিন্তু তার অন্তরে থাকে সে করবে না। যেমনঃ কারও সঙ্গে সে কোন একটা বিষয়ে চুক্তি করল। এই চুক্তির অর্থ হল সে প্রকাশ করল যে, আমি এই চুক্তি অনুযায়ী চলব। কিন্তু তার মনে মনে থাকল যে, আমি এটা সাময়িক পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য করছি, আসলে আমি কী করব সেটা আমার মনে মনে আছে। এটা প্রতারণা, এটা মুনাফেকী চরিত্র। কারণ মুসলমান হিসাবে যখন সে একটা কথা বলছে, তখন এটাই প্রতীয়মান হবে যে, সে সত্য কথা বলছে; কারণ মু'মিন তো মিথ্যা কথা বলতে পারে না, তারপরও যখন সে মিথ্যা বলছে, তাহলে এটা প্রতারণা। অতএব এটা মুনাফেকী চরিত্র। এমনিভাবে যখন তার কাছে আমানত রাখা হবে, তখন মু'মিন হিসাবে এটাই তো প্রকাশ্য ব্যাপার যে, সে খেয়ানত করবে না। তারপরও যখন সে খেয়ানত করে, তাহলে এটাই প্রমাণ হয় যে, তার বার এক ভিতর এক। এটাই তো মুনাফেকী। খাঁটি মু'মিন মুসলমান প্রতারণা করতে পারে না। খাঁটি মু'মিনের ভিতর বার থাকবে একই রকম, দুই রকম থাকতে পারবে না। খাঁটি মু'মিনের জাহের বাতেন দুই হবে না। খাঁটি মু'মিন তো এমন হবে যে, তার জাহের বাতেন অর্থাৎ, তার ভিতর বার সমান, সব কাজে ফ্রেশ। যা বাস্তব তাই বলবে, যা বাস্তব তাই প্রকাশ করবে, তার মধ্যে কোন রকম ধোঁকা প্রতারণা থাকতে পারবে না।

(৮) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল খারাপটাকে ভাল আর ভালটাকে খারাপ বলে ব্যাখ্যা দেওয়া। সূরায়ে বাকারার মধ্যে এসেছে মুনাফেকদেরকে বলা হয়েছিল,

﴿لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা ফ্যাসাদ কর না। (সূরা বাকারাঃ ১১) এখানে মুনাফেরদের বলা হয়েছে, তোমরা যে নীতি আদর্শ গ্রহণ করেছ তার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই। এই নীতি আদর্শের মধ্যে মানুষের কোন কামিয়াবী নেই, এর মধ্যে কোন সফলতা নেই বরং এটা ফ্যাসাদের নীতি। তোমরা এই ফ্যাসাদের নীতি বর্জন কর। তার জওয়াবে তারা বলেছিল,

﴿اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, আমরাই কল্যাণের নীতিতে আছি। (সূরা বাকারাঃ ১১) অর্থাৎ, আমাদের যে নীতি আদর্শ, এরই মধ্যে কল্যাণ, এরই মধ্যে সফলতা। তারা বোঝাতে চেয়েছিল যে, তাদের নীতিই ভাল, মু'মিনদের নীতি ভাল নয়। আল্লাহ্ রব্বুল আলামীন এই বিষয়টাকে মুনাফেকদের চরিত্র হিসাবে বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ, খারাপটাকে ভাল বলা আর ভালটাকে খারাপ বলে ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে মুনাফেকদের চরিত্র। যে মুমিন, সে খারাপটাকে খারাপই জানে, খারাপটাকে খারাপই বলে, খারাপ আদর্শকে সে কখনও ভাল বলতে পারে না। যে মুমিন, সে কখনও খারাপটাকে ভাল বলে ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

দুনিয়াতে কুরআন-হাদীছের বিপরীতে যত আদর্শ আছে, তার কোনটা ভাল নয়। কারণ আল্লাহ, আল্লাহ্র রসূলের কথার বাইরে কোন কিছু ভাল হতেই পারে না। ইসলামী আদর্শের সাংঘর্ষিক কোন আদর্শ ভাল হতেই পারে না। অতএব ইসলামের বাইরে মানুষের তৈরি যত ইজম, যত মতবাদ রয়েছে, কোন মুসলমান সেগুলোকে ভাল বলতে পারে না, কোন মুসলমান সেগুলোর গুণ গাইতে পারে না। নিজেকে মুমিন মুসলমান দাবী করার পর কুরআন-হাদীছের তরীকার মধ্যে কামিয়াবী নেই বরং কামিয়াবী আছে অমুক মতবাদের মধ্যে– এরূপ বলার কোনই অবকাশ নেই। যে খাঁটি মুসলমান, কুরআন-হাদীছের প্রতি তার অগাধ ভক্তি থাকবে। সে কুরআন হাদীছের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন আদর্শকে ভাল মনে করতে পারে না। এসব সহীহ্ কথা বলা হলে কারও রাগ হতে পারে। তাহলে শুনুন–

(৯) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল ভাল কথা শুনলে রাগ হয়ে যাওয়া, জিদ ধরা। এটা খাঁটি মুসলমানের চরিত্র নয়। কারণ খাঁটি মুসলমানের অন্তরে কুরআন-হাদীছের প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা থাকে, সে কুরআন-হাদীছের কথায় রাগান্বিত হতে পারে না। মদীনায় একজন বড় মুনাফেক ছিল। তার নাম ছিল আখ্নাছ ইব্নে শুরায়েক। সে ছিল গোঁয়ার শ্রেণীর মানুষ। মুসলমানদের ক্ষতি করা, মুসলমানদের জান-মাল ইজ্জত-আব্রুর ক্ষতি করাই ছিল তার কাজ। যখন তাকে উপদেশ দেয়া হত, সে রাগ হয়ে যেত যে, আমাকে উপদেশ দিচ্ছ? আমি কি তোমাদের চেয়ে কম বুঝি? আল্লাহ পাক তার সম্পর্কে আয়াত নাযিল করেছেন,

﴿وَاِذَا قِيْلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْاِثْمِ فَحَسْبُهٗ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ.﴾

অর্থাৎ, যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় করো (তুমি এরকম কর না তাহলে শাস্তি হবে), তখন ভূয়া আত্ম অভিমান তাকে পেয়ে বসে (এবং ক্ষীপ্ত হয়ে

উল্টো আরও বেশি পাপ করতে থাকে।) তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। আর জাহান্নাম কত নিকৃষ্ট ঠিকানা! (সূরা বাকারাঃ ২০৬)

এখন চিন্তা করে দেখতে হবে- যদি আলেম উলামার কথায় জিদ ধরে আরও বেশি অন্যায় করে এই বলে যে, মোল্লা মৌলভীরা আমাদের দোষ ধরে, আচ্ছা আমরা এটা করেই যাব দেখি মোল্লা-মৌলভীরা আমাদের কী করতে পারে! মৌলভীরা কিছুই করবে না। করবেন আল্লাহ। আল্লাহ কি করবেন তা আল্লাহই বলে দিয়েছেন যে, তাদের ঠিকানা হল জাহান্নাম। আলেম উলামা কিছুই করবেন না। তাদের দায়িত্ব হল শুধু ভাল কথা পৌঁছে দেয়া।

(১০) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল দ্বীনের কথা শোনার পর তার ঈমান-বিশ্বাসে বৃদ্ধি না ঘটা। এর বিপরীত খাঁটি মুমিনের চরিত্র হল- সে যতই দ্বীনের কথা শুনবে, ততই তার বিশ্বাস বাড়তে থাকবে। কুরআন-হাদীছের কথা শুনলে, আল্লাহ আল্লাহর রসূলের কথা শুনলে তার মধ্যে অবিশ্বাস আসবে না বরং বিশ্বাস আসবে। এভাবে তার বিশ্বাসের মাত্রা বাড়তে থাকবে। কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿وَ اِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيٰتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا.﴾

অর্থাৎ, যখন তাদের সামনে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বিশ্বাস বেড়ে যায়। (সূরা আনফালঃ ২)

এর বিপরীত মুনাফেকদের অবস্থা ছিল কোন সূরা নাযেল হলে তারা একজন আরেক জনকে উপহাস করে বলত,

﴿اَيُّكُمْ زَادَتْهُ هٰذِهٖ اِيْمَانًا.﴾

অর্থাৎ, (কুরআন নাযেল হলে নাকি ঈমান বাড়ে, আরে) তোদের কার ঈমান বেড়েছে রে? (সূরা তাওবাঃ ১২৪)

এভাবে তারা কুরআনকে নিয়ে উপহাস করতে থাকত। কুরআন হাদীছকে নিয়ে এই উপহাস করাটাও মুনাফেকদের চরিত্র।

(১১) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল কুরআন-হাদীছ নিয়ে উপহাস করা, আল্লাহ আল্লাহ্র রসূল (সা.)কে নিয়ে উপহাস করা। আল্লাহ, আল্লাহর রসূল, কুরআন কিতাব বা ইসলামের যেকোনো কিছু নিয়ে উপহাস করা কাফের মুনাফেকদের চরিত্র। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন, কাফের মুনাফেকরা নবীদের নিয়ে, নবীদের কাজকর্ম নিয়ে উপহাস করত। নবীদের সংগে যুগে যুগে এরকম করা হয়েছে। হযরত নূহ (আ.)-এর সঙ্গে তার সম্প্রদায়ের কাফেররা কীভাবে উপহাস করেছিল। হযরত নূহ (আ.) যখন নৌকা তৈরি

করেছিলেন এবং বলছিলেন, সামনে সর্বগ্রাসী তুফান আসবে, যারা আল্লাহ্‌কে মানে না তারা সেই তূফানে শেষ হয়ে যাবে। আমি এবং আমার অনুসারীরা এই নৌকায় চড়ে আত্মরক্ষা করব। তখন তার সম্প্রদায়ের লোকেরা দলে দলে এসে উপহাস করছিল। কুরআনে কারীমে তা উল্লেখ করা হয়েছে–

﴿وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّنْ قَوْمِهٖ سَخِرُوْا مِنْهُ.﴾

অর্থাৎ, সে নৌযান তৈরি করছিল। আর যখনই তার সম্প্রদায়ের কোন দল তার কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল তাকে নিয়ে উপহাস করছিল। (সূরা হূদ: ৩৮)

(১২) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল তারা মুসলমানদের বিপদ-আপদ দেখে কুটিল আনন্দ বোধ করে। যে খাঁটি মু'মিন সে মুসলমানদের কষ্ট দেখে, মুসলমানদের বিপদ-আপদ দেখে আনন্দ বোধ করতে পারে না। খাঁটি মুসলমান তো সে, যে অন্য কোন মুসলমানের বিপদ-আপদকে নিজের বিপদ-আপদ বলে মনে করে, অন্য মুসলমানের কষ্টে সে কষ্ট বোধ করে। এক হাদীছে এসেছে–

اَلْمُسْلِمُوْنَ كَرَجُلٍ وَاحِدٍ، إِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ، وَإِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهٗ اِشْتَكٰى كُلُّهٗ. (رواه مسلم في كتاب البر والصلة والأداب ٢٥٨٦)

অর্থাৎ, সমস্ত মুসলমান একটা দেহের মত। একটা দেহের চোখ যদি অসুস্থ হয়, তাহলে পুরো দেহ সে কষ্ট উপলব্ধি করে। মাথায় ব্যথা হলে সারা শরীর সে ব্যথা উপলব্ধি করে। (মুসলিম)

খাঁটি মুমিন মুসলমান একজনের ব্যথায় আরেকজন ব্যথিত হবে, প্রত্যেকে একে অপরের সুখে-দুঃখে শরীক থাকবে। অতএব কোন মুসলমানের কষ্ট দেখে আনন্দ বোধ করা, এটা খাঁটি মু'মিনের চরিত্র নয়, এটা মুনাফেকদের চরিত্র। মুনাফেকদের সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿اِنْ تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَ اِنْ تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَّفْرَحُوْا بِهَا.﴾

অর্থাৎ, যদি তোমাদের (মুসলমানদের) কোন কল্যাণের ছোয়া লাগে, (যদি মুসলমানদের ভাল কিছু হতে আরম্ভ করে,) তাহলে ওদের কষ্ট লাগে। আর মুসলমানদের কোন বিপদ ঘটলে তারা আনন্দ বোধ করে। (সূরা আলে ইমরান: ১২০)

(১৩) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল মুসলমানের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হওয়া, অহেতুক ঝগড়া-বিবাদ টেনে আনা, ঝগড়া- বিবাদে হাওয়া দেয়া। এক মুনাফেক সম্পর্কে কুরআন শরীফে বলা হয়েছে,

﴿وَهُوَ اَلَدُّ الْخِصَامِ.﴾

অর্থাৎ, সে মুসলমানদের সঙ্গে খুব বেশি ঝগড়া-বিবাদ করে, ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত ঘটায়। (সূরা বাকারা: ২০৪)

খাঁটি মুমিন ঝগড়া-বিবাদের সূত্রপাত করতে পারে না। খাঁটি মুমিনের চরিত্র সম্পর্কে কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿وَّ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا.﴾

অর্থাৎ, অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গে (ঝগড়া-বিবাদ উদ্রেককারী) কথা বললে তারা বলে সালাম। (সূরা ফুরকান: ৬৩)

কোন অজ্ঞ ব্যক্তিরা তাদের সঙ্গে ঝগড়া-বিবাদের সূচনা করতে চাইলে তারা শান্তিপূর্ণভাবে তা থেকে সরে যায়। অজ্ঞ লোকেরা তর্ক করতে আসলে তারা বলে, ভাই আমি তর্ক করতে চাই না। এভাবে তারা ঝগড়া-বিবাদ সৃষ্টি করে না, তর্কের সূত্রপাত ঘটায় না, তর্ক এড়িয়ে যায়। এটাই খাঁটি মু'মিনের চরিত্র। খাঁটি মু'মিন ঝগড়া-বিবাদ লাগায় না, কোথাও ঝগড়া-বিবাদ লাগলে তাতে হাওয়া দেয় না বরং সেটা মিটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। কুরআনে কারীমে এরূপ নির্দেশ দিয়ে বলা হয়েছে,

﴿وَ اِنْ طَآئِفَتٰنِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا فَاَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا.﴾

অর্থাৎ, কোন দুই পক্ষে লাগালাগি হয়ে গেলে তোমরা তা নিষ্পত্তি করে দাও। (সূরা হুজুরাত: ৯)

(১৪) মুনাফেকদের আর একটা চরিত্র হল কুরআন-হাদীছের কথাকে ওভারটেক করে কথা বলা। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَىِ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ.﴾

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা তোমরা আল্লাহ আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের আগে বেড়ে কোন কথা বলবে না। তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে। (সূরা হুজুরাত: ১)

এ আয়াতে বলা হয়েছে তোমরা আল্লাহ আল্লাহ্র রসূলের আগে বেড়ে কোন কথা বলবে না। আল্লাহর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর সামনে আগে বেড়ে কথা বলা নিষেধ ছিল। তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর আগে বেড়ে কথা বলার অর্থ হল তিনি যা বলে গেছেন তার চেয়ে আগে বেড়ে অর্থাৎ, সেটাকে ওভারটেক করে কোন কথা বলা। ওলামায়ে কেরাম হলেন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ওয়ারিছ বা প্রতিনিধি। নবীর সঙ্গে যেমন আচরণ, নবীর ওয়ারেছ বা প্রতিনিধির সঙ্গেও তেমনি আচরণ হবে। যেমন– কোন

রাষ্ট্রপ্রধান কাউকে প্রতিনিধি নিযুক্ত করে কোথাও পাঠালে সেই প্রতিনিধির সঙ্গে ওরকমই আচরণ করতে হয়, যেমন ঐ রাষ্ট্রপ্রতির সঙ্গে করা হয়। ওলামায়ে কেরাম নবীদের ওয়ারিছ বা তাঁদের প্রতিনিধি। অতএব তাঁদের সঙ্গে ওরকমই আদবের আচরণ করতে হবে, যেমন নবীদের সঙ্গে করা হয়। যেমন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর ক্ষেত্রে হুকুম ছিল– কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে,

﴿لَا تَرْفَعُوْٓا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَ لَا تَجْهَرُوْا لَهٗ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ.﴾

অর্থাৎ, তোমরা নবীর সামনে উঁচু গলায় কথা বলবে না। নবীর আওয়াজের চেয়ে উঁচু আওয়াজে কথা বলবে না। তোমরা একে অপরকে যেমন নাম ধরে ডাক, নবীকে সেরূপ নাম ধরে ডাকতে পারবে না। (সূরা হুজুরাতঃ ২)

সম্মানজনক সম্বোধন করে নবীকে ডাকার বিধান ছিল। যারা বয়সে নবী (সা.)-এর চেয়ে বড় ছিল, তারাও নবী (সা.) কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে সম্বোধন করতেন। হে মুহাম্মাদ!- এ রকম নাম ধরে ডাকতেন না।

নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সঙ্গে যেসব আদব রক্ষা করে চলার বিধান ছিল, নবীর ওয়ারিছ ওলামায়ে কেরামের সঙ্গেও সেসব আদব রক্ষা করে চলতে হবে। দ্বীনের ব্যাপারে কোন আলেমের সঙ্গে ওভারটেক করে কোন কথা বলা বে-আদবী। ওলামায়ে কেরামের সামনে নিচু স্বরে কথা বলা আদব। ওলামায়ে কেরামের নাম ধরে ডাকা আদবের খেলাফ। শহরের মানুষ তো কিছুটা আদব-কায়দা জানে। গ্রামের মানুষ এরকম হয় যে, কোন আলেম বয়সে একদিনের ছোট হলেও তার নাম ধরে ডাকে। সে মনে করে আমি ওর চেয়ে বয়সে বড়, অতএব আমি ওর চেয়ে মুরব্বী। সে মনে করে বয়সে বড় হওয়াটাই বড় জিনিস। কুরআন-হাদীছের ফয়সালা অনুযায়ী বয়স আর ইল্‌ম এই দুটোর মধ্যে ইল্‌মের মর্যাদা বেশি। একজন মানুষ বয়সে বড়, কিন্তু তার কুরআন-হাদীছের জ্ঞান কম। আর একজন তার চেয়ে বয়সে ছোট, কিন্তু কুরআন-হাদীছের তার জ্ঞান বেশি– এরূপ ক্ষেত্রে দ্বিতীয় জনই বেশি মর্যাদাবান। তাই নিয়ম হল হাঁটা-চলার সময় তাকেই মর্যাদার সাথে আগে বাড়িয়ে দিতে হবে। প্রথম জনের একথা মনে করা ঠিক হবে না যে, আমার বয়স বেশি অতএব আমিই আগে থাকার হকদার। এমনিভাবে কথা-বার্তা বলার সময়ও তাঁকে মর্যাদা দিতে হবে। প্রথম জন হল বয়সের মুরব্বী আর দ্বিতীয় জন হল ইল্‌মের মুরব্বী। বয়সের মুরব্বীর চেয়ে ইল্‌মের মুরব্বীর মর্যাদা বেশি। বয়স আর ইল্‌ম এই দুটোর মধ্যে ইল্‌মের মর্যাদা বেশি। কোন আলেম বয়সে ছোট হলেও তাঁকে মর্যাদার

দৃষ্টিতে দেখতে হবে। যেমন নবী (সা.)-এর চেয়ে বয়সে বড় সাহাবীরা নবী (সা.)-এর ক্ষেত্রে করতেন। হযরত আব্বাস (রা.) নবী (সা.)-এর চাচা ছিলেন। বয়সে তিন বছরের বড় ছিলেন। তিনি নবী (সা.)কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! বলে সম্বোধন করতেন। একদিন এক লোক হযরত আব্বাস (রা.)কে জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি বড় না মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বড়? তিনি জওয়াব দিলেন–

هُوَ أَكْبَرُ مِنِّيْ وَأَنَا أَسَنُّ مِنْهُ. (الأيام النظرة والسيرة العطرة)

অর্থাৎ, আমি বয়সী, উনি বড়। অর্থাৎ, আমার বয়স বেশি, তবে উনি আমার চেয়ে বড় বা বেশি সম্মানী।

নবীর সঙ্গে যেমন আচরণ করা হত, নবীর ওয়ারিছদের সঙ্গেও তেমন আচরণ করতে হবে। নবীর যেমন সমালোচনা করা যায় না, নবীর ওয়ারিছ ওলামায়ে কেরামেরও সমালোচনা করা যায় না। তবে কোন আলেম যদি তার সমপর্যায়ের কোন আলেমের কোন বিষয় নিয়ে কোন পর্যালোচনা করেন, তাহলে ভিন্ন কথা। কিন্তু সাধারণ লোক হয়ে কোন আলেমের সমালোচনা করা সংগত নয়। একমাত্র মুসলমানদের মধ্যেই এটা দেখা যায় যে, তারা তাদের ধর্মীয় গুরুজনদের, ধর্মের ধারক-বাহক ওলামায়ে কেরামের সমালোচনা করে। পৃথিবীর অন্য কোন জাতি তাদের ধর্মীয় গুরুদের এরকম ঢালাওভাবে সমালোচনা করে না।

(১৫) বে-হায়াপনা মুনাফেকদের একটা চরিত্র। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَبِيْ أُمَامَةَ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلْحَيَاءُ وَالْعَيُّ شُعْبَتَانِ مِنَ الإِيْمَانِ، وَالْبِذَاءُ وَالْبَيَانُ شُعْبَتَانِ مِنَ النِّفَاقِ. (رواه الترمذي ٢٠٢٧ وقال: هذا حديث حسن غريب، ورواه الحاكم في المستدرك ١٧ وقال: على شرط الشيخين، وأقره عليه الذهبي في التخليص)

অর্থাৎ, হযরত আবূ উমামা (রা.) থেকে বর্ণিত- নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, লজ্জা ও কথা বলতে কুণ্ঠা ঈমানের দুটো বিষয়। আর অশ্লীলতা ও কথা বলতে বেশি পারঙ্গমতা মুনাফেকীর দুটো বিষয়। (তিরমিযী ও মুস্তাদরকে হাকিম)

(১৬) দ্বীনের কথা বলা আর নিজে আমল না করা মুনাফেকদের চরিত্র। এটা খাঁটি মুমিনের চরিত্র নয়। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ أَبِىْ يَحْيٰى سُئِلَ حُذَيْفَةُ مِنَ النِّفَاقِ؟ قَالَ: اَلَّذِيْ يَصِفُ الْإِسْلاَمَ وَلَا يَعْمَلُ بِهٖ. (الإبانة الكبرى ٩٢٨)

অর্থাৎ, আবূ ইয়াহইয়া থেকে বর্ণিত– হযরত হুযাইফা (রা.)কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল মুনাফেকী কী জিনিস? তিনি বলেছিলেন, যে লোক দ্বীনের কথা বলে কিন্তু আমল করে না (সে হল মুনাফেক)। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

(১৭) পাপীদের সাহচর্যে বেশি থাকা মুনাফেকদের চরিত্র। হযরত ফুযায়েল (রহ.) বলেছেন,

وَعَلاَمَةُ النِّفَاقِ أَنْ يَقُوْمَ الرَّجُلُ وَيَقْعُدُ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ. (الإبانة الكبرى ٤٣٨)

অর্থাৎ, মুনাফেকীর আলামত হল বেদআতীদের সঙ্গে উঠাবসা করা। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

(১৮) স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আমীর উমরাদের প্রশংসা করা মুনাফেকদের চরিত্র। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ جَاءَ رَجُلٌ اِبْنَ عُمَرَ فَقَالَ: إِنَّا نَدْخُلُ عَلٰى اُمَرَائِنَا فَنُزَكِّيْهِمْ وَنُثْنِيْ عَلَيْهِمْ ثُمَّ نَخْرُجُ مِنْ عِنْدِهِمْ فَنَسُبُّهُمْ، فَقَالَ: كُنَّا نَعُدُّ ذٰلِكَ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النِّفَاقَ. (الإبانة الكبرى ٩٢١)

অর্থাৎ, হযরত ইবরাহীম নাখ্য়ী বলেন, এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রা.)-এর কাছে এসে বলল, আমরা আমীরদের কাছে গিয়ে তাদের সাফাই গাই, তাদের গুণকীর্তন করি। তার পর তাদের কাছ থেকে বের হয়ে তাদেরকে গালী দেই। তখন হযরত ইবনে ওমর (রা.) বললেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আমরা এটাকে মুনাফেকী গণ্য করতাম। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

(১৯) গান-বাদ্যে মশগুল হওয়া মুনাফেকদের চরিত্র। এটা খাঁটি মুমিনদের কাজ নয়। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বলেছেন,

اَلْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِى الْقَلْبِ. (السنن الكبرى للبيهقي والإبانة الكبرى ٩٤٥ و ٩٤٧ و المصنف لعبد الرزاق ١٩٩٠٧)

অর্থাৎ, গান অন্তরে মুনাফেকী চেতনার উদগম ঘটায়। (বায়হাকী, আল-ইবানাতুল কুবরা ও মুসান্নাফে আব্দুর রাজ্জাক)

(২০) সাহাবাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা মুনাফেকদের কাজ। এক হাদীছে এসেছে–

عَنْ أَنَسٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ايَةُ الْإِيْمَانِ حُبُّ الْأَنْصَارِ، وَايَةُ النِّفَاقِ بُغْضُ الأَنْصَارِ. (البخاري ١٧ ومسلم ٧٤ واللفظ للبخاري)

অর্থাৎ, হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আনসারী সাহাবীদেরকে ভালবাসা ঈমানের আলামত আর আনসারী সাহাবীদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা মুনাফেকির আলামত। (বোখারী ও মুসলিম)

এ হাদীছে শুধু আনসারী সাহাবীদের প্রতি ভালবাসার কথা বলা হয়েছে। আনসারী সাহাবীদের প্রতি রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ভালবাসা অধিক ছিল বিধায় শুধু তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। নতুবা সব সাহাবীর প্রতি ভালবাসাই ঈমানের অঙ্গ। আর যে কোন সাহাবীর প্রতি বিদ্বেষ রাখাই মুনাফেকী চরিত্র।

(২১) উপরে উপরে বুযুর্গী দেখানো মুনাফেকদের চরিত্র। এক রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত আবুদ্দারদা (রা.) বলেছেন,

تَعَوَّذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ خُشُوْعِ النِّفَاقِ. قَالَ: قِيْلَ: يَا أَبَا الدَّرْدَاءِ! وَمَا خُشُوْعُ النِّفَاقِ؟ قَالَ: أَنْ تَرَى الْجَسَدَ خَاشِعًا وَالْقَلْبُ لَيْسَ بِخَاشِعٍ. (مصنف ابن أبي شيبة ٣٦٨٦١)

অর্থাৎ, তোমরা মুনাফেকসুলভ খুশু-খুজূ থেকে আল্লাহর কাছে পানাহ চাও। জিজ্ঞাসা করা হল মুনাফেকসুলভ খুশু-খুজূ কী? তিনি উত্তরে বললেন, শরীরে (অর্থাৎ, বাহ্যিক অঙ্গে) খুশু-খুজূ দেখানো অথচ অন্তরে খুশু-খুজূ না থাকা। (মুসান্নফে ইবনে আবী শাইবা)

এ পর্যন্ত খাঁটি মুমিনদের ২১টি গুণ ও মুনাফেকদের ২১টা চরিত্র বর্ণনা করা হল। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে খাঁটি মুমিনদের এ গুণাবলী অর্জন এবং মুনাফেকদের এ চরিত্রগুলো বর্জনের মাধ্যমে তাঁর খাঁটি বান্দাদের তালিকাভুক্ত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

দ্বাদশ অধ্যায়

যদি খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার রূপে জীবন গড়তে চান

দ্বাদশ অধ্যায়

যদি খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার রূপে জীবন গড়তে চান

তাকওয়ার গুরুত্ব ও ফায়দা

তাকওয়া শরীয়তের অত্যন্ত মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। তাই রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَقْوَى اللّٰهِ رَأسُ كُلِّ حِكْمَةٍ. (المقاصد الحسنة)

অর্থাৎ, তাকওয়া হল সমস্ত তত্ত্বকথার মূল, সমস্ত ধর্মীয় কথার মূল।

এখানো বোঝানো হয়েছে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় হল সমস্ত নেক আমলের মূল। তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় এসে গেলে সমস্ত নেক আমল এসে যাবে, তাই তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় হল সমস্ত নেক আমলের মূল। আর তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় এসে গেলে সমস্ত গোনাহ থেকেও বিরত থাকা সম্ভব হবে, তাই তাকওয়া হল সব রকম পাপ থেকে বিরত থাকার মূল বা সব রকম পাপ থেকে বিরত থাকার মজবূত পন্থা।

কুরআনে কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَ لَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَ اَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমরা যথাযথভাবে আল্লাহ্কে ভয় কর। আর পূর্ণাঙ্গ মুসলমান না হয়ে, খাঁটি মুসলমান না হয়ে তোমরা মৃত্যুবরণ কর না। (সূরা আলে ইমরান: ১০২)

এখানে আল্লাহ পাক দু'টো কথা বলেছেন– এক. হল তাক্ওয়া বা আল্লাহকে ভয় করার কথা, দুই. খাঁটি ও পূর্ণাঙ্গ মুসলমান হওয়ার কথা। এর মধ্যে খাঁটি মুসলমান হওয়ার কথা বলার আগে আল্লাহ্কে যথাযথভাবে ভয় করার কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে ইংগিত পাওয়া যায় যে, তাক্ওয়া বা আল্লাহ্কে ভয় করার বিষয়টা আগে। যার মধ্যে তাক্ওয়া বা যথাযথভাবে আল্লাহ্র ভয় করা এসে যায়, সে খাঁটি মুসলমান হয়ে যায়। তাক্ওয়া বা আল্লাহ্র ভয়ই মানুষের সব আমলকে দোরস্ত করে দেয়, মানুষকে খাঁটি মানুষ বানিয়ে তোলে।

তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় এসে গেলে মানুষ সব রকম পাপ ও অপরাধ থেকে বিরত থাকতে পারে। শুধু ইবাদত-বন্দেগী সংক্রান্ত পাপ-অপরাধ নয় দুনিয়াবী পাপ-অপরাধ থেকেও বিরত হতে পারে। সব রকম পাপ ও অন্যায়-অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য তাকওয়া বা আল্লাহর ভয়ই হল সবচেয়ে সুন্দর ও সবচেয়ে বেশি কার্যকরী পন্থা। অন্যায়-অপরাধ থেকে মানুষকে বিরত রাখার জন্য যত শক্ত আইনই করা হোক, যত শক্ত শাস্তির ব্যবস্থাই করা হোক তারপরও মানুষ অন্যায়–অপরাধ করতে পারে। যেখানে আইনের চোখ দেখে না, যেখানে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার লোকজন দেখে না, সেখানে যেয়ে মানুষ অন্যায়-অপরাধ করতে পারে, পর্দার আড়ালে গিয়ে মানুষ অন্যায়-অপরাধ করতে পারে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে যদি কারও মধ্যে আল্লাহর ভয় এসে যায়, তাহলে সে পর্দার আড়ালে গিয়েও, মাটির গর্তে লুকিয়েও, পানির মধ্যে ডুব দিয়েও অন্যায়-অপরাধ করতে পারবে না। কারণ তখনও তার মনে হবে, কেউ না দেখলেও আমার আল্লাহ আমাকে দেখছেন, এই অন্যায়-অপরাধ করলে আল্লাহ আমাকে পাকড়াও করবেন, তার কাছে শাস্তি পেতে হবে। তাই যদি কারও মধ্যে আল্লাহ সদা সর্বদা আমাকে দেখেন– এই উপলব্ধি, এই চেতনা জাগ্রত থাকে, তাহলে সে সব রকম পাপ ও অন্যায়-অপরাধ থেকে মুক্ত থাকতে পারে এবং সে আল্লাহর ওলী হয়ে যেতে পারে।

এক বুযুর্গ তার দুই মুরীদকে পরীক্ষা করতে চাইলেন, তাদের মধ্যে কে আল্লাহর ওলীর স্তরে উপনীত হতে পেরেছে। তিনি তার দুই মুরীদকে ডাকলেন। প্রত্যেকের হাতে একটা করে মুরগি দিয়ে বললেন, এমন স্থানে গিয়ে জবাই করে নিয়ে আস যেখানে কেউ দেখে না। এক মুরীদ তার মুরগিটা জবাই করে নিয়ে এল, আরেকজন জবাই ছাড়াই নিয়ে এল। যিনি জবাই করে নিয়ে এলেন তাকে জিজ্ঞাসা

করা হল, কোথায় গিয়ে জবাই করে নিয়ে এসেছ? জবাব দিলেন যে, ঐ দেয়ালের আড়ালে গিয়ে, কেউ দেখেনি। যিনি জবাই করেননি তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন, কোথাও এমন জায়গা খুঁজে বের করতে পারলাম না, যেখানেই যাই, আল্লাহ তো দেখছেন। তাই জবাই করতে পারিনি। বুযুর্গ এই মুরীদকে খেলাফত দিয়ে দিলেন যে, তার মধ্যে প্রকৃত জিনিস অর্থাৎ, সদা সর্বদা আল্লাহ দেখেন– এই উপলব্ধি, এই চেতনা এসে গেছে, যে চেতনা মানুষকে খাঁটি করে তোলে। বুঝা গেল সদা-সর্বদা আল্লাহ দেখেন এই চেতনা ভেতরে জাগ্রত রাখলে মানুষ ভাল মানুষ হয়ে যায়, খাঁটি মানুষ হয়ে যায়, আল্লাহর প্রিয় বান্দা হয়ে যায়, আল্লাহর ওলী হয়ে যায়।

তাকওয়ার অর্থ

"তাকওয়া" শব্দটি আরবী। ফার্সীতে এর অর্থ করা হয় পরহেযগারী। বাংলা অর্থ হল বিরত থাকা। আর "মুত্তাকী" অর্থ যিনি বিরত থাকেন। মুত্তাকীকে ফার্সীতে বলা হয় পরহেযগার। এখন জানার বিষয় হল মুত্তাকী বা পরহেযগার হতে চাইলে কি কি জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে। ছয়টা জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে, তাহলে পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া পরহেযগারী অর্জিত হবে।

১ নম্বর– কুফ্‌র ও শির্‌ক থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব কি কি জিনিস কুফ্‌র ও শিরক তা জানতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

২ নম্বর– হারাম ও গোনাহে কবীরা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব কি কি জিনিস হারাম ও গোনাহে কবীরা তা জানতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৩ নম্বর– গোনাহে ছগীরা থেকে বিরত থাকতে হবে। অতএব কি কি জিনিস গোনাহে সগীরা তা জানতে হবে এবং তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কি কি জিনিস কুফর ও শিরক, কি কি জিনিস গোনাহে কবীরা এবং কি কি জিনিস গোনাহে সগীরা তার একটি তালিকা সামনে পেশ করা হবে।

৪ নম্বর– যেখানে হালাল না হারাম–এই সন্দেহ থাকে সেখান থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন– আপনার কোন আত্মীয়ের আপনার অফিসে কোন কাজ আছে। এ অবস্থায় সে আপনার বাসায় কোন জিনিস নিয়ে এল। এখন সন্দেহ হয় যে, সে এই জিনিস অফিস থেকে কাজ উদ্ধারের জন্য নিয়ে এসেছে, নাকি আত্মীয় হিসাবে নিয়ে এসেছে। অফিস থেকে কাজ উদ্ধারের জন্য এনে থাকলে সেটা হবে ঘুষ যা গ্রহণ করা হারাম হবে। আর আত্মীয় হিসাবে এনে থাকলে সেটা হবে হাদিয়া যা গ্রহণ করা হালাল হবে। এখানে যেহেতু উভয় দিকের সন্দেহ রয়েছে তাই তাকওয়া পরহেযগারী হল এ থেকে বিরত থাকা।

৫ নম্বর– অনর্থক কাজ ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকতে হবে। হাদীছে এসেছে–

مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيْهِ. (سنن الترمذي ٢٣١٧)

অর্থাৎ, মানুষের ইসলামের সৌন্দর্য হল অনর্থক কাজ ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকা। এ হাদীছের ভাবার্থ হল– সুন্দর মুসলমান হওয়ার জন্য অনর্থক কাজ ও অনর্থক কথা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬ নম্বর– যেসব মোবাহ কাজ গোনাহের দিকে টেনে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকতে হবে। যেমন– মাগরিবের নামাযের পরে ঘুম পড়া মোবাহ বা জায়েয। কিন্তু এই মোবাহ কাজ অন্য একটা গোনাহের দিকে টেনে নিতে পারে। তাহল ঘুমিয়ে পড়লে ঈশার নামায কাযা হয়ে যেতে পারে। তাই তাকওয়া পরহেযগারী হল এ সময় ঘুমানো থেকে বিরত থাকা। এমনিভাবে যে কোন মোবাহ কাজ যা কোন গোনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে তা থেকে বিরত থাকা তাকওয়া।

এখানে একটা কথা উল্লেখ্য যে, অনেকে তাকওয়া-র অর্থ করে থাকেন খোদাভীতি তথা আল্লাহর ভয়। বস্তুত খোদাভীতি বা আল্লাহর ভয় আসলে মানুষ গোনাহ থেকে বিরত থাকতে পারে তাই তাকওয়ার অর্থ করা হয় খোদাভীতি, নইলে তাকওয়া শব্দের মূল অর্থ হল বিরত থাকা তথা উপরোক্ত ছয়টা জিনিস থেকে বিরত থাকা।

এই ছয়টা জিনিস থেকে বিরত থাকলে পূর্ণাঙ্গ তাকওয়া পরহেযগারী অর্জিত হবে এবং এর দ্বারা মানুষ পূর্ণ মুক্তাকী, খাঁটি মুত্তাকী হতে পারবে।

সংক্ষেপে কুফর শিরক থেকে বিরত থাকা, কবীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকা, সগীরা গোনাহ থেকে বিরত থাকা, সন্দেহপূর্ণ জিনিস থেকে রিবত থাকা, অনর্থক কাজ থেকে বিরত থাকা এবং গোনাহের দিকে নিয়ে যেতে পারে এমন মোবাহ জিনিস থেকেও বিরত থাকা- এই হল তাকওয়া বা পরহেযগারী।

এখন কি কি জিনিস কুফর ও শিরক তথা কি কি জিনিস ঈমান-বিরোধী তা, "যদি খাঁটি মুমিন হতে চান" শিরোনামে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কি কি জিনিস কবীরা গোনাহ ও কি কি জিনিস সগীরা গোনাহ তার একটি তালিকা "আহকামে যিন্দেগী" থেকে উদ্ধৃত করা হল।

কবীরা গোনাহ বা বড় গোনাহের তালিকা

১. শির্ক।

২. মা-বাপের নাফরমানী করা অর্থাৎ, তাদের হক আদায় না করা।

৩. "কাত্য়ে রেহ্মী" করা অর্থাৎ, যেসব আত্মীয়ের সাথে রক্তের সম্পর্ক রয়েছে তাদের সাথে অসদ্ব্যবহার করা তথা তাদের হক নষ্ট করা।

৪. যেনা করা অর্থাৎ, নারীর সতীত্ব নষ্ট করা এবং পুরুষের চরিত্র নষ্ট করা।

৫. বালকদের সাথে কুকর্ম করা।

৬. হস্ত মৈথুন করা।

৭. প্রাণীর সাথে কুকর্ম করা।

৮. আমানতের খেয়ানত করা।

৯. মানুষ খুন করা।

১০.মিথ্যা তোহ্মত বা অপবাদ লাগানো, বিশেষভাবে যেনার অপবাদ লাগানো।

১১. মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

১২. সাক্ষ্য গোপন করা, যখন অন্য কেউ সাক্ষ্য দেয়ার না থাকে।

১৩. যাদু দ্বারা কারও ক্ষতি সাধনের চেষ্ট করা।

১৪. যাদু শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া।

১৫. অঙ্গীকার ভঙ্গ করা, ওয়াদা খেলাফ করা, কথা দিয়ে তা ঠিক না রাখা।

১৬. গীবত করা। অর্থাৎ, কারও পশ্চাতে তার দোষ-ত্রুটি অন্যের সামনে বর্ণনা করা।

১৭.স্বামীর বিরুদ্ধে স্ত্রীকে, মনীবের বিরুদ্ধে চাকরকে, উস্তাদের বিরুদ্ধে শাগরেদকে, রাজার বিরুদ্ধে প্রজাকে, কর্তার বিরুদ্ধে কর্মচারীকে ক্ষেপিয়ে তোলা।

১৮. নেশা করা।

১৯. জুয়া খেলা।

২০. সুদ রয়েছে অনেক প্রকারের– সরল সুদ, চক্রবৃদ্ধি সুদ ইত্যাদি সর্বপ্রকারের সুদই মহাপাপ। সুদদাতা, সুদগ্রহীতা, সুদের লেন-দেনে সাক্ষদাতা ও সুদ বিষয়ক লেন-দেনের দলীল লেখক সকলের প্রতি রসূল (সা.) লা'নত করেছেন। সকলেরই কবীরা গোনাহ হয়।

২১. ঘুষ বা রেশওয়াত প্রদান ও গ্রহণের কারণে আল্লাহ্র অভিশাপ অবতীর্ণ হয়, এটা মহাপাপ। তবে জালেমের জুলুমের কারণে নিজের হক আদায় করার জন্য ঠেকায় পড়ে ঘুষ দিলে তা পাপ নয়। কিন্তু ঘুষ দিয়ে কার্য উদ্ধার করার মনোবৃত্তি ভাল নয়। যাদের বেতন ধার্য আছে তারা কর্তব্য কাজ করে দিয়ে অতিরিক্ত যা কিছু গ্রহণ করে সবই ঘুষ, চাই একটা সিগারেট বা এক কাপ চা বা একটা পানই হোক না কেন।

২২. অন্যায়ভাবে কারও স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি হরণ বা ভোগ দখল করা।

২৩. অনাথ, এতীম, নিরাশ্রয় বা বিধবার মাল গ্রাস করা।

২৪. খোদার ঘর যিয়ারতকারী তথা হজ্জযাত্রীদের প্রতি দুর্ব্যবহার করা।
২৫. মিথ্যা কছম করা।
২৬. গালি দেয়া।
২৭. অশ্লীল কথা বলা।
২৮. জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা।
২৯. ধোঁকা দেয়া।
৩০. অহংকার করা।
৩১. চুরি করা।
৩২. ডাকাতি ও লুটতরাজ করা, এমনিভাবে পকেট মারা, ছিনতাই করা।
৩৩. নাচ, গান-বাদ্য সিনেমা ইত্যাদি করা ও দেখা।
৩৪. স্বামীর নাফরমানী করা, অর্থাৎ, স্বামীর হক আদায় না করা।
৩৫. জায়গা জমির আইল (সীমানা) নষ্ট করা।
৩৬. শ্রমিক থেকে কাজ পূর্ণ নিয়ে তার পূর্ণ মজুরি না দেয়া বা পূর্ণ মজুরি দিতে টাল-বাহানা করা।
৩৭. মাপে কম দেয়া।
৩৮. মালে মিশাল দেয়া।
৩৯. খরীদ্দারকে ধোঁকা দেয়া।
৪০. দাইয়ূছিয়াত অর্থাৎ, নিজের বিবিকে বা অধীনস্থ কোন নারীকে পর পুরুষের সঙ্গে মেলামেশা করতে দেয়া, পর পুরুষের বিছানায় যেতে দেয়া, এসবের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা।
৪১. চোগলখুরী করা।
৪২. গণকের কাছে যাওয়া।
৪৩. মানুষ বা অন্য কোন জীবের ফটো আদর করে ঘরে রাখা।
৪৪. পুরুষের জন্য সোনার আংটি পরিধান করা।
৪৫. পুরুষের জন্য রেশমী পোশাক পরিধান করা।
৪৬. শরীরের রূপ ঝলকে ওঠে- মেয়েলোকদের জন্য এমন পাতলা পোশাক পরিধান করা।
৪৭. মহিলাদের জন্য পুরুষের এবং পুরুষের জন্য মহিলার পোশাক পরিধান করা।
৪৮. গর্বভরে লুঙ্গি, পায়জামা, জামা ও প্যান্ট পায়ের টাখনু গিরার নিচে ঝুলিয়ে পরিধান করা ও চলা।
৪৯. বংশ বদলানো অর্থাৎ, পিতৃ পরিচয় বদলে দেয়া।

৫০. মিথ্যা মোকাদ্দমা করা, মিথ্যা মোকাদ্দমার পরামর্শ প্রদান, তদবীর ও পায়রবী করাও কবীরা গোনাহ।

৫১. মৃত ব্যক্তির শরীয়তসম্মত ওছিয়ত পালন না করা।

৫২. কোন মুসলমানকে ধোঁকা দেয়া।

৫৩. গুপ্তচরবৃত্তি করা, অর্থাৎ, মুসলমান সমাজের এবং মুসলমান রাষ্ট্রের গুপ্ত ভেদ ও দুর্বল পয়েন্টের কথা অন্য সমাজের লোকের কাছে, অন্য রাষ্ট্রের কাছে প্রকাশ করা।

৫৪. কাউকে মেপে দিতে কম দেয়া এবং মেপে নিতে বেশি নেয়া।

৫৫. টাকা বা নোট জাল করা।

৫৬. ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত প্রহরায় ক্রুটি করা।

৫৭. দেশের জরুরি রসদ, খাদ্য বা হাতিয়ার চোরাচালান বা পাচার করা।

৫৮. রাস্তা-ঘাটে, ছায়াদার কিংবা ফলদার বৃক্ষের নিচে মল-মূত্র ত্যাগ করা।

৫৯. বাড়ি-ঘর, আনাচ-কানাচ, থালা-বাসন, কাপড়-চোপড় নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন করে রাখা।

৬০. হায়েয বা নেফাছ অবস্থায় স্ত্রী সহবাস করা।

৬১. মলদ্বারে স্ত্রী সহবাস করা।

৬২. যাকাত না দেয়া।

৬৩. ইচ্ছা পূর্বক ওয়াক্তিয়া নামায কাযা করা।

৬৪. জুমুআর নামায না পড়া।

৬৫. বিনা ওজরে রোযা ভাঙ্গা।

৬৬. রিয়া তথা লোক দেখানোর জন্য ইবাদত করা।

৬৭. জনগণের কষ্ট হওয়া সত্ত্বেও দাম বাড়ানোর জন্য জীবিকা নির্বাহোপযোগী খাদ্য-দ্রব্য, জিনিসপত্র গোলাজাত করে রাখা।

৬৮. মানুষের কষ্ট হয় এমন খাদ্য-দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি দেখে খুশী হওয়া।

৬৯. ষাঁড় বা পাঠার দ্বারা গাভী বা ছাগী পাল দিতে না দেয়া। পাল দেয়ার জন্য বিনিময় গ্রহণ করা জায়েয নয়।

৭০. প্রতিবেশীকে (ভিন্ন জাতির হলেও) কষ্ট দেয়া।

৭১. পাড়া প্রতিবেশীর ঝী-বৌকে কু-নজরে দেখা।

৭২. মাল থাকা বা মাল উপার্জনের শক্তি থাকা সত্ত্বেও লোভের বশবর্তী হয়ে সওয়াল করা।

৭৩. জনগণ চায় না তা সত্ত্বেও তাদের নেতৃত্ব দেয়া।

৭৪. কারণ ছাড়াই স্ত্রীর স্বামী সহবাসে অসম্মত হওয়া।

৭৫. পরের দোষ দেখে বেড়ানো।

৭৬. কারও জান, মাল বা ইজ্জতের হানি করা।

৭৭. নিজের প্রশংসা করা।

৭৮. বিনা দলীলে কারও প্রতি বদগোমানী করা।

৭৯. ইল্‌মে দ্বীনকে তুচ্ছ মনে করে ইল্‌মে দ্বীন হাছিল না করা বা হাছিল করে আমল না করা।

৮০. এমন কথা যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেননি বা এমন কোন কাজ যা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি- সে সম্পর্কে এরূপ বলা যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন বা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেছেন।

৮১. হজ্জ ফরয হওয়া সত্ত্বেও হজ্জ করা ব্যতীত মৃত্যুবরণ করা। তবে মৃত্যুর সময় বদলী হজ্জের ওছিয়ত বা ব্যবস্থা সম্পন্ন করে গেলে পাপমুক্ত হতে পারবে।

৮২. কোন সাহাবীকে মন্দ বলা, সাহাবীদের সমালোচনা করা।

৮৩. হযরত আলী (রা.)-কে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা.) থেকে শ্রেষ্ঠ বলা।

৮৪. কোন নারীকে তার স্বামীর কাছে গমন ও স্বামীর হক আদায়ে বাধা দেয়া।

৮৫. কোন অন্ধকে ভুল পথ দেখিয়ে দেয়া।

৮৬. পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করা ও অশান্তি ছড়ানো, ফ্যাসাদ করা।

৮৭. কাউকে কোন পাপ কাজে উদ্বুদ্ধ করা ও পাপ কাজে সহযোগিতা করা।

৮৮. কোন গোনাহে সগীরার উপর হটকারিতা করা।

৮৯. পেশাবের ছিটা থেকে সাবধান সতর্ক না থাকা।

৯০. কোন দান-সদকা করে বা হাদিয়া-উপঢৌকন দিয়ে খোঁটা দেয়া।

৯১. অনুগ্রহকারীর না-শুকরী করা।

৯২. কোন মুসলমান ভাইকে ছুরি, চাকু, তলোয়ার ইত্যাদি লৌহ অস্ত্র দ্বারা ইশারা করে ভয় দেখানো।

৯৩. দাবা ও ছক্কা পাঞ্জা খেলা। আরও কতিপয় খেলা রয়েছে যা হারাম ও কবীরা গোনাহ।

৯৪. বিনা জরুরতে লোকের সামনে সতর খোলা।

৯৫. মেহমানের খাতির ও আদর যত্ন না করা।

৯৬. হাসি-ঠাট্টা করে কাউকে অপমানিত করা।

৯৭. স্বজন প্রীতি করা।

৯৮. অন্যায় বিচার করা।

৯৯. নিজে ইচ্ছা করে, দাবি করে পদপ্রার্থী হওয়া বা পদ গ্রহণ করা। তবে কোন ক্ষেত্রে যদি এমন হয় যে, তিনিই একমাত্র উক্ত পদের যোগ্য, তিনি উক্ত পদ গ্রহণ না করলে বৃহত্তর জনগোষ্ঠির স্বার্থ নষ্ট হবে, তাহলে সে ক্ষেত্রে পদ চাওয়া হলে তা ভিন্ন কথা।

১০০. ইসলামী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা।

১০১. নিজের বিবি-বাচ্চার খবর-বার্তা না নিয়ে তাদেরকে নষ্ট হয়ে যেতে দেয়া।

১০২. খতনা না করা।

১০৩. অসৎ ও অন্যায় কাজ দেখে পারতপক্ষে তাতে বাধা না দেয়া।

১০৪. জালেমের প্রশংসা বা তোষামোদ করা।

১০৫. অন্যায়ের সমর্থন করা।

১০৬. আত্মহত্যা করা।

১০৭. স্বেচ্ছায় নিজের কোন অঙ্গ নষ্ট করা।

১০৮. স্ত্রী সহবাস করে গোসল না করা।

১০৯. প্রিয়জন বিয়োগে সিনা পিটিয়ে বা চিৎকার করে কাঁদা।

১১০. স্ত্রী পুরুষের নাভীর নিচের পশম, বগলের পশম বর্ধিত করে রাখা।

১১১. উস্তাদ ও পীরের সঙ্গে বেয়াদবী করা, হাফেজ ও আলেমের অমর্যাদা করা, তাদের সাথে বেয়াদবী করা।

১১২. প্রাণীর ছবি তৈরি করা বা ব্যবহার করা।

১১৩. শুকরের গোস্ত খাওয়া।

১১৪. কোন হারাম দ্রব্য ভক্ষণ করা।

১১৫. ষাঢ়, কবুতর বা মোরগ ইত্যাদির লড়াই লাগানো।

১১৬. কুরআন শরীফ পড়ে ভুলে যাওয়া। (কোন রোগের কারণে হলে তা ভিন্ন কথা) কেউ কেউ বলেছেন, ভুলে যাওয়ার অর্থ এমন হয়ে যাওয়া যে, দেখেও আর পড়তে পারে না।

১১৭. কোন জীবকে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে হত্যা করা কবীরা গোনাহ। তবে সাপ, বিচ্ছু, ভীমরুল ইত্যাদি কষ্টদায়ক জীব থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় না থাকলে ভিন্ন কথা।

১১৮. আল্লাহ্র রহ্মত থেকে নিরাশ হওয়া।

১১৯. আল্লাহ্র আযাব থেকে নির্ভীক হওয়া।

১২০. মৃত প্রাণী খাওয়া।

১২১. হালাল জীবকে আল্লাহ্র নামে জবাই না করে অন্য কারও নামে জবাই করে বা অন্য কোন উপায়ে মেরে খাওয়া।

১২২. অপব্যয় করা।

১২৩. বখীলী বা কৃপণতা করা।

১২৪. রাজকীয় ক্ষমতা হাতে থাকা সত্ত্বেও ইসলামী আইন সমর্থন না করে অনৈসলামিক আইন সমর্থন করা।

১২৫. ইসলামী আইন হওয়া সত্ত্বেও ইসলামী আইন অমান্য করা বা রাষ্ট্রদ্রোহিতা করা।

১২৬. ছোট জাত, ছোট পেশাদার বলে বা জোলা, তেলি, কুমার, কামার, বান্দীর বাচ্চা ইত্যাদি বলে কাউকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা বা খোঁটা দেয়া।

১২৭. বিনা এজাযতে কারও বাড়ির ভেতরে বা ঘরের ভেতরে প্রবেশ করা কিংবা তাকানো।

১২৮. লুকিয়ে কারও কথা শোনা।

১২৯. ছুরত শেকেলের কারণে বা গরীব হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে টিট্‌কারি বা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করা।

১৩০. কোন মুসলমানকে কাফের বলা।

১৩১. কোন মুসলমানের সাথে উপহাস করা।

১৩২. একাধিক স্ত্রী থাকলে তাদের মধ্যে সমতা রক্ষা না করা।

১৩৩. কোন খাদ্যকে মন্দ বলা। (তবে রান্নার ত্রুটি বর্ণনা করা হলে তা খাদ্যকে মন্দ বলার অন্তর্ভুক্ত নয়।)

১৩৪. দুনিয়ার মহব্বত। অর্থাৎ, দ্বীনের মোকাবেলায় দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়া।

১৩৫. দাড়ি বিহীন বালকের প্রতি খাহেশাতের নজরে তাকানো।

১৩৬. গায়রে মাহ্‌রাম স্ত্রী লোকের নিকট একা একা বসা।

১৩৭. কাফেরদের রীতিনীতি পছন্দ করা।

(ماخوذاز فروع الایمان، تعلیم الدین، گناہ بے لذت نقلا عن انذار العشائر من الصغائر والکبائر وغیرہا)

সগীরা গোনাহের বিবরণ ও তার একটি তালিকা

নিম্নে সগীরা বা ছোট গোনাহের একটি মোটামুটি তালিকা পেশ করা হল। তবে উল্লেখ্য যে, এই তালিকার মধ্যকার অনেক গোনাহকে অনেকে কবীরা গোনাহ বলেও আখ্যায়িত করেছেন। আবার পূর্বে উল্লেখিত কবীরা গোনাহের তালিকায় উল্লেখিত কোন কোন গোনাহকে সগীরা গোনাহ বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে।

আসলে একটি গোনাহকে তার চেয়ে বড় গোনাহের তুলনায় ছোট বলা যায়, আবার তার চেয়ে ছোট গোনাহের তুলনায় তাকে বড় গোনাহও বলা যায়। আবার এক হিসাবে কোন গোনাহই ছোট নয়, কেননা সেটাও তো আল্লাহরই নাফরমানী। যেমনঃ ছোট সাপও ধ্বংসকারী, বড় সাপও জীবন ধ্বংসকারী– এরূপ বিচারে কোন সাপই ছোট অর্থাৎ, অবহেলার নয়। অতএব এ দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো পাপকেই তুচ্ছ বা ছোট মনে করতে নেই। আর সগীরা বা ছোট গোনাহের উপর হটকারিতা করলে তা কবীরা গোনাহ হয়ে দাঁড়ায়। যাহোক স্বাভাবিকভাবে যেগুলোকে সগীরা গোনাহ বলা হয় তার একটি মোটামুটি তালিকা এই:

১. কোন মানুষ বা প্রাণীকে লা'নত (অভিশাপ) দেয়া।

২. না জেনে কোন পক্ষে ঝগড়া করা কিংবা জানার পর অন্যায় পক্ষে ঝগড়া করা।

৩. ইচ্ছাকৃতভাবে নামাযে হাসা বা কোন বিপদের কারণে নামাযের মধ্যে ক্রন্দন করা।

৪. ফাসেক লোকদের সাথে উঠাবসা করা।

৫. মাকরূহ ওয়াক্তে নামায পড়া।

৬. কোন মসজিদে নাপাক প্রবেশ করানো।

৭. মসজিদে পাগল বা এমন ছোট শিশুকে নিয়ে যাওয়া, যার দ্বারা মসজিদের পবিত্রতা নষ্ট হওয়ার আশংকা থাকে।

৮. পেশাব পায়খানার সময় কেবলার দিকে মুখ বা পিঠ করে বসা।

৯. উলঙ্গ হয়ে গোসল করা, যদিও ঘেরা স্থানে এবং লোকদের অগোচরে গোসল করা হোক।

১০. কোন স্ত্রীর সাথে যিহার করলে কাফফারা আদায় করার পূর্বে তার সাথে সহবাস করা।

স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে তুমি আমার উপর আমার মাতার পৃষ্ঠ দেশের মত (অর্থাৎ, মাতার পিঠের মত হারাম) এরূপ বলাকে "যিহার" বলা হয়। ইসলামপূর্ব কালে স্ত্রীকে নিজের উপর হারাম করার এ একটা বিশেষ পদ্ধতি ছিল। এরূপ বললে কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বে স্ত্রী হালাল হবে না।

১১. সওমে বেসাল করা অর্থাৎ, এমনভাবে কয়েক দিন রোযা রাখা যে, মধ্যে ইফতারীও করবে না।

১২. মাহ্‌রাম পুরুষ ব্যতীত নারীর জন্য সফর করা।

১৩. কেউ ক্রয়ের জন্য কথা-বার্তা বলছে বা বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে এখনও উত্তর মেলেনি এরই মধ্যে অন্য কারও দর বলা বা প্রস্তাব দেয়া।

১৪. বার থেকে শহরে যে মাল আসছে সেটা শহরের বাইরে গিয়ে ক্রয় করা। (এভাবে মধ্যস্বত্ব ভোগীর কারণে শহরে এসে মালের দাম বৃদ্ধি পায়।)

১৫. জুমুআর (প্রথম) আযান হওয়ার পর ক্রয়-বিক্রয় করা এবং অন্যান্য দুনিয়াবী কাজ করা। অবশ্য জুমুআর দিকে চলন্ত অবস্থায় বেচা-কেনা করলে তাতে পাপ হবে না, কারণ অনুরূপ ক্রয়-বিক্রয় জুমুআর নামাযের জন্য ব্যাঘাত ঘটায় না।

১৬. শখ করে কুকুর লালন-পালন করা। মালামাল ও ফসল সংরক্ষণের জন্য কিংবা শিকারের উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করা জায়েয।

১৭. অতি নগন্য বস্তু চুরি করা।

১৮. দাঁড়িয়ে পেশাব করা।

১৯. গোসলখানায় কিংবা পানির ঘাটে পেশাব করা।

২০. নামাযে সাদল (سدل) করা অর্থাৎ, অস্বাভাবিকভাবে কাপড় ঝুলিয়ে রাখা।

২১. গোসল ফরয- এরূপ অবস্থায় আযান দেয়া।

২২. গোসল ফরয- এরূপ অবস্থায় বিনা ওজরে মসজিদে প্রবেশ করা।

২৩. গোসল ফরয- এরূপ অবস্থায় মসজিদে বসা।

২৪. নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রেখে দাঁড়ানো।

২৫. নামাযে লম্বা চাদর এমনভাবে শরীরে জড়ানো যাতে হাত বের করা মুশকিল হয়।

২৬. নামাযে অযথা শরীর নিয়ে খেলা করা অর্থাৎ, বিনা প্রয়োজনে কোন অঙ্গ নাড়াচাড়া করা বা কাপড় ওলট-পালট করা।

২৭. নামাযীর সামনে তার দিকে তাকিয়ে বসা বা দাঁড়ানো।

২৮. নামাযে ডানে বামে অথবা উপরের দিকে তাকানো।

২৯. মসজিদে দুনিয়াবী কথা-বার্তা বলা।

৩০. ইবাদত নয় এরূপ কোন কাজ মসজিদে করা।

৩১. রোযা অবস্থায় স্ত্রীর সাথে নিরাভরণ হয়ে জড়াজড়ি করা।

৩২. রোযা অবস্থায় স্ত্রীকে চুমু দেয়া। (যদি আরও আগে বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকে)।

৩৩. নিকৃষ্ট মাল দ্বারা যাকাত আদায় করা।

৩৪. গলার পশ্চাদ্দিক থেকে প্রাণী জবেহ করা।

৩৫. পঁচা মাছ অথবা মরে ভেসে ওঠা মাছ খাওয়া।

৩৬. বিনা প্রয়োজনে সরকার কর্তৃক দ্রব্যমূল্য নির্দ্ধারণ করে দেয়া।

৩৭. বালেগা বোধ সম্পন্ন নারীর পক্ষে ওলীর এজাযত ব্যতীত বিবাহ বসা (যদি ওলী অহেতুক বিবাহে বাধা দেয়ার না হয়)।

৩৮. "নেকাহে শেগার" করা। অর্থাৎ এমন বিবাহ যাতে মহরের টাকা পয়সার পরিবর্তে নিজের মেয়েকে বিবাহ দেয়া হয়।

৩৯. স্ত্রীকে একের অধিক তালাক দেয়া।

৪০. স্ত্রীকে বিনা প্রয়োজনে বায়েন তালাক দেয়া এবং (বরং রেজ্য়ী তালাক দেয়া উচিত।)

৪১. হায়েয অবস্থায় তালাক দেওয়া। (খোলা তালাক দেয়া যায়। অর্থের বিনিময়ে স্ত্রীকে স্বামী তালাক দিলে তাকে খোলা তালাক বলে।)

৪২. যে তুহরে সহবাস হয়েছে তাতে তালাক দেয়া।

৪৩. তালাকে রেজ্য়ী প্রদত্ত স্ত্রীকে সহবাস ইত্যাদি দ্বারা রুজু করা। (বরং প্রথমে মৌখিকভাবে রুজু হওয়া চাই।)

৪৪. স্ত্রীকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে ঈলা করা। 'ঈলা' বলা হয় কোন সময়সীমা নির্ধারণ করা ছাড়া অথবা চার মাস কিংবা তারও বেশি সময়ের জন্য স্ত্রী গমন না করার শপথ করাকে। এরূপ শপথ করার পর চার মাসের মধ্যে শপথ ভঙ্গ করলে অর্থাৎ, স্ত্রী গমন করলে শপথ ভঙ্গ করার কাফ্ফারা দিতে হবে এবং স্ত্রী বহাল থাকবে- তালাক হবে না। আর চার মাসের মধ্যে উক্ত স্ত্রীকে ব্যবহার না করলে চার মাস শেষ হওয়ার সাথে সাথে উক্ত স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে।

৪৫. সন্তানদেরকে কোন মাল ইত্যাদি দেয়ার ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা না করা।

৪৬. বিচারক কর্তৃক বাদী বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানী ও তাদের প্রতি মনোযোগ প্রদানে সমতা রক্ষা না করা।

৪৭. কোন যিম্মি কাফেরকে কাফের বলে সম্বোধন করা। (যদি সে এরূপ সম্বোধনে কষ্টবোধ করে।)

৪৮. বাদশার এনআম কবূল না করা।

৪৯. যার হালাল সম্পদের পরিমাণ কম, হারামের পরিমাণ বেশি বিনা ওজরে তাহকীক-তদন্ত ছাড়া তার দাওয়াত ও হাদিয়া গ্রহণ করা।

৫০. কোন প্রাণীর নাক কান প্রভৃতি কেটে দেয়া।

৫১. জবর দখলকৃত জমিতে প্রবেশ করা, এমনকি নামাযের জন্য হলেও।

৫২. কোন মুরতাদ বা অমুসলিম রাষ্ট্রের কাফেরকে তিন দিন পর্যন্ত তওবা করত মুসলমান হওয়ার দাওয়াত প্রদান করার পূর্বে হত্যা করে দেয়া।

৫৩. নামাযে পাঠ করার জন্য কোন বিশেষ সূরা নির্ধারিত করা।

৫৪. নামাযে যে সাজদায়ে তিলাওয়াত ওয়াজিব হয় সেটাকে বিলম্বিত করা বা ছেড়ে দেয়া।
৫৫. বিনা প্রয়োজনে একাধিক মুরদারকে এক কবরে দাফন করা।
৫৬. জানাযার নামায মসজিদের ভিতরে পড়া।
৫৭. ডানে কিংবা বাঁয়ে ফটো রেখে নামায পড়া বা ফটোর উপর সাজদা করা।
৫৮. স্বর্ণের তার দিয়ে দাঁত বাঁধাই করা।
৫৯. মৃত ব্যক্তির চেহারায় চুমু দেওয়া।
৬০. ইসলাম বিরোধী কোন সম্প্রদায়ের নিকট অস্ত্র বিক্রয় করা।
৬১. বালেগদের জন্য নিষিদ্ধ- এমন কোন পোশাক শিশুদেরকে পরিধান করানো।
৬২. স্ত্রীর সাথে এমন কারও সামনে সংগম করা যে বোঝে এবং হুশ রাখে, যদিও সে ঘুমিয়ে থাকে। (খুব ছোট শিশুর বেলায় ভিন্ন কথা)
৬৩. কোন আমীর বা শাসকের অভ্যর্থনায় বের হওয়া।
৬৪. রাস্তায় এমন স্থানে দাঁড়ানো বা বসা, যাতে অন্যদের চলতে অসুবিধা হয়।
৬৫. আযান শোনার পর ওজর বা জরুরি কাজ ব্যতীত ঘরে বসে বসে একামতের অপেক্ষা করতে থাকা।
৬৬. পেট ভরার পরও অতিরিক্ত খাওয়া। (রোযা বা মেহমানের কারণে কিছু বেশি খাওয়া হলে তা ব্যতিক্রম।)
৬৭. ক্ষুধা লাগা ছাড়াও খাওয়া। (রোগের অবস্থা ব্যতিক্রম)
৬৮. খুতবার সময় কথা বলা।
৬৯. মসজিদে মানুষের ঘাড়ের উপর দিয়ে সামনে যাওয়া।
৭০. মানুষের চলার পথে নাপাকী ফেলা।
৭১. মসজিদের ছাদে নাপাকী ফেলা।
৭২. নিজের সাত বৎসরের চেয়ে অধিক বয়স্ক ছেলের সঙ্গে এক বিছানায় শয়ন করা।
৭৩. অহেতুক কাজে ও কথায় সময় নষ্ট করা।
৭৪. কারও প্রশংসায় অতিরঞ্জন করা।
৭৫. কথা বলতে গিয়ে ছন্দ মিলানোর কসরৎ করা।
৭৬. হাসি-ফুর্তিতে সীমালংঘন করা।
৭৭. কারও গুপ্ত কথা ফাঁস করা।
৭৮. সাথী-সঙ্গী ও বন্ধু-বান্ধবদের হক আদায়ে ত্রুটি করা।
৭৯. ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও আপনজন ও বন্ধু-বান্ধবকে জুলুম থেকে বিরত না রাখা।

৮০. বিনা ওজরে হজ্জ বা যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা। কেউ কেউ এটাকে কবীরা গোনাহের তালিকাভুক্ত করেছেন।

(گناہ بے لذت থেকে গৃহীত)

উল্লেখিত কবীরা ও সগীরা গোনাহের উপরোক্ত তালিকার মধ্যে এমন অনেক বিষয় রয়েছে যে সম্বন্ধে বিস্তারিত জানা আবশ্যক। বিস্তারিত জানার জন্য আহকামে যিন্দেগী দেখুন।

গোনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে আল্লাহ ব্যবস্থা করে দেন

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে যে, এতসব গোনাহ থেকে বেঁচে থাকা কি সম্ভব? এর উত্তর হল কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। আন্তরিকভাবে চাইলে আল্লাহ সহজ করে দেন, এবং সব ব্যবস্থা করে দেন। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ঘটনা আমরা জানি। জুলায়খা একে একে সাতটা দরজা বন্ধ করে হযরত ইউসুফ (আ.) কে ভিতরের এক রুমে নিয়ে গিয়ে যেনার প্রস্তাব দিয়েছিল। হযরত ইউসুফ (আ.)-এর ভিতরে তাকওয়া তথা আল্লাহর ভয় জাগ্রত ছিল। তিনি যেনা থেকে বাঁচতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বাঁচার উপায় কী? সবগুলো দরজায় তালা লাগিয়ে দেয়া হয়েছিল। দৌড় দিয়েও পালাবার কোনো পথ নেই। কিন্তু আল্লাহর ভয়ে গোনাহ থেকে বাঁচার জন্য তিনি দৌড় দিয়েছেন, এক এক দরজার সামনে গিয়েছেন আর সেই দরজা খুলে গিয়েছে। এভাবে একে একে সব দরজা খুলে গেছে। তিনি গোনাহ থেকে বাঁচতে চেয়েছেন, সমস্যা দেখা দিয়েছে আল্লাহ পাক সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন।

গোনাহ থেকে বাঁচতে চাইলে আল্লাহ তার ব্যবস্থা করে দেন– এর আরও একটি ঘটনা শুনুন। ফকীহ আবুল লাইছ সামারকান্দী তার প্রসিদ্ধ কিতাব তাম্বীহুল গাফিলীনে ঘটনাটি লিখেছেন। আমি ঘটনাটি সংক্ষেপে বর্ণনা করছি। বনী ইসরাঈলদের একজন পরহেজগার মানুষ টুকরি বিক্রি করে তার জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন টুকরি বিক্রি করতে করতে বাদশাহর বাড়ির সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। রাণীর এক দাসী দেখল যে, এত সুন্দর একজন মানুষ টুকরি বিক্রি করছে, এরকম সুন্দর চেহারার মানুষ আর সে কখনও দেখেনি। সে ভেতরে গিয়ে রাণীকে খবর দিল, রাণীমা! এরকম সুন্দর পুরুষ আর কখনও দেখিনি। রাণী বলল, তাকে ভেতরে ডেকে আন! তাকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হল। রাণীর হাবভাবে সে বুঝল যে, রাণীর উদ্দেশ্য ভাল নয়। রাণী তাকে পাপ কাজে জড়াতে চায়। সে রাণীকে বলল যে, আপনার ঘরের ছাদের উপরে কি একটু উঠা যাবে, আমি একটু উযূ করতে চাই। রাণী বুঝতে পারেনি যে, উযূ করলে তো ঘরেই করতে পারে ছাদে কেন উঠতে চায়। যা

হোক ছাদে উঠার ব্যবস্থা করা হল। রাণী ভেতরে আছে, ভাবছে ও যাবে কোথায়? লোকটি ছাদের উপরে গিয়ে চিন্তা করছে সত্তর বৎসর ইবাদত- বন্দেগী করে আল্লাহর যতটুকু নৈকট্য অর্জন করলাম, আজ তো সব শেষ হয়ে যাবে। এখন ছাদ থেকে পড়ে যাওয়া ব্যতীত এই গোনাহ থেকে বাঁচার আর কোনো উপায় নেই। সে এই চিন্তা করছিল। ইতিমধ্যে আল্লাহ পাক হযরত জিব্রাঈল (আ.) কে বললেন, জিব্রাঈল! তোমার ডানা বিছিয়ে দাও। ডানার উপরে করে তাকে নিচে নামিয়ে নিয়ে আন। হযরত জিব্রাঈল (আ.) তাই করলেন। এই ঘটনা থেকে এটাই স্পষ্ট বুঝা যায়, কেউ যদি কোন পাপ থেকে বাঁচতে চায় আল্লাহ পাক তার জন্য সেই পাপ থেকে বাঁচার ব্যবস্থা করে দেন।

তাকওয়ার চেতনা অর্জনের উপায়

তাকওয়ার চেতনা অর্জনের বিশেষ ৪টি পদ্ধতি রয়েছে। যথা:-

(১) তাক্ওয়ার চেতনা অর্জনের তথা মনের মধ্যে তাকওয়া বা আল্লাহর ভয় আনার একটি পদ্ধতি হল আল্লাহ সবকিছু দেখেন এই চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত রাখা। আল্লাহ সবকিছু দেখেন এই চিন্তা মনের মধ্যে জাগ্রত রাখলেই তাকওয়া অর্জিত হয় এবং গোনাহ ও অপরাধ থেকে বিরত থাকা সম্ভব হয়। আল্লাহ সবকিছু দেখেন এই চিন্তা এসে গেলে কীভাবে গোনাহ অপরাধ থেকে মুক্ত থাকে- তার একটি ঘটনা শুনুন। একবার হযরত ওমর (রা.) সফরে বের হয়েছিলেন। সফরে একস্থানে তাঁর ক্ষুদা পেল। তিনি দেখলেন একজন রাখাল বকরী চরাচ্ছে। তিনি রাখালকে বললেন, আমাকে এক পেয়ালা দুধ পান করাবে কি? রাখালটি বলল, আপনাকে দুধ পান করাতে পারলে তো ভাল ছিল, কিন্তু এই সব বকরীর মালিক আমি নই। কাউকে দুধ পান করানোর জন্য মালিক আমাকে অনুমতি দেয়নি। হযরত ওমর (রা.)-এর অভ্যাস ছিল তিনি ঘুরে ঘুরে মানুষের আমানতদারী, ঈমান আমলের অবস্থা পরীক্ষা করতেন। তিনি উক্ত রাখালের আমানতদারী পরীক্ষা করার জন্য বললেন, আচ্ছা এমন যদি করা হয়- আমি তোমাকে কিছু অর্থকড়ি দিলাম, তুমি আমাকে বকরীটা দিয়ে দিলে, তাহলে আমি দুধও পান করতে পারব আবার প্রয়োজনে এটার গোশতও খেতে পারব। আবার তোমারও কিছু অর্থকড়ি হল। আর মালিক তোমাকে জিজ্ঞাসা করলে বলবে, একটা হিংস্র প্রাণী সেটাকে খেয়ে ফেলেছে। তখন রাখালটি বলল,

يَا هٰذَا فَأَيْنَ اللّٰهُ؟

অর্থাৎ, হে আল্লাহ্‌র বান্দা, তাহলে আল্লাহ কোথায়? তিনি তো দেখবেন। হযরত উমর (রা.) তখন বললেন, তোমার মত মানুষ যতদিন পৃথিবীতে থাকবে, ততদিন দুনিয়ার কোন অকল্যাণ হবে না। (اصلاحی خطبات مولانا تقی عثمانی)

মূলত আল্লাহ আমার সবকিছু দেখেন- এই চিন্তা থাকলে মানুষ অপরাধ করতে পারে না। আল্লাহ সর্বদা দেখেন- এই চিন্তা এসে গেলে মানুষের মধ্যে তাক্‌ওয়া বা আল্লাহ্‌র ভয় এসে যায়। তাই এক আয়াতে তাক্‌ওয়ার নির্দেশ দেয়ার সাথে সাথে একথাও বলে দেয়া হয়েছে যে, জেনে রাখ তোমরা যা কর আল্লাহ তার পুরোপুরি খবর রাখেন। ইরশাদ হয়েছে,

﴿ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ. ﴾

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর আর জেনে রাখ তোমরা যা কিছুই কর আল্লাহ তার খুব খবর রাখেন। (সূরা হাশ্‌র: ১৮)

(২) তাক্‌ওয়ার চেতনা অর্জনের আর একটি পদ্ধতি হল পরকালে হিসাব-নিকাশের চিন্তা জাগ্রত করা। কুরআন শরীফে ইরশাদ হয়েছে,

﴿ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. ﴾

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর অর্থাৎ, তাকওয়া অর্জন কর। আর প্রত্যেকেই যেন চিন্তা করে দেখে পরকালের জন্য সে কী করছে। (প্রাগুক্ত)

এ আয়াতে আল্লাহকে ভয় কর বা তাক্‌ওয়া অর্জন কর- এই কথার সাথে সাথে এই তাক্‌ওয়া কীভাবে আসবে তার একটি পদ্ধতিও বলে দেয়া হয়েছে। তা হল প্রত্যেকটা কাজ করার সময় এই চিন্তা করতে হবে যে, আমাকে এটার পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে। হিসাবে আঁটকে গেলে শাস্তি পেতে হবে। এভাবে প্রত্যেকটা পদে পদে পরকালের চিন্তা করতে থাকলে তাক্‌ওয়া হাছেল হতে থাকবে।

(৩) তাকওয়া অর্জন করার আর একটি পদ্ধতি হল নেককার লোকদের সঙ্গে অর্থাৎ, যাদের মধ্যে তাক্‌ওয়া আছে তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা করা, তাদের সোহবতে থাকা। কুরআনে কারীমের এক আয়াতে বলা হয়েছে,

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ. ﴾

অর্থাৎ, হে মু'মিনরা, তোমরা তাক্‌ওয়া অর্জন কর অর্থাৎ, আল্লাহকে ভয় কর এবং নেককার লোকদের সঙ্গে থাক। (সূরা তাওবা: ১১৯) অর্থাৎ, যাদের ভেতরে

আল্লাহর ভয় আছে এরকম নেককার পরহেজগার লোকদের সংগে ওঠা-বসা কর, তাদের সোহবত অবলম্বন কর।

(৪) তাক্‌ওয়ার চেতনা অর্জনের আর একটি পন্থা হল মুত্তাকী ব্যক্তির সোহবত বা সাহচর্য। বস্তুত তাকওয়া হল এক ধরনের মনের চিন্তা-চেতনা। মনের চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হওয়ার ক্ষেত্রে সোহবত বা সাহচর্যের ব্যাপক প্রভাব রয়েছে। আমি যেরকম মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করব, যে রকম মানুষের সাহচর্যে থাকব, আমার ভেতরে সেরকম চিন্তা-চেতনা আসবে। ব্যবসায়ীদের সঙ্গে ওঠা-বসা করলে ব্যবসার চিন্তা ভেতরে আসতে থাকবে। শিল্পপতির সঙ্গে ওঠা-বসা করলে শিল্পপতি হওয়ার খাহেশ জাগবে। শিক্ষাবিদের সঙ্গে ওঠা-বসা করলে শিক্ষার প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি হবে। বেদ্বীন ফাসেক ফাজেরের সঙ্গে ওঠা-বসা করলে তাদের ফাসেকী চিন্তা আসবে। চোরের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে করতে মানুষ চোর হয়। ডাকাতের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে করতে মানুষ ডাকাত হয়। এভাবে একজন ভাল মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করলে ভাল হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হয়, মুত্তাকী-পরহেযগারদের সাহচর্যে মুত্তাকী-পরহেযগার হওয়ার চেতনা জাগ্রত হয়। আর খারাপ মানুষের সঙ্গে ওঠা-বসা করলে খারাপ হওয়ার চেতনা সৃষ্টি হয়। কবি বলেন,

صحبت صالح ترا صالح کند + صحبت طالح ترا طالح کند

অর্থৎ, নেককারদের সোহবতে মানুষ নেককার হয় আর বদকারদের সোহবতে বদকার হয়। কথায় বলে সৎ সংগে স্বর্গবাস অসৎ সংগে সর্বনাশ। মোট কথা আমি যার কাছে যাব, আমার মধ্যে তার স্বভাবের আছর পড়বে। যেমন: আগুনের স্বভাব গরম, তাই আগুনের কাছে গেলে তাপ লাগে। আর বরফের স্বভাব ঠাণ্ডা, তাই বরফের কাছে গেলে ঠাণ্ডা অনুভব হয়। সোহবতের আছরও এমনই। অতএব মনের মধ্যে তাকওয়ার চেতনা সৃষ্টি করতে খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার ব্যক্তিদের সাহচর্য গ্রহণ করতে হবে।

আল্লাহ আমাদেরকে খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন!

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যদি আল্লাহর ওলী রূপে জীবন গড়তে চান

ত্রয়োদশ অধ্যায়

যদি খাঁটি আল্লাহর ওলী রূপে জীবন গড়তে চান

‘আল্লাহর ওলী’ কথাটির অর্থ

‘ওলী’ (ولي) শব্দের অর্থ নিকটবর্তী, নৈকট্যপ্রাপ্ত। ভাবার্থ প্রিয়। আল্লাহর ওলী অর্থ আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ, আল্লাহর কাছের মানুষ তথা আল্লাহর প্রিয় মানুষ। আমরা এখানে আলোচনা করব কীভাবে আল্লাহর ওলী তথা আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত মানুষ হওয়া যায়, কীভাবে আল্লাহর প্রিয় মানুষ হওয়া যায়।

কারা আল্লাহর ওলী হতে পারেন?

আমরা অনেকে মনে করি আল্লাহর ওলী হতে হলে বুঝি বড় আলেম হতে হয়, বড় হুজুর হতে হয়, বড় পীর-মুরশিদ হতে হয়। মূলত তা নয়। কুরআন-হাদীছে বলা হয়নি যে, আল্লাহর ওলী তথা আল্লাহর প্রিয় হতে হলে বড় আলেম হতে হবে, বড় হুজূর হতে হবে, বড় পীর-মুরশিদ হতে হবে। বরং একজন গর আলেম ব্যক্তিও আল্লাহর ওলী হতে পারেন, একজন ইংরেজি শিক্ষিত মানুষও আল্লাহর ওলী হতে পারেন, একজন অফিস-আদালতের চাকরিজীবীও আল্লাহর ওলী হতে পারেন, একজন কৃষক, একজন দিনমজুর, একজন কুলি, একজন রিক্সাওয়ালা, ঠেলাওয়ালাও আল্লাহর ওলী হতে পারেন। গরীব-ধনী, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, পুরুষ-নারী সকলেই

আল্লাহর ওলী হতে পারেন, যদি আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কুরআন-সুন্নাহ নির্দেশিত শর্ত পূরণ করেন।

আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য শর্ত

কীভাবে আল্লাহর ওলী হওয়া যায়, ওলী হওয়ার জন্য শর্ত কী– এ সম্বন্ধে কুরআনে কারীমের দুটো আয়াতে দিকনির্দেশনা প্রদান করে বলা হয়েছে,

﴿اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ.﴾

অর্থাৎ, জেনে রাখ যারা আল্লাহর ওলী, অবশ্যই তাদের কোনো ভয় নেই, তাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। (ওলী ঐসব লোক) যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অর্জন করে। (সূরা ইউনুসঃ ৬২–৬৩)

এ আয়াতে প্রথমে আল্লাহ তা'আলা ওলীদের সুন্দর পরিণাম সম্পর্কে বলেছেন যে, তাঁদের কোনো ভয় থাকবে না অর্থাৎ, শাস্তির কোনো ভয় থাকবে না। আরও বলা হয়েছে, তাদের কোনো দুঃখ থাকবে না। অর্থাৎ, পরকালের আল্লাহর দেয়া নাজ-নেয়ামত পেয়ে তাঁরা শুধু আনন্দই আনন্দই পাবেন। দুনিয়ার কোন কিছু চিন্তা করে তাদের দুঃখ আসবে না যে, দুনিয়াতে ইবাদত-মুজাহাদা করতে যেয়ে কত কষ্ট হয়েছে, দুনিয়াতে হক-হালাল পন্থায় থাকতে গিয়ে কত অভাব-অনটনের মধ্যে সংসার চালাতে হয়েছে। দুনিয়াতে দ্বীনের পথে চলতে যেয়ে কত মানুষ তাদেরকে কত কষ্ট দিয়েছে, কত টিকা-টিপ্পনী কেটেছে, কত নিন্দা-সমালোচনা ও গালি-গালাজ করেছে। এই সবকিছু তাঁরা ভুলে যাবেন, এগুলোর জন্য তাদের কোনো দুঃখ হবে না। এই হল আল্লাহর ওলীদের সুন্দর পরিণাম। এরপর আল্লাহ তাআলা কারা ওলী তাদের পরিচয় তুলে ধরেছেন। বলেছেন, ওলী হল যারা ঈমান আনে এবং তাকওয়া অর্জন করে।

এ আয়াতদ্বয়ে আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য দুটো বিষয়ের কথা বলা হয়েছে। এক. ঈমান। দুই. তাকওয়া। অর্থাৎ, ওলী হওয়ার জন্য খাঁটি মুমিন হতে হবে আর খাঁটি তাকওয়া-পরহেযগারী অবলম্বন করতে হবে অর্থাৎ, সব রকম গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে। এই উভয় বিষয় সম্বন্ধে আমরা পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। "যদি খাঁটি মুমিন-মুসলমান হতে চান" শিরোনামে প্রথম বিষয় এবং "যদি খাঁটি মুত্তাকী-পরহেযগার হতে চান" শিরোনামে দ্বিতীয় বিষয় সম্বন্ধে বিস্তারিত

আলোচনা করা হয়েছে। উপরোক্ত দুটো শিরোনামের অধীনে যা যা আলোচনা হয়েছে তার উপর আমল করতে পারলেই ইনশাআল্লাহ আল্লাহর ওলী হওয়া সম্ভব হবে।

আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য শত শত রাকআত নফল নামায পড়তে হবে, হাজার হাজার রাত্র জাগরণ করতে হবে– এরকমও কোন শর্ত নেই। তবে নফল ইবাদতের দ্বারা অধিকতর নৈকট্য লাভ হয় একথাটিও স্মরণে রাখতে হবে। (এ সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা রয়েছে।) নফল ইবাদত ওলী হওয়ার জন্য মূল শর্তের অন্তর্ভুক্ত নয়। মূল শর্তের মধ্যে রয়েছে ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে গোনাহ থেকে বিরত থাকা।

ওলী হওয়ার জন্য গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে– এই গোনাহ থেকে বিরত থাকার মধ্যে ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরি ইবাদতের কথাও এসে গেছে। কারণ ফরয ওয়াজিব আদায় না করলে গোনাহ হয়, অতএব গোনাহ থেকে বিরত থাকার মধ্যে ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরি ইবাদত আদায় করার বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত। অতএব এ প্রশ্ন করা অবান্তর যে, শুধু ঈমান আর গোনাহ থেকে বিরত থাকলেই আল্লাহর ওলী হওয়া যাবে, তাহলে কি নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি ফরয ওয়াজিবের উপর আমল করার কোনো প্রয়োজন নেই?

একজন মু'মিন বান্দা ফরয ওয়াজিব তো আমল করবেই, এরপরে খুব বেশি নফল ইবাদত করতে পারুক বা না পারুক, যদি গোনাহ থেকে বিরত থাকে তাহলে সে আল্লাহর ওলী, আল্লাহর প্রিয় মানুষ। এর বিপরীত একজন মু'মিন বান্দা নফল ইবাদত-বন্দেগী অনেক করল, নফল দান-সদকা অনেক করল, কিন্তু গোনাহ থেকে মুক্ত হতে পারল না, তাহলে সে আল্লাহর ওলী নয়।

একজন মু'মিন বান্দা যদি ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি জরুরি ইবাদত আদায় করার পর গোনাহ থেকে বিরত থাকে, তাহলে তার গোনাহের পাল্লা ভারী হবে না, ফলে সে নাজাত পেয়ে যাবে। আরেকজন নেক আমল অনেক করল কিন্তু সাথে সাথে গোনাহও অনেক, তাহলে ঐ কারণে তার গোনাহের পাল্লা ভারী হয়ে যেতে পারে, যার ফলে তাকে জাহান্নামে যেতে হতে পারে। (আল্লাহ পাক যেন আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেন।) সুতরাং ফরয ওয়াজিব ইত্যাদি নেক আমল করার পর নফল ইবাদত-বন্দেগীও করতে হবে, তার ফযীলত তো রয়েছেই, কিন্তু বেশি গুরুত্ব দিতে হবে গোনাহ থেকে বিরত থাকার ওপর। আল্লাহ পাক তাঁর ওলীদের পরিচয় দিতে গিয়ে এই গোনাহ থেকে বিরত থাকার কথাই উল্লেখ করেছেন। এ থেকে বুঝা গেল গোনাহ হতে বিরত থাকার ওপর জোর দিতে হবে। সারকথা, আল্লাহর ওলী

হওয়ার জন্য ঈমানের সঙ্গে সঙ্গে তাকওয়া অর্জন করতে হবে অর্থাৎ, সগীরা কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে বিরত থাকতে হবে।

একটা প্রশ্ন ও তার উত্তর

এখানে আরও একটা প্রশ্ন হতে পারে যে, আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য ছগীরা কবীরা সব ধরনের গোনাহ থেকে বিরত থাকা চাই। কিন্তু আম্বিয়ায়ে কেরাম ব্যতীত আর কেউই এমন নেই যার দ্বারা গোনাহ হয় না। একমাত্র আম্বিয়ায়ে কেরাম হলেন মা'সূম তথা নিষ্পাপ, তাঁদের দ্বারা কোনা গোনাহ হয় না, অন্য কেউ মা'সূম নয়, অন্য সকলের দ্বারাই পাপ হতে পারে এবং কম বেশি হয়েও থাকে। তাহলে তো আর কারও পক্ষেই আল্লাহর ওলী হওয়া সম্ভব নয়। এই প্রশ্নের জওয়াব হল গোনাহ হলে তওবা করে নিতে হবে। তাওবা করলে এমন অবস্থা হবে যেন গোনাহই হয়নি। এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَلتَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لاَ ذَنْبَ لَهُ. (رواه ابن ماجة و الطبراني قال الهيثمي: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه)

অর্থাৎ, গোনাহ থেকে যে ব্যক্তি তওবা করে নেয়, সে ঐ ব্যক্তির মত হয়ে যায় যার কোনো গোনাহ নেই। (ইবনে মাজা ও তাবারানী)

অতএব গোনাহ হয়ে গেলে তওবা করে নিতে হবে, তাহলে আল্লাহর ওলী হওয়ার পক্ষে কোন অন্তরায় অবশিষ্ট থাকবে না।

ওলী হওয়ার জন্য যা শর্ত নয়

আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য বড় আলেম হওয়া বা অন্তত আলেম হওয়া, বড় হুজুর হওয়া, পীর-মুরশিদ হওয়া শর্ত নয়। অনেকে মনে করে আল্লাহর ওলী হতে গেলে কারামত দেখাতে হবে, অনেক অলৌকিক কিছু দেখাতে হবে আরও কত কিছু। বস্তুত এগুলো কিছুই জরুরি নয়। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য শুধু জরুরি হল ঈমান যেন দোরস্ত থাকে, কোন গোনাহ যেন না হয়, কোন জরুরি আমল যেন ছুটে না যায়। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশ পাওয়া, অলৌকিক কিছু দেখাতে পারা এগুলো কিছুই শর্ত নয়।

একটা ঘটনা শুনুন। হযরত মোজাদ্দেদে আলফে ছানী (রহ.) সম্পর্কে আমরা অনেকে জানি। তিনি একজন সর্বজন স্বীকৃত আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁকে দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মুজাদ্দিদ বা ধর্ম সংস্কারক বলা হয়। ভারতের সেরহিন্দের অধিবাসী। তাঁর কাছে এক ব্যক্তি গিয়েছিলেন যে, শুনেছি মোজাদ্দেদে আলফে ছানী একজন বড় বুযুর্গ। যিনি গিয়েছিলেন তিনিও বুযুর্গ ছিলেন। এক বুযুর্গ আরেক বুযুর্গের কাছে যেয়ে থাকেন। তিনি মুজাদ্দিদে আলফে ছানীর সোহবতে একে একে দশ বছর কাটালেন। এই দশ বছরে মুজাদ্দিদে আলফে ছানী (রহ.) থেকে অলৌকিক কিছুই দেখতে পেলেন না। একদিন রাতে মনে মনে ভাবলেন দশ বৎসর থাকলাম, কোন কারামত দেখতে পেলাম না, কোন অলৌকিক কিছু ঘটতে দেখলাম না, আগামীকাল চলে যাব। ঐ দিন ফজরের নামাযের পর হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, বল, দিলে কী কথা এসেছে? হযরত মুজাদ্দেদে আলফেছানী (রহ.) হয়তো তার দিলের কথা আঁচ করতে পেরেছিলেন। আল্লাহ পাক বুযুর্গানে দ্বীনকে অনেক গোপন কথা জানিয়ে দেন। তাদের দিলের মধ্যে অনেক কিছু উদয় করে দেন। একে বলা হয় কাশ্‌ফ। বুযুর্গানে দ্বীন কাশফের মাধ্যমেও অনেক কিছু জানতে পারেন। যাহোক তিনি একথা প্রশ্ন করার পর লোকটি ভাবল আমি তো ধরা পড়ে গেছি, এখন স্বীকার না করে আর উপায় নেই। তিনি বললেন, হুজুর! আমার দিলে একথা এসেছে যে, দশ বছর আপনার খেদমতে থাকলাম, কোন কারামত দেখতে পেলাম না। অথচ ছোট খাট কারামত আমিও দেখাতে পারি। তাই ভাবলাম আপনার কাছে থেকে আমার কী লাভ হবে? তখন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কী কী কারামত দেখতে পার? তিনি বললেন, আমি ধ্যান করে কবরের ভিতরে ঢুকে মুর্দার সাথে কথা বলে আসতে পারি। হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বললেন, তুমি কবরের ভিতরে ঢুকে কথা বলবে আর আমি তো এখানে বসে ডাক দিলে সেরহিন্দের সব রূহ এখানে এসে হাজির হয়ে যাবে। এখানে বসে কথা বলব। কিন্তু এটা কোন বুযুর্গী নয়। প্রকৃত বুযুর্গ হলেন তিনি যার কোন আমল ছোটে না। তুমি আমার কাছে দশ বৎসর থেকেছ, বল কোন ফরয ওয়াজিব নয় কোন সুন্নাত, মোস্তাহাব আমার থেকে ছুটতে দেখেছ? তিনি বললেন, না হুজুর দেখিনি। তখন হযরত মুজাদ্দিদে আলফেছানী (রহ.) বললেন, এ-ই হল বুযুর্গী, এ-ই হল কামাল।

যাহোক বলা হচ্ছিল, আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য শুধু জরুরি হল ঈমান যেন দোরস্ত থাকে, কোন গোনাহ যেন না হয়, কোন আমল যেন ছুটে না যায়। আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য কারামত প্রকাশ পাওয়া, অলৌকিক কিছু দেখাতে পারা জরুরি বা শর্ত নয়।

ওলীর জন্য নফল ইবাদতের পাবন্দী প্রসঙ্গ

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, আল্লাহর ওলী হওয়ার জন্য তথা আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য ঈমান ও তাকওয়াই মূল শর্ত। কুরআনের আয়াত ওলী হওয়ার জন্য এ দুটোকেই শর্ত হিসাবে উল্লেখ করেছে। তবে ঈমান ও তাকওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্নাত, মুস্তাহাব এবং আদাবের উপরও আমল করা চাই। কারণ নৈকট্যের ক্ষেত্রে এগুলোর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ হাদীছের একাংশে বর্ণিত হয়েছে– রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَمَا يَزَالُ عَبْدِيْ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى أُحِبَّهٗ. الحديث. (رواه البخاري في كتاب ا لرقاق - باب التواضع ٦٥٠٢)

অর্থাৎ, নফল দ্বারা বান্দা আমার নৈকট্য লাভ করে। এমনকি আমি তাকে ভালবাসতে শুরু করি। (বোখারী)

আল্লাহর ওলীদের নফল ইবাদতের বিবরণ

নফল নামায বেশি বেশি পড়া চাই। বুযুর্গানে দ্বীন কী পরিমাণ নফল পড়তেন তা চিন্তা করতেও অবাক লাগে। ইমাম আবূ হানীফা (রহ.) সারা রাত জাগ্রত থেকে ইবাদত, দুআ ও যিকিরের মধ্যে অতিবাহিত করতেন। (تذكرة الحفاظ وعقود الجمان) তিনি সারারাত জাগ্রত থেকে তাহাজ্জুদে লিপ্ত থাকতেন। তিনি প্রতি রাতে তাহাজ্জুদে এক খতম কুরআন তেলাওয়াত করতেন। একাধারে চল্লিশ বৎসর তিনি ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন। (تاريخ بغداد) হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেব (রহ.) পঞ্চাশ বৎসর যাবত এবং আবুল মু'তামির (রহ.) চল্লিশ বৎসর যাবত একই উযূ দ্বারা ইশা ও ফজরের নামায আদায় করেছেন। ইমাম গাজালী (রহ.) আবূ তালেব মক্কী থেকে বর্ণনা করেছেন যে, চল্লিশজন তাবিয়ী ইশার উযূ দিয়ে ফজরের নামায পড়েছেন। তন্মধ্যে কেউ কেউ চল্লিশ বৎসর যাবত এ নিয়মের উপর বহাল থেকেছেন। হযরত ইমাম আহমদ ইব্‌নে হাম্বল (রহ.) সারাদিন মাসআলা চর্চা করেও দৈনিক তিনশত রাকআত নফল আদায় করতেন। বাদশা মামূন তাঁকে বেত্রাঘাত করার কারণে দুর্বল হয়ে পড়েন, তারপরও সেই অবস্থায় দৈনিক দেড়শত রাকআত নামায পড়তেন। হযরত ইমাম আবূ ইউসুফ (রহ.) ইল্‌ম চর্চা ছাড়াও প্রধান বিচারপতি হিসাবে কাজ সম্পাদন করতেন। এসত্ত্বেও তিনি দৈনিক দুইশত রাকআত

নামায পড়তেন। হযরত ইমাম শাফিয়ী (রহ.)ও রাতের বেলায় খুবই সামান্য নিদ্রা যেতেন। হযরত ছাবেত বুনানী (রহ.)-এর নামাযের সঙ্গে এত মহব্বত ছিল যে, পঞ্চাশ বৎসর যাবত তিনি রাতের বেলায় না ঘুমিয়ে নামাযে কাটাতেন আর সকাল বেলায় এই দুআ করতেন– হে আল্লাহ! যদি কাউকে কবরে নামায পড়ার অনুমতি দান করা হয় তবে আমাকেও যেন অনুমতি দান করা হয়। বিখ্যাত হাদীছ-গ্রন্থ "নাসায়ী শরীফ"-এর প্রণেতা ইমাম নাসায়ী (রহ.) দিবারাত্রের অধিকাংশ সময় ইবাদতে কাটাতেন। "তাফসীরে মাজহারী"-এর লেখক হযরত কাজী ছানাউল্লাহ পানিপথী (রহ.) প্রতিদিন একশত রাকআত নফল নামায পড়তেন। তিনি প্রতিরাতে তাহাজ্জুদে এক মনজিল কুরআন তেলাওয়াত করতেন। (فضائل اعمال وغیرہ)

বুযুর্গ নারীগণও নফলের ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকেননি। হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া (রহ.) এক আশ্চর্য রকমের বুযুর্গ মহিলা ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা.) থেকে তিনি হাদীছ শ্রবণ করেছেন। যখন সকাল হত, তখন হযরত মুয়াযাহ্ আদাবিয়া (রহ.) ভাবতেন আজই আমার মৃত্যু হয়ে যেতে পারে। এই চিন্তা করে সারাদিন তিনি ঘুমাতেন না; নফল নামায পড়তে থাকতেন। তিনি ভাবতেন যদি ঘুম পড়ি আর এ অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়ে যায় তাহলে তো আমি আল্লাহ্র স্মরণ থেকে গাফেল অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলাম। যখন রাত আসত, তখন তিনি ভাবতেন হয়ত এই রাতেই আমার মৃত্যু এসে যেতে পারে। অতএব যদি ঘুমের অবস্থায় আমার মৃত্যু হয়, তাহলে তো মৃত্যুর সময় আল্লাহ্র নামও নিতে পারব না। তাই সারারাত তিনি জেগে থাকতেন এবং নফল নামায পড়তে থাকতেন। আর নিজের নফ্সকে বলতেন, "একটু অপেক্ষা কর। ঘুমের সময় তো সামনে আসছে।" অর্থাৎ, মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত ঘুমাতে পারবে। এভাবে তিনি রাত্র-দিন জাগ্রত থেকে রাত্র-দিনে ৬ শত রাকআত নফল নামায পড়তেন। স্বামীর মৃত্যুর পর আর কোনো দিন তিনি বিছানায় যাননি। (طبقات شعرانی)

আর এক বুযুর্গ নারীর ঘটনা শুনুন। হযরত উম্মে হারূন (রহ.) আল্লাহ তাআলাকে খুব বেশি ভয় করতেন। শুকনো রুটি খেতেন। আর বলতেন, রাত এলে আমার ভাল লাগে। দিন এলেই অস্থির লাগে। তিনি সারারাত জাগ্রত থেকে ইবাদতে কাটাতেন। (طبقات شعرانی)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে তাঁর ওলীদের তালিকাভুক্ত করে নেন। আমাদেরকে তাঁর ওলী রূপে জীবন গড়ার তাওফীক দান করেন। আমীন!

চতুর্দশ অধ্যায়

যদি নূরানী জীবন গড়তে চান

চতুর্দশ অধ্যায়

যদি নূরানী জীবন গড়তে চান

নূর (نور) শব্দের অর্থ

নূর শব্দটির অর্থ আলো। বাহ্যিক আলো তথা পার্থিব আলো এবং আত্মিক আলো তথা অপার্থিব আলো দুই অর্থেই শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। বাহ্যিক আলো অর্থে শব্দটির ব্যবহার যেমন– نور الشمس অর্থ সূর্যের আলো। نور القمر অর্থ চাঁদের আলো। আরবীতে বলা হয়, نُوْرُ الْقَمَرِ مُسْتَفَادٌ مِنَ نُوْرِ الشَّمْسِ অর্থাৎ, চাঁদের আলো সূর্যের আলো থেকে অর্জিত। প্রসিদ্ধ এ বাক্যে শব্দটি বাহ্যিক আলো তথা পার্থিব আলো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

নিম্নোক্ত দুটি হাদীছেও নূর শব্দটি বাহ্যিক আলো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে–

عَنْ أَنَسٍ رض اَنَّ رَجُلَيْنِ خَرَجَا مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ لَيْلَةٍ مُظْلِمَةٍ، وَإِذَا نُوْرٌ بَيْنَ أَيْدِيْهِمَا حَتّٰى تَفَرَّقَا فَتَفَرَّقَ النُّوْرُ مَعَهُمَا. (رواه البخاري في باب منقبة أسيد بن حضير وعباد بن بشر برقم ٣٨٠٥)

অর্থাৎ, হযরত আনাছ (রা.) থেকে বর্ণিত যে, (একবার) এক অন্ধকার রাতে দুজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছ থেকে বের হল। তখন অকস্মাৎ তাদের সম্মুখে নূর (আলো) দেখা দিল। অবশেষে (চলতে চলতে যখন) তারা দুজন পৃথক হল তখন নূরও তাদের সঙ্গে ভাগ হয়ে গেল। (বোখারী)

উল্লেখ্য, এ দুজন সাহাবী হলেন হযরত উছায়দ ইবনে হুযায়র ও আব্বাদ ইবনে বিশ্‌র (রা.)।

وَقْتُ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ مَا لَمْ يَسْقُطْ نُوْرُ الشَّفَقِ. (مسند أحمد حديث رقم ٦٩٩٣)

অর্থাৎ, মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত থাকে যতক্ষণ نور الشفق (পশ্চিম দিগন্তের আলো) শেষ না হয়। (মুসনাদে আহমদ)

আত্মিক আলো তথা অপার্থিব আলো অর্থে নূর শব্দটির ব্যবহার কুরআন হাদীছে প্রচুর। ঈমানের নূর, হেদায়েতের নূর, হকের নূর ইত্যাদি কথাগুলোতে উল্লেখিত নূর পার্থিব কোন আলো নয় বরং অপার্থিব আলো। এই অপার্থিব আলোর স্থান হল কলব তথা মন। কলবের মধ্যেই এই অপার্থিব আলো বা নূরের বিকিরণ ঘটে। কলবের মধ্যে এই নূর তথা আলোর বিকিরণ ঘটলে কলবের মধ্যে ছয়টি অবস্থা সৃষ্টি হয়। নিম্নে উক্ত ছয়টি বিষয়ের বিশদ বিবরণ পেশ করা হল।

কলবে নূর থাকলে কলবের যে অবস্থা হয়

কলবে নূর থাকলে কলবে নূর জনিত ছয়টি অবস্থা সৃষ্টি হয়। নিম্নে উক্ত ছয়টি অবস্থার বিবরণ প্রদান করা হল।

(১) কলবের মধ্যে নূরের বিকিরণ ঘটলে কলব কুফরের আঁধার থেকে ঈমানের আলোকে চিনে নিতে পারে। তখন তার কলবে ঈমানের অনুকূল চিন্তা-চেতনা বিকশিত হয়, ঈমানের অনুকূল আমলের চেতনা জাগ্রত হয়, ঈমানের অনুকুল

আমল তার মনে ভাল লাগে, ঈমান-বিরোধী চিন্তা-চেতনা তার মনে অস্পষ্ট বোধ হয়, ঈমানের প্রতিকুল আমলের প্রতি তার মনে স্পৃহা জাগে না। একে বলা হয় ঈমানের নূর। এজন্যই এক রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেছেন,

اَلإِيْمَانُ نُوْرٌ، فَمَنْ زَنَا فَارَقَهُ الإِيْمَانُ، فَمَنْ لَامَ نَفْسَهُ وَرَاجَعَ رَاجَعَهُ الإِيْمَانُ. (رواه ابن أبي شيبة حديث رقم ٣١٠٠٥)

অর্থাৎ, ঈমান হল নূর। যে যেনা করে তার থেকে ঈমান (-এর নূর) পৃথক হয়ে যায়। তার পর যে নিজেকে তিরস্কার করে ফিরে আসে, ঈমান (-এর নূর) তার কাছে ফিরে আসে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীছ নং ৩১০০৫)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,

لَا يَزْنِيْ مِنْكُمْ الزَّانِيْ إِلَّا نَزَعَ اللّٰهُ نُوْرُ الْإِيْمَانِ مِنْ قَلْبِهٖ، فَإِنْ شَاءَ اَئنْ يَرُدَّهُ رَدَّهُ وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَمْنَعَهُ مَنَعَهُ. (رواه ابن أبي شيبة حديث رقم ١٧٩٣٥ و ٣٠٩٨٩)

অর্থাৎ, তোমাদের কেউ যেনা করলে আল্লাহ তার থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেন। তার পর তিনি চাইলে সে নূর ফিরিয়ে দেন আর না চাইলে তা আর ফেরত দেন না। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীছ নং ১৭৯৩৫ ও ৩০৯৮৯)

অন্য এক রেওয়ায়েতে এসেছে– হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেছেন,

يُنْزَعُ مِنْهُ نُوْرُ الإِيْمَانِ فِي الزِّنَا. (رواه البخاري تعليقا في باب لا يشرب الخمر)

অর্থাৎ, যেনার ক্ষেত্রে ব্যক্তি থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেওয়া হয়। (বোখারী)

এ সব রেওয়ায়েতে বোঝানো হয়েছে ঈমানের নূর হল যেনার জন্য প্রতিবন্ধক। ঈমানের নূর পূর্ণ সক্রিয় থাকলে যেনার চেতনা সক্রিয় হতে পারত না। যখন কেউ যেনার লিপ্ত হয়েছে তার অর্থ হল যেনাকালীন তার মধ্যে ঈমানের নূর সক্রিয় ছিল না। তবে যেনা পরবর্তী ঈমানী চেতনাকে জাগ্রত করে অনুতপ্ত হয়ে তথা তওবা করে আল্লাহর দিকে রুজু করলে আবার আল্লাহ ঈমানের নূর ফিরিয়ে দিবেন। তখন যেনার বিষয়টা আবার তার কাছে খারাপ বোধ হবে।

(২) কলবের মধ্যে নূরের বিকিরণ ঘটলে কলবে নেক আমল বিকশিত বোধ হয়। ফলে নেক আমল তার মনে ভাল লাগে, এর বিপরীত বদ আমল তথা গোনাহের বিষয়ের প্রতি মনের ঝোক হ্রাস পায়। একে বলা হয় ইসলামের নূর। নেককার লোকদের সঙ্গে উঠাবসা বৃদ্ধি করলে এরূপ নূর বৃদ্ধি পায়। পক্ষান্তরে পাপীদের সঙ্গে উঠাবসা করলে এই নূর কলব থেকে হ্রাস পেতে থাকে। তখন পাপ করতে তার মনে স্পৃহা জাগে, পাপ কাজ ভাল লাগে। এজন্যই প্রসিদ্ধ বুযুর্গ হযরত ফুযায়ল ইবনে ইয়ায বলেছেন,

مَنْ أَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ أَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَلَهُ وَأَخْرَجَ نُوْرُ الإِسْلاَمِ مِنْ قَلْبِهِ.

(الإبانة الكبرى ٤٤٠)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেদআতীকে ভালবাসে, আল্লাহ তার আমল নষ্ট করে দেন, তার কলব থেকে ইসলামের নূর বের করে দেন। (আল-ইবানাতুল কুবরা, রেওয়ায়েত নং ৪৫০)

(৩) কলবের মধ্যে নূরের বিকিরণ ঘটলে কলব মিথ্যার আঁধার থেকে সত্যের আলোকে চিনে নিতে পারে, বাতিল থেকে হককে পৃথক করে নিতে সক্ষম হয়। একে বলা হয় হকের নূর তথা হকের আলো। হক তথা সত্য ও সঠিকতার মধ্যেও নূর বা আলো আছে- এ সম্বন্ধে এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে-

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ كَانَ يَقُوْلُ : عَلَى الْحَقِّ نُوْرٌ وَعَلَى الْإِيْمَانِ وَقَارٌ. (الإبانة الكبرى برقم ٨٦٦)

অর্থাৎ, হযরত যায়দ ইবনে আসলাম থেকে বর্ণিত যে, হযরত আবুদ্দরদা (রা.) বলতেন, হকের রয়েছে নূর আর ঈমানের রয়েছে গাম্ভীর্য।
(আল-ইবানাতুল কুবরা হাদীছ নং ৩৮৮)

(৪) কলবের মধ্যে নূরের বিকিরণ ঘটলে কলব গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বেঁচে হেদায়েতের আলোকে উদ্ভাসিত হয়, খারাপ পথ নয় ভাল পথ তার কাছে বিকশিত মনে হয়। একে বলা হয় হেদায়েতের নূর। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) নিম্নোক্ত আয়াতে হেদায়েতের ব্যাখ্যা করেছেন নূর দ্বারা। আয়াতটি হল–

﴿**أُولٰئِكَ عَلٰى هُدًى مِّنْ رَّبِّهِمْ.**﴾ أي عَلٰى نُوْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ. (تفسير ابن أبى حاتم)

অর্থাৎ, আল্লাহ বলেছেন, (যারা ঈমান ও আমলের অধিকারী) তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত। (সূরা বাকারা: ৫) হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) বলেন, তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে হেদায়েতের উপর প্রতিষ্ঠিত– এ কথার অর্থ হল তারা তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম)

আরেক আয়াতে এসেছে–

﴿اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ আসমান ও জমিনের নূর। (সূরা নূর: ৩৫) এখানে নূর বলে হেদায়েতের নূর বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ, আল্লাহ আসমান ও জমিনের মধ্যে বসবাসকারী সকলের হেদায়েতকারী। ইবনে কাছীর হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে এর তাফসীর এরূপ বর্ণনা করেছেন,ঙ اَللّٰهُ هَادِيْ أَهْلِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ অর্থাৎ, আসমান ও জমিনের অধিবাসীদের হেদায়েতকারী। এরপর আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

﴿يَهْدِى اللّٰهُ لِنُوْرِهٖ مَنْ يَّشَآءُ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে চান তার নূরের দিকে (তথা হেদায়েতের দিকে) পথ দেখান। (সূরা নূর: ৩৫)

সূরা নূরের আর এক আয়াতে এই হেদায়েতের নূর সম্বন্ধে বলা হয়েছে,

﴿ وَ مَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللّٰهُ لَهٗ نُوْرًا فَمَا لَهٗ مِنْ نُّوْرٍ.﴾

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে নূর না দেন তার কোনো নূর নেই। (সূরা নূর: ৪০)

এখানে বোঝানো হয়েছে কাফেররা হেদায়েতের নূর থেকে বঞ্চিত। কাফেররা একদিকে আল্লাহর বিধি-বিধানের প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শনের কারণে তাদের স্বভাবজাত নূরকেও বিলীন করে দেয়, অপরদিকে হেদায়েতের নূর থেকেও তারা বঞ্চিত। তারা সব রকম নূর থেকে রিক্ত। ফলে তাদের সঠিক পথে আসার কোন উপায় থাকে না।

যাদের মধ্যে হেদায়েতের এই নূর থাকে তারা জাগতিক ব্যাপারে অজ্ঞ বে-খবর হলেও ভাল মন্দের ব্যাপারে সচেতন থাকে, ফলে তারা আখেরাতের ব্যাপারে পারদর্শী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হয়। এর বিপরীত যাদের মধ্যে এই হেদায়েতের নূর

অনুপস্থিত, তারা জাগতিক ব্যাপারে জ্ঞানী ও বিচক্ষণ বলে গণ্য হলেও আখেরাতের ব্যাপারে তারা থাকে বেকুব ও মূর্খ।

(৫) কলবের মধ্যে নূরের বিকিরণ ঘটলে কলবের কাছে কুরআন হাদীছের ইলম দ্বারা সঠিক পথের দিশা লাভ হয়। এই নূর না থাকলে সঠিক পথের দিশা লাভ হয় না। একে বলা হয় ইল্‌ম ও হেকমতের নূর। ইমাম মালেক (রহ.) বলেছেন,

اَلْعِلْمُ: اَلْحِكْمَةُ، نُوْرٌ يَهْدِي اللّٰهُ بِهٖ مَنْ يَّشَاءُ. (تفسير ابن أبي حاتم)

অর্থাৎ, ইলম হল হেকমত অর্থাৎ, এমন নূর যা দ্বারা আল্লাহ যাকে চান সঠিক পথের দিশা প্রদান করেন। (তাফসীরে ইবনে আবী হাতিম)

ইল্‌ম ও হেকমতের যে নূর রয়েছে এ সম্বন্ধে এক হাদীছে এসেছে-

عَنْ مُغِيْثِ بْنِ سُمَيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْزِلَتْ عَلَيَّ تَوْرَاةٌ مُحْدَثَةٌ فِيْهَا نُوْرُ الْحِكْمَةِ وَيَنَابِيْعُ الْعِلْمِ. (مصنف ابن أبي شيبة. حديث رقم ٣٢٣٩٦)

অর্থাৎ, হযরত মুগীছ ইবনে সুমাইয়্য (রা.) বলেন যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আমার কাছে নতুন রূপে তাওরাত (অর্থাৎ, কুরআন) নাযেল হয়েছে। এতে রয়েছে হেকমতের নূর ও জ্ঞানের ফোয়ারা। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীছ নং ৩২৩৯৬)

(৬) কলবের মধ্যে নূরের বিকিরণ ঘটলে কলবে কুরআন হাদীছের কথা স্পষ্ট বোধ হয়, কুরআন হাদীছের বক্তব্যের ব্যাপারে মন খুলে যায়, মনের সব অস্পষ্টতা কেটে যায়। তখন মনে হয় কুরআন-হাদীছ ও ইসলামের কথার ব্যাপারে বক্ষ উন্মুক্ত হয়ে গেছে। একে বলা হয় শরহে সদর তথা কলবের বিকাশতা অর্থাৎ, মন খুলে যাওয়া, মনের মধ্যে জ্ঞান ও চিন্তা-চেতনার বিকশিত হয়ে উঠা। কুরআন-হাদীছের বক্তব্যের ব্যাপারে, ইসলামের কথার ব্যাপারে যার মন এরূপ বিকশিত হয়, বুঝতে হবে সে আল্লাহর পক্ষ থেকে এরূপ নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে কুরআনে কারীমের একটি আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اَفَمَنْ شَرَحَ اللّٰهُ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ فَهُوَ عَلٰى نُوْرٍ مِّنْ رَّبِّهٖ.﴾

অর্থাৎ, তবে কি আল্লাহ যার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নূরের উপর প্রতিষ্ঠিত (সে ঐ ব্যক্তির সমান, যে এরূপ নয়)? (সূরা যুমারঃ ২২)

বক্ষ উন্মুক্ত হওয়া সম্বন্ধে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رضـ قَالَ: تَلاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلاَمِ﴾ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! وَمَا هٰذَا الشَّرْحُ؟ قَالَ: نُوْرٌ يُقْذَفُ بِهٖ فِي الْقَلْبِ فَيَنْفَسِحُ لَهُ الْقَلْبُ.

(مصنف ابن أبي شيبة ٣٥٤٥٦)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন, مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلاَمِ যার অর্থ হল– আল্লাহ যাকে হেদায়েত করতে চান ইসলামের জন্য তার বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন। (সূরা আনআমঃ ১২৫) তখন সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, এই বক্ষ উন্মুক্ত হওয়া কী জিনিস? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, এ হল এক নূর, যার ফলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মন খুলে যায়। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা)

এতক্ষণ পর্যন্ত কলবে নূর থাকলে দুনিয়াতে কলবের যে অবস্থা অর্জিত হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল। আর আখেরাতে নূর অর্জিত হলে ময়দানে হাশরে সে নূর কাজে আসবে। কারণ হাশরের ময়দান এক পর্যায়ে থাকবে অন্ধকারাচ্ছন্ন। পুলসিরাতেও অন্ধকার থাকবে। পুলসিরাত পার হওয়ার সময় নূর কাজে আসবে। তখন জাহান্নামের আংটা নূর বিহীন লোকদেরকে টেনে টেনে জাহান্নামের ভেতরে ফেলে দিবে। হাশরের ময়দানে নূর বিশেষ সম্মানেরও প্রতীক হবে, যখন এরূপ নূরের অধিকারীগণ নূরের মিম্বরে আরোহিত থাকবেন।

যাহোক এতক্ষণ পর্যন্ত কলবে নূর থাকলে কলবের যে অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল। এখন কলবে নূর না থাকলে কলবের যে অবস্থা হয় সে সম্বন্ধে কিঞ্চিত বিবরণ পেশ করলাম।

কলবে নূর না থাকলে কলবের যে অবস্থা হয়

নূর থাকা অর্থ কি এবং নূর থাকলে মনের মধ্যে কি কি অবস্থার সৃষ্টি হয় সে সম্বন্ধে পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। অতএব নূর না থাকা দ্বারা নূর থাকলে যেসব অবস্থার সৃষ্টি হয় তার বিপরীত হবে। সেমতে কলবে নূর না থাকলে মনের মধ্যে ঈমানের অনুকূল চিন্তা-চেতনা বিকশিত হবে না, ঈমানের অনুকূল আমলের চেতনা জাগ্রত হবে না, ঈমানের অনুকুল আমল তার মনে ভাল লাগবে না, ঈমানের অনুকুল আমলের প্রতি তার মনে স্পৃহা জাগবে না। বরং ঈমানের প্রতিকূল আমলের প্রতি তার মনে স্পৃহা জাগবে, গোনাহের প্রতি তার বেশি আকর্ষণ বোধ হবে, গোনাহের কাজ তার কাছে বেশি ভাল লাগবে।

কলবে ঈমান ও হেদায়েতের নূর না থাকলে সেখানে থাকবে গোনাহের অন্ধকার, গোনাহের ময়লা। কলবের উদাহরণ হল একটা কাঁচের পাত্রের মত। কাঁচের উপর যদি ময়লা থাকে বা কালি দিয়ে লেপানো থাকে, তাহলে ঐ কাঁচ ভেদ করে ভেতরে কোন আলো প্রবেশ করতে পারে না। কাঁচের ভেতরে আলো ঢুকতে হলে কাঁচ পরিষ্কার থাকতে হয়। ময়লা-আবর্জনা থাকলে তার ভেতরে আলো ঢুকতে পারে না। আলো বাধাগ্রস্ত হয়। কাঁচ যত পরিষ্কার ঝকঝকে থাকে, তার মধ্যে আলো তত বেশি ঢুকতে পারে। কলবের অবস্থাও তেমন। কলব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে তার মধ্যে আলো ঢুকবে। কলবে ময়লা থাকলে, কালি দিয়ে লেপা থাকলে তার মধ্যে আলো ঢুকতে পারবে না অর্থাৎ, কুরআন-হাদীছের নূর ঢুকতে পারবে না। অতএব কোন কলবের আয়নার উপরে ময়লা থাকলে অর্থাৎ, গোনাহের ময়লা থাকলে ঐ কলবে কুরআন-হাদীছের নূর প্রবেশ করতে পারবে না। কলব থাকবে অন্ধকার। ঐ অন্ধকারে কুরআন-হাদীছের কোন কথার প্রকৃত স্বরূপ তার কাছে পরিষ্কার হবে না। এ জন্যই দেখা যায় কুরআন–হাদীছের কথা শুনলে নেককার লোকদের ভাল বুঝে আসে, তাদের অস্পষ্টতা কেটে যায়, কিন্তু পাপীদের ভালভাবে বুঝে আসে না, তাদের অস্পষ্টতা কাটে না। এর কারণ একটাই। তাহল তাদের অন্তরে নূরের অনুপস্থিতি এবং পাপের ময়লার উপস্থিতি। এই ময়লা তাদের কলবের আয়নাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। ফলে কুরআন–হাদীছের কথা তাদের অন্তরে ঢুকছে না। কুরআন-হাদীছের নূর ভেতরে প্রবেশ করছে না। কলবে পাপের ময়লা না থাকলে, কলব আয়নার মত ঝকঝকে পরিষ্কার থাকলে ভাল করে বুঝে আসত, দ্বীনের সব কথা কলবের কাছে পরিষ্কার মনে হত। দ্বীন সম্বন্ধে সব অস্পষ্টতা কেটে যেত।

পাপের কারণে অন্তর কালিমাচ্ছন্ন থাকলে ঐ অন্তরে হেদায়েতের নূর প্রবেশ করে না বলেই সেই অন্তর থেকে ভাল-মন্দের বিবেচনা বোধ লোপ পায়। ফলে ভালকে খারাপ বোধ হয়, আর খারাপকে ভাল বোধ হয়। একারণেই ইবাদত ভাল

লাগে না, ইবাদতে মজা বোধ হয় না। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফিতনার জমানার কথা উল্লেখ করে বলেছেন, যখন নানানরকম পাপের বিস্তার ঘটবে, তখন এই এই অবস্থা হবে যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

حَتّٰى تَصِيْرَ عَلٰى قَلْبَيْنِ عَلٰى أَبْيَضَ مِثْلَ الصَّفَا لاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ، وَالْآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لَا يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ. (رواه مسلم في كتاب الإيمان - باب رفع الأمانة والإيمان إلخ)

অর্থাৎ, তখন মানুষের কলব দুই ধরনের হয়ে যাবে। এক ধরনের কলব সেসব পাপ থেকে দূরে থাকার কারণে কালিমাচ্ছন্ন হবে না; বরং ঝকঝকে মসৃণ পাথরের মত থাকবে। আর এক ধরনের কলব সেসব পাপে জর্জরিত হওয়ার কারণে কালো হয়ে যাবে, সেসব অন্তর ভালকে ভাল এবং মন্দকে মন্দ বলে বুঝতে সক্ষম হবে না। বরং শুধু খাহেশাতে নফসানীটাই বুঝবে। (মুসলিম)

এতক্ষণ নূর থাকলে কি অবস্থা হয় এবং নূর না থাকলে কি অবস্থা হয় উভয়টা সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা হল। এবার দুনিয়া আখেরাত উভয় জগতে নূর অর্জন করার পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা পেশ করা হল।

দুনিয়াতে নূর অর্জন করার পদ্ধতি

মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবেই একটা নূর আল্লাহ পাক রেখেছেন। সেটা হল স্বভাবজাত নূর। আবার আমলের মাধ্যমেও মানুষ নূর অর্জন করতে পারে। মানুষের মধ্যে সৃষ্টিগতভাবে নূর রাখার প্রমাণ নিম্নোক্ত হাদীছ।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا خَلَقَ اللّٰهُ اٰدَمَ مَسَحَ ظَهْرَهُ فَسَقَطَ مِنْ ظَهْرِهٖ كُلُّ نَسَمَةٍ هُوَ خَالِقُهَا مِنْ ذُرِّيَّتِهٖ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَجَعَلَ بَيْنَ عَيْنَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَبِيْصًا مِنْ نُوْرٍ.

الحديث. (رواه الترمذي في كتاب التفسير باب ومن سورة الأعراف حديث رقم ٣٠٧٦ وقال: حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করলেন, তার পৃষ্ঠদেশে হাত বুলালেন, তখন তার পৃষ্ঠদেশ থেকে কেয়ামত পর্যন্ত তার বংশধরদের মধ্যে যাদেরকে আল্লাহ সৃষ্টি করবেন সকলে বের হয়ে পড়ল। আল্লাহ সেই সমস্ত মানুষের দুই চোখের মাঝে রেখে দিলেন নূরের চমক। (তিরমিযী)

এ পর্যন্ত সৃষ্টিগতভাবে মানুষের মধ্যে যে নূর রয়েছে, তার বর্ণনা পেশ করা হল। যেসব আমলের মাধ্যমে নূর অর্জিত হয় নিম্নে সেসব আমলের বিবরণ পেশ করা হল।

(১) কুরআন শিক্ষা করলে তথা কুরআনের কথা কলবের মধ্যে ঢোকালে কলবে নূর পয়দা হয়। কেননা, কুরআন হল নূর। কুরআনে কারীমকে নূর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

﴿قَدْ جَآءَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ نُوْرٌ وَّ كِتٰبٌ مُّبِيْنٌ.﴾

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে এসেছে আল্লাহ পাকের কাছ থেকে নূর অর্থাৎ, সুস্পষ্ট কিতাব। (সূরা মায়িদা: ১৫)

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

﴿وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ نُوْرًا مُّبِيْنًا.﴾

অর্থাৎ, এবং তোমাদের কাছে আমি পাঠিয়েছি সুস্পষ্ট নূর। (সূরা নিছা : ১৭৪)

এখানে নূর দ্বারা কুরআনে কারীমকে বোঝানো হয়েছে। কুরআনকে নূর আখ্যায়িত করার একটা কারণ হল কুরআন দ্বারা মানুষের অন্তরে ঈমানের নূর জন্মলাভ করে। (জালালাইন)

(২) কুরআন তিলাওয়াত দ্বারাও নূর অর্জিত হয়। এক রেওয়ায়েতে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ! أَوْصِنِيْ قَالَ: أُوْصِيْكَ بِتَقْوَى اللّٰهِ فَإِنَّهُ أَزْيَنُ لِأَمْرِكَ كُلِّهِ. قُلْتُ: زِدْنِيْ. قَالَ: عَلَيْكَ بِتَلَاوَةِ الْقُرْآنِ وَذِكْرِ

اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ ذِكْرٌ لَكَ فِي السَّمَاءِ وَنُوْرٌ لَكَ فِي الْأَرْضِ

الحديث. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٤٧٣٧. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل برقم ٣٦١. واللفظ للبيهقي)

অর্থাৎ, হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি আরয করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, আমি তোমাকে তাকওয়া অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি। কেননা এটা তোমার সবকিছুকে সুন্দর করে দিবে। আমি আরয করলাম, আমাকে আরও কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, কুরআন তিলাওয়াত কর এবং যিকর কর। কেননা, এতে আসমানে তোমার সম্বন্ধে আলোচনা হবে এবং দুনিয়াতে তোমার জন্য নূর হবে। (শুআবুল ঈমান ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

(৩) যিকর দ্বারাও কলবে নূর অর্জিত হয়। পূর্বে বর্ণিত হাদীছে এ বিষয়টা উল্লেখিত হয়েছে।

(৪) হাদীছের কথা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া দ্বারাও নূর অর্জিত হয়। বস্তুত হাদীছ কুরআনেরই ব্যাখ্যা। তাই কুরআন যেমন নূর, তেমনি কুরআনের ব্যাখ্যা হাদীছও নূর। এক হাদীছে ইরশাদ হয়েছে,

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: سَمعت رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: نَضَّرَ اللّٰهُ اِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَحَفِظَهُ حَتّٰى يُبَلِّغَهُ، فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلٰى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ. (رواه أبو داؤد في كتاب العلم ٣٦٥٧، والترمذي في باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع ٢٦٥٦)

অর্থাৎ, আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে সমুজ্জ্বল করেন যে আমার কথা শোনে অতঃপর তা পৌঁছে দেয়। অনেক সময় যিনি কোন দ্বীনী বুঝ অন্য থেকে গ্রহণ করেন তিনি তেমন সমঝদার হন না, আর অনেক সময় দ্বীনী বুঝ গ্রহণকারী তা এমন লোকের কাছে পৌঁছে দেন যিনি তার চেয়ে বেশি সমঝদার হন। (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী,)

এ হাদীছে উল্লেখিত نَضَّرَ اللّٰهُ (সমুজ্জ্বল করেন) কথাটির ব্যাখ্যায় প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস হযরত সুফইয়ান ইবনে উয়াইনা বলেন,

مَا مَنْ أَحَدٍ يطلب الحديث اِلَّا وَفِيْ وَجْهِهٖ نَضْرَةٌ أَيْ بَهْجَةٌ صُوْرِيَّةٌ أَوْ مَعْنَوِيَّةٌ لِهٰذَا الْحَدِيْثِ. (مرقاة المفاتيح)

অর্থাৎ, হাদীছ শিক্ষা করে এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির চেহারাতেই প্রভা ও ঔজ্জ্বল্য থাকে, চাই তা বাহ্যিক হোক বা অভ্যন্তরীণ। (মিরকাত)

(৫) আমল দ্বারা নূর পয়দা হয়। হযরত সাহ্‌ল ইবনে সাআদ সাইদী (রা.) বর্ণিত এক হাদীছের শেষাংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

فَإِذَا عَمِلَ الْمُؤْمِنُ عَمَلًا نَارَ فِيْ قَلْبِهٖ نُوْرٌ. (طبراني كبير برقم ٥٨٠٩)

অর্থাৎ, যখন মুমিন কোন আমল করে তার অন্তরে নূর চমকে ওঠে। (তাবারানী কাবীর)

উপরোক্ত হাদীছে যে কোন আমলের দ্বারা কলবে নূর পয়দা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আর এক হাদীছে বিশেষত নামায দ্বারা ঘরে নূর পয়দা হওয়ার কথা বলা হয়েছে। হযরত ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এর রেওয়ায়েতে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهٖ نُوْرٌ فَنَوِّرُوْا بُيُوْتَكُمْ. (مصنف ابن أبي شيبة ٢٥٢١)

অর্থাৎ, মানুষের ঘরে নামায পড়া হচ্ছে নূর। তাই তোমরা তোমাদের ঘরকে নূরান্বিত কর। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীছ নং ২৫২১)

অন্য এক রেওয়ায়েতে নফল নামাযের কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে,

صَلَاةُ الرَّجُلِ فِيْ بَيْتِهٖ تَطَوُّعًا نُوْرٌ فَمَنْ شَاءَ نَوَّرَ بَيْتَهٗ. الحديث. (مسند أحمد حديث رقم ٨٦)

অর্থাৎ, মানুষের ঘরে নফল নামায পড়া হচ্ছে নূর। অতএব কেউ চাইলে তার ঘরকে নূরান্বিত করে নিক। (মুসনাদে আহমদ, হাদীছ নং ৮৬)

(৬) গাম্ভীর্য রক্ষা করে চললে এবং কম হাসলে চেহারায় এক ধরনের নূর থাকে। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে আছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٤٧٣٧. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل برقم ٣٦١. واللفظ للبيهقي)

অর্থাৎ, (হে আবূ যর!) তুমি অধিক হাসা থেকে নিজেকে বিরত রাখ। কারণ অধিক হাসা কলবকে মেরে ফেলে এবং চেহারার নূরকে অপসারিত করে দেয়। (শুআবুল ঈমান ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

(৭) পাকা দাড়ি চুলও এক ধরনের নূর। এক হাদীছে এসেছে–

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ وَقَالَ: إِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ.

(رواه الترمذي في باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب وقال: هذا حديث حسن. حديث رقم ٢٨٢١)

অর্থাৎ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা চুল তুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা তো মুসলমানের নূর। (তিরমিযী)

পাকা চুল দাড়ি কীভাবে নূর এর ব্যাখ্যা চতুর্থ অধ্যায়ের "বৃদ্ধ বয়স ও চুল দাড়িতে কলপ লাগানো" শিরোনামের অধীনে দেখুন।

(৮) আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা এবং আল্লাহর মহব্বতও নূর। আশা হল নেক আমলের মাধ্যমে আল্লাহর থেকে পাওয়ার এক চেতনা আর মহব্বত বা ভালবাসা হল নেক আমল ও আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সব রকম ত্যাগ স্বীকার করার এক চেতনা। হযরত আবূ আলী জুযাজানী বলতেন,

اَلرَّجَاءُ نُوْرٌ مُنَوَّرٌ وَالْمَحَبَّةُ نُوْرُ الْأَنْوَارِ. (شعب الإيمان للبيهقي ٤٦٣)

অর্থাৎ, আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা হচ্ছে বহু উজ্জ্বল নূর আর মহব্বত হচ্ছে সব নূরের নূর। (শুআবুল ঈমান)

(৯) দুআ দ্বারাও নূর অর্জিত হয়। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَلِيٍّ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلدُّعَآءُ سِلاَحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّيْنِ، وَنُوْرُ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ. رواه الحاكم في المستدرك في كتاب الدعاء حديث رقم ١٨٤٨. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي في التلخيص: صحيح.

অর্থাৎ, হযরত আলী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, দুআ হল মুমিনের অস্ত্র, ধর্মের স্তম্ভ আর আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর নূর। (মুস্তাদরকে হাকিম)

সংক্ষেপে দুনিয়াতে নূর অর্জন করার ৯টি আমল হলঃ

১. কুরআন শিক্ষা করলে তথা কুরআনের কথা কলবের মধ্যে ঢোকালে কলবে নূর পয়দা হয়।

২. কুরআন তিলাওয়াত দ্বারাও নূর অর্জিত হয়।

৩. যিকর দ্বারাও কলবে নূর অর্জিত হয়।

৪. হাদীছের কথা শিক্ষা করা এবং শিক্ষা দেয়া দ্বারাও নূর অর্জিত হয়।

৫. আমল দ্বারা নূর পয়দা হয়।

৬. গাম্ভীর্য রক্ষা করে চললে এবং কম হাসলে চেহারায় এক ধরনের নূর থাকে।

৭. পাকা দাড়ি চুলও এক ধরনের নূর।

৮. আল্লাহর রহমতের প্রতি আশা এবং আল্লাহর মহব্বতও নূর।

৯. দুআ দ্বারাও নূর অর্জিত হয়।

আখেরাতে নূর অর্জন করার পদ্ধতি

(১) ঈমানের দ্বারা আখেরাতে নূর অর্জিত হবে। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা.) কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল কেয়ামতের দিন মুমিনগণ কোথায় থাকবেন? তিনি বলেছিলেন,

يُوْضَعُ لَهُمْ كَرَاسِيُّ مِنْ نُوْرٍ، وَيُظَلَّلُ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ، وَيَكُوْنُ ذٰلِکَ الْيَوْمُ أَقْصَرَ عَلَيْهِمْ مِنْ سَاعَةٍ مِنْ نَهَارٍ. (مصنف ابن أبي شيبة حديث رقم ٣٥١٦٢)

অর্থাৎ, তাদের জন্য নূরের কুরছি রাখা হবে, তাদের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করা হবে আর সেদিন তাদের নিকট দিনের এক প্রহরের চেয়েও খাটো মনে হবে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা, হাদীছ নং ৩৫১৬২)

(২) উযূর মাধ্যমে নূর অর্জিত হবে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ اُمَّتِيْ يُدْعَوْنَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ غُرًّا مُّحَجَّلِيْنَ مِنْ اٰثَارِ الْوُضُوْءِ، فَمَنْ اِسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُّطِيْلَ غُرَّتَهٗ فَلْيَفْعَل. متفق عليه. رواه البخاري في كتاب العلم – باب فضل الوضوء والغر المحجلين من آثار الوضوء، ورواه مسلم في كتاب الطهارة – باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء. واللفظ للبخاري.

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন আমার উম্মতকে (জান্নাতের দিকে) ডাকা হবে "গুর্‌রাম মুহাজ্জাল" (অর্থাৎ, হে ঐসকল লোক উযুর চিহ্নের কারণে যারা উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট) বলে। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তির পক্ষে তার উজ্জ্বলতাকে দীর্ঘ করে নেয়া সম্ভব সে যেন তা করে নেয়। (বোখারী ও মুসলিম)

ব্যাখ্যা: "গুর্‌রাম মুহাজ্জাল" বলা হয় এমন ঘোড়াকে, যার হাত, পা ও কপাল ধবধবে সাদা। এখানে উযূর কারণে কেয়ামতের দিন মুমিনের চেহারা উজ্জ্বল হবে এটাই বোঝানো হয়েছে। সুতরাং নির্দিষ্ট স্থান পূর্ণরূপে ভিজিয়ে উত্তমরূপে উযূ করা চাই।

(৩) নামাযের মাধ্যমে নূর অর্জিত হবে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে,

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهٗ ذَكَرَ الصَلاَةَ يَوْمًا فَقَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيْهَا كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا وَبُرْهَانًا وَنَجَاةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ يَكُنْ لَهٗ بُرْهَانٌ وَلاَ نُوْرٌ وَلَا نَجَاةٌ، وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُوْنَ وَهَامَانَ وَفِرْعَوْنَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ. (رواه

الدارمي في كتاب الرقاق – باب في المحافظة على الصلاة حديث رقم ٢٧٢١، وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقات. مجمع الزوائد جـ/١ باب فرض الصلاة. ورواه ابن حبان في صحيحه حديث رقم ١٤٤٨. واللفظ لابن حبان)

অর্থাৎ, হযরত আব্দুল্লাহ ইব্‌নে আম্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত যে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বললেন, যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান থাকে, কেয়ামতের দিন সেই নামায তার জন্য নূর হবে, (হিসাবের সময় নামায তার জন্য) দলীল হবে এবং নামায তার জন্য নাজাতের ওছীলা হবে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি নামাযের প্রতি যত্নবান হবে না, কেয়ামতের দিন নামায তার জন্য নূর ও দলীল হবে না, তার জন্য নাজাতের কোন সনদও থাকবে না; বরং কারূন, হামান, ফেরআউন ও উবাই ইব্‌নে খাল্‌ফ (প্রমুখ জঘন্য কাফের)–এর সাথে তার হাশর হবে। (সহীহ ইব্‌নে হিব্বান, সুনানে দারিমী ও মুসনাদে আহমদ)

হযরত আবূ মালিক আশআরী (রা.) বর্ণিত একটি দীঘ রেওয়ায়েতের একাংশে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. الحديث. (رواه مسلم في باب فضل الوضوء. حديث رقم ٣٢٢)

অর্থাৎ, নামায হল নূর, সদকা হল দলীল আর সবর হল প্রখর আলো। (মুসলিম)

(৪) রোযা দ্বারা নূর পয়দা হবে। হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেছেন,

لَا يَسْتَاكُ الصَّائِمُ بِالْعَشِيِّ وَلٰكِنْ بِاللَّيْلِ، فَإِنَّ يُبُوْسَ شَفَتَيِ الصَّائِمِ نُوْرٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (السنن الكبرى للبيهقي. حديث رقم ٨٤١٩)

অর্থাৎ, রোযাদার যেন বিকেল বেলা মেসওয়াক না করে, বরং সে রাতের বেলা মেসওয়াক করবে। কারণ, রোযাদারের দুই ঠোটের শুষ্কতা কেয়ামতের দিন তার দুই চোখের মাঝে নূর হয়ে দাঁড়াবে। (বায়হাকী)

(৫) সবর দ্বারাও নূর পয়দা হবে। এ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, হযরত আবূ মালিক আশআরী (রা.) বর্ণিত একটি দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে এসেছে, রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

اَلصَّلَاةُ نُوْرٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. الحديث. (رواه مسلم في باب فضل الوضوء. حديث رقم ٢٢٣)

অর্থাৎ, নামায হল নূর, সদকা হল দলীল আর সবর হল প্রখর আলো। (মুসলিম)

উল্লেখ্য, এ হাদীছে নামাযকে বলা হয়েছে নূর (نور) আর সবরকে বলা হয়েছে যিয়া (ضياء) তথা প্রখর আলো। আল্লামা নববী বলেছেন, সবরকে যিয়া বলা হয়েছে তার কারণ হল যিয়া শব্দের অর্থে প্রখরতা রয়েছে। (আল-আরবাঈন) সম্ভবত সবরে কষ্ট-ক্লেষ হয় বিধায় সবর হল এক ধরনের প্রখরতা। তাই তার বদলায় যে আলো প্রদান করা হবে তাতেও থাকবে প্রখরতা।

(৬) কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত হবে নূর। আছ-ছুনানুল কুবরাতে হযরত মা'ক্বিল ইবনে ইয়াছার (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে এসেছে,

وَلِكُلِّ اٰيَةٍ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (السنن الكبرى للبيهقي. حديث رقم ٣٠٢٦٤)

অর্থাৎ, কেয়ামতের দিন প্রত্যেক আয়াতের নূর হবে।

বিশেষত সূরা কাহাফ নূর হওয়া সম্পর্কে রেওয়ায়েতে এসেছে– জুমুআর দিন (জুমুআর নামাযের আগে হোক বা পরে) সূরা কাহাফ তেলাওয়াত করলে তার জন্য একটি দীর্ঘ নূর প্রকাশ পাবে। রেওয়ায়েতটি এই–

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رضـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّوْرِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ الْعَتِيْقِ.

رواه البيهقي في شعب الإيمان. حديث رقم ٢٤٤٤.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমার দিন সূরা কাহাফ পাঠ

করবে, তার জন্য তার থেকে কাবা শরীফ পর্যন্ত দীর্ঘ নূর চমকাতে থাকবে। (শুআবুল ঈমান)

আর এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে−

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رضـ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ فِيْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ أَضَآءَ لَهُ النُّوْرُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ. رواه البيهقي في الدعوات الكبير. كذا في المشكاة، وفي الترغيب رواه النساي (أي في عمل اليوم والليلة) والبيهقي مرفوعا والحاكم مرفوعا وموقوفا، وقال: صحيح الإسناد.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি জুমুআর দিন সূরা কাহাফ পাঠ করবে, তার জন্য এ জুমুআ থেকে ঐ জুমুআ পর্যন্ত নূর চমকাতে থাকবে। (দাওয়াতুল কাবীর, নাসায়ী, বায়হাকী ও হাকিম)

অন্য এক রেওয়ায়েতে আছে−

عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضـ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتْ كَانَتْ لَهُ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهٖ إِلٰى مَكَّةَ. الحديث. رواه الحاكم في المستدرک حديث رقم ٢١١٢ وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي في التلخيص: على شرط مسلم.

অর্থাৎ, হযরত আবূ সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূরা কাহাফ পাঠ করবে যেমন তা নাযেল হয়েছে, কেয়ামতের দিন তার জন্য তার স্থান থেকে মক্কা পর্যন্ত দীর্ঘ এক নূর চমকাতে থাকবে। (মুস্তাদরকে হাকিম)

(৭) ইনসাফ দ্বারা কেয়ামতের দিন নূর অর্জিত হবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الْمُقْسِطِيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ عَلٰى مَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ عَنْ يَمِيْنِ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِيْنٌ. الحديث. (رواه مسلم في فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر برقم ١٨٢٧)

অর্থাৎ, ইনসাফগারগণ দয়াময় আল্লাহ জাল্লা শানুহুর ডানে নূরের মিম্বরের উপর থাকবেন। আর তাঁর উভয় হাতই ডান। (মুসলিম)

(৮) মুসলমানদের পারস্পরিক মহব্বত ভালবাসাও এমন একটা আমল যার দ্বারা কেয়ামতের দিন নূর অর্জিত হবে। নূরের মেম্বর লাভ হবে। হাদীছে এসেছে–

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رض. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَالَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ: اَلْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلَالِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ. رواه الترمذي في أبواب الزهد – باب ما جاء في الحب في الله ٢٣٩٠. وقال: هذا حديث حسن صحيح.

অর্থাৎ, হযরত মুআয ইব্‌নে জাবাল (রা.) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার মর্যাদার খাতিরে যারা একে অপরকে ভালবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) নূরের এমন সুউচ্চ মেম্বর হবে যে, তাদের প্রতি নবী এবং শহীদগণও ঈর্ষা করবে। (তিরমিযী)

আর এক রেওয়ায়েতে এসেছে এরূপ লোকদের চেহারাতে নূর চমকাতে থাকবে। বর্ণিত হয়েছে,

إِنَّ وُجُوْهَهُمْ لَنُوْرٌ وَإِنَّهُمْ عَلٰى نُوْرٍ. الحديث. (رواه أبو داود في كتاب البيوع باب في الرهن. حديث رقم ٣٥٢٤)

অর্থাৎ, অবশ্যই তাদের চেহারা নূরান্বিত হবে আর তারা থাকবে নূরের ওপর। (আবূ দাউদ)

(৯) আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে তার জন্য কেয়ামতে নূর হবে। হযরত কা'ব (রা.) বলতেন,

لِلشَّهِيْدِ نُوْرٌ، وَلِمَنْ قَاتَلَ الْحَرُوْرِيَّةَ عَشَرَةُ أَنْوَارٍ. (مصنف عبد الرزاق برقم ٤٥٣/٩)

অর্থাৎ, শহীদদের জন্য থাকবে নূর। আর খাওয়ারেজদের সঙ্গে যারা জেহাদ করে তাদের জন্য থাকবে দশ নূর। (মুসান্নাফে আব্দুর রজ্জাক)

(১০) আল্লাহর রাস্তায় আহত হলেও তার জন্য কেয়ামতে নূর হবে। হযরত আবুদ্দরদা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَمَنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ خُتِمَ لَهُ بِخَاتَمِ الشُّهُدَاءِ، لَهُ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. الحديث. (مسند أحمد. حديث رقم ٢٧٣٧٦)

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় যার কোন জখম লাগবে তাকে শহীদদের আংটি পরিয়ে দেয়া হবে। কেয়ামতের দিন তাদের জন্য থাকবে নূর। (মুসনাদে আহমদ)

(১১) হজ্জ উমরায় মাথা মুণ্ডন করলে তার বিনিময়ে কেয়ামতে নূর অর্জিত হবে। হযরত ইবনে ওমর (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের শেষে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا حَلَقَ رَأْسَهُ فَلَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ سَقَطَتْ مِنْ رَأْسِهِ نُوْرٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه ابن حبان في صحيحه برقم ١٨٨٧.)

অর্থাৎ, যখন মাথা মুণ্ডন করবে প্রত্যেকটা চুল যা তার মাথা থেকে পড়বে তার বিনিময়ে কেয়ামতের দিন তার জন্য নূর থাকবে। (সহীহ ইবনে হিব্বান)

(১২) রাতের অন্ধকারে মসজিদের গমন করলে তার বিনিময়েও কেয়ামতে নূর হবে। এক হাদীছে বর্ণিত হয়েছে–

عنْ بُرَيْدَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَشِّرِ الْمَشَّآئِيْنَ فِي الظُّلَمِ إِلَى الْمَسَاجِدِ بِالنُّوْرِ التَّامِّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه أبو داود في كتاب الصلاة - باب ما جاء في المشي إلى الصلاة في الظلم ٥٥٧.

অর্থাৎ, হযরত বুরায়দা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যারা অন্ধকারে মসজিদে যায়, তাদেরকে কেয়ামাতের দিন পূর্ণাঙ্গ নূর পাওয়ার সুসংবাদ দিয়ে দাও। (আবূ দাঊদ)

এ হাদীছে পূর্ণাঙ্গ নূর পাওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু কী রূপে সে নূর লাভ হবে সে বিষয়ে কিছু বলা হয়নি। তাবারানী কাবীরে হযরত আবূ উমামা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক রেওয়ায়েতে সে সম্বন্ধে বর্ণনা এসেছে। সে রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

بَشِّرِ الْمُدْلِجِيْنَ إِلَى الْمَسَاجِدِ فِي الظُّلَمِ بِمَنَابِرَ مِنْ نُوْرٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْزَعُ النَّاسُ وَلَا يَفْزَعُوْنَ. (طبراني كبير برقم ٧٥١٨)

অর্থাৎ, যারা রাতের অন্ধকারে মসজিদে গমন করে তাদের জন্য কেয়ামতের দিন নূরের মিম্বর পাওয়ার সুসংবাদ দিয়ে দাও। সেদিন সমস্ত মানুষ ভীত হবে কিন্তু তারা ভীত হবে না। (তাবারানী কাবীর)

(১৩) পাকা চুল দাড়ি দ্বারা দুনিয়াতে যেমন নূর হবে, তেমনি কেয়ামতেও নূর হবে। এক রেওয়ায়েতে এসেছে–

عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَسَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَانَتْ لَهٗ نُوْرًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه الترمذي في باب ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله ١٦٣٥ وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب.)

অর্থাৎ, হযরত আমর ইবনে আবাছাহ (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় শুভ্র হবে (অর্থাৎ, তার চুল দাড়ি পাকবে।) এটা কেয়ামতের দিন তার জন্য নূর হবে। (তিরমিযী)

সংক্ষেপে আখেরাতে নূর অর্জন করার ১৩টি আমল হল।

(১) ঈমানের দ্বারা নূর অর্জিত হবে।
(২) উযূর মাধ্যমে নূর হবে।
(৩) নামাযের মাধ্যমে নূর অর্জিত হবে।
(৪) রোযা দ্বারা নূর হবে।
(৫) সবর দ্বারা নূর হবে।

(৬) কুরআনের প্রত্যেকটি আয়াত হবে নূর।
(৭) ইনসাফ দ্বারা নূর হবে।
(৮) মুসলমানদের পারস্পরিক মহব্বত দ্বারা নূর হবে।
(৯) আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হলে নূর হবে।
(১০) আল্লাহর রাস্তায় আহত হলে নূর হবে।
(১১) হজ্জ উমরায় মাথা মুণ্ডন করলে নূর হবে।
(১২) রাতের অন্ধকারে মসজিদের গমন করলে নূর হবে।
(১৩) পাকা চুল দাড়ি কেয়ামতে নূর হবে।

নূর নষ্ট হওয়ার কারণসমূহ

কুরআন হাদীছ ও বুযুর্গানে দ্বীনের উক্তির আলোকে দেখা যায় ১০টা বিষয় এমন রয়েছে, যার কারণে নূর নষ্ট হয়ে যায়। নিম্নে উক্ত ১০টা বিষয়ের বিবরণ পেশ করা হল।

(১) গোনাহ দ্বারা কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়। যেমন একটা কাঁচের উপর ময়লা পড়তে থাকলে সেই কাঁচের উজ্জ্বলতা লোপ পায়। গোনাহ হল এক ধরনের ময়লা। প্রত্যেকটা গোনাহ দ্বারা অন্তরের কাঁচের উপর এক একটা কাল দাগ পড়তে থাকে। এভাবে ক্রমাগত ময়লা এবং কাল দাগ পড়তে পড়তে কলবের নূর তথা উজ্জ্বলতা লোপ পেয়ে যায়। এক হাদীছে এসেছে,

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضـ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَخْطَأَ خَطِيْئَةً نُكِتَتْ فِيْ قَلْبِهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِذَا هُوَ نَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ وَتَابَ صُقِلَ قَلْبُهُ، وَإِنْ عَادَ زِيْدَ فِيْهَا حَتّٰى تَعْلُوَ قَلْبَهُ، وَهُوَ الرَّانُ الَّذِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ – ﴿كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ﴾. (رواه الترمذي في كتاب التفسير – سورة ويل للمطففين ٣٣٣٤ وقال: هذا حديث حسن صحيح.)

অর্থাৎ, হযরত আবূ হুরায়রা (রা.) বলেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, বান্দা যখন গোনাহ করে (তার অন্তরে) একটা কাল দাগ পড়ে, অনন্তর তা থেকে বিরত হয়ে তাওবা-ইস্তিগফার করলে তার অন্তর জংমুক্ত হয়ে যায়। আবার গোনাহ করলে আরও বেশি জং পড়ে এমনকি জং তার অন্তরকে

ছেয়ে ফেলে। এটা হল ঐ জং যার কথা আল্লাহ **كَلاَّ بَلْ رَانَ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ مَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ** আয়াতে উল্লেখ করেছেন। (তিরমিযী) আয়াতের অর্থ হল– তাদের কৃতকর্মই তাদের অন্তরসমূহে জং ধরিয়েছে। (সূরা আত-তাতফীফ: ১৪)

ব্যাখ্যা: লোহার উপর জং বা মরিচা পড়লে রেত দ্বারা ঘষে সেই জং দূর করা হয়। তদ্রূপ কলবের উপর জং বা মরিচা পড়লে তাওবা দ্বারা এই জং পরিষ্কার করা যায়।

এখন বুঝতে হবে কলবের জং কি এবং সেই জং পরিষ্কার না করলে কি ক্ষতি হয়, আর পরিষ্কার করলে কি লাভ হয়। কলবের জং হল পাপের ময়লা। পাপ করলে কলবের উপর কালো দাগ পড়ে। পাপ করতে করতে এবং তার কলবে কালো দাগ পড়তে পড়তে এক সময় তার অন্তর সম্পূর্ণ কালিমাযুক্ত হয়ে যায়। আলোচ্য হাদীছে বলা হয়েছে, কলবের সেই কালো দাগ তথা কলবের জংকে দূর করার উপায় হল তওবা-ইস্তিগফার। তওবা- ইস্তিগফার দ্বারা কলবের জং দূর হবে আর কলবের জং দূর হলে কুরআন- হাদীছের নূর ভেতরে প্রবেশ করবে, দ্বীনের সব কথা কলবের কাছে পরিষ্কার মনে হবে, দ্বীন সম্বন্ধে সব অস্পষ্টতা কেটে যাবে, ইবাদত করতে ভাল লাগবে, ইবাদত-বন্দেগীতে মজা বোধ হবে।

(২) অধিক হাসা দ্বারা চেহারার নূর নষ্ট হয়ে যায়। হযরত আবূ যর গিফারী (রা.) কর্তৃক বর্ণিত এক দীর্ঘ রেওয়ায়েতের একাংশে আছে, (যা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে,) রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِيَّاكَ وَكَثْرَةَ الضِّحْكِ فَإِنَّهُ يُمِيْتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُوْرِ الْوَجْهِ. (رواه البيهقي في شعب الإيمان برقم ٤٧٣٧. ورواه ابن حبان في صحيحه في حديث طويل برقم ٣٦١. واللفظ للبيهقي)

অর্থাৎ, (হে আবূ যর!) তুমি অধিক হাসা থেকে নিজেকে বিরত রাখ। কারণ অধিক হাসা কলবকে মেরে ফেলে এবং চেহারার নূরকে অপসারিত করে দেয়। (শুআবুল ঈমান ও সহীহ ইবনে হিব্বান)

(৩) যেনা করলে কলবের নূর দূর হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বে হাদীছ উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন, ঈমান হল নূর। যে যেনা করে তার থেকে ঈমান (-এর নূর) পৃথক হয়ে যায়। তার পর যে

নিজেকে তিরস্কার করে ফিরে আসে, ঈমান (-এর নূর) তার কাছে ফিরে আসে। (মুসান্নাফে ইবনে আবী শাইবা হাদীছ নং ৩১০০৫)

(৪) শরাব খেলে কলবের নূর দূর হয়ে যায়। এক হাদীছে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

لاَ يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِيْنَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، يُنْزَعُ مِنْهُ نُوْرُ الإِيْمَانِ كَمَا يَخْلَعُ أَحَدُكُمْ قَمِيْصَهُ فَإِنْ تَابَ تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ. (الإبانة الكبرى ١١٥٢)

অর্থাৎ, শরাবখোর যখন শরাব খায় তখন সে মুমিন থাকে না। তার থেকে ঈমানের নূর ছিনিয়ে নেয়া হয়। যেমন তোমাদের কারও শরীর থেকে জামা খুলে নেয়া হয়। তার পর সে তওবা করলে আল্লাহ তার তওবা কবূল করেন (এবং ছিনিয়ে নেয়া নূর তাকে পুনঃপ্রদান করা হয়।) (আল-ইবানাতুল কুবরা)

(৫) পাকা চুল, দাড়ি উঠালে নূর বিদূরীত হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদা চুল তুলে ফেলতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন, এটা তো মুসলমানের নূর। (তিরমিযী) অতএব সাদা চুল দাড়ি তুলে ফেললে নূর বিদূরীত হয়ে যাবে।

(৬) হাছাদ দ্বারা নূর নষ্ট হয়ে যায়। এক হাদীছে এসেছে– রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الْحَسَدَ يُطْفِئُ نُوْرَ الْحَسَنَاتِ. الحديث. (رواه أبو داود في كتاب الأدب باب في الحسد. حديث رقم ٤٨٩٦)

অর্থাৎ, অবশ্যই হাছাদ তথা পরশ্রীকাতরতা নেক আমলসমূহের নূর মিটিয়ে দেয়। (আবূ দাউদ)

(৭) অহংকার দ্বারা কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়। এক হাদীছে এসেছে, নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেছেন,

مَثَلُ الرَّافِلَةِ فِي الزِّيْنَةِ فِيْ غَيْرِ أَهْلِهَا كَمَثَلِ ظُلْمَةٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ نُوْرَ لَهَا.

(رواه الترمذي في باب ما جاء في كراهية خروج النساء ١١٦٧)

অর্থাৎ, যে নারী সৌন্দর্যের জন্য অন্যায়ভাবে পরিধানের কাপড় মাটিতে ঝুলিয়ে হাঁটে, কেয়ামতের দিন সেটা অন্ধকারের মত হবে, তার জন্য কোন নূর থাকবে না। (তিরমিযী)

(৮) কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করলে কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়। হযরত হাছান বসরী (রহ.) বলেছেন,

مَنْ فَسَّرَ ايَةً مِنَ الْقُرْآنِ بِرَئْيِهِ فَأَصَابَ لَمْ يُؤْجَرْ، وَإِنْ أَخْطَأَ مُحِيَ نُوْرُ تِلْكَ الْاٰيَةِ مِنْ قَلْبِهِ. (الابانة الكبرى ٨١٣)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মনগড়া কুরআনের কোন আয়াতের ব্যাখ্যা করবে আর সেটা সঠিক ব্যাখ্যাই করবে, তাতে তার কোন ছওয়াব হবে না। আর যদি ভুল ব্যাখ্যা দেয় তাহলে তার অন্তর থেকে ঐ আয়াতের নূর মুছে দেয়া হবে। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

(৯) বেদআতীদের সাহচর্য দ্বারা নূর নষ্ট হয়ে যায়। সাধারণ নিয়ম হল পাপ দ্বারা কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়। এ ব্যাপারে এই পরিচ্ছেদের শুরুতে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। পাপ দ্বারা যেমন কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়, তেমনি পাপীদের সাহচর্য দ্বারাও নূর নষ্ট হয়ে যায়, কারণ পাপীদের সাহচর্যে থাকাও পাপ। বিশেষত বেদআতীদের সাহচর্য দ্বারা, বেদআতীদেরকে ভালবাসা দ্বারা কলবের নূর নষ্ট হয়ে যাওয়ার বিষয়টা বুযুর্গানে দ্বীন খাস করে উল্লেখ করেছেন। হযরত ফুযায়েল ইবনে ইয়ায (রহ.) বলেছেন,

مَنْ جَلَسَ إِلٰى صَاحِبِ بِدْعَةٍ أَوْرَثَهُ اللّٰهُ الْعُمْيَ يِعْنِيْ فِيْ قَلْبِهِ. وَقَالَ: مَنْ اَحَبَّ صَاحِبَ بِدْعَةٍ أَحْبَطَ اللّٰهُ عَمَلَهُ، وَاَخْرَجَ نُوْرَ الْإِسْلَامِ مِنْ قَلْبِهِ. وَقَالَ: لَا تَجْلِسْ مَعَ صَاحِبِ بِدْعَةٍ، فَإِنِّيْ اَخَافُ اَنْ تُنْزَلَ عَلَيْكَ اللَّعْنَةُ. (الإبانة الكبرى ٤٣٧ و ٤٤٠ و ٤٤١)

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি বেদআতীদের সাহচর্যে থাকবে আল্লাহ তার অন্তরে অন্ধত্ব (নূরের বিপরীত অবস্থা) সৃষ্টি করে দিবেন। তিনি আরও বলেছেন, যে ব্যক্তি বেদআতীকে ভালবাসবে আল্লাহ তার আমল নষ্ট করে দিবেন এবং তার কলব থেকে

ইসলামের নূর বের করে দিবেন। তিনি আরও বলেছেন, বেদআতীদের কাছে বসো না। কারণ, আমার আশংকা হয় তোমার ওপর লা'নত বর্ষিত হবে। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

(১০) ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কুটিলতা এবং অহেতুক প্রশ্নও কলবের নূর নষ্ট করে দেয়। 'আল-ইবানাতুল কুবরা' নামক হাদীছের কিতাবের সংকলক ইবনে বাত্তা বলেছেন, আমার শায়েখ বলেন, আমি চিন্তা-ফিকির করে দেখেছি মানুষ কেন আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত থেকে বিচ্যুত হয়ে যায়, কেন তারা বেদআতের দিকে ঝোকে, কেন তাদের মধ্যে আত্মিক বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয় এবং কেন তাদের কলব থেকে আত্মিক বিচক্ষণতা ও অন্তর্দৃষ্টির নূর অপসারিত হয়ে যায়। আমি বুঝেছি তার কারণ দুটো। এক. ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কুটিল আলোচনা এবং অহেতুক প্রশ্ন। দুই. যাদের সাহচর্য ফিতনা থেকে মুক্ত নয় এবং যাদের সাহচর্য কলবকে ধ্বংস করে দেয়- এমন লোকদের সঙ্গে উঠা-বসা। (আল-ইবানাতুল কুবরা)

সংক্ষেপে নূর নষ্ট হয়ে যাওয়ার ১০টা কারণ হল:

(১) গোনাহ দ্বারা কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(২) অধিক হাসা দ্বারা চেহারার নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(৩) যেনা করলে কলবের নূর দূর হয়ে যায়।

(৪) শরাব খেলে কলবের নূর দূর হয়ে যায়।

(৫) পাকা চুল, দাড়ি উঠালে নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(৬) হাছাদ দ্বারা নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(৭) অহংকার দ্বারা কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(৮) কুরআনের মনগড়া ব্যাখ্যা করলে নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(৯) বেদআতীদের সাহচর্য দ্বারা নূর নষ্ট হয়ে যায়।

(১০) ধর্মীয় বিষয় নিয়ে কুটিলতা এবং অহেতুক প্রশ্ন দ্বারা কলবের নূর নষ্ট হয়ে যায়।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে নূর নষ্ট হওয়ার এসব কাজ থেকে হেফাজত করুন। আমাদের জীবনকে নূরে নূরান্বিত করে দিন। আমীন!

সমাপ্ত

গ্রন্থপঞ্জী

الإبانة الكبرى لابن بطة

إتحاف السادة المتقين للزبيدي

احسن الفتاوی ، مفتی رشید احمد

احکام میت ، عارف باللہ مولنا ڈاکٹر محمد عبد الحہ

اصلاح انقلاب امت ، اشرف علی تھانوی

اصلاحی خطبات ، مولانا تقی عثمانی

الاعتدال في مراتب الرجال (اسلامی سیاست) شیخ محمد زکریا سہارنپوری

بہشتی زیور، اشرف علی تھانوی

بیان القرآن، اشرف علی تھانوی

تحفۂ زوجین، ترتیب دادہ از رسائل اشرف علی تھانوی

تذکره السامع والمتکلم لبدر الدين بن جماعة

تربیت اولاد، اشرف علی تھانوی

تعليم المتعلم للزرنوجي

التمثيل والمحاضرة للثعالبي

تنبيه الغافلين للفقيه أبي الليث السمرقندي

جامع الأحاديث للسيوطي

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي

الجامع الصغير للسيوطي

حاشية السندي للإمام أبي الحسن السندي

حلية الأولياء لأبي نعيم

دینی دعوت کے قرآنی اصول ، قاری محمد طیب

زوائد ابن ماجة للبوصيري

سنن ابن ماجة للإمام أبي عبد الله ابن ماجة القزويني

سنن أبي داود للإمام أبي داود السجستاني

سنن الترمذي للإمام أبي عيسى الترمذي

سنن الدارمي للحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي السمرقندي

السنن الكبرى للبيهقي

سنن النسائي للإمام النسائي

سیرت مصطفیٰ، مولنا ادریس کاندہلوی

شرح الأربعين للنووي

شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي

شعب الإيمان للبيهقي

صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري

صحيح مسلم للإمام مسلم بن الحجاج

صحيح ابن حبان للإمام أبي حاتم ابن حبان الخراساني

طبقات شعرانی

فقه اللغة وأسرار العربية للثعالبي

قيمة الزمن عند العلماء للشيخ عبد الفتاح أبي غدة

كتاب الأذكار للنووي

كشف الخفاء ومزيل الإلباس للعجلوني

كنز العمال لعلي المتقي الهندي

گناہ بے لذت ، مفتی محمد شفیع

مجمع الزوائد لنور الدين الهيثمي

المدخل للبيهقي

المستدرک للحاکم

مسند أبي يعلى للإمام أبي يعلى الموصلي

مسند أحمد للإمام أحمد بن محمد بن حنبل

مسند البزار (البحر الزخار) للإمام أبي بكر البزار

المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي لأحمد بن محمد الفيومي

المصنف لابن أبي شيبة

المصنف لعبد الرزاق

المطالب العالية لابن حجر العسقلاني

معجم الأفعال المتعدية بحرف لموسى بن محمد بن الملياني الأحمدي

المعجم للطبراني

معارف القرآن، مفتی محمد شفیع

مفاتيح الجنان شرعة السلام ليعقوب بن سيد علي

المقاصد الحسنة للإمام السخاوي

ملفوظات محدث کشمیری

আহকামে যিন্দেগী, মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ, মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
ইসলামী মনোবিজ্ঞান, মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন
ফিকহুন্ নিছা, মাওলানা মুহাম্মাদ হেমায়েত উদ্দীন

লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

১. আহকামে যিন্দেগী
২. ফাযায়েলে যিন্দেগী
৩. ইসলামী আকীদা ও ভ্রান্ত মতবাদ
৪. ফিক্‌হুন নিছা
৫. আহকামুন নিছা
৬. বয়ান ও খুতবা ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড
৭. আহকামে হজ্জ
৮. ইসলামী মনোবিজ্ঞান
৯. কুরআন হাদীছ ও ইসলামী ইতিহাসের মানচিত্র

১০. কথা সত্য মতলব খারাপ
১১. চশমার আয়না যেমন
১২. ভাষা ও সাহিত্য প্রশিক্ষণ
১৩. দাওয়াত ও তাবলীগের মূলনীতি
১৪. তলোয়ারে নয় উদারতায়
১৫.
১৬.

প্রাপ্তিস্থান
মাকতাবাতুল আবরার
ইসলামী টাওয়ার, ১১/১, বাংলাবাজার,
ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১২-৩০৬৩৬৪